৩৯শ বর্ষ
(১৩৪৩ মাঘ হইতে ১৩৪৪ পৌষ)

সম্পাদক
স্বামী সুন্দরানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০] [প্রতি সংখ্যা।০

উদ্বোধন—বর্ষ-সূচী

(মাঘ ১৩৪৩—পৌষ ১৩৪৪)

উদ্বোধন—বর্ষ-সূচী

উদ্বোধন—বর্ষ-সূচী

উদ্বোধনের নববর্ষ

সম্পাদক

দেখিতে দেখিতে উদ্বোধন-পত্রের আর একটী বৎসর অনন্ত কালের গর্ভে চিরতরে অন্তর্হিত হইল। আজ (১লা মাঘ, ১৩৪৩ সন) 'উদ্বোধন' ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' তাহার প্রচ্ছদ-পট-দেহ-উদ্‌গীত উপনিষদের ওজঃপ্রদ "উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত" বাণী অসংখ্য নিবন্ধসহায়ে শুনাইয়া এই সুষুপ্ত জাতিকে জাগাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার ভার দেশের চিন্তাশীল বুধমণ্ডলীর উপর। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকাই সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ-পরিচালিত 'উদ্বোধনে'র একমাত্র জীবনাদর্শ। এই ব্রত উদ্‌যাপনে আজ এই শুভ নববর্ষে 'উদ্বোধন' তাহার 'লোকসংগ্রহ'-কর্ম্মব্রতী লেখক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

গত ফাল্গুন হইতে সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, আগামী চৈত্র মাসে ইহা পরিসমাপ্ত হইবে। এই কয়েক মাসের মধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশে এই দেব-মানবের শতবার্ষিকী উৎসব যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের পর ভারতের ধর্ম্ম ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আর এমন ভাবে জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাস প্রমাণ দেয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা শত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাই

ইদানীং তথাকথিত পৌত্তলিক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবন এবং সহজ সরল উপদেশের মধ্যে মানুষমাত্রেরই জীবন-সমস্যার সমাধান দেখিতে পাইতেছেন।

পাশ্চাত্যজাতি এখন ভোগের শেষ সীমায় উপনীত। এই ভোগ সমগ্র মানবজাতির হিতার্থে নিয়ন্ত্রিত হইতে অসমর্থ হইয়া পৃথিবীর শান্তি-সুখ হরণ করিয়াছে। অধুনা প্রতীচ্য জাতিসমূহ ভোগ স্বার্থের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিস্ফোরক-স্তূপের উপর উপবিষ্ট! যে কোন সময়ে একটু অগ্নি-সংযোগ হইলেই সকলে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে! এই দৃশ্য দেখিয়া পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মনীষিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালোকে অলোকিত বেদান্তের সাম্য ধর্ম্মের মধ্যে এই সমস্যা সমাধানের সন্ধান পাইয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আহূত সভাসমূহে তথাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের বক্তৃতার ভিতর দিয়া এই সত্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী উৎসবের ব্যাপকতার মূলও এইখানে। সেদিন লণ্ডন নগরীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী উৎসব-সভায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্যর্ ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্ব্যাণ্ড বলিয়াছেন, "The West is now prepared to receive spiritual messages from the East and specially from Sri Ramkrishna who is not only the greatest spiritual genius in India of the present age but also one of the greatest men of all times" এই সময় যদি শত শত "আশিষ্ঠো দ্রঢিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ" এবং মেধাবী ভারতীয় যুবক বুদ্ধের হৃদয়বত্তা, শঙ্করের মস্তিষ্ক, খৃষ্টের ভক্তি ও রামকৃষ্ণের সমন্বয় লইয়া প্রতীচ্যে যাইয়া বেদান্তের যুক্তি সহায়ে সকল জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ বিরাট ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে অগ্রসর হন এবং ধর্ম্মকে নিজ জীবন দিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে ভারতের আধ্যাত্মিকতা যথার্থই পাশ্চাত্য বিজয় করিতে সমর্থ হইবে। শত সমস্যা-সমাকুল হিন্দু-ভারতের বিজয়াভিযানের এই পথ যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ নিজ জীবন দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে দেশের শিক্ষিত হিন্দু তরুণবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতবর্ষের অনেকস্থানে—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের অগণন সহর-পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সকল উৎসবের সংক্ষিপ্ত সংবাদ 'উদ্বোধন' এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্থানীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনের উপর যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

দেশের আপামর জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন গঠন করিতে এই প্রকার উৎসবের উপযোগিতা অসাধারণ। দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মের প্রাণ হইলেও ইহার জটিলতত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানগম্য নহে। আনুষ্ঠানিক পূজা-পার্ব্বণ এবং উৎসবাদির ভিতর দিয়াই সাধারণের মধ্যে সকল দেশে সকল কালেই ধর্ম্ম ও নীতি বিস্তারলাভ করিয়াছে। সাধারণ লোক ধর্ম্ম বলিতে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াই বুঝিয়া থাকে। আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবাদির সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে এককালে বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের মূলেও আমরা এই দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের বিখ্যাত তীর্থস্থানসমূহ এবং উৎসবাদি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি সম্প্রসারণে কম সাহায্য করিতেছে না। ধর্ম্ম-সাধনের জন্যও

এইরূপ আনুষ্ঠানিক উৎসব সাধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য। এ সম্বন্ধে গত জুলাই মাসে লণ্ডন নগরীতে অনুষ্ঠিত "World Fellowship of Faiths"এর একটী সভায় বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্যর্ রাধাকৃষ্ণনন্ বলিয়াছেন—"* * Even as the soul fashions for itself a body to complete its otherwise imperfect life on earth, so man's thoughts and ideas tend to mbody themselves in some concrete form, which appeals to the imagination and the senses, but there is no reason why we should force others to adopt the same forms and apprehend things exactly as we apprehend them So far as outer expressions are concerned, there must be freedom of manifestation All that we need insist on is that the outward visible expression must be entirely governed and obedient to the ever-growing inward Truth. Dogmas and rites are not unnecessary or unworthy or negligible, for they are aids and supports to religion, though they are not its essence Dogma is a temporary mould into which spiritual life may flow but it should not become a prison in which it dies An idea is a power, not when it is simply professed but when it is inwardly creative A symbol is there to help us to realise in life the thing symbolised" যাঁহারা সার্ব্বজনীন উৎসবাদিকে "দীয়তাং ভুজ্যতাং"-ধর্ম্মমাত্র মনে করিয়া অবহেলা করেন, জগৎপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের উদ্ধৃত বাক্যের প্রতি তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দেশের সকলের সঙ্গে যোগসূত্র সংস্থাপনের দিক দিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর ন্যায় সার্ব্বলৌকিক উৎসবের বিশেষ উপযোগিতা আছে। হিন্দুজাতি ধর্ম্ম ও সমাজে শতধা বিচ্ছিন্ন। কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা সামাজিক ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া সকল হিন্দুর একযোগ হইবার পথ রুদ্ধ। হিন্দু-সমাজের এক অঙ্গের সঙ্গে অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগাযোগ নাই, এক অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য অপর অঙ্গ বেদনা বোধ করে না। এ অবস্থায় যত অধিক ব্যাপারে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দু একযোগ হইবার সুযোগ পায়, ততই শ্রেয়। পূর্ব্বে দেশের ধনবান হিন্দুমাত্রেরই আলয়ে জাঁকজমকপূর্ণ পূজাপার্ব্বণাদি ব্যাপারে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দু একযোগ হইয়া আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইত। এইভাবে যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া লোক-শিক্ষার চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। ইদানীং নানা কারণে এই সকল প্রথা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে, ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর দেশবাসীর একযোগ হইবার ক্ষেত্রও সেই অনুপাতে কমিয়া আসিতেছে। অবশ্য অধুনা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্বার্থে দেশের লোককে একযোগ করিবার চেষ্টা চলিতেছে, এবং এই সকল বিষয়েরও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে, কিন্তু অতি মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে প্রয়োজন বোধ না হইলেও আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা আছে এবং ইহা নিবারণের জন্য সার্ব্বজনীন উৎসবাদির আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পূজা-উৎসব, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-প্রচার এবং 'নর-নারায়ণ'-সেবা হিন্দুর স্বগৃহে সাম্য স্থাপন এবং হিন্দুকে অহিন্দু জাতিসমূ-

হের সহিত ঐক্যবদ্ধ করিতে কতদূর সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার ভার দেশের চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দের উপর।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন ভারতের বিক্ষিপ্ত আপাতবিরোধী পারমার্থিক শক্তিসমূহকে তাঁহার প্রচারিত "যত মত তত পথের" ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিতে, জগতের ধর্ম্ম-বিরোধ চিরতরে বিনষ্ট করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে। ইদানীন্তন ভারতের সর্ব্বতোমুখী জাতীয় জাগরণের আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমাচ্ছন্ন ভারতে এক ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ভারতে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্বার্থ ভারতের আভ্যন্তর বিরোধ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে অসমর্থ। দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রীয় মতবাদ এক বা একাধিক বিষয়ে মানুষের মধ্যে সাম্য স্থাপনে সমর্থ হইলেও ইহা আবার অনেকদিক দিয়া অসাম্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের কথাই ধরা যাক্, এই বহুজন-সমর্থিত মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যস্থাপনে অনেকটা কৃতকার্য্য হইলেও ইহার অনুসরণে দেশের জন-সাধারণের স্বার্থ-সংরক্ষণের নামে রাষ্ট্রক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় শক্তিশালী লোকের আধিপত্য বিস্তার এবং ধন-শ্রম-বিদ্যা ও শক্তিগত শ্রেণি-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। এ যেন ঔষধের প্রভাবে মানুষের এক অঙ্গের ব্যাধিকে অপর অঙ্গে লইয়া যাওয়া। অতএব কোন বাহ্যিক উপায় অবলম্বনে জগতে মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য সংস্থাপন সম্ভবপর নহে। রাষ্ট্রীয় মত, সমস্বার্থবাদ, আইন, সৈন্য বা পুলিশ মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ। অবশ্য মানুষের মধ্যে শান্তি ও সাম্য সংস্থাপনের জন্য এই সকল বাহ্যিক উপায়ের আবশ্যকতা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু প্রকৃত সাম্য স্থাপনের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। মানুষের শরীরের ব্যাধি দূর করিতে যেমন সুচিকিৎসককে ইহার মূল ধরিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, তেমন মানবজাতির মধ্যে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। প্রাচুর্য্যের মধ্যে অনুকূল অবস্থায় সমাজ, লোকলজ্জা, আইন বা পুলিশের ভয়ে অনেককে ভাল-মানুষ 'সাজিতে' দেখা যায়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া আপন স্বার্থ চরিতার্থের সম্পূর্ণ সুযোগ পাইয়াও যিনি 'ভাল-মানুষ' থাকিতে পারেন, তিনিই যথার্থ 'ভাল-মানুষ'। এইরূপ 'ভাল-মানুষ' হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই মনের পরিবর্ত্তন। একমাত্র প্রকৃত 'ধর্ম্ম-জ্ঞান'ই মানুষের মনে এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সক্ষম। এ কথার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপে বলা যায় যে, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ পারমার্থিক মতবাদ প্রচার করিয়া সমগ্র জগতে মানুষের মনোরাজ্যে যে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোন ঐহিক মতবাদ প্রচারের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। এইজন্য মানুষের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ 'ধর্ম্মের' উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। মানুষ যদি মনে প্রাণে বুঝিতে পারে যে, মানুষমাত্রই আত্মা হিসাবে এক ও অভেদ, সুতরাং অপরের ইষ্টানিষ্ট এবং তাহার নিজের ইষ্টানিষ্ট একই কথা, তাহা হইলে তাহার আভ্যন্তর প্রকৃতিও তদনুরূপ হইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক প্রকৃতি—প্রতি কথা ও কাজ অপরিহার্য্যরূপে ঐ ভাবের অভিব্যক্তিমূলক হইতে বাধ্য হইবে। ধর্ম্মমত-সমূহে যতই বাহ্যিক ভিন্নতা দৃষ্ট হউক না কেন, মানুষকে 'সমদর্শনে' উপনীত করাই সকল ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য। যুগধর্ম্মাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার

সাধন-জীবন সহায়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্ম বিভিন্ন পথ দিয়া মানুষকে একত্বরূপ চরম সাম্যে উপনীত করিতে সক্ষম। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ধর্ম্মের দিক দিয়া মানুষের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী সংস্থাপনে ব্রতী।

বর্ত্তমানযুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রবর্ত্তিত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-সাধন ধর্ম্ম-বিরোধ দূর করিয়া জগতের ধর্ম্মরাজ্যে যে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে, ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্তও তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাই ভারতব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের উল্লাস-সঞ্জাত উত্তেজনার অবসানে এই কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় গভীর নিরাশা-ব্যথিত হইয়া উঠে। আজও ধর্ম্ম অপেক্ষা ধর্ম্মমতবিশেষকে উচ্চস্থান দিয়া ভারত উৎকট সাম্প্রদায়িকতা-বিষে জর্জ্জরিত। আজও ভারতবাসী ধর্ম্ম-বিরোধরূপ বিষবৃক্ষের নিম্নে বাস করিয়া বিষমস্থ—উত্থানশক্তিহীন পঙ্গু। এই ধর্ম্ম-বিরোধ-ব্যাধি ভারতের সমাজের সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। অবশ্য এই বিরোধের মূলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ নিহিত আছে সত্য, কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতের সমষ্টি-জীবনকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করিবার পথে ধর্ম্ম ও সমাজ-বিরোধ আজও পর্ব্বতপ্রমাণ বাধারূপে বর্ত্তমান। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, দেশময় সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও তৎপ্রবর্ত্তিত 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' দেশবাসী এ পর্য্যন্তও কর্ম্মজীবনে পরিণত করিতে পারে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিচয়ে তাঁহার জীবন-বেদ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করিয়াছেন, "সততবিবদমান আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্ব্বথা বিপরীত আচার-সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্মনামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশ-কালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-খণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে, এবং কাল-বশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নবযুগধর্ম্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান, এবং এই নবযুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ।—হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর।" ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলেখ্য দেশবাসীর ঘরে ঘরে বিরাজিত, কিন্তু এই প্রতিকৃতির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা-প্রদর্শন তখনই যথার্থ সার্থক হইবে, যখন তাহারা সর্ব্ববিধ বিরোধের অবসান ঘটাইয়া স্বগৃহে সাম্য-মৈত্রী স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতানুসরণকারী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করিতে যাঁহারা গৌরব-বোধ করেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব সমধিক। দেশের লোক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদিগকে সর্ব্ববিধ মহৎ ভাবের প্রতি-নিধিরূপে দেখিতে চান, এবং তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবকে অভিব্যক্ত দেখিতে ইচ্ছা করেন। প্রকৃত-পক্ষেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-ধারা যাঁহার জীবন দিয়া উচ্ছলিত আবেগে প্রবাহিত হয় না, তাঁহাকে তাঁহাদের যথার্থ অনুগামী বলা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবরূপ পরশমণির স্পর্শে যিনি সোনা হইয়াছেন, তিনিই তাঁহাদের প্রকৃত ভাবের স্পর্শ পাইয়াছেন। তাঁহাদের দেব-ভাবের প্রভাবে যিনি দেবত্বলাভ না করিলেন, তিনি তাঁহা-দের কিসের ভক্ত? যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দের ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনাপেক্ষা তাঁহাদের ভাবকে কর্ম্ম-জীবনে পরিণত করিতে সমধিক যত্নপরা-য়ণ তাঁহারাই তাঁহাদের প্রকৃত ভক্ত। সকল বিষয়ে

চিরাচরিত গড্ডলিকা প্রবাহে যাঁহারা গাত্র ভাসাইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত বলা যায় না। সাধারণ মানুষ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তগণের একটা মহত্ত্ব-মণ্ডিত বৈশিষ্ট্য থাকা চাই; ধর্ম্মসাধন, দরিদ্র-নারায়ণসেবা, স্বদেশসেবা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অলঙ্ঘ্যনীয়। উচ্চভাব মনে মনে পোষণ করিলেই উহা সার্থক হয় না, বাহ্যিক সৃজনি-শক্তি বিকাশের মধ্যেই উহার সার্থকতা নিহিত।

আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন, আজ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তৎপ্রচারিত আদর্শ অবলম্বনে ভারতের অতীত যুগের গৌরবোজ্জ্বল মহত্ত্বের সঙ্গে বর্ত্তমান আবশ্যকতার সামঞ্জস্যে সমগ্র দেশের আদর্শস্থানীয় এমন একটী সর্ব্বাঙ্গীণসম্পূর্ণ উন্নত সমাজ আজ পর্য্যন্তও গড়িয়া উঠিল না, যাহার আবহাওয়া দেশে মানুষের মত মানুষের অভাব ঘুচাইতে থাকিবে এবং যাহার প্রভাব সমগ্র দেশকে দিকে দিকে বিজয়ের অভিযানে জয়যুক্ত করিবে। দেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার ও সংগঠনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আজও ভয়াবহ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার জগদ্দল পাষাণ দেশের বক্ষের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, আজও অস্পৃশ্যতাপ্রমুখ শত শত স্বগৃহ উচ্ছেদকারী সমাজনীতি দেশকে ধ্বংসের দিকে লইয়া চলিয়াছে, বিশ্বময় রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সমাজনৈতিক বন্ধন-মুক্তির তুমুল নিনাদ আজও দেশের আপামর সাধারণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিতেছে না, আপনার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আজও ভারতের গণ-বিগ্রহ তামসিকতার মহানিদ্রায় নিদ্রিত। স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ-বিনিসৃত 'উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত' বাণী দেশের একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশ সকল দিক দিয়া উন্নতিক্ষেত্রে কতকটা অগ্রসর হইয়াছে সত্য কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি নগণ্য। স্বামিজী বলিতেন—"এগিয়ে যাও—এগিয়ে যাও।" ভারতকে তাঁহার জাতীয়-জীবনের জয়যাত্রার পথে আরও অনেক দূরে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষকে সকল বিষয়ে বিশ্বের দরবারে গৌরবমণ্ডিত আসনে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে স্বামী বিবেকানন্দ যে কর্ম্মপ্রণালী দেশের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, দেশবাসী উহার সামান্য অংশই এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছে। তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশন এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার লোকবল এবং অর্থবলের অনুপাতে যে সামান্য কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং হইতেছেন, তাহা ভারতবর্ষের মত একটী বিশাল দেশের উন্নয়নের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

এ জন্য চাই দেশগতপ্রাণ শত শত শিক্ষিত তরুণ—যাঁহারা নিজের জন্য কিছুমাত্র না ভাবিয়া ভারতের জন্য জীবনোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যের ভার উত্তরাধিকারসূত্রে শিক্ষিত বাঙালী যুবকের উপরই বিশেষভাবে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব অপরিসীম। বাঙলার নব-জাগ্রত তরুণকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও অগ্রসর হইতেই হইবে। বাঙলার সঙ্ঘবদ্ধ যুবশক্তি জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে প্রবুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষকে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দ্দেশিত আসনে অধিষ্ঠিত করুক, ইহাই উদ্বোধনের নববর্ষে আমাদের আন্তরিক কামনা।

স্মরণে

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

জ্ঞানের বর্তিকা লয়ে, কে তুমি সন্ন্যাসি,
দেখাইতে পথ—ভারতের ভাগ্যাকাশে
হইলে উদয় ? তোমার প্রভাব আজ
তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতের মোহ গেল টুটি,
শুনিল অভয়বাণী, জাগ্রত অন্তরে
স্মরণ করিল সবে এই ভারতের
বীরত্ব গৌরবময় অতীত উজ্জ্বল।
জাগিল ভারত-প্রাণ, নবীন উদ্যমে
রাষ্ট্রে ধর্ম্মে সমাজের প্রতি কর্ম্মপথে
অপূর্ব্ব গৌরব গর্ব্বে চলেছে ছুটিয়া,
তোমার পরশ পেয়ে ; নবীন ভারতে
ত্যাগের উজ্জল মূর্ত্তি উঠিয়াছে হাসি।
আবার চলিলে তুমি নির্ভয় অন্তরে
বীরেন্দ্র-কেশরী সম প্রতীচ্য বিজয়ে ,
বিশ্বের সভায় বেদান্ত দুন্দুভিনাদে
শুনাইলে শান্তি সত্য অমৃতের বাণী।
বিস্ময়ে শুনিল বিশ্ব, ভাঙ্গিল চমক,
হৃদয়ে পাইল শান্তি হেরিয়া তোমায়
হে মহান্ ! সৌম্য শান্ত নির্ভীক সন্ন্যাসি !
ভাবিল জগৎ—আচার্য্য শঙ্কর বুঝি
হল আবির্ভূত, অথবা সে ঈশা বুঝি
এসেছে ধরায় পুনঃ করিতে প্রচার
পবিত্র প্রেমের বাণী। বিস্ময়-বিমুগ্ধ
প্রাণে বিশ্ববাসী জন লুটায়ে পড়িল
তাই পদমূলে তব, গভীর আবেগে
দানিল শ্রদ্ধার অর্ঘ্য,—বিশ্বের আকাশে
উড়িল ধরম ধ্বজা। হে বিশ্ব-বিজয়ি,
তোমার জনম তিথি, সেই পুণ্য দিন
স্মরিয়া জগৎজন—ভক্তিনত চিতে
করিছে প্রণতি। আশিস করিও তুমি,
দানিও হৃদয়ে শান্তি, অশান্ত জগতে
সত্য শান্তি প্রেম যেন বহে গো জাগিয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শাঙ্কর বেদান্ত

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

সাধারণতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শাঙ্কর বেদান্তের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই বিশ্বাস শুধু ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত নহে, বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতেও ইহার বহুস্থানে উল্লেখ আছে। এমন কি অনেক বৈষ্ণবভক্ত আছেন যাঁহারা মায়াবাদী সন্ন্যাসীর নাম শুনিলে বা দেখিলে নাসিকা সঙ্কুচিত করেন এবং মনে মনে তাঁহারা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই ইহা ছাড়া বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব সকলেরই ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মায়াবাদী বৈদান্তিকদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। এই অভিযানে তাঁহার দুইটী বিজয়স্তম্ভের গৌরব সকলে ঘোষণা করেন—একটী নীলাচলে সার্ব্বভৌম-বিজয়, অপরটী পুণ্যভূমি বারাণসী ক্ষেত্রে প্রকাশানন্দ-বিজয়। গত আশ্বিন সংখ্যার "উদ্বোধনে" সর্ব্বাগ্রে শ্রীবৃন্দাবনদাস বিরচিত "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। বরং তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবীন-যৌবনে অল্পবয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় বিশেষ অনুযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সার্ব্বভৌম মহাশয় ছিলেন সাধারণ স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশ্বাসী। দশনামী সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার বিরক্তি পরিস্ফুট ছিল। আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শঙ্করকে সার্ব্বভৌম ভক্তিযোগ দিয়াই বুঝিয়াছিলেন এবং শঙ্কর যে তাঁহার নির্দ্দিষ্টপথাবলম্বী সন্ন্যাসীবৃন্দকে অনুক্ষণ "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিতে বলিয়াছিলেন—তাহা ভক্তিসাধনারই অঙ্গবিশেষ। শঙ্কর সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম যে সব আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা মহাপ্রভু অনুমোদন করিয়াছিলেন। বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য লইয়া উভয়ের মধ্যে কোনও পঠন-পাঠন বা বাদ-বিতণ্ডা কিংবা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই—তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে বুঝা যায়।

কবি কর্ণপুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেন মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্যের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে তাঁহাদের আসন অতি উর্দ্ধে। সেই কবি কর্ণপুর তাঁহার রচিত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকে সার্ব্বভৌম ও শ্রীচৈতন্যের বেদান্তবিচারের কি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

কবিকর্ণপুর প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিরাগের মুখে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

"সন্মাত্রানির্ব্বিশেষাশ্চিদুপাধি রহিতা নির্ব্বিকল্পানিরীহা
ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাচা শিব শিব ভগবদ্বিগ্রহে বদ্ধবৈরাঃ।
যেঽমী শ্রৌতপ্রসিদ্ধাঽহহ ভগবতোঽচিন্ত্য-
শক্ত্যাদ্যশেষান্
প্রত্যাখ্যান্তো বিশেষানিহ জহতি রতিং হন্ত
তেভ্যোঃ নমো বঃ॥

অর্থাৎ ইঁহারা সৎস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, উপাধি ও ভেদ-জ্ঞানশূন্য নিশ্চেষ্ট শিব, শিব, আমিই ব্রহ্ম বলিতেছেন বিধায় ভগবদ্বিগ্রহে ইঁহারা বদ্ধশত্রু, অর্থাৎ চির-বিরোধী। ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা অশেষ মূর্ত্তি-বিগ্রহ ধারণ করিতেছেন, ইহা শ্রুতি-

প্রসিদ্ধ হইলেও ইঁহাদের দ্বারা তাহা সর্ব্বদা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। ভগবদ্‌বিগ্রহে ইঁহাদের কিছুমাত্র রতি বা অনুরাগ নাই—অতএব ইঁহাদের নমস্কার করি।" যে কবি কর্ণপুর মায়াবাদী বৈদান্তিক সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিরাগের প্রমুখাৎ তাঁহার নিজমত বা স্বীয় গোষ্ঠীর মত ব্যক্ত করিয়াছেন—যিনি উক্ত নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আচার্য্যরত্নকে দিয়া বলাইয়াছেন —

"সন্ন্যাসেন তব প্রভো ভবিবিরচিতঃ সর্ব্বস্বনাশো হি নঃ।"

অর্থাৎ প্রভু! তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনে আমাদের নিশ্চয় সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আবার অন্যত্র এই আচার্য্যরত্নই বলিতেছেন—

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।
ইতি নামানি দেবোঽয়ং যথার্থয়ত্যধুনা করোৎ॥

অপিচ

অস্মিন্নেবহি ভগবতি যথার্থম ভবন্মহাবাক্যম।
মুখ্যার্থতয়া হি তয়া জহদজহৎস্বার্থলক্ষণা নাত্র॥

অর্থাৎ সন্ন্যাসী শম নিষ্ঠা ও শান্তিপরায়ণ নামসকল এই দেবই বর্তমানকালে সফল করিয়াছেন। আরও এই ভগবানেই মহাবাক্য (অর্থাৎ তত্ত্বমসি শ্রুতি) জহৎ স্বার্থলক্ষণা ব্যতিরেকে মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

যিনি বৈষ্ণব শিরোমণি অদ্বৈত গোস্বামীর প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের সার্থকতায় বলাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণস্বরূপং চৈতন্যং কৃষ্ণচৈতন্য সঙ্গিতং।
অতএব মহাবাক্যস্যার্থোঽহতি ফলবানিহ॥"

"যিনি স্বরূপতঃ স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনি চৈতন্যরূপী, ইহা কৃষ্ণচৈতন্যনামে নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব মহাবাক্য নিজ অর্থেই—সার্থক হইয়াছে।"

সেই কবি কর্ণপুর সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীচৈতন্যের যে বেদান্ত-বিচার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অবহিত হইয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে প্রবেশ করিতেছেন তখন তাঁহার সহচরদিগের মনে পড়িল যে "ভগবতঃ পরমাপ্ততমো" অর্থাৎ ভগবানের পরমাত্মীয় এবং "খলু ভগবতো নবদ্বীপবিলাসবিশেষাভিজ্ঞঃ" গোপীনাথ আচার্য্য এখানে আছেন, ইনি বিশারদের জামাতা এবং সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গোপীনাথ বলিলেন—

"স্বামিন্ বিনা সার্ব্বভৌম সম্ভাষণং শ্রীজগন্নাথদর্শনং
ন শুভমিতি মন্যামহে ভগবতো বা কীদৃশীচ্ছা।"

অর্থাৎ "হে স্বামিজী! সার্ব্বভৌমকে সম্ভাষণ না করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করা শুভজনক হইবে না বলিয়া মনে করি। এক্ষণে ভগবানের কি অভিপ্রায়?"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোপীনাথের কথা শিরোধার্য্য করিয়া সার্ব্বভৌমের নিকট অনুচরাদিসহ গমন করিলেন। গোপীনাথ উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলে সার্ব্বভৌম বলিলেন—

"আচার্য্য অমুমালোক্য স্নেহশোকতারল্যং জাতং।
নীলাম্বরচক্রবর্ত্তিসম্বন্ধাদয়মতীব স্নেহাস্পদং নঃ॥
অল্পীয়সি বয়সি তুরীয়াশ্রমো গৃহীতঃ কথমনেন।
ক স্বাবদস্য মহাবাক্যোপদেষ্টা।"

অর্থাৎ "আচার্য্য! ইঁহাকে দেখিয়া—স্নেহ ও শোকে আমি চঞ্চল হইয়াছি। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মাতামহ) সম্বন্ধে ইনি আমাদের পরমস্নেহাস্পদ। এই অল্প বয়সে ইনি কেন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন? ইঁহার মহাবাক্যের উপদেষ্টা কে?"—অর্থাৎ ইঁহার সন্ন্যাসের গুরু কে?

গোপীনাথ বলিলেন—"কেশবভারতী।" সার্ব্বভৌম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন—ইনি ভারতীসম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন কেন? গোপীনাথ তদুত্তরে বলিলেন—ইঁহার কোন প্রকার বাহ্যাপেক্ষা বা সম্প্রদায়ের প্রাধান্যতার গৌরবের অপেক্ষা নাই—ত্যাগই ইঁহার আদরণীয়। সার্ব্বভৌম এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না—তিনি প্রকাশ্যে ভগিনীপতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই গৌরবে দোষ কি? তস্মৈবং

ভক্তুতে ভদ্রতবসাম্প্রদায়িকভিক্ষোঃ পুনর্যোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা বেদান্তশ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ॥" অর্থাৎ "আমি বলি যে ভদ্রতর বা শ্রেষ্ঠতর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর দ্বারা পুনর্ব্বার যোগপট্ট গ্রহণ করাইয়া এবং বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা ইহাকে সংস্কার করান উচিত।"—গোপীনাথ অসূয়া প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য—তুমি ইঁহার মহিমা জান না—তাই এইরূপ অনুচিত বাক্য বলিতেছ। আমি এই মহাত্মার যে সকল অপূর্ব্ব অলৌকিক কার্য্য দেখিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইনি স্বয়ং ঈশ্বর।" সার্ব্বভৌমের শিষ্যেরা উত্তেজিত হইয়া ইঁহার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দাবী করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন—লৌকিক প্রমাণ এখানে নিষ্ফল—অলৌকিকতত্ত্ব অলৌকিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। শিষ্যেরা বলিলেন—ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। গোপীনাথ প্রমাণ দিলেন পুরাণ বাক্য। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ব্রহ্মা বলিতেছেন—

> অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
> প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
> জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
> ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্নিতি॥

অর্থাৎ যাঁহার প্রতি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণার লেশমাত্র উদয় হইয়াছে—ভগবদমহিমার দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব তিনিই কেবল জানিতে পারেন—অন্য লোকেরা চিরদিন শাস্ত্র মার্গে অন্বেষণ করিয়াও কেহ বুঝিতে বা জানিতে পারে না। শিষ্যেরা ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না—তাহারা তর্ক তুলিলেন "তবে হে আচার্য্য মহাশয়, তুমি শাস্ত্র পাঠ করিতেছ কেন?" গোপীনাথ বলিলেন "আমার সে শিক্ষা সে শাস্ত্র পাঠ—'শিল্পবিশেষ এব তৎ।' উহা শিল্পবিশেষের মত শিক্ষা হইয়াছে।"

সার্ব্বভৌম এতক্ষণ নীরব ছিলেন—দেখিলেন যে বিষয়টী ক্রমশঃ অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং গোপীনাথ রুষ্ট হইতেছেন, তখন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তিনি সহাস্যে বলিলেন, "গোপীনাথ। তোমার প্রতি ঈশ্বরের করুণা হইয়াছে, তাঁহার তত্ত্ব তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ। এখন তুমি সে সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু বল।"

গোপীনাথ বলিলেন, "ঈশ্বর তর্কের বিষয়ীভূত বা তত্ত্ববাক্যের গোচর নহেন। ভগবান্ গৌরচন্দ্র যখন তোমাকে কৃপা করিবেন তখন অনুভবের দ্বারা বুঝিতে পারিবে।"

সার্ব্বভৌমের প্রতি গোপীনাথের ঈদৃশ রূঢ় বাক্য শুনিয়া শিষ্যেরা বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, "বোধ হয় ভগিনীপতি বলিয়া ব্যঙ্গভাবে এই সব বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন।"

পরে গোপীনাথ বলিলেন, "সার্ব্বভৌম মহাশয়। আপনি এই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া) কিছু অন্যায় অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া আমি আপনাকে আজ স্পষ্টভাবে এরূপ বাক্য প্রকাশ করিলাম। আপনি স্থির, ধীর, গম্ভীর ও বিদ্বান্, আপনাদের মত মহৎ ব্যক্তিদের পক্ষে এরূপভাবে ঈশ্বরালাপ করা উচিত নয়। অথবা আপনাদেরই বা দোষ কি?

> "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
> বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
> কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
> তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে।"

অর্থাৎ "যাঁহার মায়াদি শক্তি সমূহে বারংবার বিমোহিত হইয়া বাদী ও বিবাদীরা বাদানুবাদ করিয়া থাকে সেই অনন্তগুণশালী সর্ব্বব্যাপী ভূমা পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।"

সার্ব্বভৌম হাসিয়া বলিলেন "জানিলাম তুমি বৈষ্ণব। আর কথা বাড়াইয়া কাজ নাই। তুমি এখন যাও—শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার পর আমার মাসীমার বাড়ীতে তোমার ঈশ্বরকে স্বগণসহ বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে আর তাঁহাকে

আমার নাম করিয়া শ্রীশ্রীভগবানের প্রসাদগ্রহণে স্বগণসহ নিমন্ত্রণ করিও।"

গোপীনাথও "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত গোপীনাথ মিলিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনাকে আজ ভট্টাচার্য্য সপরিকরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন অতএব আপনি আসুন।" এই বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মাতৃস্বসার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপ্রক্ষালন ও দন্তধাবনাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া উপবেশন করিলে গোপীনাথ মলিনমুখে ও ব্যথিতচিত্তে বলিলেন, "প্রভো! ভট্টাচার্য্য আপনাকে আরও এক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিরূপ নিমন্ত্রণ?' গোপীনাথ বলিলেন "সাম্প্রদায়িক-সন্ন্যাসিনঃ সকাশাদ্যোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা বেদান্তং শ্রাবয়িষ্যতি।" অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর দ্বারা যোগপট্ট গ্রহণ করাইয়া বেদান্ত শ্রবণ করাইবেন। তদুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি অনুগৃহীত হইলাম, সেইরূপই করিব।" ইহাতে মুকুন্দ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না—সার্ব্বভৌম যখন গোপীনাথ আচার্য্যকে ইহা বলেন তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন। সার্ব্বভৌমের সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহার অন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছিল। মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "প্রভো! ভট্টাচার্য্যের এই বাক্যরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা আচার্য্যের হৃদয় দগ্ধ হইতেছে—তাই আজ তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদও গ্রহণ করেন নাই।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোপীনাথ আচার্য্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আচার্য্য! সার্ব্বভৌমের নিকট আমি বালক মাত্র। তিনি ভালবাসিয়া স্নেহভরেই এই কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তুমি দুঃখিত হইতেছ কেন?" গোপীনাথ ক্ষুণ্ণচিত্তে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবন্! আমার হৃদয়ের এই শেল যদি উদ্ধার করেন তবে আমি জীবন রক্ষা করিব, নতুবা"—এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিলেন "পুণ্ডরীকাক্ষাস্তে মনোরথং পূরয়িষ্যতি" অর্থাৎ ভগবান পুণ্ডরীক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই তোমার মনাভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

ইহার পরদিন অতি প্রত্যূষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথের মঙ্গলারতি দর্শন করিতে গমন করেন। তথায় জনৈক পাণ্ডা মহাপ্রসাদ দান করিলে মহাপ্রভু সেই প্রসাদান্ন অঞ্চলে গ্রহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিয়াই "সিংহবত্ত্বরিতগতিঃ নিষ্ক্রান্তঃ।' অর্থাৎ "সিংহের ন্যায় দ্রুত গতিতে প্রস্থান করিলেন।" পরিকরেরা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিস্মিতভাবে দেখিলেন মহাপ্রভু স্বীয় বাসস্থানের পথ ত্যাগ করিয়া অন্যপথে চলিলেন। তাহার পর কি ঘটিল কবি কর্ণপুর তাঁহার নাটকে সার্ব্বভৌমের দুইজন ভৃত্যের কথোপকথনে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল।

"প্রথম ভৃত্য: অলে ন আণাসি সেজ্জাএ অণুত্থিদেজ্জেব ভট্টাচালিএ এসে অম্মহ্মাদো সঅণ-ঘলদুআলে গদে। তদো বড়্এণ কহিঅং ভট্টাচালিঅ ভট্টাচালিএ অ উথেহি উথেহি মে সন্ন্যাসী আ আদোত্তি। তদোধসসি অ ভট্টাচালি উত্থিঅ ইমস্স চলণে পডিএ। তদো ইমিণা জহন্নাহস্স পসাঅভত্তং হত্থে কদুঅ ভুঞ্জত্তি গদিদবন্তো। তদো অম্হাণং ঈসলে ভট্টাচালি এ কহিম্পি পসা অভত্তং ণা এইসে ঈসলে উম্মত্তে বিঅ অকিঅ-বিচালে তক্খণমেত্তেণ তং ভত্তং গিলিঅ বন্তে অকিদসিণাণে জ্জেব অকিও অমুহ্ পক্-খালণে জ্জেব। গিলি উণ উন্মত্তে বিঅ কণ্ঠইদ সঅলঙ্গে নঅণ জলখিমি দবসণে অব গগ্গল কণ্ঠ সদ্দে অবন্তাল লাঅ বিবসে বিঅ ভবিঅ মহীদলে লুঠেদি কিং হুবিস্সদি ন আণেম্ম।"—ইহার সংস্কৃত রূপ এই যে "অরে ন জানাসি শয্যায়াঃ অনুত্থিতে

এব ভট্টাচার্য্যো একঃ সন্ন্যাসী অকস্মাৎ শয়নঘবদ্বাবি গতঃ। ততো বটুনা কথিতং। ভট্টাচার্য্য ভট্টাচার্য্য উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ—স সন্ন্যাসী আগত ইতি। তত স সাধ্বসো ভূত্বা ভট্টাচার্য্য উত্থায় অস্য সন্ন্যাসিণ শ্চবণে পতিতঃ ততোঽয়ং জগন্নাথস্য প্রসাদান্নং হস্তে কৃত্বা ভুঙ্ক্ষ্ব ইতি গদিতবান্। ততোঽস্মাকং ঈদৃশো ভট্টাচার্য্যঃ কদাপি প্রসাদান্নং ন খাদতি স ঈদৃশঃ উন্মত্ত ইব অকৃতবিচাবঃ তৎক্ষণমাত্রেণ তদন্নং গিলিতবান্ অকৃতস্নান এব অকৃতমুখপ্রক্ষালন এব গিলিত্বা উন্মত্তঃ কণ্টকিতসর্ব্বাঙ্গঃ নয়নজলস্তিমিত বসনঃ গদগদকণ্ঠশব্দ অসম্ভালবোগবিবশ ইব ভূত্বা মহীতলে লুঠতি কিং ভবিষ্যতি ন জানীমঃ।

বঙ্গানুবাদ। অবে তুই জানিসনি? আজ শয্যা থেকে ভটচাজ না উঠ্‌তেই এই সন্ন্যাসী তাঁব শোবাব ঘবে গিয়েছিল। সেখানে যে বামুন ছোঁডা ছিল সে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—"ভট্‌চাজ মশায! ভট্‌চাজ মশায়! উঠুন, উঠুন সেই সন্ন্যাসী এসেছে।" ভট্‌চার্জ তো হকচকিয়ে উঠে তখনিই সেই সন্ন্যাসীব পায়ে একেবাবে ভূমিষ্ঠ পেন্নাম কব্‌লেন। তাবপব সেই সন্ন্যাসীর হাতে জগন্নাথেব মহাপ্রসাদ ছিল, সে না সেই প্রসাদ ভট্‌চাজেব সাম্‌নে ধবে বল্‌লে "খেয়ে ফেল।" আবে আমাদেব ভট্‌চাজ যে কখনও মহাপ্রসাদ খায়নি, সে আজ পাগলেব মত তখনিই খেয়ে ফেল্‌লে। তখনও মুখও ধোযনি আব স্নানও কবেনি—সেই বাসিমুখে অশুদ্ধ অবস্থায় এই মহাপ্রসাদ গিল্‌লে—কিন্তু তখনিই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘট্‌লো, ভট্‌চাজের গায়েব লোমগুলো একেবাবে কাঁটার মত হ'যে উঠ্‌লো, চো'খ দিয়ে দবদব কবে জল পড়ে তার কাপড চোপড সব ভিজিয়ে দিলে, গলা দিয়ে গদ্‌গদ্ শব্দ হ'তে লাগ্‌ল—তখন এক অদ্ভুত ব্যাবামী বোগীব মত এলিয়ে পডে ভুঁযে লুটিয়ে পড়্‌লো—না জানি এব পবে কি হবে?

দামোদব—সার্ব্বভৌমেব অবস্থা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

বিনা বাবীং বদ্ধো বনমদকবীন্দ্রো ভগবতা
বিনা সেকং স্বেষাং শমিত ইব হৃত্তাপদহনঃ।
যদৃচ্ছাযোগেন ব্যবচি যদিদং পণ্ডিতপতেঃ
কঠোবং বজ্রাদপ্যমৃতমিব চেতোঽস্য সবসং।

অর্থাৎ ভগবান (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) বাবী অর্থাৎ গজবন্ধিনী ছাডাই মদমত্ত বন্যহস্তীকে বদ্ধ কবিলেন, বিনা জলসেকেই বহুজনেব অন্তবদাহকাবী অনল নির্ব্বাপিত হইল। কাবণ ভাগ্যবশতঃ ভগবান পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সার্ব্বভৌমেব বজ্র হইতেও কঠিন হৃদযকে অমৃতেব ন্যায সবস কবিয়াছেন।

ইহাব পবেব দৃশ্যে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ ও জগদানন্দ প্রভৃতি স্বগণসহ বসিয়া ইষ্ট গোষ্ঠি কবিতেছেন, এমন সময কে যেন বলিতেছে "মহাবাজ! শ্রীমন্দিবেব ঐ পথ নয়।" মহাপ্রভু গোপীনাথকে লক্ষ্য কবিযা বলিলেন, "আচার্য্য, গিযা দেখ ব্যাপাবটা কি?" পথেব দিকে তাকাইয়াই গোপীনাথ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে চাহিয়া দেখিল সার্ব্বভৌম আসিতেছে। সার্ব্বভৌম এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেব ঈশ্ববত্বে অবিশ্বাসী নহেন—গোপীনাথেব ন্যায এখন তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর বলিয়া ধাবণা কবিয়াছেন—তাই মনে কবিতে কবিতে আসিতেছেন "গোপীনাথাচার্য্য ঠিক কথাই বলিয়াছে, আমাদেব কঠিন চিত্তকে দ্রবীভূত কবিতে ঈশ্বব ব্যতিবেকে আব কে পাবে? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে স্বযং ঈশ্বব তাহাতে আব সন্দেহ নাই।" এখন সাক্ষাৎ নবরূপধাবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দর্শন কবিতে তাঁহাব প্রবল উৎকণ্ঠা হইয়াছে। তাই মহাপ্রভুকে দর্শন কবিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণতিপূর্ব্বক প্রেমে আবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন—

"নানালীলাবসবশতযা কুর্ব্বতো লোকলীলাং
সাক্ষাৎকাবেঽপি চ ভগবতো নৈব তত্ত্বাববোধঃ।
জ্ঞাতুং শক্তোত্যহহ ন পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তিতরাং লোহমাত্রং ন হেম॥

অর্থাৎ নানাভাবে ভগবান্ বিবিধ লীলারসে নরলীলা করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহাকে সাক্ষাৎদর্শন করিয়াও কেহ তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না—যেমন স্পর্শমণি যে পর্য্যন্ত লৌহকে স্বর্ণে পরিণত না করে—সে পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারে না যে ইহা স্পর্শমণি।

আরও—

> স্বজনহৃদয়সদ্মা নাথ পদ্মাধিনাথো
> ভুবি চরসি যতীন্দ্রচ্ছদ্মনা পদ্মনাভঃ।
> কথমিহ পশুকল্পাস্ত্বামনল্পানুভাবং
> প্রকট মনুভবামো হন্তঃ বামো বিধির্নঃ॥

"হে রমাপতি! হে পদ্মনাভ! তুমি নিজজনের হৃদয়বাসী হইয়াও যতীন্দ্রের ছলে ভূতলে বিচরণ করিতেছ। হে নাথ! আমরা পশুতুল্য, তাই আপনার অসীম প্রভাব আমরা কিরূপে হৃদয়ে ধারণ করিব? হা ভগবন্, বিধাতাও আমাদের প্রতি বাম।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সার্ব্বভৌমের স্তব শুনিয়া হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন "ভট্টাচার্য্য! একি বলিতেছেন? আমি যে আপনার নিকট বালক—স্নেহের পাত্র! আমাকে একি বলিতেছেন?" ইদানীং ভট্টাচার্য্যের মনোবৃত্তি কিরূপ জানিবার জন্য মহাপ্রভু প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়! শাস্ত্রদ্বারা কি নির্ণীত হয় তাহা অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া বলুন।"

সার্ব্বভৌম কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন—

> "শাস্ত্রং নানামতমপি তথা কল্পিতং স্বস্বরুচ্যা
> নোচেত্তেষাং কথমিব মিথঃ খণ্ডনে পণ্ডিতত্বং।
> তত্রোদ্দেশ্যং কিমপি পরমং ভক্তিযোগো মুরারেব্
> নিষ্কামো যঃ স হি ভগবতোঽনুগ্রহেণৈব লভ্যঃ॥

অর্থাৎ "স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী শাস্ত্রে নানামত কল্পিত হইয়াছে, নতুবা আমাদের চিত্তে কিরূপে পরস্পরের মত খণ্ডনে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইবে? এই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সেই মুরারির প্রতি ভক্তিযোগ যাহাতে উৎপন্ন হয়—যাহা কেবল ভগবদনুকম্পাতেই লভ্য হইয়া থাকে।"

আরও—

> বেদাঃ পুরাণানি চ ভারতঞ্চ
> তন্ত্রাণি মন্ত্র অপি সর্ব্ব এব।
> ব্রহ্মৈব বস্তু প্রতিপাদয়ন্তি-
> তত্ত্বেঽস্য বিভ্রাম্যতি সর্ব্ব এব।

অর্থাৎ বেদ ও পুরাণসমূহ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থ, তন্ত্র ও মন্ত্রসমূহ—একমাত্র ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু ভগবদ্‌তত্ত্ব নিরূপণে সকলেই বিভ্রম হইয়া পড়ে। কেননা শ্রুতিতে আছে—

> যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
> সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
> বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
> প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।

অর্থাৎ যে যে শ্রুতি নির্বিশেষ বা নিরাকার বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সেই শ্রুতি বিশেষ বা সাকার তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। বিচার করিলে দেখা যায় সাকারতত্ত্বই বলবান।

শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীত্যাদি-রূপয়া শ্রুত্যা অপাদানকরণ কর্ম্মকারকত্বেন বিশেষত্বা-পত্তে এবং যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদিরূপয়া স ঐক্ষ্যতেত্যাদৌ সো কাময়ত ইত্যাদৌ চ ঈক্ষণং পর্য্যালোচনং কামঃ সংকল্প ইত্যাভ্যামপি বিশেষবত্ত্বাৎ তাবন্নির্বিশেষত্বমুপপন্নং ভবতি।"

অর্থাৎ—"এই সমস্ত ভূত বা জীবসমূহ আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা আনন্দের দ্বারা জীবিত রহিয়াছে আবার আনন্দেই পুনরায় প্রবেশ করিতেছে—এই সকল শ্রুতিবাক্যে অপাদান, করণ, ও কর্ম্মকারকের নির্দ্দেশে তাঁহার সাকারত্ব প্রতি-

পাদিত হইতেছে। যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মিয়াছে এবং তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন এবং বহুধা হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন প্রভৃতি প্রতিবাক্যে তাঁহার ঈক্ষণ বা পর্য্যালোচনা ও কাম বা সংকল্প প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার সাকারত্ব প্রমাণিত হয়—উহাতে নিরাকারত্ব উপপন্ন হয় না।" সাকারের রূপ কি প্রকার? সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—

"আয়াতে চ বিশেষে রূপস্যাপি বিশেষাদারাতত্ত্বং ন তু তদ্রূপং প্রাকৃতং জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিতি। জ্যোতিষোঽ প্রাকৃতত্বং যথা সাধ্যতে তথা তস্য রূপস্যাপীতি। কেবল নির্বিশেষত্বে শূন্যবাদাবসরঃ প্রসজ্জেত। তেন ব্রহ্মশব্দো মুখ্য এব মুখ্যত্বেন ভগবান্ ব্রহ্মেত্যবশিষ্টং।

তথাচ—বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

স্বপক্ষ রক্ষণগ্রহ-গ্রহিলাস্তু মুখ্যার্থভাবাভাবেঽপি লক্ষণয়া নিরূপয়িতুমশক্যমপি নির্বিশেষত্বং যে প্রতিপাদয়ন্তি তেষাং দুরাগ্রহমাত্রং। বস্তুতস্তু॥

অর্থাৎ "ব্রহ্ম সাকার হইলেও তাঁহার রূপ প্রাকৃত নয়—কারণ শ্রুতিতে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়চরণাদি শব্দে জ্যোতিঃর মতই উহা অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ভগবানের রূপ জ্যোতির্ম্ময়—জ্যোতিঃর মতই উহা অপ্রাকৃত স্বরূপ। কিন্তু কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে শূন্যবাদের অবসর হইয়া পড়ে। সেই হেতু ব্রহ্ম শব্দটী মুখ্য—মুখ্যাবৃত্তিতে ব্রহ্মই ভগবানের প্রতিপাদক। প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোক—"তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয় জ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে অভিহিত হন।"

স্বপক্ষ রক্ষণে অর্থাৎ স্বমত স্থাপনে যাঁহারা গ্রহগ্রস্তের ন্যায় মুখ্যার্থ ভাবকে ছাড়িয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা নিরূপণে অসমর্থ হইয়াও নির্বিশেষত্ব বা নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করে—তাহাদের বস্তু নির্ণয়ে দুরাগ্রহ বা বৃথা আগ্রহ মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে আছে—

আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দোঽচ্যুতো মতঃ॥
অমূর্ত্তঃ পরমাত্মা চ জ্ঞানরূপশ্চ নির্গুণঃ।
স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্ম চেতি সতাং মতং॥
অমূর্ত্তমূর্ত্তয়ো র্ভেদো নাস্তি তত্ত্ববিচারতঃ।
ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈ-র্মণিতত্তেজসোরিব॥

অর্থাৎ—আনন্দ দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়—এক মূর্ত্ত, অপরটী অমূর্ত্তভেদ। মূর্ত্তই অমূর্ত্তের অবলম্বন—সেই মূর্ত্তানন্দই স্বয়ং অচ্যুত—ইহা সিদ্ধান্ত মত। যিনি অমূর্ত্ত, পরমাত্মা, জ্ঞানরূপ, নির্গুণ, স্ব-স্বরূপ ও কূটস্থ—তিনিই ব্রহ্ম—ইহা সাধুদিগের মত। বাস্তবিক প্রকৃত প্রস্তাবে অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তানন্দে তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখিলে কোনও ভেদ নাই। মণি এবং তার জ্যোতির মতই শ্রুতিতে ভেদ কল্পিত হইয়াছে—বস্তুতঃ তত্ত্বতঃ দুইই—এক বস্তু। কপিলপঞ্চরাত্রেও অগস্ত্যকে ভগবান্ কপিলদেব ইহাই বলিযাছেন—

দ্বে ব্রাহ্মণী তু বিজ্ঞেয়ে মূর্ত্তাঞ্চামূর্ত্ত মেব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্তস্বভাবোঽয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ॥

অর্থাৎ "জগতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দুইটিকেই ব্রহ্ম বলিযা জানিবে—এই দুইই তাঁহার স্বরূপ। এই মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বভাবই নারায়ণ, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে।" ইহা এই পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্তের মতই নির্ম্মৎসর।

সার্ব্বভৌম বলিলেন "কেবলং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিনস্তু অমূর্ত্তানন্দমেব ব্রহ্মেতি নিরূপয়ন্তঃ স্ববাসনাপারুষ্যমেব প্রকটয়ন্তি ন তু তে নির্ব্বিশেষত্বং স্থাপয়িতুং শক্নুবন্তি। পাঞ্চরাত্রিকমতস্বীকারে তু আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যাদি চ সিদ্ধ্যতি। রূপত্বেন মূর্ত্তত্বং মণিতত্তেজসোরি বেত্যুক্তেনাদ্বিতীয়ত্বং তেন ভগবানেব ব্রহ্মেতি সর্ব্বশাস্ত্রমতং।"

অর্থাৎ "কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা অমূর্ত্তানন্দকেই ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া নিজ বাসনারূপ কাঠিন্যই প্রকাশ করিয়া থাকেন—নির্ব্বিশেষত্ব বা নিরাকারত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হন না। পঞ্চরাত্রের মত স্বীকার করিলে আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, তিনি একই এবং অদ্বিতীয়—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত হয়। মণি ও তাহার জ্যোতিঃরই ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তত্ব ও রূপত্ব এবং তাহার অদ্বিতীয়ত্ব সাধিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবানই ব্রহ্ম—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের অভিমত।

"বাসনা বৈশিষ্ট্যাদেব মূর্ত্তানন্দে ভগবতি লীলাবিগ্রহমিতি মন্বানা অমূর্ত্তানন্দমেব ব্রহ্মেতি কেচিদাহুঃ। পাঞ্চরাত্রিকাস্ত্ববিগীতশিষ্টা ভগবদুপাসকত্বাৎ তেন তদাচরিতেনৈব বেদার্থা অনুমীয়ন্তে। তথাচ

শাখাঃ সহস্রং নিগমদ্রুমস্য
প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন সমগ্র এষঃ।
পুরাণবাক্যৈরবিগীতশিষ্টা-
চারৈশ্চ তস্যাবয়বাহনুমেয়ঃ।

অভিপ্রায় বা ইচ্ছার বিশিষ্টতা হেতুহ কেহ কেহ মূর্ত্তানন্দে লীলাবিগ্রহ জ্ঞান করিয়া কেহ অমূর্ত্তানন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। পাঞ্চরাত্রিকেরা ভগবানের উপাসক, তাই তাঁহারা নির্ম্মল ও শিষ্ট। তাঁহাদের আচরণেই শ্রুতির অর্থ অনুমান করা যায়। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়—নিগমতরু অর্থাৎ বেদরূপ তরুর সহস্র শাখা সহস্রবেদ কাহারও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না। তাই পুরাণাদির বাক্য ও অনিন্দিত শিষ্টগণের আচরণ দ্বারাই তাঁহার অবয়বকে অনুমান করিতে হইবে।" এ স্থলে পুরাণ বচনসমূহ প্রমাণার্থে প্রয়োগ করা যথা "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিত্যাদি পূর্ণ রূপবত্ত্বেন নির্ব্বিশেষস্তু ব্রহ্ম অপূর্ণং নীরূপমিত্যর্থঃ। শিষ্টাস্তু সাত্বতা স্তেষাং মতং বাসুদেবপরা দেবতা বাসুদেবপরাৎপর মাত্মানঃ সঙ্কর্ষণো জীব ইত্যাদি জীবমৃতি জীবং করোতীতি জীবঃ স চাত্মা শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ ইতি তদুক্তে তস্মাদেব জীবসৃষ্টিরিত্যর্থঃ। অতো মূর্ত্তানন্দ এব কৃষ্ণ ইতি শাস্ত্রার্থঃ।

অর্থাৎ "পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহাদের মিত্র" ইত্যাদি বাক্যে ভগবানের রূপ থাকাতেই তাঁহার পূর্ণত্বের কারণ। এস্থলে নির্ব্বিশেষ অরূপ হওয়াতেই অপূর্ণ ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে সূচিত হইতেছে। শিষ্ট সাধুদিগের বা সাত্বতবৃন্দের অভিমত এই যে বাসুদেবই পরম দেবতা, বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা—সমস্ত জীবস্রষ্টা ও পালনকারী বলিয়া তিনিই সঙ্কর্ষণ হইয়াছেন—তিনিই আত্মা। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম "উভয়ই আমার নিত্য শরীর," ইহাই শ্রীভগবানের উক্তি। তাঁহা হইতেই জীবসৃষ্টি হইতেছে ইহাই অর্থ। অতএব মূর্ত্তানন্দই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য। ইহা বলিয়া সার্ব্বভৌম নীরব হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিলেন "সাধু সাধু তদিদানীং পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনায় সাধয়" অর্থাৎ "ধন্য ধন্য এখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনে গমন কর।"

সার্ব্বভৌম দামোদর ও জগদানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রভো, ইনিই সেই ভট্টাচার্য্য?" মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন, "তোমাদের মত মহাভাগবতদের সঙ্গগুণে এইরূপ হইয়াছে।" গোপীনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা বটে।"

দামোদর ও জগদানন্দ ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে ভট্টাচার্য্য দুইটী শ্লোক ও তৎসঙ্গে ভোজনের নিমিত্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্ন পাঠাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিলেন, "অনুগৃহীত হইলাম।" মুকুন্দ তখন হস্ত হইতে পত্রে লিখিত শ্লোকদুইটী পাঠ করিয়া দেখিলেন। সেই দুইটী শ্লোক—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থ মেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে। ১
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূত স্তস্য পাদার বিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

অর্থাৎ বৈরাগ্য বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিখাইবার জন্য সেই পুরাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে শরীর ধারণ করিয়াছেন, এতাদৃশ কৃপাসাগর যিনি—তাঁহার শরণাগত হইলাম। ১

কালপ্রভাবে বিলুপ্ত ভক্তিযোগকে শিখাইতে যিনি কৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার শ্রীচরণ-অরবিন্দে আমার চিত্তভ্রমর প্রগাঢ় ভাবে লীন হউক।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত সার্ব্বভৌমের মায়াবাদী বৈদান্তিকের বিচার এই নাটকে পাইলাম না। কবি কর্ণপুরের "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক" পাঠ করিয়া আমরা দেখিলাম যে সার্ব্বভৌম শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে শাস্ত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম শাস্ত্রাদির সারমর্ম্ম বুঝাইলেন যে ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার। শ্রুতি দুইটাই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাকার শ্রুতিই বলবতী, ভগবানের সাকার রূপ অপ্রাকৃত। জ্যোতিঃ বলিলে যেমন তাহার প্রাকৃত রূপ বুঝায় না সেইরূপ শ্রুতিতে জ্যোতির্ময় কর চরণ উক্ত হওয়াতে উহা জ্যোতিঃর মতই অপ্রাকৃত রূপ। ব্রহ্ম, ভগবান ও পরমাত্মা অদ্বয় জ্ঞানেরই সংজ্ঞা বাচক। মণি ও তাহার জ্যোতিঃ যেমন ভিন্ন নয়, সেইরূপ সাকার ও নিরাকারে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই।

যিনি অমূর্ত্ত, পরমাত্মা, জ্ঞান, নির্গুণ স্ব-স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ তিনি ব্রহ্ম। মূর্ত্তামূর্ত্ত নারায়ণই ধ্যেয় বস্তু। তিনি নির্ম্মৎসর। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা শুষ্ক ও কঠিন—তাহারা মূর্ত্তানন্দ বা সাকার রূপের আনন্দ আস্বাদ করিতে পারে না। এই মূর্ত্তানন্দ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান বাসুদেবই পরম দেবতা অর্থাৎ দেবতাদেবও উপাস্য দেবতা। সার্ব্বভৌমের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সাধুবাদ করিলেন। আমরা আরও দেখিলাম, সার্ব্বভৌম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মধ্যে কোনও প্রকার বেদান্ত বিচার বা শাঙ্কর বেদান্ত লইয়া বাদানুবাদ তো হয়ই নাই, অধিকন্তু ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন বা ভাগবতের একাদশ প্রকার শ্লোক ব্যাখ্যা—ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই। সার্ব্বভৌমকে আমরা হয়-শীর্ষ পাঞ্চ-রাত্রের মতাবলম্বী কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত রূপেই দেখিতে পাইলাম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সমীপে শাস্ত্রের এই বিশদ ব্যাখ্যা ও তাঁহার ভক্তিপূর্ণ আবেগ দেখিয়াই গোপীনাথ পণ্ডিত বলিলেন—"ইনিই সেই ভট্টাচার্য্য।" তাঁহার বলিবার বিশেষ হেতু সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেন অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ?—ভারতী সম্প্রদায় অতি হীন সম্প্রদায়। অপর সম্মানিত সাম্প্রদায়িক গুরুর নিকট যোগপট্ট গ্রহণ করাইয়া ও বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া ইহার সংস্কার করা কর্ত্তব্য।" এই উক্তিতেই গোপীনাথ ও মুকুন্দের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বেদান্ত অধ্যয়ন বা শ্রবণ করাইবেন—এইরূপ উক্তিও করেন নাই। কবি কর্ণপুরের নাটকে আছে "ভদ্রতরসাম্প্রদায়িকভিক্ষোঃ পূর্ণযোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা বেদান্ত শ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ।" এই মাত্র বেদান্তের উল্লেখ। বারান্তরে আমরা কবি কর্ণপুরের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' হইতে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নারীজাতি

শ্রীবিভা গুপ্তা, এম্-এ

এই পৃথিবীতে মহাপুরুষের আবির্ভাব সচরাচর ঘটে না। জ্ঞানের প্রদীপ হাতে লইয়া যুগে যুগে তাঁহারা আবির্ভূত হন অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানবকে আলোর সন্ধান দিতে এবং মায়ামোহমুগ্ধ মানবাত্মাকে মুক্তি প্রদান করিতে।

জগৎ এই জাতীয় যুগবিপ্লবকারী মহামানবের পদরেণুস্পর্শে চিরকালই ধন্য হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এইরূপে যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া মানবকে তাহার সত্য-জীবনের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর অন্যতম অতিমানব শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

পূর্ণ এক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের অন্ধকার ভাগ্যাকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় তিনি উদিত হইয়াছিলেন। সেই জ্যোতিষ্ক হইতে সহস্ররশ্মি বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র জগৎকে আজ উদ্ভাসিত করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদেরই একান্ত নিজস্ব। আমাদেরই বাংলাদেশে পল্লীমায়ের বুকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাহার জন্ম হয়। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এবং সামাজিক জীবনের এক পরম সন্ধিক্ষণে এই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব আবির্ভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জাতির সহিত পরিচয়ের ফলে আমাদের দেশের সামাজিক জীবনের ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সমাজ ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্ম-জীবন প্রাণহীন ছিল। চিরাচরিত সংস্কার, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীন চিন্তার পথকে রুদ্ধ রাখিয়াছিল। অর্থহীন অনুষ্ঠানমূলক এবং বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ নানাপ্রকার ব্রত এবং নিয়ম পালনের মধ্যেই ধর্ম্ম ছিল সীমাবদ্ধ। কায়া ভুলিয়া ছায়াকেই অজ্ঞান মানব আঁকড়াইয়া ধরিতেছিল। এমন কি সাধারণ নৈতিক এবং সদ্‌গুণ সকলও ধর্ম্মের নামে অনেক সময় উপেক্ষিত এবং পদদলিত হইত।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেশের আধ্যাত্মিক জীবনের ধ্বংস ঘটিতেছিল। এই ভাবের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের ফলে। সমস্ত কিছুকেই বিনা বিচারে মানিয়া না লইয়া স্বাধীন চিন্তা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রকৃত সত্য এবং অসত্যকে নির্দ্ধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা তখন হইতেই মানুষের মনে জাগ্রত হইল। ইহাই হইল ভারতীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে নবযুগের আরম্ভ। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে কেবল যে কল্যাণই ঘটিল তাহা নহে। পরানুকরণপটু বাংলাদেশ পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্লাবিত হইয়া আপন বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিল। জড়-বিজ্ঞান আসিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আসনকে অধিকার করিয়া বসিল। ঐহিক সুখ ভোগকেই মানুষ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিল। একদিকে পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের প্রভাব, অন্যদিকে নিজেদের দেশেই এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরোধ, এই সকলের ফলে দেশে নানা মত এবং নানাপথের সৃষ্টি হয়। নিজেদের সমাজের অত্যাচার, অবিচার, সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতার ফলে দলে দলে লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। ইহাতে ক্রমে হিন্দুসমাজ

শক্তিহীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে কিন্তু সত্যকার উন্নতির বিশেষ কোন পন্থা আবিষ্কৃত হইল না।

জাতির ধর্মজীবনের এমনি মহাসঙ্কটের দিনে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব। তিনি আপনার প্রেম, ত্যাগ, সাধনা এবং তপস্যা দ্বারা দেশে এক নূতন ভাব এবং চিন্তার ধারা আনিয়া দিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশবাসী নবজীবনের-সন্ধান লাভ করিল এবং বহুপ্রাচীন বিশাল হিন্দুধর্মের সংস্কারের পথ উন্মুক্ত হইল।

ভারতীয় যে সাধনা এবং সংস্কৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্ স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং পৃথিবীর নানাস্থানে প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে যখন নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকার, তখন অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ভ্রান্ত দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন—

"ভয় নাই। পথের সন্ধান পাইয়াছি। চোখ খুলিয়া দেখ, অপূর্ব্ব এক আলোক-সম্পাতে আর্য্যস্থানের লুপ্তগৌরব উদ্ধারের পথ উদ্ভাসিত।" গুরুবলে বলীয়ান্ এই পুরুষসিংহ হতবীর্য্য ভারতবাসীর প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিয়া গম্ভীর উদাত্ত স্বরে বলিয়াছেন, "চক্ষুষ্মান্ দেখিয়া লও। বুদ্ধিমান্ বুঝিয়া লও। ঐ আলোকের সাহায্যে শাস্ত্রের জটিল রহস্য সহজ সরল ও সরস হইয়া উঠিবে, ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আর্য্য-সংস্কৃতি আবার মহিমান্বিত হইবে, ক্ষাত্রবীর্য্য ও ব্রহ্মতেজের যুগপৎ সাধনায় ভারত-দেহে নবজীবনের আবির্ভাব হইবে, ঐ আলোকের সাহায্যে জগতের সকল ধর্ম্ম—সকল মত স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের নরনারীকে শান্তির পথে, কল্যাণের পথে, মহামিলনের পথে, মহামানবতার উদ্বোধনের পথে চালিত করিবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় এবং 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভবজনিত যে অপূর্ব্ব প্রেম তাঁহার জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহারই প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ের পর তাঁহারই বরপুত্র স্বামিজী কর্ত্তৃক গীতোক্ত নিষ্কামকর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং সার্ব্বজনীন সেবাব্রতের প্রচার পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে।

এই সেবাব্রত প্রচারে নারীর স্থান অনেক উচ্চে এবং তার কর্ত্তব্য বহুবিধ। প্রাচীন কালের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ভারতে নারীর আসন ছিল অনেক উচ্চে। সাক্ষাৎ শক্তি-রূপিণী জ্ঞানে নারীকে পুরুষ পূজা করিত। কালের আবর্ত্তনে ভারতীয় ধর্ম্ম এবং সমাজ যখন গ্লানিগ্রস্ত হইল, তখন নারী মহিমাও ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে নবভাবের প্রবর্ত্তন হয় তাহারই ফলে মহাশক্তি লাভ করিয়া নারী-প্রগতি এক উচ্চতম আদর্শের অভিমুখী হইল। তাঁহার সমগ্র জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তিনি নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিতেন, সকল নারীর মধ্যেই তিনি জগদম্বার রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং লোকসেবায় নারীকে তিনি পুরুষের সমান অধিকার দিয়া গিয়াছেন।

সমাজের অর্দ্ধেক শক্তি নারী। নারী এবং পুরুষ এতদুভয়ের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত দেশের প্রকৃত কল্যাণ কখনই সাধিত হইতে পারে না। যে জাতি নারীকে তাহার আপন স্থান দিতে পারে না, যে সমাজে স্ত্রীশক্তি অবমানিতা, লাঞ্ছিতা, সে জাতি এবং সে সমাজের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত, তথায় নারী তাহার আপন স্থান খুঁজিয়া লউক।

কর্ম্মক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ পরস্পর

পরস্পরকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। সংসার গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা না করিয়া নারী স্বহস্তে পুরুষের ললাটে জয়টীকা অঙ্কিত করিয়া দিয়া তাহাকে যাত্রাপথে অগ্রসর করিয়া দিবে। অনুক্ষণ আকর্ষণ না করিয়া পশ্চাতে থাকিয়া নারী তাহার পাথেয় জোগাইবে।

নারী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। জগতে অমৃত পরিবেষণ করিবার ভার তাঁহারই কল্যাণ হস্তে ন্যস্ত আছে। সুতরাং স্মিত, প্রসন্নমুখে, করুণারূপিণী হইয়া অমৃত বিলাইবার ভার তাঁহাকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। ভোগ, বিলাস এবং দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া নিজের সত্তাকে হারাইয়া ফেলিলে চলিবে না, তাঁহার মধ্যে যে ঐশী শক্তি নিহিত আছে, বিফল হইতে না দিয়া তাহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে।

দেশের আজ মহাদুর্দ্দিন। অত্যাচার, অনাচার, অজ্ঞানতা ধর্ম্মহীনতা ইত্যাদির ফলে দেশ আজ চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আজ দেশবাসীর বিশেষ করিয়া স্মরণ করা প্রয়োজন। তাঁহার প্রচারিত নিষ্কাম সেবাধর্ম্মকে আজ মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে।

নারীর সেবার পথ আজ প্রশস্ত। নারী হৃদয়ে বিধাতৃদত্ত যে স্বাভাবিক সেবার প্রেরণা রহিয়াছে, সর্ব্বতোমুখী ব্যবহার দ্বারা তাহাই আজ সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রত্যেক নারী এক একটি সংসারের গৃহিণী। সাংসারিক নানাবিধ কার্য্যের মধ্যেও একটি সুমহান্ উচ্চ আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে এক বৃহত্তর সার্ব্বজনীন সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও সংসারাতীত, লোকাতীত এক ঐশ্বরিক আলোর প্রতি সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতায় আচ্ছন্ন এবং জড়তায় অভিভূত হইয়া তাঁহাকে আপন কর্ত্তব্য ভুলিলে চলিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটাই মোহমুগ্ধ মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই পরম সত্যটি স্মরণ করিবার জন্যই তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন। সমস্ত জগতের নরনারীর প্রাণে যে আজ সেই মহাপুরুষের প্রাণের কথা পৌছাইতেছে এবং তাঁহার বাণী পুনরালোচিত হইতেছে, সর্ব্বসাধারণের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাই শতাব্দী জয়ন্তীর পরম সার্থকতা। সকল নারী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করুক সেই মহীয়সী নারী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কথা, যিনি অপূর্ব্ব ত্যাগ ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পতির ব্রতোদ্‌যাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই কথা যদি কেহ মনে করেন যে, সংসারী জীব হইয়া জনসেবাব্রত গ্রহণ করা চলে না, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। সংসারে থাকিয়াও যে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া জনসেবাব্রত গ্রহণ করা যায়, এই কথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হইতেছে। আজ শুধু তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া থামিলেই চলিবে না। যদি তাঁহার অতুলনীয় মহজ্জীবন আলোচনা করিয়া সকল প্রকার অধর্ম্ম, দুর্নীতি ও তুচ্ছ সাংসারিকতা হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারি, তাঁহারই প্রদর্শিত সেবার পথ গ্রহণ করিতে পারি, তবেই বুঝিব এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান কতকাংশে সার্থক হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরাধ্যা "মা" আজ সমগ্র মাতৃজাতির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠুক। নারী আজ মঙ্গল দীপটি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরুক, তাহারই স্নিগ্ধ দীপ্তিতে স্নাত হইয়া মোহমুগ্ধ মানব নবজীবন লাভ করুক। স্বর্গ হইতে মহাত্মার কল্যাণময় শুভাশিস আমাদের নতমস্তকে বর্ষিত হইবে।

রুসোর শিক্ষা-প্রণালীতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগ

ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ, ইডি-ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া)

ইউরোপীয় শিক্ষার নবযুগের অবনতির সময়ে যে সকল পাশ্চাত্য মনীষিগণ তৎকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচলিত শিক্ষার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফরাসী মনীষী জন্ জেকান্ রুসো একজন। তিনি প্রসিদ্ধ "ইমিল" গ্রন্থ রচনায় তাঁহার শিক্ষাতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা প্রাকৃতিক আব-হাওয়ার মধ্যে আদর্শ শিক্ষকের নেতৃত্বাধীনে দিবার জন্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষা উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের অধীনে প্রকৃতির ক্রোড়ে দিতে হইবে। পুঁথির সাহায্যে নহে। প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই তাহাদের পুস্তক। শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ কোমলমতি শিশুদের মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করা। পুঁথিগত বিদ্যায় তাহাদের মন পরিপূর্ণ করা নহে। শিশুদের শিক্ষার সহিত প্রাকৃতিক পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ থাকিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয় মানবের জ্ঞানের পঞ্চদ্বার বিশেষ।

অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের তর্ক-বিতর্কে শিশু-দিগকে উৎসাহ দেওয়া আদৌ সমুচিত নহে। কেননা এত অল্প বয়সে সূক্ষ্ম বিষয়ের সমালোচনা শিশুদের মধ্যে পরিস্ফুট হয় না। সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচারের ক্ষমতা শিশুদের জন্মিলে তাহাদের শিক্ষার কোন প্রয়োজন হইত না। চিন্তাশক্তি পরিস্ফুট করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কাজেই কোমলমতি শিশুদিগকে দুরূহ বা অবোধ্য ভাষায় অভিভাষণ করিলে, তাহাদিগকে শুধু ভাষার পাণ্ডিত্য ও অপরের বাণী উদ্গীরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র। প্রকৃত শিক্ষা শিশুদের বয়স ও মনোবৃত্তির পরিস্ফুটের অনুযায়ী হওয়া উচিত। হয়ত এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি শিশুদিগকে তর্ক-বিতর্কে আদৌ উৎসাহ দেওয়া হইবে না? নিশ্চয় দেওয়া হইবে। তাহাদের বোধগম্য বিষয়-গুলিতেই তর্ক-বিতর্ক করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। শিশুরা সাধারণতঃ তাহাদের পারিপার্শ্বিক দ্রব্যগুলিতেই আকৃষ্ট হয় বেশী ও ইহাদের বিষয়ে ক্রমাগত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া থাকে। শিক্ষক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেন। এই সুযোগে তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা এমন সহজভাবে করিতে হইবে যাহাতে শিশুগণ অল্পায়াসেই পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলির জ্ঞান লাভ করিতে পারে। শিশুরা স্বয়ং প্রত্যেক বস্তু চক্ষুদ্বারা নিরীক্ষণ ও হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে। তৎপরে শিক্ষক শিশুদিগকে পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলির বিষয় আলোচনা করিতে উৎসাহ দিবেন ও তাহাদিগকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করিবেন। প্রকৃতি ও ইহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই প্রকৃত পুস্তক। কাজেই শিশুদের শিক্ষা প্রকৃতির আবহাওয়ার সংস্পর্শেই দিতে হইবে। রুসোর অভিমত এই যে, দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত শিশুদের শিক্ষা প্রকৃতির আবহাওয়ার পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে দিতে হইবে। পুস্তকের সাহায্যে নহে। এই সময়ে তাহারা পারিপার্শ্বিক বস্তুর প্রতিই আকৃষ্ট হয় বেশী এবং যাহা দেখে ও শ্রবণ করে তাহা তাহাদের মানসপটে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। যে সকল পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলি মনোবৃত্তির পূর্ণবিকাশের অনুকূল, সেই গুলিরই

বাছাই করিতে হইবে। প্রতিকূল বস্তুগুলি অবশ্য পরিত্যাজ্য। ইন্দ্রিয়ের সহিত পারিপার্শ্বিক বস্তুর সংযোগে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহাদের মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

রুসোর অভিমত এই যে, আমাদের বহির্জগতের জ্ঞান একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহযোগের উপর নির্ভর করে। এক ইন্দ্রিয়ের উপর জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করিতে পারে না। যেমন বরফখণ্ডের সত্য ধারণা করিতে হইলে আমাদিগকে শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইবে। রুসো তাঁহার বিখ্যাত "ইমিল" নামক গ্রন্থে কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের গুণাবলীর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

প্রথমতঃ রুসো স্পর্শেন্দ্রিয়ের গুণের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা সর্ব্ব-শরীরে বিরাজমান ও প্রহরীর ন্যায় সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে বিপদ হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছে। সচরাচর দেখা যায় যে, অন্ধদিগের মধ্যেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী ক্ষমতা খুব বেশী ও তাহারা সর্ব্বদা ইহার সাহায্যে চলাফেরা করিয়া থাকে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিচারশক্তি থাকিলেও ইহার সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য নহে। কাজেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের ভ্রম দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংশোধন করিতে হইবে। রুসোর মতে স্পর্শেন্দ্রিয়ের তুলনায় দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই দ্রব্যের পরিচয় দ্রুত হইয়া থাকে। তজ্জন্য মন সর্ব্বদা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে লব্ধ সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই ইহা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য। অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলির সংস্পর্শে অর্জ্জিত জ্ঞান ভ্রমাত্মক, যেহেতু ইহারা দূরবর্ত্তী জিনিসের জ্ঞানলাভে সহায়তা করিয়া থাকে। কাজেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সর্ব্বদা আমরা বহির্জ্জগতের সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ইহার সাহায্যে অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ দর্শনেন্দ্রিয়ের গুণ বর্ণনাকালে রুসো অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয় বেশী ভ্রমাত্মক, যেহেতু ইহা আমাদিগেকে দূরস্থিত দ্রব্যের জ্ঞানলাভে সাহায্য করিয়া থাকে। অধিকন্তু আমরা সর্ব্বপ্রথমে অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলির তুলনায় চক্ষুদ্বারাই দূরস্থিত দ্রব্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকি। কাজেই দূরস্থিত দ্রব্যের লব্ধ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সঠিক হয় না। সুতরাং কোন বস্তুর সঠিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে রুসো উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিশ্চল ও চলৎ-শক্তিশীল এই উভয় প্রকার পদার্থগুলিই সমভাবে প্রাণীর স্পর্শেন্দ্রিয়ের উত্তেজনাশক্তি আনিয়া দেয়। কিন্তু এই উভয় প্রকার পদার্থগুলির মধ্যে চলৎ-শক্তিশীলগুলিই শ্রবণেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দুনিয়ার প্রত্যেক পদার্থ চলৎশক্তিবিহীন হইলে আমরা একেবারেই কিছু শুনিতে পাইতাম না। রাত্রিতে চলাচলের সময় আমরা গম্যমান পদার্থগুলি হইতেই ভীত হই। কাজেই আমরা ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা পদার্থগুলির গমনাগমনের কারণ বিশেষরূপে জানিয়া রাখি। রুসো দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের তুলনা নিম্নোক্তরূপে করিয়াছেন :—

কামানের অগ্নিশিখা দেখিলেও গুলির আঘাত পরিত্যাগের যথেষ্ট সময় থাকে। কিন্তু শব্দ শুনিবা-মাত্র আর সময় থাকে না, যেহেতু শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই গুলির আঘাত লাগিয়াছে। বজ্রপাতের দূরত্ব আমরা আলো ও বজ্রশিলার পতনের সময়

নিরূপণদ্বারা অনুমাণ করিয়া থাকি। শিশুগণ উক্ত প্রকার এক্সপেরিমেন্ট বুঝিতে চেষ্টা করুক। তাহাদের মেধাশক্তির অনুরূপ এক্সপেরিমেণ্ট করুক ও ইহা হইতে অনুমানের সাহায্যে আবিষ্কারে রত হউক। অপরের নিকট হইতে কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করার চেয়ে শিশুগণ বরং অজ্ঞ থাকিবে। মোটকথা, রুসো এই বলিতে চাহেন যে, শিশুগণ আত্মপ্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে জ্ঞান লাভ করিবে।

চতুর্থতঃ রুসো রসেন্দ্রিয়ের বিষয়ে নিম্নোক্তরূপে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বেশী। পারিপার্শ্বিক দ্রব্যগুলির চেয়ে, যে সকল বস্তু আমাদের দেহের পুষ্টি সাধনের সহায়ক, সেইগুলির সঠিক বিচারে আমরা আগ্রহান্বিত। এমন অনেক হাজার হাজার জিনিষ আছে যাহা স্পর্শ, শ্রবণ অথবা দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরে সাধারণতঃ আসেনা, কিন্তু এমন বস্তু কদাচিৎ আছে যাহাতে রসনা একেবারে উদাসীন। অধিকন্তু রসেন্দ্রিয়ের প্রভাব শরীর ও দ্রব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কল্পনা ও অনুকরণের প্রভাবে আমরা প্রায়ই অন্যান্য ইন্দ্রিয়সম্ভূত অভিজ্ঞতায় নৈতিক চরিত্রের আভাস দেখিতে পাই। কিন্তু রসেন্দ্রিয় কল্পনাকর্ত্তৃক কদাচিৎ প্রভাবিত হয়। এমন কি, যাঁহারা সাধারণতঃ অতি সহজেই উত্তেজিত হন তাঁহারা অল্পায়াসেই অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা প্রভাবিত হইলেও, রসেন্দ্রিয় তাঁহাদিগকে সহসা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে না। ইহাতে রসেন্দ্রিয় কিয়ৎ-পরিমাণে খর্ব্ব হইলেও এবং ইহার অত্যধিক প্রশংসার হ্রাস পাইলেও রুসোর ধ্রুব বিশ্বাস যে, রসেন্দ্রিয়ই শিশুদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বেশী।

এতক্ষণে আমরা কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ইন্দ্রিয়ের গুণাবলীর বিষয়ে রুসোর মন্তব্যের ধারাবাহিক অবতারণা করিয়াছি। এক্ষণে শিশুদের আদর্শ শিক্ষায় রুসোর মনোনীত পাঠ্য-তালিকার আলোচনা করিব।

চিত্রাঙ্কন :—

শিশুরা অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া স্বভাবতঃই চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করে। তাহাদের এই স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা চিত্রাঙ্কনের চর্চ্চায় পরিচালিত করিতে হইবে। চিত্রাঙ্কন শিশুদের দৃষ্টিশক্তির ভ্রম বিদূরিত এবং হস্তের সুচারুরূপে পরিচালনার সাহায্য করিবে। কোমলমতি শিশুদিগকে চিত্র-বিদ্যায় কৃতী করিবার উদ্দেশ্যে ইহা শিক্ষা দেওয়া হইবে না। অধিকন্তু চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে শিশুদের মন ও দেহের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। তাহাদের চিত্রাঙ্কনের সাহায্যকল্পে কোন ড্রইং-শিক্ষক নিযুক্ত থাকিবে না। প্রকৃতি-দেবী তাহাদের চিত্রাঙ্কনের শিক্ষয়িত্রী হইবেন। শিশুরা প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক বস্তু হইতে চিত্রাঙ্কন করিবে। তাহারা ঘর হইতে ঘর, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ ও মানুষ হইতে মানুষের ছবি আঁকিবে। কৃত্রিম ছবি হইতে কদাচিৎ চিত্র আঁকিবে না। এমন কি স্মৃতিশক্তি হইতেও তাহারা কখনও চিত্র আঁকিবে না।

জ্যামিতি—

শিশুদের জ্যামিতি শিক্ষা দিবার সময় তাহাদের প্রণালীরই অনুকরণ করিতে হইবে। যাহা আমাদের পক্ষে তর্কের বিষয়, তাহা তাহাদের নিকট দর্শনোপযোগী হইবে। আমাদের প্রণালীতে জ্যামিতি শিক্ষা দিতে হইলে, কল্পনা ও তর্কের সমাবেশ করিতে হয়। একটি প্রব্লেম বর্ণনাকালে ডিমনস্ট্রেশনও কল্পনায় আনিতে হয়। অর্থাৎ আমাদিগকে দেখিতে হয়, কোন্ পূর্ব্বপরিচিত প্রপোজিশনের উপর নূতনটি নির্ভর করে। এই জ্ঞাত মূলতত্ত্বের ফলাফল হইতেই আমরা প্রয়োজনীয়

প্রপোজিশন বাছাই করিয়া থাকি। রুসো তৎকালীন ইউরোপীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জ্যামিতি শিক্ষা-প্রণালীর সমালোচনা নিম্নোক্তরূপে করিয়াছেন :—

এই প্রণালী অনুযায়ী কূটতর্ক-বিশারদও স্বাভাবিক উদ্ভাবনশক্তি রহিত হইলে ভুল করিয়া থাকেন। শিক্ষক শিশুদিগেকে ডিমনষ্ট্রেশনের আবিষ্কারে সাহায্য না করিয়া তাহাদের নিকট আবৃত্তি করেন মাত্র। জ্যামিতির সাহায্যে তাহাদিগকে তর্ক-বিতর্ক করিতে শিক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে নিজেই তর্ক-বিতর্ক করিয়া থাকেন মাত্র।

ভূগোল—

শিশুদিগকে ভূগোল শিক্ষাদিবার সময় গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্য কখনও লওয়া উচিত নহে। তাহাদিগকে সঞ্জীবিত জিনিষের সাহায্যে ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে। প্রকৃতির আবহাওয়া-স্থিত বস্তুর সাহায্যে শিশুদিগকে ভূগোল শিক্ষা দিলে তাহাদের বোধশক্তির উন্মেষের বিশেষ সহায় হয়। এস্থলেও রুসো তদানীন্তন ভূগোল শিক্ষার ইউরোপীয় প্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে সুইজ্যারল্যাণ্ডের শিক্ষাসংস্কারক পেষ্টেলেজির য়্যুভার্ডনস্থিত স্কুলগৃহে ও বিংশতি শতাব্দীর মার্কিন দর্শনশাস্ত্রবিশারদ জনডুয়ির শিক্ষাতত্ত্বে রুসোর শিশু-শিক্ষার মতের প্রভাব সম্যকরূপে দেখিতে পাই।

এতক্ষণ আলোচনাপ্রসঙ্গে বেশ বুঝা গেল, রুসো তাঁহার কালে প্রচলিত ইউরোপীয় স্কুলে শিশু-শিক্ষার প্রণালী আদৌ সমর্থন করেন নাই। কেননা তদানীন্তন শিক্ষা-রীতি কেবল শিশুদের মত পুঁথিগত বিদ্যাদ্বারা ভারাক্রান্ত করিত মাত্র। তাহাদের মনোবৃত্তির পুষ্টিসাধন করিত না। শিশুগণ প্রকৃতির ক্রোড়ে বিচরণ করিয়া আশে পাশের সমস্ত জিনিষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃত শিক্ষালাভ করিবে। শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য শিশুদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা জাগাইয়া তোলা ও বালসুলভ ঔৎসুক্যের সহায়তায় তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করা। রুসোর অভিমত এই যে, প্রাকৃতিক অবহাওয়ার মধ্যে শিশুদিগকে সুশিক্ষিত করিলে, তাহাদের মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। রুসো যদিও স্কুলে কোনরূপ এক্সপেরিমেণ্ট করিয়া তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বের প্রাধান্য প্রমাণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রভাব ইউরোপীয়, মার্কিন ও অপরাপর সুসভ্য দেশের আধুনিক এলিমেণ্টারী স্কুলসমূহের পাঠ্যতালিকার ও শিক্ষা-প্রণালীতে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। রুসো-শিক্ষাতত্ত্বের প্রভাব বিস্তারে সুইজ্যারল্যণ্ডের চিরস্মরণীয় শিক্ষা-সংস্কারক পেষ্টালজিই দায়ী। পরে এই মনীষীর এলিমেণ্টারী স্কুলের এক্সপেরিমেণ্টের বিষয় আলোচনা করিব।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামতি রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই সূচিত করে। হিন্দুধর্ম্মের ঘোর দুর্দ্দিনে রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম এজন্য তাঁহার নিকট ঋণী। পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন তাহার অপূর্ব্ব সম্মোহন-শক্তি লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় যুবকবৃন্দ তাহার মনোহর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহার চরণে আত্মোৎসর্গ করিল। নিজেদের যাহা কিছু—ধর্ম্ম, সাহিত্য, ভাষা ও সমাজ—সমস্তই তাহারা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিল, বৈদেশিক ধর্ম্ম ও সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল এবং দলে দলে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ খৃষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। পৌত্তলিক উপাসনা যে ধর্ম্মের মূল-সূত্র, সে ধর্ম্ম বর্ব্বরের ধর্ম্ম, এবং যে সাহিত্যের উপর সেই ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, সেই সাহিত্যও বর্ব্বরের সাহিত্য, সুতরাং তাহা ইংরেজী শিক্ষিতদের জন্য নহে;—এই অদ্ভুত ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যখন দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল সুশিক্ষিত যুবকগণ প্রতীচির ধর্ম্ম ও সাহিত্য সাদরে বরণ করিয়া লইল, জাতির সেই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইলেন রাজা রামমোহন রায় অমানুষিক শক্তি লইয়া। তিনি তাঁহার অকাট্য যুক্তিতর্ক দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত যুবকদিগকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন যে, তাহাদের ধর্ম্ম বর্ব্বরের ধর্ম্ম নহে এবং একেশ্বর বাদই এই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। এইভাবে রামমোহন আসন্ন ধ্বংস হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন, কিন্তু রামমোহন ধর্ম্মের যে নূতন আদর্শ-জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, তাহা জাতির মুষ্টিমেয় কয়েকজন গ্রহণ করিল মাত্র; সকলকে তাহা আকৃষ্ট করিতে পারিল না, কেননা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য—হিন্দুর সনাতন পদ্ধতিকে রামমোহন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, সাধনার সুবিধার জন্য নিরাকারকে আকার দিয়া, অসীমকে সসীম করিয়া উপাসনা করা হিন্দুর চিরন্তন প্রথা। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রচারের সুবিধার জন্য উক্ত প্রথাকে উপহাস করিলেও উহা নিরর্থক নহে, পরন্তু সাধনমার্গে উন্নতিলাভের জন্য ও হৃদয়ে ধর্ম্মভাব নিরন্তর জাগরূক রাখিবার জন্য ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই কথা অস্বীকার করিয়া হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ সাধন পদ্ধতির ব্যতিক্রম করায়, রাম-মোহন-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হিন্দুসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের ধর্ম্মমতও হিন্দু সাধারণ একই কারণে গ্রহণ করে নাই। হিন্দুর এই সনাতন সাধন-পদ্ধতির অমোঘতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাধক শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আবির্ভূত হন।

"Thus at this time when the whole land was in a ferment and faiths were rising and declining with astounding quickness, there was born a man who was destined to continue the traditional faiths of the land and give it a new

vigour and life by a new synthesis of his own (Indian Review—1908 quoted from Probuddha Bharat—Centenary number—Page 146)—এইভাবে যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে নব নব ধর্ম্মমতের উদ্ভব এবং বিলয় হইতেছিল, তখন জন্মগ্রহণ করিলেন এক মহাপুরুষ ভারতের চিরপ্রচলিত সাধনার ধারা সঞ্জীবিত রাখিতে এবং তাহাতে নূতন ভাব সঞ্চারিত করিতে।

সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি দ্বারা। তিনি স্বীয় সাধনালব্ধ অনুভূতি দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, ভগবান এক—যে ঈশ্বরকে খৃষ্টানগণ ও মুসলমানগণ ভজনা করেন, অবিকল সেই ঈশ্বরকেই হিন্দুগণও আরাধনা করিয়া থাকেন; সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক, কেবল সেই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার পন্থা বিভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাতে "My Master" নামক বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছিলেন—"The second idea that I learned form my master, and which is perhaps the most vital, is the wonderful truth that the religions of the new world are not contradictory or antagonistic: they are but various phases of One Eternal Religion" "আমার গুরুদেবের নিকট আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই পাইয়াছি যে, জগতের সকল ধর্ম্মই এক, তাহাদের পরস্পর কোন বিরোধ নাই। একই ধর্ম্ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে অনুসৃত হয় মাত্র।" সকল ধর্ম্মের মূলগত একত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিলে ভগবান পৃথিবীতে নররূপে অবতীর্ণ হন,—গীতাতে ভগবান এই কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। ধর্ম্মের বেশ ধরিয়া অধর্ম্ম যখন জগতময় বিচরণ করিতেছিল, এবং তাহার পাশবিক আস্ফালনে ধরণী যখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন ভগবান প্রকৃত ধর্ম্মভাব পুনঃ সংস্থাপনের জন্য।

ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতাই সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক কলহের প্রধান কারণ। ধর্ম্মের সারমর্ম্ম সম্যক অনুধাবন করিতে না পারিয়াই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে এবং নিকৃষ্ট বিবেচনা করে, একজন অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর আঘাত করে এবং তাহার স্বাধীন ধর্ম্মবিশ্বাসকে অপহৃত করিয়া তাহাকে স্বীয় ধর্ম্মে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না, এজন্য জগতে কম অনর্থের সৃষ্টি হয় নাই, কম রক্তপাত হয় নাই। Protestant, Roman Catholic ও Puritan দের পরস্পর মতভেদের শোচনীয় পরিণাম ইউরোপের ইতিহাসপাঠক অবগত আছেন। খৃষ্টান সমাজ ইহুদি সমাজের প্রতি কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা শিক্ষিতগণ অবিদিত নহেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আইনষ্টিন ঘটিত লজ্জাকর ব্যাপার ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরকাল কলঙ্কিত করিবে। ভারতের কতিপয় মুসলমান নরপতির অহেতুক হিন্দু-বিদ্বেষ অবর্ণনীয়। শিখগুরুদের মর্ম্মান্তিক হত্যা-কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই সমস্ত অতীতের ঘটনা, শুধু ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতে পারি। বর্ত্তমানে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিনিয়ত এমন শত শত ঘটনা ঘটিতেছে না কি? বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ এবং তাহার মর্ম্মভেদী পরিণাম সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন, সুতরাং বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। এই সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সেখানেও ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যে জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে,

শত চেষ্টায়ও তাহার উপযুক্ত মীমাংসা হইতেছে না। এই সকল অসদ্ভাবের মূলে অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস বর্ত্তমান। এই সকল পরস্পর বিবদমান সম্প্রদায়সমূহ যদি বুঝিতে পারিত যে, ধর্ম্ম মূলতঃ এক, স্থান ভেদে এবং জাতি ভেদে ইহা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র, যদি তাহারা বুঝিতে পারিত যে, সমস্ত ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক, যেমন সকল নদীরই পরিণতি একই সাগরে, তাহা হইলে আর সম্প্রদায় সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিত না, নির্যাতন করিত না। জগতে এক বিরাট শান্তি বিরাজ করিত। রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জগৎকে এই সাম্যনীতি শিক্ষা দিবার জন্যই। তিনি বৈষ্ণব মতে, শাক্ত মতে, তান্ত্রিক মতে, বামাচার মতে, খৃষ্টীয় মতে এবং ইসলামী মতে তপস্যা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, কোন পথই নিন্দনীয় নহে, ইহার যে কোনটিকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিলাভ সম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মমতের সাধনে সাফল্য লাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতের সকল ধর্ম্মমতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তেমনই আবার তিনি ভারতের ধর্ম্মবিরোধ নাশ করিয়া কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদের জাতিত্ব সর্ব্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়ে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব পরিশিষ্ট, ১৯ পৃঃ)

সময়ের প্রয়োজন অনুসারে অবতার পুরুষদের জগতে আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। রাক্ষসদের অমানুষিক অত্যাচার হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্যায়কে দমন করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া মানুষ যখন কেবল কতকগুলি প্রথাকে ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, ঘটাপূর্ণ কতকগুলি যাগযজ্ঞই যখন ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইতেছিল, তখন অবতীর্ণ হইলেন, ভগবান্ বুদ্ধ মানুষকে কর্ম্মের অমোঘ বাণী শুনাইতে এবং বাহ্য আচারের শূন্যতা প্রতিপাদন করিয়া অন্তঃশুদ্ধির অপরিহার্য্যতা জগতে প্রচার করিতে। নৈয়ায়িকগণের শুষ্ক তর্কতাপে সমাজ-হৃদয় যখন মরুভূমি সদৃশ হইয়াছিল, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের কঠোর শাসনের ফলে মানুষ যখন মানুষকে ক্ষুদ্র, অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, জাতিভেদের তীব্র হলাহল যখন সমাজ-দেহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন সেই স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণেরই প্রধান পীঠস্থান নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে এবং ভক্তি বন্যায় মনুষ্য হৃদয় পরিপ্লাবিত করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সময়ে আবির্ভূত হইলেন, তাহা এক উৎকট ধর্ম্ম-বিপ্লবের যুগ। এই বিপ্লবের ফলে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় একত্রে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে—উদ্দেশ্য, হিন্দুধর্ম্মকে সভ্যসমাজে হীন প্রতিপন্ন করা। এই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের চরম পরিণতি ঘটে চিকাগোতে। সেখানে এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়, এবং হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। চিকাগো ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও সাধকবৃন্দের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রত্যেকেই নিজের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনালব্ধ শক্তিদ্বারা সকল ধর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়া আপন আপন ধর্ম্মমত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বুঝিতেন, সকলেই

ভগবানের সন্তান, তবে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতভেদ কেন? ইহার মীমাংসা তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সমস্যা লইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে মহা আন্দোলন চলিতেছিল। এই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান সনাতন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে প্রচুর থাকিলেও প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা এ তত্ত্ব প্রচার এই সময়ে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের ফলে মনুষ্য মন হইতে যখন হিংসাদ্বেষ, এবং পরধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বিদূরীত হইয়া মহা প্রেমের রাজ্য জগতে সংস্থাপিত হইবে, তখন এই ধরাধাম কি সুখের স্থল হইবে, তাহা ভাবিতেও হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরলাভ করেন। এইভাবে তিনি দেখাইলেন, সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য এক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এই জন্যই সকল ধর্ম্ম সমন্বয়ের মূর্ত্তবিগ্রহ বলা হয়। পৃথিবীর সকল সিদ্ধ মহাপুরুষগণ জগতের হিতকামনায় স্ব স্ব শক্তি একত্রিভূত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেমন বিক্ষুব্ধ দেবতাগণের পুঞ্জীভূত তেজরাশি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন মহাশক্তি চণ্ডী অত্যাচারী দানবদের সংহার করিয়া ন্যায়ের প্রতিভূস্বরূপ দেবতাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সুন্দর কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা,
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।"

আমেরিকার অধ্যাপক Ernest P Horrwitz "Probuddha Bharat" এর শতবার্ষিক বিশেষ সংখ্যায় "Ramkrishna and Vivekananda" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছিলেন—"Every denomination within every faith is inclined to raise the warcry: my creed alone is true, only my saviour is divine! But Neo-Vadanta, world-wide in its sympathies, points to the one divine and dynamic life which is profuse in all of God's messengers, Moses and Mohammed, Buddha and Jesus."

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবান্ লাভের প্রধান উপায়—বিশ্বাস ও ভক্তি, পুঁথিগত জ্ঞান ও তর্কদ্বারা ভগবদ্দর্শন অসম্ভব। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর,' এই কথার যাথার্থ্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি। বিশ্বাস ও ভক্তি—এই দুইটি মাত্র সম্বল করিয়া তিনি নানা মতে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, পুঁথিগত বিদ্যা এবং দার্শনিক বিচারের দিক দিয়া তিনি যান নাই। শুধু দার্শনিক আলোচনা দ্বারা কেহ ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াও ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। এই বিশ্বাস ও ভক্তির নিকট তর্ক ও অবিশ্বাসের পরাজয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের সমুদয় যুক্তিতর্ক শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় জল হইয়া যাইত। কিন্তু রামকৃষ্ণের জীবনের সর্ব্বোজ্জ্বল ঘটনা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়, ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথের মতি-পরিবর্ত্তন ও তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যশ্রেণিভুক্ত করা। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রনাথের আত্মসমর্পণ শুধু ঠাকুরের জীবনে একটি প্রধান ঘটনা নয়, পরন্তু এই ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। এই ঘটনা সমগ্র চিন্তাজগতে একটি

ওলট-পালটের সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া, খ্যাতনামা ধর্ম্মাচার্য্যগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া যাঁহার মনের পরিতৃপ্তি হয় নাই, এবং যিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, সেই আধুনিক শিক্ষিত ও আধুনিক ভাবাপন্ন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহার কথায় তাঁহার বিদ্রোহী চিন্তাধারা সংযতভাব ধারণ করিল। প্রথম দর্শনে সন্দিগ্ধচিত্ত নরেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "তোমাদিগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাদিগের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছি সেইরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায়, কিন্তু ঐরূপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রী পুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চক্ষের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য ঐরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরূপ কে করে, বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরূপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে দেখা দেন।" জগৎ একটা সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনিল। নিরাকারবাদিগণ এ কথায় বিস্মিত হইলেন এবং শূন্যবাদীরা বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। সর্ব্বভূতে বিরাজমান অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলা যায়, এ যুগে কেহ একথা উচ্চারণ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই কথা ধর্ম্মপিপাসু নরেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করিল। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, নিরাকার মতের উপাসক ইংরেজী শিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথের 'ঐ কথা শুনিয়া মনে হইল, তিনি অপর ধর্ম্মপ্রচারকদের ন্যায় কল্পনা বা রূপকের সহায় লইয়া ঐরূপ বলিতেছেন না, সত্যসত্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন।' নরেন্দ্রনাথের মত যুক্তিবাদী ও অবিশ্বাসী মনের অকস্মাৎ এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সত্যই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ শুধু একথা শুনিয়াই কি ঠাকুরের শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন? নরেন্দ্রনাথ সে প্রকৃতির লোকই ছিলেন না। তিনি উত্তমরূপে পরীক্ষা না করিয়া কোন কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। ঠাকুরকে তিনি বার বার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের কথার সত্যতা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিয়া তিনি ঠাকুরকে স্বীয় অন্তর রাজ্যের দেবতা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই হইতেই জগতে নাস্তিক্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত হইল। আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার ইহা এক বিচিত্র দান।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্মিলনের আরও একটা দিক ভাবিবার আছে। বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবেন, ইহা যেন একটি বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্যাপার। রামকৃষ্ণের সাধনালব্ধ অপূর্ব্ব ফল জগতে বিতরণ করিবার জন্যই যেন বিবেকানন্দের সৃষ্টি। অশোক না থাকিলে যেমন বুদ্ধের বাণী জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে এবং অত শীঘ্র পৌঁছিত না, প্লেটো না থাকিলে যেমন সক্রেটিসের মতবাদ জগতে প্রচারিত হইত না, জগাই-মাধাই বিজয়ী নিতানন্দ না থাকিলে যেমন শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্ম্ম অত প্রসারলাভ করিতে পারিত না, অর্জ্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা বাস্তবে পরিণত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত মতবাদ জগতে এমন সুন্দরভাবে প্রচারিত হইত না।

জগতে এপর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম-প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই ধর্ম্মমতের মধ্যে অল্পাধিক সাম্প্রদায়িকতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব গণ্ডির মধ্যে অপর গণ্ডিভুক্তদিগকে আনিবার জন্য অল্পাধিক প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ এবং তদীয় শিষ্যগণের

মধ্যে একপ প্রবৃত্তি কখনও লক্ষিত হয না। "He preached no conversion but the legitimate fulfilment of each creed independent of each other. He realised one and the same truth as the basis of all religions and instructed all not to give up their own creeds Let the Hindu be a true Hindu, Moslem a true Moslem and a Christian a true Christian" (Lecture by Swami Sadasivananda at Lucknow) ধর্ম্মেব এমন সার্ব্বভৌমিক ভাব ইতিপূর্ব্বে আব কেহ এমন সবল উদাবভাবে প্রচাব কবিয়াছেন বলিযা আমবা জানি না। তাঁহাব শিষ্যগণ কখনও তাঁহাদেব গুরুব আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিযাছেন "Do I wish that a Christian would become a Hindu? God forbid Do I wish that the Hindu or the Buddhist would become Christian? God forbid, The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his law of growth" সাকাববাদীকে বামকৃষ্ণ দেব-বিগ্রহেব পূজা কবিতে বলিযাছেন, আবাব নিবাকাব পন্থীকেও কখনও বলেন নাই যে তাহাব পথ খাবাপ। ইহাই বামকৃষ্ণেব বিশেষত্ব। সাকাববাদী শশধব তর্কচূড়ামণি প্রমুখ পণ্ডিতগণ এবং নিরাকারবাদী কেশব সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ করিয়া সমভাবে পবিতৃপ্ত হইতেন। রোঁমা বোঁলা, মোক্ষমূলব প্রভৃতি ইউবোপীয় মনীষিবৃন্দও এই কাবণেই রামকৃষ্ণেব প্রতি এতদূর অনুবক্ত। ধর্ম্মজগতে ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাব এবং এই অভিনব ভাবের স্রষ্টা যে ভাবতেবই ঋষি এজন্য ভাবতবাসী আমরা গৌববান্বিত। চিন্তাজগতে ইহা ভারতের আরও একটি বিশেষ গৌববময় দান। 'আনন্দবাজার' শতবার্ষিক সংখ্যায একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন —"বামকৃষ্ণেব ধর্ম্মে দেব-দেবীর হাঙ্গামা নাই। ইহাই ঠাকুবেব বিশেষত্ব। যাব যা খুসী সে সেই দেবতা পূজা কবিতে পাবে। এমন কি হিন্দুও দেবদেবীব তোযাক্কা না বাখিয়া বামকৃষ্ণেব আওতায় আসিলে ধর্ম্মেব খোবাক যথেষ্ট পায়। একজন বাঙ্গালী হিন্দুব পক্ষে এইরূপ দেবতা নিরপেক্ষ ধর্ম্মপ্রচার কবা ধর্ম্মেব ইতিহাসে পুবাদস্তব যুগান্তব।"

বামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এক যুগ সন্ধিক্ষণে, আবাব তাঁহাব শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে অনুরূপ ভয়ঙ্কব সময়েই। তখন অবোধ ভাবত সন্তানগণ নিজেব ধর্ম্ম পবিত্যাগ কবিয়া অপব ধর্ম্মেব শবণাগত হইতেছিল। বামকৃষ্ণ সেই সময় অবতীর্ণ হইয়া বিভ্রান্ত যুবকদিগকে ডাকিয়া আনিলেন নিজদেশে, নিজঘরে। আবাব এখন ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক বোধ জাতির মনোবাজ্যে প্রবেশ কবিয়া জাতীয় জীবন দুর্ব্বহ কবিয়া তুলিযাছে। এই দুর্দ্দিনে রামকৃষ্ণেব জীবনী ও বাণী যত আলোচিত হইবে ততই মঙ্গল।

হিন্দু-সঙ্গীত

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্

নৃত্যগীত মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। পৃথিবীর সভ্য অসভ্য যাবতীয় জাতির মধ্যেই কোন না কোন আকারে সঙ্গীত প্রচলিত আছে। শিশুর নৃত্য তার স্বাভাবজাত ইচ্ছার ফল, যাঁদের কণ্ঠে গান গাইবার মত ক্ষমতা মোটেই নেই, তাঁরাও অনেক সময়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এক আধটুকু গেয়ে ফেলেন, এমন কি এদেশে পুত্রবিয়োগ-বিধুরা মায়ের ক্রন্দন-বিলাপেও সুর স্থান পেয়েছে, এসব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। শিশুর নৃত্যে বা অগায়কের গানে আমরা হয়ত মানুষের উদ্ভাবিত কোন নিয়ম-প্রণালী দেখতে পাই না, কিন্তু নাচবার বা গাইবার স্বাভাবিক ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝতে পারি।

সঙ্গীতের উৎপত্তি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে গেলে এই স্বাভাবিক ইচ্ছাকে বাদ দেওয়া চলবে না, কারণ একথা ঠিক, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানারকমের বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়ে এই স্বাভাবিক ইচ্ছাই 'সঙ্গীতের সুনিয়ন্ত্রিতরূপের সৃষ্টি করেছে। এই ইচ্ছা মানুষের মনে কবে প্রথম জেগেছিল তার ইতিহাস নেই, সুতরাং একথা নির্ব্বিবাদে বলা চলে যে, সঙ্গীত সৃষ্টিরও কোন ইতিহাস নেই।

কিন্তু মানুষ তার ইতিহাসের যতদিনকার কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিখে রেখেছে, তত-দিনের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশে কিভাবে সঙ্গীত এক একটা বিশিষ্ট ধারায় শিল্পসৃষ্টির নমুনা দেখিয়েছে, তার মোটামুটি ইতিহাস আমরা পাই। সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের—এমন কি ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য এই সব ধারার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কারণেই পণ্ডিতেরা বলেছেন, কোন জাতির ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে গেলে তার সঙ্গীতকে বুঝতে হবে। সঙ্গীত ভাষাহীন শিল্প, এতে দর্শনীয় কোন রূপ নেই। ভাষা ও রূপ অনেক সময় তাদের বিষয় বস্তুর স্বরূপটীকে প্রকাশ না ক'রে বরং গোপন করতেই সাহায্য করে। কিন্তু সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে মানুষের গভীরতম মর্ম্মকথা অতি স্পষ্ট এবং সুন্দর-রূপে প্রকাশ পায়।

এই কথা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, জাতির মনের অবস্থা এবং সভ্যতার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেও পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার লোপের সঙ্গে মিশরীয় সঙ্গীতও লোপ পেয়েছে। গ্রীক সভ্যতা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি বলে আমরা যতই বক্তৃতা করি না কেন, বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্যতার নমুনা দেখে প্রাচীন গ্রীসের কথা মনে পড়ে না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সঙ্গীত প্রাচীন গ্রীক সঙ্গীতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তার কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতীচ্যের আধুনিক সভ্যতা যেমন প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করতে পারেনি, সেখানকার আধুনিক সঙ্গীতও তেমনি প্রাচীন সঙ্গীতের গঠন ও রূপকে বরদাস্ত করতে পারেনি।

ভারতের ইতিহাস একটু আলাদা রকমের। এখানে অন্য কোন দেশের চেয়ে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক

বিপর্য্যয় কিছু কম ঘটেনি। কিন্তু প্রত্যেক বিপর্য্যয়ের পরেই ভারতবাসী যেন কি এক নিগূঢ় উপায়ে নূতন অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন অবস্থার একটা সুন্দর সামঞ্জস্য করে নিয়েছে :—প্রাচীনের আদর্শ বা নীতি সে কোন বিপ্লবের পরেই ত্যাগ করেনি। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যতাসমূহের অন্যতম হয়েও এই সর্ব্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগ পর্য্যন্ত তার বৈশিষ্ট্যকে খানিকটা রক্ষা করতে পেরেছে।

ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাসও তাই। শাস্ত্রে আছে বেদ থেকে সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে। সামবেদের গান বর্ত্তমানে যা শুনতে পাওয়া যায়, তা থেকে অবশ্য বুঝতে পারা যায় না যে প্রাচীনকালে কিভাবে সামগান হ'ত, কিন্তু সামগানের নিয়ম কানুন সম্বলিত যে সব গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলি যতই দুর্ব্বোধ্য হো'ক, তাদের বর্ণিত পরিভাষার প্রাচুর্য্য দেখলেই মনে হয়, সেই অতি প্রাচীন যুগেই ভারতীয় সঙ্গীত উপপত্তিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে একটা সুপ্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির যতটা আমাদের বোধগম্য হয়েছে তাতেই আমরা জোর করে বলতে পারি বৈদিকযুগের সঙ্গীত আর বর্ত্তমানযুগের ভারতীয় সঙ্গীত একই মূল নীতিকে মেনে চলেছে।

কিছুকাল আগেও লোকের ধারণা ছিল, বৈদিক সঙ্গীত পঞ্চস্বরে গঠিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও পঞ্চস্বারিক সঙ্গীতকে সঙ্গীতের আদিম অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ তাঁদের মতে সভ্যতা বিকাশের পূর্ব্বে বা সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নাকি পাঁচটীর বেশী স্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেনি। এই যুক্তির অনুকূলে বর্ত্তমানের অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য পাহাড়ী ও বুনো জাতিদের পঞ্চস্বারিক সঙ্গীতকে প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আধুনিক গবেষকদের চেষ্টায় প্রমাণিত হয়েছে, বেদগানে সাত সুরই ব্যবহৃত হ'ত। 'ক্রুষ্টস্বর' ও 'অতিস্বরের' প্রয়োগ ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে সব সন্দেহই দূর হয়েছে।

সামগানে ব্যবহৃত স্বরের শ্রুতি পরিমাণ লৌকিক সঙ্গীতের মতই ছিল কি না তা নির্দ্ধারণের কোন উপায়ই নেই একথা সত্য; কিন্তু এই ব্যাপারের উপরেই সঙ্গীতের মূল নীতি নির্ভর করে না। গত দুই একশ' বছরের লৌকিক সঙ্গীতেও দেখতে পাওয়া যায়, একই রাগে ব্যবহৃত স্বরের মধ্যে যথেষ্ট বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু এর ফলে একথা বলা চলে না যে, গত দশ বছরে এদেশের সঙ্গীতের ধারা বদলে গিয়ে এখন একটা অভিনব সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে যাকে আর আমরা ভারতীয় সঙ্গীত বলতে পারিনা। প্রাদেশিক বৈষম্যের ফলে এবং অন্যান্য কারণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়, অথচ এই দুটী ধারার উৎস একই। সাতশ' বছরের পুরানো 'সঙ্গীত রত্নাকর'কে এই উভয় সঙ্গীতের পণ্ডিত ব্যক্তিরাই নিজ নিজ সঙ্গীতপদ্ধতির অতি প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থরূপে এখন পর্য্যন্ত আদর করে থাকেন। এই আদরকে আমরা অন্ধ আদর বলতে পারি না।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' 'সঙ্গীত রত্নাকরে'র চাইতে বোধ হয় আরও সাতশ' বছর আগেকার রচিত। নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গীতাংশের অনেক কথাই আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রচলিত সঙ্গীতের তত্ত্ব আলোচনা করলে বুঝতে পারি। প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত 'আলপ্তি' লক্ষণে মধ্য ও মন্দ্রস্বরের যে প্রয়োগ-বিধি উল্লিখিত আছে, তার সঙ্গে সামগীতির ক্রুষ্ট ও অতিস্বরের যেমন একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনই আবার সেই আলপ্তির সঙ্গে বর্ত্তমান সঙ্গীত-পদ্ধতির রাগালাপেরও কিছু কিছু মিল প্রমাণ করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। এইভাবে বুঝতে পারা যায়, সুপ্রাচীনের সঙ্গে প্রাচীনের, প্রাচীনের সঙ্গে মধ্য-যুগের এবং মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক সময়ের সঙ্গীত

একই বিশিষ্ট ধারা রক্ষা করে আসছে। এই বিশিষ্ট ধারাটীকেই আমরা হিন্দু-সঙ্গীত বলে জানি।

হিন্দু-সঙ্গীতের সঙ্গে অনেক সময় আর দুটী সঙ্গীত ধারার উল্লেখ করা হয়, তাদের একটী গ্রীক-সঙ্গীত এবং অপরটী পারস্য-সঙ্গীত। এই তিনটী সঙ্গীতেরই মূলনীতি নাকি প্রায় এক রকমের ছিল। একথা বলবার কারণ, এই তিন সঙ্গীতেই স্বরগুলি পরপর অর্থাৎ একটীর পরে আর একটী, এইভাবে ব্যবহার করবার নিয়ম ছিল বা আছে। তা ছাড়া হিন্দু-সঙ্গীতের মত গ্রীক ও পারস্য সঙ্গীতও কতকটা রাগমূলক ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ কর্তৃক পারস্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পারস্যের সঙ্গীত-শিল্প বিলুপ্ত হয়েছে, পরবর্ত্তী আমলের পারসিক সভ্যতায় প্রাচীন সঙ্গীতের ঠিক পরিচয় আর পাওয়া যায়নি।

রোমকরাও গ্রীস জয় করেছিল, কিন্তু গ্রীসের সভ্যতা নষ্ট করতে পারেনি, বরং গ্রীসের পাদমূলে বসে রোমকে সভ্যতার অনুশীলন করতে হয়েছিল। সুতরাং গ্রীস জয়ের সঙ্গে গ্রীসের সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্প লোপ পায়নি। গ্রীস জয়ের ফলে ইটালীতে ও সেই সঙ্গে অপর কোন কোন ইউরোপীয় রাজ্যে গ্রীক-সঙ্গীত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইভাবে গ্রীসের সঙ্গীতই পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর ধীরে ধীরে ইউরোপের স্বর সমবায়মূলক (harmonic) সঙ্গীত গড়ে ওঠে।

ইউরোপের এই সঙ্গীত-বিপর্য্যয়ের আর হিন্দু সঙ্গীতে মুসলমান প্রভাবজনিত বিপর্য্যয়ের ইতিহাস প্রায় সমসাময়িক। তবে ভারতে এবং ইউরোপে এই বিপর্য্যয় একভাবে ঘটেনি। গ্রীক-সঙ্গীতের স্বর পরম্পরামূলক (melodic) সঙ্গীত ইউরোপের নব গঠিত রুচিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কাজেই প্রাচীন সঙ্গীতের ধারা একেবারে নির্ব্বাসিত করে তার জায়গায় অভিনব সৃষ্টির কাজ চলতে লাগল। হয়ত প্রাচীন গ্রীক-সঙ্গীতের তথাকথিত 'রাগে' হিন্দু-সঙ্গীতের রাগের পরিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ভাবটী ছিলনা, হয়ত রাগ হিসাবে গ্রীক-সঙ্গীত তেমন উন্নতিলাভ কোন কালেই করতে পারেনি, অথবা এমনও হতে পারে যে, পরবর্ত্তী আমলের গ্রীক ও রোমকগণ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম স্বর প্রয়োগের বাহুল্য ঘটাতে গিয়ে সঙ্গীতকে সাধারণ শ্রোতার কাছে নীরস করে তুলেছিলেন। এই রকম একটা বা একাধিক কারণে প্রাচীন গ্রীক-সঙ্গীত নবসৃষ্ট সঙ্গীতের পাশে আর নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি।

কিন্তু হিন্দু সঙ্গীতে মুসলমান প্রভাবের ইতিহাস একেবারে ভিন্ন ধরণের। মুসলমানগণ বিদেশী হলেও ভারতে রাজত্ব আরম্ভ করবার পর আর বিদেশী থাকেননি। হিন্দু সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব হচ্ছে—সে অপরের প্রদত্ত বস্তুকে আপন করে নিতে জানে। বিদেশাগত শক হুন ইত্যাদি জাতি যেমন কালে হিন্দুসমাজের অঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছে, তেমনই বিভিন্ন যুগে আনীত বিদেশী আচার ব্যবহার এবং ভাবধারাকে হিন্দু সভ্যতা অতি স্বাভাবিক উপায়ে হজম করে নিয়েছে। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই মুসলমান গুণী-ব্যক্তিরা হিন্দু-সঙ্গীতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করবার বা অপর কোন অভিনবত্ব সৃষ্টি করবার পূর্ব্বে নিজেরাই হিন্দু-সঙ্গীতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁদের সৃষ্টিতে আমরা হিন্দু-সঙ্গীতের মূলনীতির বিরুদ্ধে কোন চেষ্টাই দেখতে পাইনা। তাঁদের অনুশীলনের ফলে আমাদের সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন ঘটেছে যথেষ্টই, কিন্তু সে পরিবর্ত্তনে আমাদের সঙ্গীত বিলুপ্ত না হয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

অন্যান্য অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পের মত সঙ্গীতও শিষ্য পরম্পরা লব্ধ বিদ্যা। উত্তর ভারতের মুসলমান দরবারে লালিত এই বিদ্যাকে গত কয়েক

শতাব্দী ধরে মুসলমান গুণীরা সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ না করেই শুধু গুরুর মুখে শুনে শুনে যেভাবে আয়ত্ত করেছেন, তার কাহিনী অতি বিচিত্র। দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান প্রভাব কোন কালেই ব্যাপক-ভাবে বিস্তারলাভ করেনি। দক্ষিণী গায়ক বাদক চিরদিন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্গীত-শাস্ত্রের ভক্ত, কাজেই একথা বলা একেবারে ভুল হবে না যে, দাক্ষিণাত্যে প্রাচীন সঙ্গীতের ধারা খানিকটা বজায় আছে। সেই দক্ষিণী বা কর্ণাটকী সঙ্গীতের সঙ্গে তথাকথিত মুসলমান প্রবর্ত্তিত বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটু তুলনা করলেই স্পষ্ট বুঝা যাবে, উত্তর ও দক্ষিণী সঙ্গীত আলাদা জিনিষ নয়। উভয়ের মধ্যে প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য আলাদা হ'তে পারে, কিন্তু মূলত কোন প্রভেদ নেই।

সুতরাং বৈদিক আমল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত সকল যুগের সকল প্রদেশের ভারতীয় সঙ্গীতকেই আমরা হিন্দু-সঙ্গীত বলতে পারি। আগেই বলেছি সঙ্গীত পরিবর্ত্তনশীল, ভবিষ্যতে হয়ত আরও বহুসংখ্যক অভিনব সৃষ্টি হিন্দু-সঙ্গীতের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলবে, কিন্তু যতদিন এর মূলনীতি উপেক্ষিত না হবে ততদিন, হিন্দু সঙ্গীত শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও হিন্দু-সঙ্গীতই থাকবে।

সঙ্গীতে অভিনব সৃষ্টির ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা এই কথাটী দয়া করে মনে রাখবেন। নূতনত্বের অতিরিক্ত উৎসাহে যদি কেউ হিন্দু-সঙ্গীতে পাশ্চাত্যের harmony বা স্বর সমবায়মূলক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হ'লে হিন্দু-সঙ্গীত আর হিন্দু সঙ্গীত থাকবে না, একথা আমি জোর করে বলতে পারি। Harmonyর সাহায্যে নতুন ধরণের সঙ্গীত সৃষ্টি করা যেতে পারে, এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের আসনে সেই নবসৃষ্ট সঙ্গীতকে বসিয়ে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে না।

প্রণতি

শ্রীনলিনীবালা বসু

অনাদি ঊষার প্রথম প্রভাতে অরুণ কিরণ মাখি
হে নবদেবতা! উদয় অচলে কি কথা বলিলে ডাকি?
　　ধরণী তখন নিদ্রা বিবশ
　　নদী গিরি বন স্বপ্ন-অলস,
নীরব নিথর মেঘ ঘন ঘোর
　　　　নীরব কণ্ঠে পাখী।

প্রকাশে তোমার আলোর লহরে হাসিয়া উদিল রবি,
নব চেতনায় প্রকৃতি জননী ধরিল মধুর ছবি
　　পাখীর কণ্ঠে ফিরে এলো গান,
　　উছলি উঠিল জল কলতান,
বীণার ছন্দে বাঁধি নব গান
　　　　বন্দিল আদি কবি।

দ্যুলোকে ভূলোকে পড়িল ছড়ায়ে তব কণ্ঠের ধ্বনি,
তারায় তারায় বাজে সংঘাত উঠে তায় রণ রণি,
অশিব নাশন সে অমরবাণী
কল্যাণ শুভ সবে দিল আনি
কোটী জনমের জড়তা ভাঙ্গিয়া
মানব জাগিল শুনি।

সীমার মাঝারে অসীম প্রকাশ দেখাইলে এ জগতে,
বিশ্ব-প্রকৃতি নোয়াইল শির তোমার লীলার পথে,
আছে অখণ্ড খণ্ডেরি মাঝে,
ক্ষুদ্রের মাঝে রুদ্র সে রাজে,
নরের মাঝারে নর-নারায়ণ
দেখা দিল এ মরতে।

ক্ষমা-সুন্দর শান্ত মূরতি মানবের চির প্রিয়;
ভুবন ব্যাপিয়া রয়েছে ঢাকিয়া তোমারি উত্তরীয়,
গেরুয়ার রঙে রাঙিল আকাশ,
বন্দনা-গীতি স্বনিল বাতাস
চরণ পরশে ধন্য ভারত
ধরণীর বরণীয়।

এখনো মুগ্ধ অন্তরধারা তব ভাবনায় লীন,
নয়ন সলিল অর্ঘ্য সাজায় অনন্ত নিশিদিন,
বিকশিত শত কুবলয় দলে,
ভক্তি-প্রদীপে প্রেমারতি চলে,
হে দেব! তোমার পূজার আসনে
হবে না কি সমাসীন?

মধু বসন্তে পুণ্য প্রভাতে অভয় শঙ্খ বাজে,
অগণ্য মন নিরত আজিকে তোমার সেবার কাজে;
সুপ্তি নাশন, ভাব ভাস্বর,
নয়নাভিরাম লীলা সুন্দর,
পরাণ-ভৃঙ্গ মগ্ন সতত
পদ-পঙ্কজ মাঝে।

চিত্তে আমার জাগে বিস্ময় একি লীলা অভিনব?
তমসার পারে হে জ্যোতির জ্যোতি
নিরখি অরূপ তব;
দিগ্ দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া,
যুগ যুগ ধরি আছ উজলিয়া,
অনাদি মহান্ জন্ম রহিত,
চির পুরাতন নব।

ওগো কাণ্ডারি! লবে না কি আসি খেয়া
পারাপার করি,
আকুল অশ্রু সাগর মাঝারে ভাসায়ে তোমার তরী?
নিরজনে আজ একা পথ ভুলে,
বসে আছি প্রাণ-সাগরের কূলে
হে চির শরণ! আসিয়া কি তুমি
লবে না বেদনা হরি?

শুনিয়াছি আমি পুরাণ কাহিনী সাধুসন্তের মুখে
পতিতের লাগি' তুমি আসো নাকি মর ধরণীর বুকে,
হে পরম গুরু! হে পরম প্রিয়!
পুণ্য চরণ রেণুকণা দিয়ো
শির'পরে মোর সুখ মানি লব তাহলে দারুণ দুখে,
বেদনা আমার ফুল হয়ে প্রভু!
ফুটিবে আমার বুকে।

যোগ-দর্শন

অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

জ্ঞানার্থক দৃশ্ ধাতু নিষ্পন্ন দর্শন শব্দের অর্থ জ্ঞান। আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। বাহ্য জগৎ সংস্পৃষ্ট ভৌতিক পদার্থ ঘটপটাদি যে জ্ঞানের বিষয় তাহা আধি-ভৌতিক (অধিভূত+ষ্ণিক)। আর আন্তর পদার্থ ঈশ্বর, আত্মা, মন প্রভৃতি যে জ্ঞানের বিষয়, তাহা আধ্যাত্মিক (অধ্যাত্ম+ষ্ণিক)। ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যগণ উক্ত দ্বিপ্রকার জ্ঞানের জ্ঞান ও বিজ্ঞান সংজ্ঞা দিয়াছেন। "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানংশিল্পশাস্ত্রযোঃ।"—অমরকোষ। মুক্তি বিষয়ে যে বুদ্ধি উহা জ্ঞান। আর শিল্পবস্তু (Art) ও উহার শাস্ত্র (Science) বিষয়ে যে জ্ঞান, উহার নাম বিজ্ঞান। ইহ-কালেও পরকাল লইয়া মানবজীবনের পূর্ণতা। একপক্ষ পক্ষীর মত কেবল ইহকাল কিংবা কেবল পরকাল লইয়া কোন জীবনের সার্থকতা হয় না। কিন্তু ভারতে জীবনের মূল লক্ষ্য মোক্ষলাভের জন্য যতখানি জোর দেওয়া হইয়াছে, গৌণ লক্ষ্য পার্থিব উন্নতির দিকে ঠিক ততখানি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ, কালধর্ম্মের প্রকৃতির নিয়মে আধুনিক পৃথিবীতে জড়বিজ্ঞানের সমধিক উৎকর্ষে ভোগের পথ ও বস্তু যত প্রশস্ত ও সমাহৃত হইয়াছে, প্রাচীনকালে, এমন কি, আজি হইতে অনধিক দুই-শত বৎসর পূর্ব্বের পৃথিবীতে এত অধিক ভোগ-বাহুল্য ছিল না। সেই জনবিরল ও ভোগদুর্লভ যুগের মানব স্বচ্ছন্দজাত স্বল্পায়াস লভ্য ফলমূল ও স্বহস্ত উৎপাদিত পরিমিত কৃষিজাত দ্রব্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি তথা অনায়াসলভ্য বৃক্ষত্বক্ অথবা ঐরূপ অন্য কোন দ্রব্যে লজ্জা নিবারণ করিয়া অবশিষ্ট অবসর কাল ইষ্ট ও ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। ঐ যুগে ত্যাগ ও ত্যাগসুলভ অধ্যাত্মচিন্তা যত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, অধুনাতন কালে সেইরূপ হওয়া বা ততখানি আশা করা যায় না। এ জন্য ঐ ত্যাগের সত্যযুগে যে সকল ঋষি ও ঋষিকল্প মহাত্মা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখসঙ্কুল সংসার হইতে অজ্ঞান মানবগণকে পরিত্রাণ মানসে তাঁহাদের কঠোর তপোলব্ধ আত্মচিন্তাসুলভ তত্ত্ব-দর্শনের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আলোচ্য যোগ-দর্শন ঐ সকল দর্শন-সন্দর্ভের অন্যতম প্রধান সন্দর্ভ। এই দর্শনের প্রাধান্যের কারণ, একদিকে যেমন ইহাতে ন্যায় মীমাংসাদির মত জটিল তর্ক-জালের গোলকধাঁধার অভাব, অন্য দিকে রচনার প্রাঞ্জলতা ও রচয়িতার উদারতা নিবন্ধন ইহাতে মানবমাত্রেরই তুল্যাধিকার। খ্যাতনামা দার্শনিক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু তাঁহার সুসংবাদিত পাতঞ্জল-দর্শনের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন,—"ইহা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই পতঞ্জলির উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন।"—যোগ-দর্শনের এই সার্ব্বজনীন অধিকার বিষয়ে ভারতমাতার মানস সন্তান শ্রদ্ধেয় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার যৌগিক প্রতিভার মণিমুকুর "রাজযোগ" গ্রন্থরাজের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"এই যোগ-দর্শন কখনও আমাদিগকে (পাঠক বা সাধকদিগকে) আমাদের ধর্ম্মমত কি, অর্থাৎ আমরা দ্বৈত কি অদ্বৈতবাদী, আস্তিক কি নাস্তিক, খৃষ্টান, ইহুদী কি বৌদ্ধ এইরূপ কোন প্রশ্ন করেন না। কেন

না, এই দর্শনের মতে প্রত্যেক মানবাত্মার ধর্ম্মতত্ত্বের আচরণে ও অনুশীলনে সমান অধিকার আছে।" এই সকল মূল্যবান মন্তব্যের মূল যোগানুষ্ঠান পরম ধর্ম্ম। এই পরম তত্ত্ব সম্পর্কে মহর্ষি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ,—

> "ইজ্যাচারদমাহিংসা তপঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মণাম্।
> অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥"
> ইন্দ্রিয় দমন যজ্ঞ আচার তপস্যা,
> বেদপাঠ ধর্ম্মকর্ম্ম পবিত্র অহিংসা,
> সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হয় যোগের সাধন,
> যাহা হ'তে করে জীব আত্মদরশন।

বস্তুতঃ এই আত্মদরশন বা মুক্তিলাভই কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানের—এক কথায় সকল ধর্ম্মের মুখ্য লক্ষ্য। যে ধর্ম্মের আচরণে সাক্ষাৎ আত্মদর্শন বা স্বরূপোপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, জগৎ কি, ঈশ্বর কি, আমার জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি ইত্যাকার তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হয় না, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না। ভারতীয় যোগ-সাধনা অবৈদিক অনুষ্ঠান নহে। সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক কঠশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"নচিকেতা যমরাজের নিকট এইরূপে আত্মবিদ্যা ও সমস্ত যোগানুষ্ঠান-বিধি শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাশ ছেদনপূর্ব্বক অবিদ্যা ও কামাদি পরিহার করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন।" ২।১৮। স্বয়ং ভগবান্ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—"কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপঃপরায়ণ অপেক্ষা যোগী উৎকৃষ্ট। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠান পর কর্ম্মিগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ। এমন কি, পরোক্ষ জ্ঞানযুক্ত জ্ঞানী হইতেও যোগী উত্তম। অতএব, হে অর্জ্জুন, তুমিও যোগী হও।" এই শ্লোকের টীকায় মধুসূদন সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—'এক্ষণে যোগীর প্রতি শ্রদ্ধাতিশয় উৎপাদনার্থ এবং যোগানুষ্ঠানের জন্য অর্জ্জুনের নিকট ভগবান্ যোগানুষ্ঠানের স্তব (স্তূয়তে, প্রশংসা) করিতেছেন।' বিখ্যাত গোবিন্দভাষ্য রচয়িতা শ্রীল বলদেব গোস্বামী বুঝাইয়াছেন,—"যোগপথে অগ্রগতির তারতম্য বশতঃ কর্ম্মযোগী সংখ্যায় বেশী। কর্ম্মযোগী হইতে ধ্যানী যোগযুক্ত বিধায় শ্রেষ্ঠ। যুক্তযোগী হইতে সমাধিপ্রবিষ্ট যোগী যুক্ততর হওয়ায় উৎকৃষ্ট, এবং শ্রবণাদিসাধন-ভক্তিসম্পন্ন যোগী যুক্ততম বলিয়া সর্ব্বোত্তম।" স্বয়ং ভগবান্ যে যোগসাধনার প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, উহার সফলতার বিষয়ে সংশয় অথবা প্রামাণ্য সম্পর্কে হেয়জ্ঞান আস্তিক্য বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। তারপর গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেও যোগ-দর্শনের উৎকর্ষ অবিসম্বাদিত। শাস্ত্রে সাক্ষাৎ অনন্তদেবকে যোগ-দর্শনের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। "যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাকরৎ পন্নগরাজ এষ...' ইত্যাদি। উক্ত প্রমাণে শেষাবতারকে শারীরমল (ব্যাধি) নাশক বৈদ্যরাজ 'চরক' বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি কেবল দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক নহেন। তিনি যেমন বাহ্য ব্যাধির চিকিৎসক, একাধারে তেমনি পতঞ্জলি নামে পাণিনির মহাভাষ্যের প্রণয়ন করিয়া বাক্যের মল (অশুদ্ধি) এবং যোগ-দর্শনের রচনা করিয়া মনের মল অসাধ্য ব্যাধি কামক্রোধাদিরও অদ্বিতীয় চিকিৎসক। চিকিৎসা-শাস্ত্র যেমন নিদান, রোগনির্ণয়, ঔষধ নির্ব্বাচন ও চিকিৎসা এই চারি ব্যূহে বিভক্ত, আলোচ্য যোগ-দর্শনও তেমনি সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য এই পাদচতুষ্টয়ে উপনিবদ্ধ। আমার মনে হয়, এই চারিটি পাদ যেন সত্য, শৌচ, দয়া, দান ধর্ম্মের চারিটি পাদসদৃশ, অথবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পুরুষ মাত্রেরই কাম্য চতুর্বর্গের সহিত ন্যূনাধিক সাদৃশ্যযুক্ত। যোগশাস্ত্রের এই চারিটি পাদে নিম্নোক্ত যৌগিকতত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা, বৃত্তি ও ভাষ্যের সাহায্যে সযৌক্তিক প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সমাধি বা প্রথম পাদে যোগের উদ্দেশ্য (নাম দ্বারা বস্তুর নির্দ্দেশ), যোগের লক্ষণ (অপরাপর বস্তু হইতে ভেদ নির্দ্দেশ), যোগানুষ্ঠানের উপায় এবং যোগের প্রকারভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বা সাধন পাদ ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক (কর্ম্মফল), কর্ম্মফলের দুঃখ হেতুত্ব এবং হেয় (পরিত্যাজ্য) হেতু, হান ও হানের উপায় চতুষ্টয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় বা বিভূতি পাদে যোগের অন্তরঙ্গ সাধন, পরিণাম, সংযমবিশেষ দ্বারা বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যবিশেষ এবং বিবেকজ জ্ঞান উপনিবদ্ধ হইয়াছে। চতুর্থ বা কৈবল্য পাদে মুক্তিযোগ্য চিত্ত পরলোকসিদ্ধ বাহ্যার্থ-সদ্ভাবসিদ্ধি, চিত্তাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ধর্ম্ম-মেঘসমাধি, জীবন্মুক্তি বিদেহ-কৈবল্য, এবং প্রকৃত্যা পূর্ব্বাদি যথাযথোপদিষ্ট হইয়াছে। যোগ শব্দের যৌগিক(যুজ্ + ঘঞ্) অর্থ মিলন। ধাতুটির অর্থ-বাহুল্য-প্রযুক্ত অমরকোষে যোগ শব্দের সন্নহন্-কবচ (Armour), উপায়, ধ্যান, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, (Suppression of mental modification), সঙ্গতি ও যুক্তি এই কয়টি অর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। মেদিনী প্রভৃতি পরবর্ত্তী কোষগ্রন্থে যোগশব্দের আরও অনেকানেক অর্থ ধৃত হইয়াছে। আমরা প্রস্তাবের অন্তরঙ্গরূপে যোগ শব্দের প্রথমোক্ত অর্থ মিলন অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য অর্থটিই গ্রহণ করিলাম। অবশ্য আলোচ্য যোগ-দর্শনে যোগ শব্দটি "আয়ুর্ঘৃতম্" ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় যুগপৎ উপায় এবং উপেয় অভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐরূপ ঐক্য বা তাদাত্ম্যভাবটি দক্ষস্মৃতিতে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত আছে, যথা—

"বৃত্তিহীনং মনঃকৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে"॥

'মন বৃত্তিহীন করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে বিলীন করিয়া যে মুক্তিলাভ, তাহাই শ্রেষ্ঠযোগ।' ইহার সংক্ষিপ্ত ভাবটি মহর্ষি বশিষ্ঠ অল্প কথায় বুঝাইয়াছেন,—"সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।" 'সাধনার সাহায্যে জীবাত্মা পরমাত্মার যে মিলন তাহারই নাম যোগ।' শ্রদ্ধেয় ষড়্দর্শনকারের ব্যাখ্যাটি যেমন স্বল্পায়তন তেমনি সুন্দর। তিনি বলেন,—"চিত্তদ্বারেণাত্মেশ্বর সম্বন্ধো যোগঃ।" অর্থাৎ একাগ্রচিত্তের সাহায্যে জীবাত্মা ও ঈশ্বরের (পরমাত্মার) যে সম্পর্ক (ঐকাত্ম্য) প্রতিপাদন, উহার নাম যোগ। যোগের উপকারিতাও আবশ্যকতা বিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ,—"যোগ হইতে প্রজ্ঞালাভ হয়, যোগের অভাব হইতে প্রজ্ঞানাশ হয়। লাভালাভের উপায়ভূত এই দুইটি পথ জানিয়া আপনাকে এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে, যাহাতে প্রজ্ঞা পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়।"

বাংলার সাধক

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম্-এ, এম-আর্-এ-এস্, বিদ্যাবিনোদ

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

দেরেপুর গ্রাম—ক্ষুদিরামের গৃহ

ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবী

ক্ষুদিরাম। চন্দ্রা, আজ আমাদের বড় সাধের ক্ষুদ্র গ্রামখানি আর পূর্ব্বপুরুষদের ভিটে ছেড়ে যেতে হবে।

চন্দ্রাদেবী। কেন, রামানন্দ বাবু কি সত্যই এত নির্দ্দয় হ'লেন?

ক্ষুদিরাম। যেখানে স্বার্থ, মানুষ সেখানে নির্দ্দয় নির্ম্মম না হ'য়ে পারে না। সংসারী লোক যারা, টাকাকড়ি নিয়ে কারবার যাদের, স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগ্‌লেই তারা ক্ষেপে ওঠে।

চন্দ্রাদেবী। তা' হোক্ গে যাক্। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। চল, এই গ্রাম ছেড়ে যাই। যেখানে তুমি ও আমি, সেই আমাদের দেশ—গৃহ—সেখানেই সুখ। রঘুবীর তো সঙ্গে থাক্‌বেন? তিনি আহার জুটিয়ে দেবেন।

ক্ষুদিরাম। হাঁ, তা' বটে, কিন্তু, চন্দ্রা, নাড়ীর-টান যেখানে, সে স্থান ত্যাগ কর্‌তে হ'লে বুক ফেটে যায়।

(জমিদারের গোমস্তাকে আসিতে দেখিয়া)

তুমি একটু সরে দাঁড়াও, ঐ জমিদারের লোক আস্‌ছে।

(চন্দ্রা চলিয়া গেলেন। গোমস্তার প্রবেশ)

গোমস্তা। নমস্কার, ঠাকুর মশাই।

ক্ষুদিরাম। কি গো? এসো এসো, কল্যাণ হোক্—

গোমস্তা। জমিদার বাবু আপনাকে শেষ ব'লে পাঠালেন, এখনও যদি ভাল চান তো তাঁর হ'য়ে সাক্ষ্য দিয়ে আসুন, নইলে—

ক্ষুদিরাম।—নইলে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে? আমি প্রস্তুত আছি। জীবন থাক্‌তে আমি হলপ কোরে মিথ্যা বল্‌তে পারবো না, তাঁকে বল্‌বেন।

গোমস্তা। দেখুন, ঠাকুর মশাই, সংসারে বাস কর্‌তে হ'লে একটু আধটু এদিক ওদিক না কোরে উপায় নেই। আর ক্ষতিই বা কি? একটা কথা বলে এলে যদি অত বড় একটা লোক হাতে থাকে, আর দেশত্যাগ না কর্‌তে হয়, তা' হ'লে—

ক্ষুদিরাম। আমায় মাপ কর। তোমার জমিদার মশাইকে ব'লো, তিনি যতই বড় হোন্ না, উপরে একজন আছেন, যাঁর ইঙ্গিতে এখনও বায়ু বইছে, চাঁদ উঠ্‌ছে, সূর্য্যি কিরণ দিচ্ছে, মনের কোণে পাপ করলেও তাঁর চোখে ধূলো দিতে কেউ পারে না। আমি মিথ্যা বল্‌বো না—বল্‌তে পার্‌বো না।

গোমস্তা। কাজটা ভাল কর্‌ছেন না, ঠাকুর মশাই। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা ভাল তো নয়ই, উচিতও নয়।

ক্ষুদিরাম। উচিত অনুচিত, ভাল-মন্দ বিচার কর্‌বেন রঘুবীর, মানুষ নয়।

গোমস্তা। একান্তই যদি কথা না শোনেন তো আর কি করবো? তবে এখন আসি।

(প্রস্থান)

(চন্দ্রাদেবীর প্রবেশ)

চন্দ্রাদেবী। গোমস্তা সেই একই কথা বল্‌তে এসেছিল?

ক্ষুদিরাম। হাঁ, আমি পারবো না বলেছি—

চন্দ্রাদেবী। ঠিক্ করেছ। যা হবার হবে। রঘুবীরের ইচ্ছা। চল, আজই যাবো কামারপুকুরে তোমার বন্ধুর বাড়ী। তিনি তো আমাদের যেতে বলেছেন ?

ক্ষুদিরাম। হাঁ—তা তো বলেছেন, কিন্তু—

চন্দ্রাদেবী। যখন যেতেই হবে তখন 'কিন্তু' বল্‌বার কিছু নেই—

ক্ষুদিরাম। যাবো তো। কর্ত্তারা যা জমিজমা রেখে গেছলেন তাতে উঞ্ছবৃত্তি করতে হ'ত না। দেড় শ বিঘা জমি, চন্দ্রা। যে ধান জন্মাত তাতে রঘুবীরের সেবা চলত, সারা বছরের খোরাক হ'ত, অতিথি সেবা হ'ত। যে পাট পেতুম তাতে খাজনা দিয়ে এক শ দেড় শ টাকা উদ্বৃত্ত হ'ত। যে সরিষা পেতুম তাতে তেলের খরচ চ'লে পঞ্চাশ ষাট্ টাকায় বিক্রী হ'ত। আমার সোণার জমি, চন্দ্রা, আমার সোণার জমি। ক্ষেতের ধান, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, ক্ষেতের তরিতরকারি, পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরুর দুধ—বল কি, চন্দ্রা, এমন জমি, ঘর-বাড়ী, পুকুর, বাগান-বাগিচা ছেড়ে যেতে বুক ফেটে যাচ্ছে।

চন্দ্রাদেবী। তা কি আর করবে বল ? দুষ্টু লোকের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে হ'লে তার চেয়ে বেশী দুষ্টামি করতে হ'বে—তা কি তুমি পারবে ?

ক্ষুদিরাম। না ঃ—তা পারবো না। যাক্ সব, পারবো না। চল, আজই চল। তুমি প্রস্তুত হও গে। ছেলেদের খাইয়ে নাও। আমি আর কিছু খাবো না। রঘুবীরের পূজো সেরে ওঁকে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে জন্মের মতো জন্মভূমির কাছে বিদায় নেব।

চন্দ্রাদেবী। রামকুমার, আর কাত্যায়নী পথ হাঁট্‌তে পারবে তো ?

ক্ষুদিরাম। হাঁ, পারবে—তুমি ভেবো না। রঘুবীর সঙ্গে থাক্‌বেন। তিনি ওদের শক্তি দেবেন।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

জমিদার রামানন্দ রায়ের বৈঠকখানা
(তাকিয়া ঠেস্ দিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে বসিয়া ও গোমস্তা দাঁড়াইয়া)
রামানন্দ ও গোমস্তা

রামানন্দ। কি বল্‌লে সে বিট্‌লে বামুন ? সেই এক কথা ? পারবে না ?

গোমস্তা। না—সে পারবে না।

রামানন্দ। তুমি ভাল ক'রে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলে তো ? সাক্ষ্য দিলে পুরস্কার, আর তা না দিলে ছারখার, ভিটেমাটি চাটি কোরে দেওয়া হ'বে ? বলেছিলে তুমি ?

গোমস্তা। আজ্ঞে হাঁ বলেছিলুম কিন্তু সে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছে, সব যাক্ তবু মিথ্যে বলবে না।

রামানন্দ। তাই নাকি ? বেটা বড় ঢেঁটা দেখ্‌ছি। বেটা ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়েছেন।

(নিমাই এর প্রবেশ)

নিমাই। বাবু। বাবু !

রামানন্দ। কে রে ?

নিমাই। আমি নিমাই বাগ্দী।

রামানন্দ। তবে মাথা কিনে নিয়েছ আর কি ? নিমাই বাগ্দী—কি হয়েছে, বল, বেটা বল—

নিমাই। (কাঁপিতে কাঁপিতে) কাল বিকেলে আমার মা মারা গেছেন। বাবা উঠানের একটা আমগাছ কেটে তাঁকে পোড়াবার কাঠ তৈরি করবার জন্য কুড়ুল দিয়ে যেই একটা ঘা দিয়েছেন, অমনি এই গোমস্তা মশাই কোত্থেকে দৌড়ে এসে বাবার গালে ঠাস্ কোরে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। বল্‌লেন, ত্যাখ্ বেটা, জমিদারকে না ব'লে খবরদার গাছে হাত দিস্‌নি—দিস্ তো ভাল হ'বে না। গাছকাটা হ'লো না, মা এখনও প'ড়ে আছেন, পোড়ান হয়নি !

রামানন্দ। না হয়েছে তো আমার জমিদারিখানা ভেসে গেল আর কি। ঠিকই হয়েছে। জমিদারের গাছ, আর বেটারা গাছ কেটে তচ্‌নচ্‌ করছে।

নিমাই। (কাতরভাবে) মাকে যে এখনো পোড়ান হয়নি, বাবু।

রামানন্দ। দুলে বাগ্দীদের আবার পোড়ান কি রে বেটা? আমার গাছে হাত দিস্‌নি ব'লে দিচ্ছি।

নিমাই। আপনার গাছ কি মশাই? এ গাছ তো বাবা নিজেই বসিয়েছিলেন।

রামানন্দ। বসিয়েছিলেন তো গাছটা তাঁরই হ'লো আর কি? বলি, জায়গাটা কার? যা বেটা যা—তর্ক করতে এসেছে। ওরে কে আছিস্‌, দে তো বেটাকে বের কোরে—

(বালক কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল)

তা হ'লে ক্ষুদিরাম ঠাকুর অল্পে ঢিট্‌ হ'বে না দেখ্‌ছি?

গোমস্তা। না হবে না—তবে লোকটা ধার্ম্মিক।

রামানন্দ। তোর ধার্ম্মিকের মুখে আগুন। কিসের ধার্ম্মিক বল ত? যে প্রজা জমিদারের কোন উপকার করে না, তেমন প্রজা চাই না।

গোমস্তা। তা হ'লে, বাবু, ঠক্‌ বাছ্‌তে গাঁ উজোড় হ'যে যাবে।

রামানন্দ। তা যাক্‌ গে, তোমায় অত ওস্তাদি করতে হ'বে না। এখন যা বল্‌ছি কর। একদিকে বাকি খাজনার নালিশ কর, আর একদিকে একখানা তমসুক প্রস্তুত কোরে পাওনা টাকার জন্য মোকদ্দমা রুজু কর। আমি কাল্‌কের মধ্যে নালিশ রুজু হয়েছে দেখ্‌তে চাই।

গোমস্তা। আজ্ঞে হুজুর, যা হুকুম করেন—

রামানন্দ। প্রজা শাসন করতে হয় কি কোরে তা রামানন্দ রায় জানে। দেখি, ক্ষুদিরাম দাঁড়ায় কোথায়?

(হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল)

গোমস্তা। দাঁড়াবে ভগবানের দরজায়। উৎপাতেই নিপাত—উৎসন্ন যেতে বেশী দেরি নেই। আহা! নিরীহ ব্রাহ্মণ, অত মারপ্যাচ জানে না! এদের অত্যাচারে গ্রাম থেকে ভাললোক সব বিদেয় নিয়ে চ'লে যায়, থাকে প'ড়ে নিরক্ষর অসহায় গণ্ডমূর্খের দল। তা না হ'লে আর বাংলাদেশের এত দুর্গতি?

(প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

কামারপুকুর—ক্ষুদিরামের কুটীর

ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবী

ক্ষুদিরাম। দেখ, চন্দ্রা, দেরেপুর ছেড়ে আসার সময় প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু কামারপুকুরের কাছে দেরেপুর হার মেনে যায়।

চন্দ্রাদেবী। সত্যই, এমন সুন্দর গ্রাম দেখিনি—

ক্ষুদিরাম। গ্রামখানি পৃথিবীর স্বর্গ। এমন ছায়া-ঢাকা পাখীডাকা দেশ কোথাও দেখিনি। এই গ্রামের উত্তর দিকে ক্ষুদ্র পয়োধরা "ভূতির খাল" ক্ষীণ রেখায় এঁকে-বেঁকে প্রবাহিত হ'যে দূরে আমোদর নদে মিলিত হয়েছে। এর উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্মশান। তার পশ্চিমে বিস্তৃত গোচর-ভূমি আর এই গোচারণ-ভূমির কোলে বিশাল আম্রবন, হরিৎসাগরে যেন নীল দ্বীপ। আবার গ্রামের ভিতর বৃহৎ সরোবর। এখানে ওখানে দু'চারটি তরু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জ রচনা ক'রে রেখেছে। পাখীর ডাকে, ফুলের গন্ধে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে গ্রামখানি যেন একটি তপোবন।

চন্দ্রাদেবী। আর আমাদের এই "লক্ষ্মীজলা" যেন কামধেনু। এর প্রচুর ধানে রঘুবীরের সেবা, আমাদের সংসার, অতিথির সৎকার, সমস্তই স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হচ্ছে!

ক্ষুদিরাম। সবই রঘুবীরের দয়া, চন্দ্রা, সবই রঘুবীরের দয়া!

(একজন ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। জয় রাধেকৃষ্ণ—ভিক্ষে পাই গো—

চন্দ্রাদেবী। আমরা বড় ভাগ্যবান। আমাদের এই দরিদ্র সংসারে অতিথি প্রায়ই আসেন।

ক্ষুদিরাম। তোমার খাওয়া হয়নি, চন্দ্রা ?

চন্দ্রাদেবী। না—

ক্ষুদিরাম। আজ তিনবার বাঁধ্‌লে—বিকেল হ'য়ে গেছে, আর কি তোমার খাওয়া হ'বে ?

চন্দ্রাদেবী। না হোক্—(অতিথিকে দেখিয়া) আসুন। বোধ হয় এখনও খাওয়া হয়নি ?

ভিক্ষুক। না—

চন্দ্রাদেবী। তবে দয়া কোরে আহার করুন, আপত্তি নেই তো ?

ভিক্ষুক। ভিক্ষুকের আবার আপত্তি ?

ক্ষুদিরাম। ও কথা বল্‌বেন না। অতিথি সাক্ষাৎ নারায়ণ। বহু ভাগ্যফলে অতিথি সেবার সুযোগ হয়।

চন্দ্রাদেবী। (ক্ষুদিরামের প্রতি) আমি যাই, ওঁর সেবার ব্যবস্থা করি গে'।

(চন্দ্রা চলিয়া গেলেন)

ক্ষুদিরাম। (মোহিত হইয়া) আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি। আপনার নাম কি, বাবা ?

ভিক্ষুক। তা অসম্ভব নয়। আমার নাম অন্তর্যামী।

ক্ষুদিরাম। অন্তর্যামী! বা! নামটি তো বেশ! আচ্ছা, বাবা, আপনি গান জানেন ?

ভিক্ষুক। হাঁ, জানি। গাইবো ?

ক্ষুদিরাম। আপনার কোন কষ্ট হ'বে না তো ?

ভিক্ষুক। না—

গান

আজকে আমি ডাক্ শুনেছি হৃদয়-বীণার তারে,
আনন্দ গান গা রে সবাই, আনন্দ গান গা রে।
স্বপন আজি ভাঙ্গলো রে
বাঁধন আজি টুট্‌লো রে
প্রাণের কথা ভাষা হারায় অশ্রু-বাদল ঝরে।
হৃদয়-পুরে তোমার আসন পাতা আছে আজি
উত্তরীয়ের হাওয়া বহে মনের বনে লাগি,
আজ কেন যে বুকের মাঝে,
কোন অসীমের সুরটি বাজে,
চরণ 'পরে রাখ্‌বো হিয়া গাঁথি ব্যথার হারে॥

ক্ষুদিরাম। বাঃ বেশ গান গাইতে পারেন তো, অন্তর্যামী। এমন গান শুন্‌লে মন উদাস হ'য়ে ওঠে। আপনার বাড়ী কোথায়, অন্তর্যামী ? আপনি এখানে থাক্‌বেন ?

ভিক্ষুক। আমার আবার বাড়ী কোথায় ? ভিক্ষুকের আবার বাড়ী ? তার ঘর সারা বিশ্বে—যে তাকে ডাকে, সে তারই। আমি বাঁধাধরা হ'য়ে কোথাও থাকি না, থাক্‌তে পারি না, তবে প্রয়োজন হ'লেই আসি।

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রাদেবী। আসুন, সেবা করবেন আসুন—

(চন্দ্রার সহিত ভিক্ষুক চলিয়া গেল, ক্ষুদিরাম একা বসিয়া রহিলেন)

ক্ষুদিরাম—

গান

তোমারি নাম বল্‌বো আমি গাইবো নানা ছন্দে
তোমার চরণ ধূলায় ধূসর হ'ব ভাসি' নয়ন জলে।
কেন আমায় দূরে রাখো
আমি তোমায় ভুল্‌বো নাকো
নবীন হ'য়ে উঠুক্ হিয়া তোমার চরণ তলে
জীবন আমার উঠুক্ ফুটে কত ফুল-ফলে॥

(চন্দ্রার প্রবেশ)

অন্তর্যামী কোথায় ?

চন্দ্রাদেবী। তিনি চ'লে গেলেন—

ক্ষুদিরাম। চ'লে গেলেন ? চন্দ্রা, তোমায় একটি কথা বল্‌বো ? ইনিই তিনি—গয়ায় এঁকেই আমি স্বপ্নে দেখেছিলুম। *

চন্দ্রাদেবী। কি স্বপ্ন ?

* ঘটনা সত্য নহে। উঃ সঃ।

ক্ষুদিরাম। অপূর্ব্ব! অতি অপূর্ব্ব! বলা যায় না! মরি, মরি, কি রূপমাধুরী সে!

চন্দ্রাদেবী। সে কেমন?

ক্ষুদিরাম। নবজলধর শ্যাম।

চন্দ্রাদেবী। সে কেমন?

ক্ষুদিরাম। অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-কঙ্কন, বসন মনোরম,
অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল॥

চন্দ্রাদেবী। কি বল্লেন তিনি?

ক্ষুদিরাম। তিনি বল্লেন, আমি যাচ্ছি তোমার গৃহে সেবা করবার অধিকার দিতে—

চন্দ্রাদেবী। তিনি কি আস্বেন এই দরিদ্রের কুটীরে?

ক্ষুদিরাম। তাঁর কথা মিথ্যা নয়। তিনি আস্বেন নয়, তিনি এসেছেন।

চন্দ্রাদেবী। তুমি বুঝ্লে কি কোরে?

ক্ষুদিরাম। আমি বুঝেছি। তোমার গদাধরই তিনি। তুমি দেখ্ছ না, চন্দ্রা? তার কি অপূর্ব্বভাব!

চন্দ্রাদেবী। কই, আমি তো কিছু বুঝ্তে পারিনি—

ক্ষুদিরাম। সাধারণ লোকে তাঁকে চিন্তে পারে না। তিনি আসেন গোপনে, চেনবারও ক্ষমতা চাই। তুমি একটু দেখলেই চিন্তে, বুঝ্তে পারবে।

চন্দ্রাদেবী। তাই বটে। আমার গদাইএর কথায় অমিয় ঝরে। তার আদর ঘরে ঘরে। তার গুণে সারা গ্রামখানা একটা পরিবার হ'য়ে উঠেছে। গদাই কোথায়?

ক্ষুদিরাম। সঙ্গীদের নিয়ে সে গিয়েছে মাণিক-রাজার আম বাগানে। চল, রঘুবীরের আরতির সময় হ'য়ে এলো।

(প্রস্থান)

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগণেশায় নমঃ

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকস্য ক্রিয়তে পদদীপিকা॥

সন্ন্যাসিগণের আচার্য্য শ্রীভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য—উভয়কেই প্রণাম করিয়া, প্রত্যক্-তত্ত্ব-বিবেক (নামক পঞ্চদশীর প্রথম) প্রকরণের পদ-দীপিকা নাম্নী টীকা আমি রচনা করিতেছি।

গ্রন্থকর্ত্তা মুনীশ্বর শ্রীবিদ্যারণ্য, যে পঞ্চদশী গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয় এবং জিজ্ঞাসু সমাজে প্রচারলাভ করিতে পারে, এই উভয় প্রয়োজনে, শিষ্টগণের আচরণ হইতে প্রাপ্ত, ইষ্ট-দেবতা গুরুনমস্কাররূপ মঙ্গলের আচরণ, স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্যগণের প্রতি সেইরূপ অনুষ্ঠান উপদেশ করিবার জন্য, শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিতেছেন এবং এই শ্লোকের অর্থদ্বারা এই বেদান্ত-প্রকরণ গ্রন্থের বিষয় ও প্রয়োজন সূচনা করিতেছেন।

গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দ গুরু পাদাম্বুজন্মনে।
সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে॥১

অন্বয়—সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে শ্রী-শঙ্করানন্দগুরু পাদাম্বুজন্মনে নমঃ।

অনুবাদ—শ্রীশঙ্করানন্দগুরুদেবের চরণযুগলরূপ কমলে আমার প্রণতি হউক, কারণ, সেই চরণকমল, মূলাজ্ঞানরূপ হিংস্র জলজন্তুর এবং সেই মূলাজ্ঞানের কার্য্যের—সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চসমূহের একমাত্র বিনাশক।

টীকা—'শম্' শব্দের অর্থ সুখ, তাহাই যিনি করেন, তিনি 'শঙ্কর'—সকল জগতের আনন্দকর পরমাত্মা। "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইতি (তৈত্তি, উ ২।৭।২) 'যেহেতু এই পরমাত্মা সমস্ত সংসারকে স্বধর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করেন' এই শ্রুতিবচন হইতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া, পরমানন্দস্বরূপ প্রত্যগাত্মাই (জীবাত্মাই), 'আনন্দ' শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। আর যিনিই শঙ্কর, তিনিই আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মই প্রত্যগাত্মা। এইরূপে প্রত্যক্ আত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাই "শঙ্করানন্দ" পদের অর্থ। সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মই গুরু। যেহেতু আগমবচন (সময় বলে সম্যক্-রূপে পরোক্ষানুভবের সাধক-বচন) রহিয়াছে—

"পরিপক্বমলা যে তানুৎসাদন হেতু শক্তিপাতেন।
যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষয়াচার্য্য মূর্ত্তিস্থঃ॥"

'যাঁহাদের দ্বেষাসক্তি প্রভৃতি চিত্তমল বিদগ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অধিকারীকে, অজ্ঞানাদি প্রতিবন্ধকনাশের উপায়স্বরূপ শক্তিপাত করিয়া, যিনি প্রত্যেক্-অভিন্ন পরমাত্মার উপলব্ধিতে নিয়োজিত করেন, সেই প্রত্যক্-অভিন্ন পরমাত্মাই দীক্ষার নিমিত্ত আচার্য্য মূর্ত্তিতে অবস্থিত।' সেই শ্রীমান্ শঙ্করানন্দগুরু—শ্রীশঙ্করানন্দগুরু। গন্ধবান্ দ্বিপকে বা হস্তীকে যেরূপ গন্ধদ্বিপ বলা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। 'শ্রী'শব্দ দ্বারা গুরু যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন তাহাই সূচিত হইল। অথবা 'শ্রী'—দ্বারা যিনি 'শম্' সুখ (বিধান) করেন, তিনি "শ্রীশঙ্কর," এইরূপেও সমাস হইতে পারে; কেননা শ্রুতিবচন রহিয়াছে—"রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্" (বৃহদা, উ ৩।৯।২৮) ["রাতিঃ, রাতেঃ-ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা, ধনস্য ইত্যর্থঃ, ধনস্য দাতুঃ কর্ম্মকৃতো যজমানস্য পরময়ণং পরাগতিঃ কর্ম্মফলস্য প্রদাতৃত্বাৎ] ধনদাতা কর্ম্মীর পরমাশ্রয়ভূত ব্রহ্মই (ফললাভে মূলকারণ, কেননা তিনিই কর্ম্মফল প্রদাতা)। ইহার দ্বারা শ্রীগুরু যে ভক্তের ইষ্টসাধনে সমর্থ, তাহাই সূচিত হইল। সেই গুরুর পাদদ্বয়রূপ যে অম্বুজন্ম বা কমল, তাহার প্রতি আমার "নমঃ" প্রণতি বা নম্রভাব হউক। সেই চরণকমল কি প্রকার? এই হেতু বলিতেছেন—"সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে", বিলাস—সমষ্টি ব্যষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপ কার্য্যসমূহ, তাহার সহিত যে 'মহামোহ' বা মূলাজ্ঞান, তাহাই মকরাদির ন্যায় আপনার বশীভূত জন্তুর অতিশয় দুঃখের হেতু, সেই কারণে তাহা গ্রাহ বা মকর, তাহার গ্রাস-গলাধঃকরণ বা নিবৃত্তিই 'এক' মুখ্য 'কর্ম্ম' ব্যাপার, যাহার—সেই চরণকমলকে নমস্কার। ইহাই অর্থ। এস্থলে 'শঙ্করানন্দ' এই কৃতসমাস পদে যে শঙ্কর ও আনন্দ এই দুই পদের সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে অর্থাৎ ভিন্নার্থক উক্ত শব্দদ্বয়ের একার্থ-বোধকতাশক্তি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা জীবব্রহ্মের একতা-রূপ (গ্রন্থপ্রতিপাদ্য) "বিষয়" সূচিত হইল। আর জীব ভূমব্রহ্মরূপ বলিয়া—দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বলিয়া, পরিপূর্ণ সুখের আবির্ভাবরূপ "প্রয়োজন"ও সূচিত হইল। আর "সবিলাস" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ অনর্থের বা কার্য্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ 'প্রয়োজন' গ্রন্থকার আপনার বচন দ্বারাই ব্যক্ত করিয়াছেন।॰১।

গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা

এক্ষণে গ্রন্থের অবান্তর প্রয়োজন বর্ণনপূর্ব্বক গ্রন্থের আরম্ভ করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্ব সেবানির্ম্মলচেতসাম্।
সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোঽয়ং বিধীয়তে।২

অন্বয়—তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্ সুখ-বোধায় অয়ম্ তত্ত্বস্য বিবেকঃ বিধীয়তে।

অনুবাদ—গুরুর চরণকমলযুগল সেবা করিয়া যাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে, তাঁহারা যাহাতে অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, এই হেতু এই তত্ত্ববিচার করা যাইতেছে।

টীকা—"তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্মলচেতসাম্"—সেই গুরুর চরণদ্বয়রূপ যে কমলযুগল, তাহার স্তুতিনমস্কারাদিরূপ পরিচর্য্যা দ্বারা, যাঁহাদের চিত্ত নির্মল অর্থাৎ আসক্তি প্রভৃতি রহিত হইয়াছে, সেই অধিকারিগণের, "সুখবোধায়"—যাহাতে অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে সেই জন্য, "অয়ম্" নিম্নবর্ণিতপ্রকার—"তত্ত্বস্য-বিবেকঃ"—তত্ত্বের অর্থাৎ যাহার স্বরূপ অকল্পিত, সেই মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থের—প্রত্যক্-অভিন্ন ব্রহ্মের—যাহা অগ্রে (৪৬ সংখ্যক শ্লোকে) "অখণ্ডসচ্চিদানন্দ"-রূপে বর্ণিত হইবে, তাহার, 'বিবেক' কল্পিত পঞ্চকোশরূপ জগৎ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্করণ, "বিধীয়তে" করা যাইতেছে। ইহাই শ্লোকের অর্থ।২

যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

জীবব্রহ্মের একতাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য জীব যে "সত্য-জ্ঞান-অনন্ত," ইত্যাদিরূপ তাহাই দেখাইবার ইচ্ছা করিয়া, গ্রন্থকার তৃতীয় শ্লোকদ্বারা প্রথমে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদন করিয়া, সেই জ্ঞানের নিত্যতা প্রমাণ করিতেছেন—"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ"—ইত্যাদি শব্দ দ্বারা। সেই তিন অবস্থার মধ্যে স্পষ্ট ব্যবহার বিশিষ্ট জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন—

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাবৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্
ততো বিভক্তা তৎসম্বিদৈক্যরূপ্যান্নভিদ্যতে।৩

অন্বয়—জাগরে বেদ্যাঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ বৈচিত্র্যাৎ পৃথক্। ততঃ বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐক্যরূপ্যাৎ ন ভিদ্যতে।

অনুবাদ—জাগ্রদবস্থায় শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞেয় বস্তুসকল পরস্পর ভিন্ন; তাহা তৎসমুদয়ের বিচিত্রতা দ্বারাই প্রমাণিত হয়; কিন্তু তত্তদ্বিষয়ক সম্বিৎ বা জ্ঞানকে, বুদ্ধি দ্বারা সেই সেই বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, দেখা যায়, তাহা জ্ঞানমাত্র অর্থাৎ একই প্রকারের জ্ঞান; এই হেতু তাহাতে ভেদ নাই।

টীকা—"জাগরে বেদ্যাঃ"—"পঞ্চীকরণ বার্ত্তিকে" সুরেশ্বরাচার্য্য জাগ্রদবস্থার লক্ষণ করিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতম্"—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের প্রতীতিকে জাগরিতাবস্থা বলে। সেই প্রকার অবস্থায় সম্বিতের বিষয়ীভূত অর্থাৎ জ্ঞেয় "শব্দস্পর্শাদয়ঃ"—শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি যাহারা আকাশাদির গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই সকল গুণের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ আকাশাদি দ্রব্য "বৈচিত্র্যাৎ"—গো অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় বিলক্ষণধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া "পৃথক্"—পরস্পর ভিন্ন। "ততঃ বিভক্তা" আর সেই সেই বিষয় হইতে বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া পৃথক্ করিলে, "তৎসম্বিৎ"—সেই শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞান, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদিতে জ্ঞান, জ্ঞান—এইরূপে, "ঐক্যরূপ্যাৎ ন ভিদ্যতে"—একই আকারে ভাসমান হয় বলিয়া, পরস্পর ভিন্ন নহে; যেমন আকাশ (ঘটাকাশ, মঠাকাশ, কূপাকাশ ইত্যাদি স্থলে একই)। [এ স্থলে এই 'অনুমান' আছে—বিবাদের বিষয় যে সম্বিৎ—(পক্ষ), তাহা স্বরূপতঃ ভেদরহিত—(সাধ্য), যেহেতু উপাধির গ্রহণ বিনা ভেদের প্রতীতি হয় না—(হেতু), যেমন আকাশ (উদাহরণ)। এইরূপে শব্দের জ্ঞান স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু (উভয়ই) সম্বিৎ বা জ্ঞানরূপ; যেমন স্পর্শসম্বিৎ (অর্থাৎ স্পর্শের জ্ঞান,) জ্ঞান বলিয়া স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপ।] যেমন একই আকাশে, ঘট মঠ প্রভৃতি উপাধিকৃত ভেদবশতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হয়, সেইরূপ একই জ্ঞানে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি উপাধিবশতঃ শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হইলেও, বাস্তবভেদের কল্পনা করিলে গৌরবদোষজনিত * বাধা ঘটে এইরূপ বুঝিতে হইবে।৩

* যে স্থলে অল্প মানিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সে স্থলে ততোধিক মানিলে গৌরব দোষ হয়, যেমন এক পয়সা মূল্যের বস্তু এক আনায় খরিদ করা দোষ, সেইরূপ।

সমালোচনা

যোগসূত্র বা পাতঞ্জল-দর্শন— শ্রীনক্ষত্রকুমার দত্ত প্রণীত। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় আশ্রম— কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত। ২৩৯ পৃষ্ঠা, ৷৷০ আনা।

মহর্ষি পতঞ্জলিব যোগসূত্রসমূহ এবং প্রতি-সূত্রেব নিম্নে বঙ্গভাষায় শ্লোকাকাবে লিখিত সূত্রানুসারী সবলার্থকে উত্তম সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ কবা হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি পাশ্চাত্য ভাষাব সাহায্যে যোগসূত্র বিষয়ে নিজ কল্পনা ব্যক্ত কবিযাছেন, তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী এই লেখক ভূমিকাতে "ঈশ্বব প্রতিপাদকসূত্র পতঞ্জলির কার্য্য নয়" এইরূপ লিখিতে সাহসী হইয়াছেন। পবন্তু ইনি বৃত্তিভাষ্য বার্ত্তি-কাদি ব্যাখ্যাসমূহ পর্য্যালোচনা কবিলে এইরূপ বিরুদ্ধমত পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। মহর্ষি কোন যোগ বলিতেছেন এইরূপ শঙ্কাও পূর্ব্ব-বীতিতেই নিরস্ত হইবে। লেখক যোগসূত্রেব প্রাবম্ভে লিখিতেছেন—(১ পৃষ্ঠা, দুইবস্তু হইতে মহাশয পর্য্যন্ত) যুজ্ সমাধৌ এইরূপ গণনির্দ্দেশ বশতঃ যোগশাস্ত্রে সমাধ্যর্থক যোগ পবিগৃহীত হইয়াছে। যুজিব যোগে এইরূপ গণপঠিত সম্বন্ধ বিশেষার্থক যুজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন যোগ পবিগৃহীত হয় নাই, তথাপি তাদৃশার্থ গ্রহণ করা একটী প্রমাদ। তেমন প্রমাদ পুস্তকেব বহুস্থলেই আছে।

লেখক দ্বিতীয় সূত্রের প্রারম্ভে লিখিতেছেন - "মনেব বাসনা ভূমি চিত্ত পবিচয়, বৃত্তি তাব নানাবিধ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।" মনোরূপ ইন্দ্রিয় চিত্তেব অন্তর্গত এবং বাসনাসমূহ অনাদি, এজন্য "মনেব বাসনা ভূমি" চিত্তের পরিচয় হইতে পারে না। পঞ্চবিধ বৃত্তিকে নানাবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করাও অপর প্রমাদ।

লেখক তৃতীয়সূত্রে লিখিতেছেন--"এই পঞ্চ-ভূমি মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থা, যোগমধ্যে অনুকূল আছয়ে ব্যবস্থা।" একাগ্র ও নিরুদ্ধ এতদুভয় যোগানুকূল হইলেও কেবল নিরুদ্ধকে যোগানুকূল বলিয়া নির্দ্দেশ কবা—সম্প্রজ্ঞাত যোগকে অস্বীকাব কবা একটী প্রবল প্রমাদ। ফলতঃ অনুবাদচ্ছলে সূত্রেব প্রতিপাদ্য বিষয়েব অপলাপ কবা হইয়াছে। লেখক পদ্য লিখিবাব সামর্থ্যে নির্ভব করিয়া স্বয়ং অনালোচিত দুরূহ যোগসূত্রেব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখকেব পদ্য লিখিবাব ঔৎসুক্য শাস্ত্রাতিবিক্ত বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র তর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব ও সাধন রহস্য— প্রথম খণ্ড মধুকৈটভ বধ, স্বামী যোগানন্দ প্রণীত, মূল্য ১৲। গাবোহিল যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত। ১৮৬ পৃঃ সমাপ্ত।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ও সুলেখক, তাই তিনি যে যে স্থানে মূল মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ কবিয়াছেন, তাহা সুন্দব ও সহজবোধ্য হইযাছে। অর্গল, কীলক ও কবচ ভাগের এইরূপ অনুবাদ কবিলে ভাল হইত। মন্ত্রগুলিকে অবলম্বন কবিয়া যে সকল তত্ত্বকথা বলা হইয়াছে, তাহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও অতি বিস্তৃত বলিয়া সাধাবণেব পক্ষে পূর্ব্বাপব বিষয় স্থির বাখিয়া তাহা হইতে যথার্থ অর্থ অবগত হওয়া অসুবিধাজনক, গোলে পড়িবার আশঙ্কাও আছে। গ্রন্থকার এই পুস্তকে মূল মন্ত্রগুলির যেরূপ বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন, আদ্যোপান্ত সমগ্র চণ্ডীর ঐরূপ অনুবাদ সম্বলিত একখানি গ্রন্থ রচনা কবিয়া প্রকাশ কবিলে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

গীতাসার সংগ্রহ। স্বামী প্রেমেশানন্দ সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র দে কর্ত্তৃক ঢাকা হইতে প্রকাশিত। ১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।।০ আনা।

বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থ গীতার বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক একশতটী শ্লোকের দশ দশটী করিয়া দশাধ্যায়ে সমাবেশ। অন্বয় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। এই সার-সংগ্রহ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা একাধারে সাধারণ পাঠক এবং পণ্ডিতবর্গের প্রণিধান যোগ্য। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই পুস্তিকা বিশেষ উপযোগী, কেন না, ইহাতে গীতার সারতত্ত্ব অতি সরল ও নির্দ্দোষভাবে সাময়িক সমস্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত ব্যক্তি এই ব্যাখ্যা-পদ্ধতিতে স্থলে স্থলে অনেক নূতনত্বের আভাস পাইবেন। যোগ বলিতে যে ভগবানে যুক্ত হইবার উপায় বুঝায়, সমগ্র যোগসমষ্টিকে যে মুখ্যতঃ চারিভাগে ভাগ করা যায় এবং ধর্ম্ম যে একটী বিজ্ঞান ইত্যাদি কথার ভিতর বেশ মৌলিকতা রহিয়াছে। বর্ত্তমান সম্পাদকের ব্যাখ্যায় নূতনত্বের বিশেষ কারণ তাঁহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে গীতা ব্যাখ্যার চেষ্টা। বাস্তবিক যোগ বলিতে যে ভগবানে যুক্ত হইবার উপায় বুঝায় এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞান যে সত্য সত্যই বিজ্ঞান তাহা বর্ত্তমান যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনালোকে জগৎ জানিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান লেখক তদীয় গীতা ব্যাখ্যায় এই নূতন আলোক সম্পাত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এইরূপ করিতে গিয়া স্থলে স্থলে তিনি নিজস্ব চিন্তার পরিচয়ও যথেষ্ট দিয়াছেন। পাঠক তাঁহার বিষাদ-যোগের ব্যাখ্যা মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন এবং শঙ্করাচার্য্য ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁহার ব্যাখ্যার তুলনা করিবেন। লেখক ভাবদক্ষ এবং তাঁহার সংযত লেখনী অনধিক অথচ যথোপযুক্ত ভাষা প্রয়োগে পটু। কি ভাষায়, কি ভাবে গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কোথাও কোনরূপ জটিলতার ছাপ নাই।

গীতার প্রচলিত অধ্যায় বিভাগের সঙ্গে গ্রন্থকারের বৈষম্য রহিয়াছে বলিয়া চিরপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা গীতা পাঠে অভ্যস্ত, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, এবং নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে উভয় সমস্যায় পড়িয়া গীতামর্ম্ম বুঝিতে স্থলে স্থলে অসুবিধা হওয়াও স্বাভাবিক। এইজন্য মনে হয় ভাবদক্ষ ও ভাষাকুশল লেখক যদি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনালোকে ও তদীয় স্বাধীন চিন্তা সহযোগে সমগ্র গীতার একখানি ব্যাখ্যা পুস্তক প্রণয়ন করেন, তবে জনসাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে পুরকায়স্থ, এম্-এ

ন্যায়ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে অসামঞ্জস্য শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

এতদিন পরে গত কার্ত্তিকমাসের উদ্বোধনে শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্যতর্কতীর্থ মহাশয়ের লিখিত ন্যায় ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে অসামঞ্জস্য শীর্ষক সমালোচনার উত্তর বাহির হইল। উহা আমরা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ঐ উত্তর লেখক হইলেন কলিকাতা বেথুন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য। যাহা হউক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অল্পদিনের গবেষণা প্রশংসনীয় বটে, তবে উত্তরগুলি যে বিশেষ ভাবে বিচার্য্য ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা বোধ হয়, আমাদের নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ দেখিলে পণ্ডিত-মাত্রই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ন্যায়াচার্য্য মহাশয়, "অর্থাব্যভিচারিত্বকে প্রমাণের প্রামাণ্য বলিলে প্রমাণে অর্থাব্যভি-চারিতার অনুমান হইতে পারে না" এইরূপ দোষ উদ্ভাবন

করিয়াছিলেন। উত্তর-বাদী—তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, অর্থাব্যভিচাবিত্ব প্রমাণের অসাধারণ-ধর্ম্ম (অর্থাৎ প্রমাণের লক্ষণ। নৈয়াযিকগণ—অসাধাবণ ধর্ম্মকেই বস্তুব লক্ষণ বলিয়া স্বীকাব কবেন।) এবং ঐ অর্থাব্যভিচাবিত্ব প্রামাণ্য হইতে ভিন্ন। সুতবাং প্রমাণে অর্থাব্যভিচাবিতাব অনুমান হইতে কোন বাধা নাই। তিনি আবও লিখিয়াছেন, যেমন কম্বুগ্রীবাদিমত্ব ও ঘটত্ব বিভিন্ন ধর্ম্ম বলিয়া "ঘটঃ—কম্বুগ্রীবাদিমান্" এইরূপ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ "প্রমাণমর্থাব্যভিচাবি" এইরূপ প্রয়োগও হইবে। কিন্তু "প্রতিপাদ্য পদার্থের এই অব্যভিচাবিতাই প্রমাণেব প্রামাণ্য, এই অব্যভিচারিতাব অনুমানই প্রমাণেব প্রামাণ্যানুমান" এইরূপ বঙ্গানুবাদেব দ্বারা অর্থাব্যভিচাবিতা হইতে প্রামাণ্য যে ভিন্ন ইহা বুঝা যায কি ? জানিনা বঙ্গভাষায অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষযে কি বলেন। অর্থাব্যভিচাবিত্ব প্রমাণেব অসাধাবণ ধর্ম্ম এবং প্রামাণ্য হইতে ভিন্ন হইলে ও তাহাব অনুমান দেখাইবাবই বা ভাষ্যকাবেব কি প্রয়োজন ছিল ? অসাধাবণ ধর্ম্মেব দ্বাবা ইতব ভেদেবই অনুমান প্রাযশঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অসাধাবণধর্ম্মেব অনুমান কবিবাব বোধ হয় কোনই প্রয়োজন নাই। তাহাব পব উত্তববাদী লিখিযাছেন, "কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব হইতে ঘটত্ব ভিন্ন হইলেও নৈয়ায়িকগণ যেমন বলিযাছেন "কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বং ঘটত্বং" সেইরূপ প্রমাণং অর্থাব্যভিচাবি এইরূপও হইবে।" ইহাও ঠিক নহে। নৈয়ায়িক দিগেব মতে পদার্থেব পবস্পব ভেদ থাকিলে কখনও সমান বিভক্তিক পদপ্রয়োগ হয না। সুতবাং ঘটত্ব শব্দেরদ্বাবা ঘটেব অসাধাবণধর্ম্ম বুঝাইলেই "কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বং ঘটত্বং" এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। প্রামাণ্য শব্দেব দ্বারাও যদি প্রমাণেব অসাধাবণ ধর্ম্ম বুঝায় তাহা হইলেই "অর্থাব্যভিচারিতাই প্রমাণের প্রামাণ্য" ইহা বলা যায়। কিন্তু ঐ অসাধাবণধর্ম্মেব অনুমান কবিবাব বোধ হয় কোনই প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতগণ এখন সহজেই বুঝিতে পাবিবেন, জয়ন্তভট্ট বা বাচস্পতি মিশ্রের লিখিত পঙ্‌ক্তিব ব্যাখ্যা সাহিত্যিকভাবে করিলে চলেনা। উহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে নব্যন্যায়ের অনেক গ্রন্থপড়া নিতান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বপ্রবন্ধেও ন্যায়াচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, অর্থাব্যভিচাবিত্বেব বিশদভাবে ব্যাখ্যা হয় নাই। এখনও আমবা লিখিতেছি, অর্থাব্যভিচাবিত্ব শব্দেব ঘটক অর্থশব্দেব দ্বাবা যাবৎ অর্থকে গ্রহণ কবা অসম্ভব। কাবণ কোনই প্রমাণ যাবদর্থের অব্যভিচাবি নহে। যৎকিঞ্চিদর্থও গ্রহণকরা চলেনা। কাবণ প্রমাণসামান্য যৎকিঞ্চিদর্থেব অব্যভিচাবি নহে। এবিষযে বিশেষ লেখা বাহুল্য মাত্র। পণ্ডিতগণ, এবিষয়ে বিবেচনা কবিয়া দেখিবেন।

ন্যাযাচার্য্য মহাশয লিখিয়াছেন, "অর্থাব্যভিচাবিত্বকে প্রামাণ্য বলিলে, "প্রমাণং প্রমাণং" এইরূপ পরার্থানুমান পর্য্যবসিত হইয়া যায়।" উত্তববাদী তদুত্তবে লিখিযাছেন, "প্রমাণেব ঘটক প্রমা পদার্থ বিভিন্ন হইলে "প্রমাণং প্রমাণং" এইরূপ অনুমান স্বীকাব কবিলে কোনই দোষ হয় না।" এই সকল উত্তব নৈয়ায়িকদিগেব মতবিরুদ্ধ। এইরূপ উত্তব না লেখাই ভাল ছিল। প্রমাপদার্থ পবস্পব বিভিন্ন হইলেও "প্রমাণং প্রমাণং" এইরূপ প্রয়োগ কখনও হয় না। কিন্তু "বিশেষ্যাবৃত্ত্যপ্রকাবক-জ্ঞানকরণং" "তদ্বতিতৎপ্রকাবকজ্ঞানকবণং" এইরূপ প্রয়োগই হইতে পাবে। মথুবানাথ তর্কবাগীশ বা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতির অভিপ্রায় ও তাহাই। তাঁহারা বলেন, লক্ষণেব দ্বাবা ইতরভেদেব অনুমান কবিতে হইলে বিশেষ্যাবৃত্ত্য-প্রকারক-জ্ঞানকরণশব্দঃ স্বেতরভিন্নঃ তদ্বতিতৎপ্রকারক-জ্ঞানকরণ-শব্দত্বাৎ" এইরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু "প্রমাণশব্দঃ স্বেতরভিন্নঃ প্রমাণ-শব্দত্বাৎ" এইরূপ নহে।

সুতরাং কেবল লিখিয়াছেন লিখিয়াছেন বলিলেই উত্তর হয় না। ঐ সকল লেখার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে নব্যন্যায়-শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক।

উত্তরবাদী লিখিয়াছেন, "ফলকথা যেরূপই হউক প্রমাণত্ব ও অর্থাব্যভিচারিত্ব পদার্থের ভেদবশতঃই বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিজ কল্পিত ব্যাখ্যা নহে।" যাহা হউক আমরা ঐ ভেদ স্বীকার করি বটে, কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদের দ্বারা প্রামাণ্য ও অর্থাব্যভিচারিত্বের মধ্যে কোনই ভেদ বুঝিতে পারি নাই। আশা করি উত্তরবাদী ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গানুবাদের বঙ্গানুবাদ করিয়া আমাদিগকে ঐ ভেদ বুঝাইয়া দিবেন।

ন্যায়াচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, ভাষ্যোক্ত "প্রমাণতঃ" এই শব্দের দ্বারা বহু প্রমাণ বা প্রমাণত্বয় ব্যাখ্যা করা সমীচীন হয় নাই এবং ভাষ্যের প্রমাণ-মিত্যাদি একবচনান্ত প্রয়োগই বা কেন হইল?" উহার উত্তরে উত্তরবাদী ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "উত্তর কিছুই কঠিন নহে। সামান্যতঃ প্রমাণ পদার্থের বোধের জন্য একবচনান্ত প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।" এই সকল উত্তরের মূলের কাঠিন্যটুকু অবশ্য লক্ষ্য করা উচিত ছিল। যদিও প্রমাণ সামান্য বোধে একবচনান্ত "প্রমাণং" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে তথাপি ঐ একবচনের অর্থ একত্বের কোথায় অন্বয় হইবে তাহা বলা হয় নাই। বলাও কঠিন বটে। কারণ, প্রমাণও এক নহে, প্রমাণত্বও এক নহে। তবে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন "জাত্যপেক্ষয়া একবচনং"। এই জাতি কে? নৈয়ায়িকদের মতে কিন্তু প্রমাণ বা প্রমাণত্ব কেহই জাতি নহে। মিশ্রজী ও প্রথমোক্ত একবচনের সমর্থন না করিয়া প্রমেয়-সূত্রের পূর্ব্বভাষ্যের একবচনের সমর্থন করিতেছেন কেন? এই সকল প্রাচীন পঙ্‌ক্তি ভাল করিয়া দেখিয়া তাৎপর্য্য বুঝা অতি আবশ্যক।

ফলকথা "অর্থবৎ প্রমাণং" এই স্থলে যদি সামান্যতঃ প্রমাণ বোধের জন্য একবচনান্ত প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা হইলে "প্রমাণতঃ" এই স্থলেও সামান্যতঃ প্রমাণ বোধের জন্য একবচনের উত্তর তসি প্রত্যয় হইতে আপত্তি কি? তবে উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির গ্রন্থের বিরোধ হয়। বিরোধ না বলিলেও চলে। তাহাদের যে যথাশ্রুত অর্থেই তাৎপর্য্য ইহা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি? অন্য তাৎপর্য্যও তাহাদের হইতে পারে। এখন আমাদের সেই তাৎপর্য্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সে বিষয়ে নিবস্ত রহিলাম।

বলা বাহুল্য যে উত্তর বাদীই যদি ভাষ্যকারের প্রমাণসংপ্লবের উদাহরণ বা তর্কবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে একজন নৈয়ায়িকের পক্ষে বোধ করি ঐ সকল বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। আজকাল সাহিত্যিকেরাও ঐ সকল উদাহরণাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু পূজনীয় তর্কবাগীশ মহাশয়কে কোনরূপ আক্ষেপ করিতে চাহি না। তবে পঠদ্দশায় উক্ত ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের মুখে একাধিকবার শুনিতে পাইয়াছি—"সমালোচনা করিলে নাকি ন্যায় ভাষ্যের বঙ্গানুবাদের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিরই সমালোচনা চলিতে পারে"।

ন্যায়াচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছিলেন, মিশ্রাদি-মীমাংসকগণের মতে যথার্থ জ্ঞানের করণ প্রমাণ পদার্থের প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ্য নহে। উত্তরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "মিশ্রকে কোন্ মীমাংসকের আদি বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না"। প্রামাণ্যবাদ দেখা থাকিলে উত্তরবাদীর মনে এই সকল প্রশ্ন উঠিত না। সম্ভবতঃ উত্তরবাদী এস্থলে মিশ্র শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্রকেই বুঝিয়া থাকিবেন। কিন্তু ন্যায়াচার্য্য

মহাশয় এখানে মিশ্র শব্দের প্রয়োগ মীমাংসক মুরারি মিশ্রকে উদ্দেশ্য করিয়াই করিয়াছেন এবং ভট্ট ও গুরু প্রমুখ মীমাংসকগণকেই আদি পদের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ইঁহাদের কাঁহারও মতে প্রমাকরণত্বরূপ প্রামাণ্য-পদার্থ স্বতোগ্রাহ্য নহে। কারণ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের প্রামাণ্যবাদের "জ্ঞান প্রামাণ্যং তদপ্রামাণ্যাগ্রাহক যাবজ্জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীগ্রাহ্যং নবা" এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যার প্রথমেই দীধিতিকার লিখিয়াছেন, "অত্রচ তাৎপর্য্যবশাৎ তদ্বতিতৎপ্রকারকত্ব-বিশিষ্টং জ্ঞানং প্রশব্দোপ-সংহিতেন মা ধাতুনা প্রত্যায্যতে, ভাবল্যুটাচ তাদৃশ জ্ঞানত্বং. করণল্যুটা তাদৃশজ্ঞানকরণত্বং তদ্ধিতান্তে নোপস্থাপ্যতে। তত্র তাদৃশ জ্ঞানকরণত্ব-নিরাসায় জ্ঞানেতি সাবধারণম"। সুতরাং ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে, প্রমাকরণ জ্ঞানই হউক অন্যই হউক কিন্তু সেই প্রমাকরণত্ব কখনও মীমাংসকদিগের মতে স্বতোগ্রাহ্য নহে। প্রমাকরণত্ব স্বতোগ্রাহ্য হইলে "তাদৃশ জ্ঞানকরণত্ব নিরাসায় জ্ঞানেতি সাবধারণং" এইরূপ বলিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। যথাশ্রুত জ্ঞানপ্রামাণ্য-পদার্থকে পক্ষ করিলে প্রমাকরণত্বে আংশিক বাধ হয়। সুতরাং দীধিতিকার "জ্ঞানেতি সাবধারণম্" এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা ঐ গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্যও লিখিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলির দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার প্রথমেই মীমাং-সকদিগের পূর্ব্বপক্ষে শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, নিত্য-নির্দ্দোষতয়া চ বেদস্য প্রামাণ্যম্ মহাজন-পরিগ্রহাচ্চ প্রামাণ্যগ্রহঃ। অর্থাৎ "বেদাঃ প্রমাণং মহাজন-পরিগৃহীতত্বাৎ" এইরূপ অনুমানের দ্বারাই বেদে প্রামাণ্যগ্রহ হইবে। সুতরাং বেদের প্রামাণ্যও যে মীমাংসকদিগের মতে স্বতোগ্রাহ্য নহে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। যদি কেহ বেদকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ স্বশব্দের উত্তর পঞ্চমীর অর্থ কখনও প্রামাণ্যে অন্বয় হইতে পারে না। উহা কোথায় অন্বয় হইবে, তাহা পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিবেন। এখন শ্লোক বার্ত্তিকের লিখিত "স্বতঃ সর্ব্বপ্রমাণানাং প্রামাণ্যমিতি গৃহ্যতাং" ইহারও তাৎপর্য্য অবশ্য পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ভাবে ল্যুট্ প্রত্যয় করিলেও প্রমাণ শব্দের দ্বারাও প্রমা বুঝাইতে পারে। তদ্ধিতান্ত প্রামাণ্য শব্দের দ্বারাও প্রমাত্ব বোধ হইলে বোধ হয় কোনই দোষ হয় না। প্রাচীনগণ অনেক স্থানেই প্রমা বুঝাইতে প্রমাণ শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রমাণের স্বরূপ বিষয়েও মতভেদ আছে। যাহাদিগের মতে যথার্থ জ্ঞানই মুখ্য প্রমাণ, তাঁহারা সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যের স্বতোগ্রাহ্যত্ব সমর্থন করিলে প্রমাণের প্রামাণ্যেরই স্বতোগ্রাহ্যত্ব সমর্থন করা হয়"। যথার্থজ্ঞান প্রমাণ হইলেও সেই যথার্থ জ্ঞানের প্রামাণ্য হানোপা-দানোপেক্ষাবুদ্ধিকরণত্বস্বরূপে কখনও স্বতোগ্রাহ্য নহে। সেইস্থলে প্রমাণত্ব উত্তরবাদীর মতেও বোধ হয় হানোপাদানোপেক্ষা-বুদ্ধি-করণত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যথার্থজ্ঞান-করণত্ব ও যথার্থ-জ্ঞানত্ব কখনও একস্থানে থাকে না। হানোপাদানোপেক্ষা বুদ্ধিকে যথার্থজ্ঞান বা প্রমিতি রূপে গ্রহণ ভাষ্যকারেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তিনি লিখিয়াছেন, যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং"; কিন্তু ঐ বুদ্ধিকে প্রমিতি বা যথার্থ-জ্ঞান বলেন নাই। আংশিক যথার্থজ্ঞান বলিয়া উহাকে যথার্থজ্ঞান বলিলে ভ্রমকেও যথার্থজ্ঞান বলিতে হয়। ইহারও তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক।

বস্তুতঃ যথার্থজ্ঞানের করণ কিম্বা হানো-পাদানোপেক্ষা-বুদ্ধির-করণ যথার্থজ্ঞান, যাহাকেই প্রমাণ বলা হউক না কেন, মীমাংসকদিগের মতে উহাদের প্রামাণ্য কখনও স্বতোগ্রাহ্য নহে। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় প্রমাণের প্রামাণ্যকে অলীক বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, প্রমাণ প্রমেয় হইলেও চক্ষুরাদি প্রমাণের প্রামাণ্য কোন দার্শনিকের মতেই

চক্ষুরাদি প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য নহে। কিন্তু দার্শনিকগণ ঐ প্রামাণ্য চক্ষুরাদি ভিন্ন প্রমাণের দ্বারাই গ্রাহ্য হয় বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু "মীমাংসকদিগের মতে চক্ষুরাদির প্রামাণ্য চক্ষুরাদির দ্বারাই গ্রাহ্য হয়" ইহাই উত্তরবাদী বহু প্রাচীন গ্রন্থ পড়িয়া ও দেখিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন। "অথ যথার্থপরিচ্ছেদকত্বং প্রামাণ্যং, তৎ কিং স্বতোজ্ঞায়তে"? ইত্যাদি শ্রীধর ভট্টের পূর্ব্বপক্ষ সন্দর্ভের মধ্যে "স্বতঃ" এই শব্দের অর্থও বিশেষভাবে বিবেচনীয়। আমরা এই প্রবন্ধে উহার ব্যাখ্যা দেখাইতে চাহি না। পূর্ব্বাপর দেখিয়া উত্তরবাদী ঐ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

২০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তর্কবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে শুনিয়া ঐ বঙ্গানুবাদের সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যের অভিপ্রায়ে ন্যায়াচার্য্য মহাশয় উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়কে বিবেচনা করিবার জন্য বঙ্গানুবাদের যৎকিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরবাদী ঐ সকল অসামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য বলিয়াই গণ্য করেন না বলিয়াই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। বোধ হয়, এই সকল লেখা দেখিয়া উত্তরবাদী অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। যেই সকল দোষ ন্যায়াচার্য্য মহাশয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন, আগামী সংস্করণে তাহার সংশোধন করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিলেই ভাল হয়। আমাদের মনে হয়, উত্তরবাদীর এই সকল উত্তরগুলি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে পূজনীয় তর্কবাগীশ মহাশয় দেখিয়া দেন নাই। কেননা তাহা হইলে এইরূপ উত্তরাভাস বোধ হয় বাহির হইত না। আশা করি, পুনরায় আর এইরূপ উত্তরাভাস বাহির হইবে না। ইতি

শ্রীশ্যামাপদ লায়েক তর্কতীর্থ,
অধ্যাপক, কাজরা সারস্বত চতুষ্পাঠী,
জিলা বর্দ্ধমান।

সন্ন্যাসিনী গৌরীমা (প্রতিবাদ)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উদ্বোধন সম্পাদক

সমীপেষু

মহাশয়, আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায়, বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসের উদ্বোধনে, পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীগৌরীমাতাজীর জীবন চরিত আলোচিত হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাহা পাঠ করিয়াছি। যে দুইটী ঘটনার সমাবেশ উক্ত "সন্ন্যাসিনী গৌরীমা" প্রবন্ধে করা হইয়াছে, তাহা মাতাজীর জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবৃতিতে অনেক ভুল ত্রুটি রহিয়াছে। আপনার পত্রিকার পাঠকবর্গ এবং যাঁহারা মাতাজীর নিজমুখে এই সকল ঘটনা অন্যরূপ শুনিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে শ্রদ্ধায় কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন—তাঁহাদের অবগতির জন্য অনতিবিলম্বে উক্ত প্রবন্ধের সংশোধন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমার বিনীত নিবেদন, উদ্বোধনের আগামী সংখ্যায় আমার এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিতা করিবেন।

মাতাজী যে দিন প্রথম ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভ করেন, সেদিন ঠাকুর চেতলার দিকে যাইতেছিলেন, কালীমন্দিরে নহে। বেলঘরিয়ার ঠিকানা ঠাকুর নিজেই বালিকাকে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনের পরদিনই বালিকা বাড়ী হইতে পালাইয়া যান, একথা সত্য নহে। একাকিনী বালিকা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে টিকিট কাটিয়া রেলগাড়ীতে বেলঘরিয়া গিয়াছিলেন, একথাও সত্য নহে, ঠাকুরের যে বয়স দেওয়া হইয়াছে, সে সময় বেলঘরিয়ার ষ্টেশন এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল লাইন ছিল না বলিয়াই শুনিয়াছি। একটী অপরিচিত স্থানে আসিয়া নূতন মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিরাট ব্যাপারে আট বছরের একটী নবাগতা "বালিকা একাই বিবিধ প্রকারের ভোগ রান্না করিলেন"—এমন ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বালিকা তাহা করেনও নাই। গোপাল মুখার্জ্জি নামক কোন ব্যক্তি, ঠাকুরের আদেশে, বালিকাকে কালীঘাটের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া অশেষ প্রশংসাবাদ ও আপ্যায়নাদিতে পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেলেন,—এসব ব্যাপার কল্পনাপ্রসূত। বালিকার কোন নিকটতম আত্মীয় অনুসন্ধান করিতে করিতে বেলঘরিয়ার সেই ঠাকুর বাড়ীতে বালিকার দেখা পান। তারপর একদা গঙ্গারঘাটে পূজা করিবার সময় এক হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী নিজের ঝুলি হইতে একটী শালগ্রাম শিলা বাহির করিয়া গৌরীমাকে দিয়াই সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্যা হইলেন,—ঘটনা এরূপ নহে। মাতাজীর আশৈশব পূজিত সিদ্ধশিলা শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর দামোদর-জিউকে তিনি অন্যত্র এবং অন্যভাবে লাভ করেন, তাহার ইতিহাস অলৌকিক।

এতদ্ব্যতীত আরও ভুল ত্রুটি আলোচ্য প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটী কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, মাতাজীর জীবনী আদৌ প্রকাশিত হয় ইহাই তিনি ইচ্ছা করেন না। যদিই বা হয়, তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা প্রকাশিত হয় ইহা তাঁহার নিষেধ। মাতাজীর কর্ম্ম-সাধনার কেন্দ্রস্থল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম তাঁহার জীবন-চরিত তাঁহারই পূজনীয়া গর্ভধারিণী, অগ্রজ প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন এবং পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা, পূজনীয় শ্রীমৎ রামলাল চট্টোপাধ্যায়, স্বামী সারদানন্দ, শ্রীম-মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু মাতাজীর অভিপ্রেত নয় বলিয়া তাহা এখন প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করিতেছেন না। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক নিজের নাম গোপন রাখিয়া ছদ্মনাম প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যেই হউন, অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তিনি মাতাজীর এত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মাতাজীর এই সুব্যক্ত নিষেধাজ্ঞাও তিনি অবশ্য জ্ঞাত থাকিবেন। তাহা সত্ত্বেও ইহা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জীবিত ব্যক্তির জীবনী অথবা বিশেষ ঘটনাবলী পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সম্মতি লওয়া এবং বিবৃত ঘটনাবলীর সত্যাসত্য সঠিক জানিয়া প্রকাশ করাই সমীচীন। বিগত ৩০।৩৫ বৎসর মাতাজীর নিকট এবং তাঁহার পূজনীয়া গর্ভধারিণীর নিকট যাহা আমি নিজে শুনিয়াছি এবং যাহা আমি সত্য বলিয়া জানি, তাহাই আমি এখানে লিখিলাম। আপনার পত্রিকায় আমার এই পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় আপনাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি—

ভবদীয়—

শ্রীমতী কেশবমোহিনী দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বুয়েনোস্ আইরেস্ (দক্ষিণ আমেবিকা)—স্বামী বিজয়ানন্দজী প্রায় পাঁচ বৎসর দক্ষিণ আমেবিকায় কৃতিত্বেব সহিত বেদান্ত প্রচাব কবিয়া গত ১৯শে ডিসেম্বব বেলুড় মঠে পৌছিয়াছেন। বুয়েনোস্ আইরেস্ নিবাসী কতিপয় মনীষী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আর্জ্জেণ্টাইনেব স্পেনীয় ভাষাভাষী জনসাধাবণেব মধ্যে ভাবতীয় ধর্ম্ম প্রচাবেব উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সনে তিনি আমেবিকায় প্রেবিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৫ সনেব ১৭ই মার্চ্চ তিনি তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা কবেন। এই আশ্রম হইতে স্বামী বিবেকানন্দেব কযেকখানা পুস্তক স্বামিজী স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত কবিযা প্রকাশ কবিয়াছেন। গত ১৯শে সেপ্টেম্বব তথায় শ্রীবামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমাবোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই আশ্রম পবিদর্শন কবিযা ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্থানীয় বামকৃষ্ণ মিশনেব স্বামী বিজয়ানন্দ গত পাঁচ বৎসব যাবৎ চমৎকাব কাজ কবিতেছেন। লাটিন আমেবিকায় সর্ব্বপ্রথম তিনিই ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব প্রচাব কবেন। বুয়েনোস্ আইবেস্ পবিত্যাগেব পূর্ব্বে শ্রীবামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীব সাধাবণ সভায় আমি যোগদান কবিয়াছিলাম। সেখানে "ভাবতেব অতীত ও বর্ত্তমান" সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা দিবাব জন্য আহূত হইয়াছিলাম। স্বামী বিজযানন্দ স্পেনীয় ভাষায় দক্ষিণেশ্বরেব ঋষিব জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা কবেন। বম্বেব ম্যাডাম্ সোফিয়া ওযাদিয়া, মিসেস্ এডেলিনা গুইরালডেস্ প্রভৃতি ঐ সভায় বক্তৃতা কবিযাছিলেন। প্রায় হাজাব লোক উৎসবে যোগদান কবিয়াছিল।" স্বামী বিজয়ানন্দজী কিছুদিন বেলুড়মঠে অবস্থান কবিয়া পুনরায় দক্ষিণ আমেরিকা প্রত্যাগমন কবিবেন।

বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রম—শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দজী বাগেবহাট আগমন কবিয়া বামকৃষ্ণ আশ্রমেব বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ও ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। সমাগতা মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণেব নিকট তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ব্যাখ্যা কবেন এবং স্থানীয় টাউন হলে শ্রীযুত বমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব সভাপতিত্বে "শান্তিলাভেব উপায়" শীর্ষক বক্তৃতা দান কবেন। স্বামিজীব সহজ সবল দৃষ্টান্তে সকলেই মুগ্ধ হন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কুমাবী সুনীলাবালা মুখার্জ্জী ও কুমাবী সতীবাণী দাসেব সঙ্গীত ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাব কার্য্য শেষ হয়।

ইদিলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—শিলং শ্রীবামকৃষ্ণ আশ্রমেব ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দজী বেলুড় মঠে যাইবাব পথে ঢাকা শ্রীবামকৃষ্ণ মঠে আসিযাছিলেন। প্রিযকাঠী পবগনায় অবস্থিত ইদিলপুব শ্রীবামকৃষ্ণ আশ্রম ও দক্ষিণ বিক্রমপুবেব কাগ্‌দী শ্রীবামকৃষ্ণ আশ্রমেব পক্ষ হইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি এখানে ৪ঠা নভেম্বব তাবিখে আগমন কবিযা ইদিলপুব শ্রীবামকৃষ্ণ আশ্রম, প্রিয়কাঠী বিবেকানন্দ বিদ্যালয, সাবদেশ্ববী বালিকা বিদ্যালয, ধানকাঠী, কণেশ্বব, কাগ্‌দী শ্রীবামকৃষ্ণ আশ্রম, রুদ্রকব, ইদিলপুব অনাথ আশ্রম, গোসাইবহাট প্রভৃতি স্থানে "মানবজীবনেব লক্ষ্য", "শান্তিলাভেব উপায়" "গীতায কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ", "শ্রীবামকৃষ্ণদেবেব জীবন ও বাণী," "ধর্ম্মেব প্রযোজনীযতা," "হিন্দুনাবীব আদর্শ" "ছাত্রজীবনেব কর্ত্তব্য" ও "সনাতন ধর্ম্মেব আদর্শ" সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কতিপয় দিবস বক্তৃতা ও আলোচনা কবেন। স্বামিজীব সবল ও অনাড়ম্বব আলোচনায নবনাবী নির্ব্বিশেষে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রীবামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনেব আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কবিবাব জন্য এতদঞ্চলে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চাব হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংবাদ

ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন—শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসবের সর্ব্বশেষ এবং অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠানরূপে আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে কলিকাতা নগরীতে কেন্দ্রীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে একটী ধর্ম্মমহাসম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ইহাতে ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতগণ এবং বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইবেন।

রুমানিয়ার স্যর নোটী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ সি, নার্লি শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে "মর্ত্তবাসী মানবের লক্ষ্য" সম্বন্ধে একটী দার্শনিক প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের নিকট এই মর্ম্মে পত্র দিয়াছেন—"যাঁহারা আপনাদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়া পৃথিবীতে শ্রেয়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সমুৎসুক, আমার মনে হয় তাঁহাদের পক্ষে এই মহামানবের (শ্রীরামকৃষ্ণের) শিক্ষাদর্শ অবশ্যই অনুসরণ যোগ্য।"

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রস্থ নিউহাভেনের মিঃ ওটোটি ম্যালারি এবং উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জি, এল্, গিলিস ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নিখিল ভারত শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী প্রদর্শনী—কেন্দ্রীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা ভবানীপুর নর্দানপার্কে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে একটী প্রদর্শনী খোলা হইবে। যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাবে ভারতের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পাদি নব-জীবনে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে "নিখিল ভারত শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী প্রদর্শনী"র আয়োজন অতি শোভন এবং সঙ্গত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে "মোহেঞ্জোদারু"র সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্ম, শাস্ত্র, শিল্প, চিত্রকলা, স্থপতি, ভাস্কর্য্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে। ইহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বিশেষভাবে দেখান হইবে। ভারতে প্রচলিত বিবিধ প্রকার হস্ত নির্ম্মিত শিল্প, কুটির শিল্প, সীবন শিল্প, তকু শিল্প, আলপনা প্রভৃতি প্রদর্শনীতে থাকিবে। প্রদর্শনীক্ষেত্রে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সঙ্গীত সম্মেলন, কীর্ত্তন, কথকতা, 'কালক্ষেপণ', যাত্রা, কুস্তি-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি এই প্রদর্শনীর অঙ্গস্বরূপে অনুষ্ঠিত হইবে। মাসাধিককাল ইহা স্থায়ী হইবে।

করাচি—গত নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে করাচিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের মহা-মানবের অলৌকিক উদারভাবের উপযোগী করিয়া উৎসবটী সুসম্পন্ন করিবার জন্য স্থানীয় প্রায় সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের দুইজন সন্ন্যাসীকে লইয়া একটী শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে আটদিন ব্যাপিয়া একটী সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে জগতের নানা ধর্ম্মমতানুবর্ত্তিগণ আপন আপন ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণের লোকোত্তর জীবনী ও অলৌকিক বাণী সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা হইয়াছিল।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রফেসার শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় উৎসবে যোগদান করায় ইহা বিশেষ শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল। অধিকাংশ দিনই তিনি

সভাপতি অথবা বক্তারূপে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তস্থ এই নগরীতে তিনি বাঙলা ও সিন্ধুদেশের যোগসূত্ররূপে প্রতীয়মান হইতেছিলেন। তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাবলী শ্রোতৃবর্গের বিশেষ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। রেভারেণ্ড হাসকেল খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শেঠ গোলাম আলি চাগলা ইসলামের উদারভাব সম্বন্ধে অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ইরাণ-ভারত সংস্কৃতিতে অগাধ পণ্ডিত ডক্টর এন এম ধল্ল ভারত ও ইরাণের সংস্কৃতির মধ্যে একতা ও সাম্য প্রদর্শন করেন। বোম্বাইয়ের পালি-বিশেষজ্ঞ প্রফেসার ভাগবত তাঁহার মনোজ্ঞ বক্তৃতায় দেখাইয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ও ভাবপ্রচারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও প্রচার অতি সুন্দরভাবে মিলিয়া যায়।

এই ধর্ম্ম-সম্মেলন ছাড়া সহরের আরও চারিটী বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দি, সিন্ধি, গুজরাটি ও মারাঠিতে বক্তৃতা হইয়াছিল। করাচিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের একটী স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনোদ্দেশ্যে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী ষোল হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টিগণের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে।

গঙ্গারামপুর (যশোহর)—যশোহর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব ক্রিয়া মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্ত্তন গীত হইয়া মহোৎসবের উদ্বোধন করা হয়। তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, হোম, শ্রীচণ্ডী পাঠ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে অক্ষুণ্ণভাবে সম্পন্ন হয়। গঙ্গারামপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের জনসাধারণ, নড়াইল, রতনগঞ্জ ও সিঙ্গিয়া হইতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং বিনোদপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রগণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যূন পাঁচশত লোকের ভিতর প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিনোদপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মজুমদার, বি-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় গঙ্গারামপুরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাখালদাস গোস্বামী, বি-এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বিশ্বাস প্রভৃতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন। পরদিন প্রাতঃকালে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কয়েকটী দল কর্ত্তৃক বিভিন্ন প্রকারের লাঠিখেলা এবং গঙ্গারামপুর ও বিনোদপুরের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শিত হয়। দ্বিপ্রহরে দুই ঘণ্টাকালব্যাপী বিনোদপুরের শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "অবতার কীর্ত্তন" গীত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া কীর্ত্তন সহকারে গ্রামের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করা হয়। এই দিন অষ্টশতাধিক ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্কুলের সম্মুখস্থ তোরণোপরি এই দুই দিন ধরিয়া নহবৎবাদ্য মহোৎসবের সৌকর্য্য অনেকাংশে বৃদ্ধি করিয়াছিল। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু এবং তাঁহার সতীর্থগণ, স্কুলের ছাত্রগণ এবং স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর সমবেত আন্তরিক চেষ্টার ফলেই এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে।

বানিয়াচঙ্গ—বানিয়াচঙ্গ ৫।৬নং কাছারীতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন পালিত মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় শতবার্ষিকী কমিটির প্রচেষ্টায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের

স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী ও সুনামগঞ্জ মিশনের স্বামী চণ্ডিকানন্দজী আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ঊষাকীর্ত্তন, পূজা, পদকীর্ত্তন, বাউল-গান, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, কালী-কীর্ত্তনাদিতে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন দিক হইতে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে উৎসব-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণ সেবায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী "শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম্মজীবন" ও স্বামী চণ্ডিকানন্দজী 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহা ছাড়া শ্রীসুবোধচন্দ্র দেব, বি-এ, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি-এ, শ্রীশিবেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীরণেন্দ্রমোহন পালিত, শ্রীরাখেশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ এবং বক্তৃতা দান করেন। সভার শেষে সন্ধ্যারতি ও কীর্ত্তনে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। পরদিন সকাল বেলা ৯ ঘটিকায় মহিলাদের জন্য একটী সভা আহূত হয়। স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী "নারী ও ধর্ম্ম" স্বামী চণ্ডিকানন্দজী "নারী ও রামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে দুইটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর বেলা দুই ঘটিকায় নৌকায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর প্রতিকৃতি সুশোভিত করিয়া একটী শোভাযাত্রা নগর কীর্ত্তনসহ বাহির হয়। সন্ধ্যায় ভজন, কীর্ত্তন, বাউল গান ও প্রসাদ-বিতরণের পর উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

ছায়াচিত্র—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-কথা সাধারণ্যে বহুল প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সমিতি ৪১ খানা ছায়াচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছেন। চিত্রগুলি নিপুণ শিল্পীদ্বারা অঙ্কিত। জন্ম হইতে মহাসমাধি পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জাহাজ কোম্পানীর ভাড়া হ্রাস—আগামী মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় যে ধর্ম্মমহাসভা হইবে, যাহাতে সকলেই তাহাতে যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মৌলিক মহাশয় জাহাজের ভাড়া কমাইবার জন্য লয়েড ট্রিষ্টিনো কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত কোম্পানী তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা ঐ ধর্ম্ম-মহাসভায় যোগদান করিবেন, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের ভাড়া শতকরা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হ্রাস করা হইবে।

কোকনদ—স্বামী ঘনানন্দজী কোকনদ টাউন-হলে রামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর উচ্চাদর্শ সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি রামস্বামীযাজুলু শতবার্ষিকী সমিতিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। দেওয়ান বাহাদুর সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি নাইডু, অধ্যক্ষ রামস্বামী প্রভৃতি সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কোকনদে শতাব্দী জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য একটী স্থানীয় সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহাতে দেওয়ান বাহাদুর সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি সভাপতি, মিঃ শ্রীপদ-রামিয়া ও এন্ ওয়াই যোগানন্দ রাও সম্পাদক এবং লেখরাজ সুব্বা রাও, পিড়া শ্রীরামকৃষ্ণাইয়া, এম্ বঙ্গিয়া প্রভৃতি সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

বালী—বালী সহরবাসিগণ মহাসমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দী জয়ন্তী সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে অন্যান্য উৎসবানুষ্ঠানসহ একটী মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। তাহাতে বহু সংখ্যক নরনারী যোগদান করেন। অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সভানেতৃত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, স্বামী

সৎপ্রকাশানন্দজী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাবোদ্দীপক বক্তৃতার পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

চন্দননগর—শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে চন্দননগর লাইব্রেরী-হলে গত ২৪শে ডিসেম্বর তত্রত্য অধিবাসিগণের একটী সভা হয়। ভূতপূর্ব্ব মেয়র জে, সি, ঘোষ সভায় সভাপতিত্ব করেন। চন্দননগরবাসীর বিশেষ নিমন্ত্রণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ও স্বামী সুন্দরানন্দজী সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও বিশ্বব্যাপী শতবার্ষিকী আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ পরিতোষ লাভ করেন।

হাসড়া—শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে দিবসত্রয় ব্যাপিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে হাসড়া গ্রামে সুসম্পন্ন হইয়াছে। হাসড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ জনমণ্ডলী জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যোগদান করিয়া এই উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। উৎসবের প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তনসহ সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করে। দ্বিতীয় দিন ভজন, ঠাকুরের বিশেষ পূজার্চ্চনা ও হোম সম্পন্ন হয়। দ্বিপ্রহর হইতে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সহস্রাধিক লোক প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকালে একটী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন হইতে আগত বিশিষ্ট সাধু ও ভক্তগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশাবলী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। রাত্রে আরাত্রিক ও ভজন হয়। সোমবার দিন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটীর এক বিশেষ অধিবেশন হয়।

হেঁড়্যা কাঁথি—শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন কল্পে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের চেষ্টায় হেঁড়্যা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ প্রধান, বি-এ, বি-টি মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত স্কুল-প্রাঙ্গণে স্থানীয় ৬০ খানি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটী সাধারণ সভা হয়। সভায় দুইজন ভদ্রলোক শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী মঙ্গলানন্দজী শতবার্ষিকী উৎসবের প্রয়োজনীয়তা ও ঠাকুরের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উৎসবটী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় তাহার জন্য সভাপতি মহাশয় সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় উৎসব সমিতির চেষ্টায় স্বামী মঙ্গলানন্দজী কয়েকটী গ্রাম একত্র করিয়া পর পর কয়েকটী বৈঠকী সভা করেন এবং তাহাতে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। হেঁড়্যা স্কুল ও বড়বাড়ী স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে স্বামিজী 'রামকৃষ্ণ ও বর্ত্তমান যুগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরমহংসদেবের ধর্ম্মসমন্বয়ের একদিক্

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

এমন একটা কথা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রায়ই শুনা যায় যে, ধর্ম্মের সহিত মানবের এমন কোন সম্বন্ধই নাই, যাহাকে উপেক্ষা করিলে তাহার জীবনযাত্রা অচল বা উপদ্রব-সঙ্কুল হইয়া উঠিতে পারে। ধর্ম্ম নামে বাহিরের যে সকল আচার পরম্পরা আমাদের পরিচিত, তাহা সকলই যদি মনুষ্য সমাজ হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তথাপিও মানুষের আহার নিদ্রা বিহার প্রভৃতি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, এখনও যেমন চলিতেছে তেমনিই সে চলিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। এই জন্মের অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিণাম যে পরলোকেও থাকিবে, অর্থাৎ আমার এ দেহের ধ্বংসের পর আমার এই আমিত্বও বজায় থাকিবে এবং আমাকেই তাহা ভোগ করিতে হইবে, এই প্রকার বিশ্বাস যাহার নাই, (বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ লেখাপড়াজানা লোকেরই যে তাহা নাই ইহাও ধ্রুব সত্য) তাহার পক্ষে সমাজে বাস করিতে হইলে, মধ্যে মধ্যে ধার্ম্মিকতার ভাণ করিতে হয় এবং না করিলে সামাজিক জীবনে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগও অনিবার্য্য হইয়া থাকে। এই জন্য এই জাতীয় ধার্ম্মিকতা বা বিবেকবিরোধী সুবিধা-গ্রহণপরতা—বর্ত্তমান সময়ে লেখাপড়াজানা লোক সমূহের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার মনোবৃত্তি শুধু ভারতেই নহে, বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সভ্যনামে পরিচিত সকল দেশের সকল মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। অপর দিকে যাহার সেবনে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পারলৌকিক শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায় তাহাই ধর্ম্ম,—ইহাই হইল ধর্ম্মের ঋষিজনসম্মত লক্ষণ (যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ স ধর্ম্মঃ)। এই লক্ষণানুগত ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত সুশিক্ষিত মানবগণের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের যে

কোন সম্পর্কই নাই, ইহা বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু, তাই বলিয়া ধর্ম্মের কথা কাহারও বক্তব্য নহে অথবা কাহারও শ্রোতব্য নহে, ইহাও বলিতে পারা যায় না। ধর্ম্মের সহিত বিশ্বপণ্ডিত-কুলের সম্বন্ধ থাকুক বা নাই থাকুক, মানুষ কিন্তু ধর্ম্মের কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না অথবা না শুনিয়াও থাকিতে পারে না। ইহাই হইল মানুষের স্বভাব। এই কথাই শাস্ত্রে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, যথা,—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনানি
সমানি হি স্যুঃ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন মানবের ন্যায় পশুদিগের মধ্যেও হইয়া থাকে, এই সকল ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দালাভ করাই মনুষ্যত্ব নহে, ধর্ম্মই পশু প্রভৃতি জীব হইতে মানবের বৈলক্ষণ্য বা বিশেষ, সেই ধর্ম্মের সহিত যে মানবগণের সম্বন্ধ নাই, তাহাদের সহিত পশুগণের ফলতঃ কোন বৈলক্ষণ্য নাই।

এ সংসারে সকলেই চাহে সুখ—আর চাহে না দুঃখ, প্রাণী মাত্রেরই যখন এই স্বভাব তখন সুখের জন্য বা দুঃখের নিবৃত্তির জন্য যে প্রত্যেক মানুষই চেষ্টা করিবে, তাহা ত স্বাভাবিক। এইরূপ চেষ্টা করে বলিয়া সে প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় হইতে পারে না, অথচ আমরা সুখার্থী মানুষকে নিন্দা করিয়া থাকি—শুধু যে নিন্দাই করি তাহাও নহে স্তুতিও করিয়া থাকি। মানবমাত্রই যখন সুখ পাইবার জন্য বা দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে, তখন বিবাহিত স্ত্রীতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিকে আমরা প্রশংসা করি কেন? আর ব্যভিচারনিরত ব্যক্তিকে আমরা নিন্দাই বা করি কেন? এইরূপ স্তুতি বা নিন্দার প্রবর্ত্তক মানবপ্রকৃতিগত যে সদসদ্বুদ্ধিরূপ বিবেক বা বৈশিষ্ট্য, তাহাই হইল ধর্ম্মের মূলীভূতকারণ। এই প্রকার মানবপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা মানবস্বভাব বশতঃই আমরা পাপ প্রবৃত্তির নিন্দা করিয়া থাকি এবং পুণ্য প্রবৃত্তির প্রশংসা করিয়া থাকি।

মানুষ অনাদিকাল হইতেই ধর্ম্মের ভাবনা করিয়া আসিতেছে এবং যতদিন এ ধরায় থাকিবে, ততদিন সে ধর্ম্মে বিশ্বাস করুক বা না-ই করুক, ধর্ম্মের ভাবনা ছাড়িতে পারিবে না, ধর্ম্মের কথা না কহিয়াও থাকিতে পারিবে না। ধর্ম্মকে ছাড়িয়াছি বলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা-পত্র পাইবার জন্য সে বিদ্বৎসমাজে নিজের দাবী বার বার কঠোর স্বরে সংস্থাপন করিতে পারে এবং করিতেও লজ্জাবোধ করে না—ইহা সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম তাহাকে এক ক্ষণের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ইহা স্থির, কারণ সেই ধর্ম্মই যে মানুষের স্বভাব।

আসল কথা এই হইতেছে যে, ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বপণ্ডিতগণ মাঝে মাঝে এমন বাগাড়ম্বর করিয়া বসেন, যাহাতে ধর্ম্মতত্ত্বানু-সন্ধিৎসু বহু ব্যক্তিরই মাথা বিগড়াইয়া যায়, তাহার ফলে ধর্ম্মাভাস বা অপধর্ম্মই অনেকের কাছে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, কাজেকাজেই সংশয় বা বিপরীত জ্ঞানের প্রভাবে অনেক মানুষের কাছেই মানুষের ধর্ম্ম অবোধ্যই থাকিয়া যায়। এই ধর্ম্ম কি? মনু বলিতেছেন—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তং নিবোধত॥

যাঁহাদের হৃদয় রাগদ্বেষশূন্য, যাঁহারা বিদ্বান ও যাঁহারা সাধু, তাঁহারা হৃদয়ের অনুমত বলিয়া যে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন, আমি সেই ধর্ম্মের উপদেশ করিতেছি, হে ঋষিগণ তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মনুপ্রোক্ত এই বিদ্বান্‌গণের সেবিত ও হৃদয়াভ্যনুজ্ঞাত ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে হইলে মানব-স্বভাবের বৈচিত্র্যের প্রণিধান করা একান্ত আবশ্যক। মানুষ পশুপক্ষীর মত বিষয় ও

ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে সমুৎপন্ন সুখ চাহিয়া থাকে ইহা যেমন অখণ্ডনীয় সত্য, তেমনি বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ-জনিত প্রাকৃত সুখ হইতে বিলক্ষণ আর এক প্রকার সুখও যে সে চাহিয়া থাকে, ইহা ত প্রত্যাখ্যান করা যায় না, সেই সুখ কি তাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

কঠোপনিষদে দেখিতে পাই—নচিকেতা পিতার ক্রোধবশতঃ অকালে যমের বাড়ী যাইতে আদিষ্ট হইয়া যখন যমের ভবনে অতিথি হইয়াছিল, এবং যমের করুণাবশতঃ না মরিয়া, 'বিশেষ বর প্রার্থনা কর' এই বলিয়া অভ্যর্থিত হইয়াছিল, তখন সে চাহিয়াছিল—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন লোকে ভাবিয়া থাকে এই যে মানুষটী মরিল, সে কি একেবারে অনন্ত অভাবে বা শূন্যে পরিণত হইল, অথবা লোকান্তরে বা রূপান্তরে পরিণত হইয়া বাঁচিয়া রহিল। এই যে ভাবনা—এই যে সংশয়, তাহার নিবৃত্তি যে নিশ্চয় হইতে হইয়া থাকে, সেই নিশ্চয় রূপ-ই বর আপনি আমাকে দিন, আমি আপনার নিকট অন্য কোন বরই চাহি না—ইহাই আমার তৃতীয় বর। উপনিষদের এই নচিকেতা ও যম সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তাহাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না, কিন্তু মরিবার পর মানুষের অর্থাৎ মানব-আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা—এই প্রকার যে সংশয় ও তাহার প্রকৃত উত্তর কি? তাহা জানিবার জন্য মানুষের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাহা অনাদিকাল হইতে মানুষের মনকে যে আকুল করিয়া আসিতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে?

এই আকাঙ্ক্ষাই—মানুষের নিম্নস্তরের সকল জীব হইতে বৈশিষ্ট্য, পশুপক্ষী প্রভৃতির হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়া থাকে কিনা তাহার স্পষ্ট উত্তর মানুষ এ পর্য্যন্ত দিতে পারিয়াছে কিনা ইহা এস্থানে আলোচ্য নহে, কিন্তু এইরূপ আকাঙ্ক্ষা যেমন মানুষ নিজ হৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহা পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্ জাতীয় প্রাণীর হৃদয়েও যে আছে, তাহার কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, ইহা স্থির।

মরণের পর আমার অস্তিত্ব থাকিবে কিনা ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিবার জন্য, মানবের এই উৎকট আকাঙ্ক্ষাই অনাদিকাল হইতে এপর্য্যন্ত তাহাকে সকলপ্রকার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া আসিতেছে এবং যতদিন এ পৃথিবীতে মানুষ থাকিবে, ততদিন তাহা তাহাকে সেই পথেই পরিচালিত করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

এই আকাঙ্ক্ষার—এই আত্মজিজ্ঞাসার চরিতার্থতাই মানবজীবনে সকল প্রয়োজনের মধ্যে প্রধানতম—ইহারই নাম পরম পুরুষার্থ, ইহাই হইল হিন্দুর সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সারভূত উপদেশ।

এই আত্মজিজ্ঞাসা ও তাহার চরিতার্থতা সম্পাদনের যাহা বিরোধী তাহাই অধর্ম্ম, আর যাহা তাহার অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ যে পর্য্যন্ত বিস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাবৎকালই মানুষ ধর্ম্মের আসনে অধর্ম্মকে বসাইয়া, তাহারই সেবা করিতে লজ্জিত হয় না, প্রত্যুত আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া শ্লাঘারও অনুভব করিয়া থাকে, অপর দিকে অধর্ম্মের আসনে ধর্ম্মকে বসাইয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা বা নিন্দা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না, ইহাও প্রচুরভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম-স্বরূপ নিরূপণের প্রসঙ্গে মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এস্থলে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য, তিনি বলিয়াছেন—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলম্॥

যথাবিধি-ধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি শ্রীভগবানে প্রীতির উৎপাদন না করে, তাহা হইলে, উহা বিফল শ্রমেই পরিণত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি ভগবৎপ্রেম হৃদয়ে উদিত হইয়া বদ্ধমূল না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ ধর্ম্ম বিফলশ্রম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে, অর্থাৎ উহা প্রকৃত ধর্ম্মই নহে উহা অপধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। ইহাই হইল উল্লিখিত বেদব্যাস বচনের তাৎপর্য্য, এইরূপ তাৎপর্য্য অনেকের পক্ষে সন্তোষপ্রদ না হইতে পারে, না হইবারও অনেক কারণ থাকিতে পারে, তাই ইহার পরবর্ত্তী কয়টী শ্লোকে মহর্ষি আবার বলিতেছেন—

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্যনেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থোযশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥

সকল সময়ের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ সাক্ষাৎকারই যাহার ফল, সেই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য অর্থ হইতে পারে না। এইরূপ ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ যে অর্থ, তাহার উদ্দেশ্য অভিলষিত বিষয়-সমূহের ভোগ বা আস্বাদন নহে, এই প্রকার বিষয়-ভোগ বা কামের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-প্রীতিও নহে, কিন্তু জীবন বা সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকাই কামের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। এইরূপ জীবনের বা বাঁচিয়া থাকারও একমাত্র লক্ষ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসাই হইয়া থাকে। কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা যে ঐহিক বা পারত্রিক অনিত্য সুখলাভ হয়, তাহার জন্য মানবের জীবন নহে।

এই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা এখানে বলা হইয়াছে সেই তত্ত্বের স্বরূপ কি? ইহারই উত্তর হইতেছে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

সর্ব্বপ্রকারে দ্বৈতশূন্য যে জ্ঞান তাহাকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বা পারমার্থিক বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ উদ্ধৃত শ্লোক কয়টীতে সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার আর একটু বিস্তৃতভাবে তাৎপর্য্যানুশীলন এখানে আবশ্যক মনে হয়।

মানুষ বিষয়েন্দ্রিয় সংসর্গের পরিণতিরূপ যে সুখ, তাহার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত—ইহা কাহারও অবিদিত নহে, কিন্তু এইরূপ সুখলাভ করিলেই যে সে চরিতার্থ হয় তাহা নহে, কারণ সেইরূপ সুখ-লাভের পর তাহার যে চরিতার্থতা বোধ, তাহা চিরস্থায়ী নহে। অভীষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধ লাভের পর—মানুষ আপনাকে কিয়ৎকালের জন্য সুখী বা চরিতার্থ বলিয়া বোধ করে—ইহা যেমন সত্য, সেইরূপ সেই সুখভোগের পরই আবার তাহার অনুভূতজাতীয় সুখান্তরের প্রাপ্তির জন্য নবীন আকাঙ্ক্ষাও যে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, ইহাও তেমনি সত্য। তাই ভাগবতে দেখিতে পাই—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো বিভুঃ
নৈবার্থদো যৎপুনরর্থিতা নৃণাম্।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতা মনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজ পাদপল্লবম্॥

যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের নিকট কোন অভিলষিত বিষয়ের প্রার্থনা করে, তাহার সেই প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিয়া থাকেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তিনি তাহার যথার্থ কামনার বিষয় যে বস্তু, তাহা দেন না; কারণ, তাহাই যদি তিনি দেন, তাহা হইলে তাহার অর্থিতা অর্থাৎ ইষ্ট-বস্তু বিষয়ে কামনা কেন আবার উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু, কোন প্রকার বিষয়ের প্রাপ্তির কামনা না করিয়া, যদি কেহ তাঁহার পদ-পল্লবের ভজনা করে, তাহা হইলে, তিনি তাহার সকল প্রকার কামনাকে তিরোহিত অর্থাৎ মূলের সহিত বিনাশিত করিয়া থাকেন।

ইহাই হইল মানবের স্বভাব যে, সে সুখ চাহে অথচ সুখ যদি ভাগ্যবশতঃ তাহার আসে, সে পরক্ষণেই আবার সুখান্তরের কামনা করে এবং তাহা লাভ করিবার জন্য বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে যে, মানুষের স্পৃহণীয় যে সুখ, তাহা ক্ষণিক অর্থাৎ নিত্য নহে, সুতরাং তাহার বিনাশের পরই আবার নূতন অথচ পূর্ব্বানুভূত সুখের ন্যায় ক্ষণিক অন্য একটী সুখের কামনা তাহার হইয়া থাকে। এইরূপ সুখের কামনা বা সুখের প্রাপ্তি আবার সুখান্তরের কামনার উদয় মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক সংসারী মানবের জীবনে অপরিহার্য্য।

এইরূপ কামনার পর সুখ, আবার সুখের পর কামনা—ইহাই কিন্তু মানব জীবনের চরিতার্থতা নহে; কারণ ইহা মানবের অন্যপ্রাণী হইতে বৈশিষ্ট্য নহে। ইহা প্রাণীমাত্রেরই স্বভাব, এই স্বভাবই হইল—মানবের সহিত ইতর প্রাণীর সাধারণ্য, ইহা কিন্তু মানবের বৈশিষ্ট্য নহে।

এই বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন ক্ষণিক সুখের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া নিত্য সুখের স্বরূপ যে নিজ আত্মা, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য যে অভিলাষ, তাহাই হইল মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান সকল মানুষ করে না, ইহা সত্য। কেন যে করে না তাহার হেতু এই যে, মানুষের নিকট—বিষয়াসক্ত অবিবেকী মানুষের নিকট, এইরূপ ক্ষণিক বৈষয়িক সুখ ছাড়া, অন্য কোন প্রকার সুখ থাকিতে পারে, এই প্রকার সম্ভাবনাও উদিত হয় না। বাস্তবিক কিন্তু সুখ একই প্রকারের নহে, অধ্যাত্মশাস্ত্রে সুখকে তিন প্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে। তাই ভগবদ্গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, সুখ ত্রিবিধ, তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক। তামস সুখ যথা—

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্।

আরম্ভে বা অবসানে যে সুখ আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে, যাহা নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ। রাজস সুখের লক্ষণ যথা—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥

অভিলষিত বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, প্রথমে যাহা অমৃতের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু পরে যাহাকে বিষ বলিয়া মনে হয়, তাহাই রাজস সুখ। সাত্ত্বিক সুখের স্বরূপ এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা—

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্॥
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

অভ্যাস হইতে যাহাতে আসক্তি আসে, যাহা দুঃখের অন্ত করিয়া থাকে। প্রথমে যাহা বিষের ন্যায় প্রতীত হয় কিন্তু পরিণামে যাহা অমৃত তুল্য বলিয়া মনে হয়, সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ। আত্মার যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তদ্বিষয়িণী যে বুদ্ধি বা জ্ঞান সেই জ্ঞানের প্রকর্ষ বা নির্ম্মলতা হইতেই এই সাত্ত্বিক সুখ উৎপন্ন হয় ও তাহাতে আসক্তি হইয়া থাকে।

এই সাত্ত্বিক সুখের অনুভূতিই ধর্ম্ম-সাধনার পরিণতি, এই সুখের আস্বাদন যাহার হইয়াছে, সে আর এ জীবনে রাজস ও তামস সুখের আকাঙ্ক্ষা করে না, রাজস বা তামস সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা মনুষ্য-সমাজে যতই প্রাবল্যলাভ করিবে, ততই বিরোধ, কলহ, সংগ্রাম ও অশেষ প্রকারের অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই অল্প বা বিস্তরভাবে বুঝিতে পারে। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে বিবদমান সভ্যজাতিনিবহের রাজস ও তামস সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য হইয়াছে। তাই মনুষ্য-প্রকৃতির প্রতিকূল বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা বিদ্যা, কুল ও ঐশ্বর্য্যের অভিমানে আজ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ তাহারা পৃথিবীর সকল প্রদেশে প্রজ্বলিত অশান্তির অনলরাশিতে জড়বিজ্ঞান ও

রাজনীতিশাস্ত্রের সাহায্যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল ইন্ধন যোজনার আয়োজন করিতেছে, ও তাহা করিতে করিতে ব্যাকুল ও দিশেহারা হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। ইহার—এই পৃথিবীব্যাপী অশান্তি দাবানলের নির্ব্বাণ করিতে হইলে সাত্ত্বিক সুখের প্রতি মানবমাত্রেরই যাহাতে বাস্তব আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাহাই করিতে হইবে। সেই সাত্ত্বিক সুখের স্বরূপ ও তাহার প্রাপ্তি-সাধন কি তাহা বুঝিবার জন্য অনাদিকাল হইতে যে উপদেশপরম্পরা নানা দেশের নানা মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই হিন্দু শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাস বলিয়া থাকে, পারসীকগণ তাহাকে আবেস্ত কহে, খ্রীষ্টিয়ান তাহাকে বাইবেল বলিয়া প্রচার করে, মহম্মদীয়গণ তাহারই কোরাণ সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকে। ধর্ম্মের যাহা বাহ্যসাধন, তাহা নানাদেশে নানাজাতির মধ্যে দেশকাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈষম্যবশতঃ চিরদিনই পৃথক্ পৃথক্ হইয়া আসিতেছে। যতদিন মানুষ এসংসারে থাকিবে, ততদিনই তাহা পৃথক্ পৃথক্ই থাকিবে, তাহাতে অসন্তোষের অবসাদের নৈরাশ্যের বা কলহের কোন হেতুই নাই, আসল যাহা ধর্ম্ম—অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখলাভের সর্ব্বমানবসাধারণ উপায়, তাহা সৃষ্টির আদি হইতে এপর্যন্ত এককপই ছিল, আছে এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত থাকিবে, এই কথা মানুষের ভুলিলে চলিবে না, ইহাই হইল বর্ত্তমান যুগের পূর্ণ-অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। ইহা চিরপুরাতন হইলেও পরমহংসদেব পৃথিবীর সকল মানবকে নূতন ভাবে যেমন করিয়া উপদেশ ও আদর্শের দ্বারা বুঝাইয়াছেন তাহা অসাধারণ অতুলনীয় ও অলৌকিক। শ্রদ্ধেয় উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছেন—প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে বলিবার কথা অনেক রহিয়া গেল, কি করিব উপায় নাই, তাই বাধ্য হইয়া এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

(১)

হে জলন্ত বহ্নিসম জয়দৃপ্ত সত্যের পূজারি।
ধর্ম্ম-যজ্ঞে হে উদ্গাতা কর্ম্মে তব মুগ্ধ নরনারী,
হে প্রবল প্রাণ।
আজি হে তাপস সূর্য্য
বাজে তব জয় তূর্য্য,
সন্ন্যাসিন্ তব পদে লক্ষবার প্রণাম! প্রণাম।
দুরাসদ কামরিপু ভস্মীভূত করি হেলাভরে—
দুর্জ্জয় শঙ্কর সম এসেছিলে নির্ভীক অন্তরে—
দীন মর্ত্ত্য 'পরে।

(২)

বৈদান্তিক জাতি মোরা ভীমনাদে উঠিল হুঙ্কার,
হে বীরেন্দ্র, তব কণ্ঠে চূর্ণ করি ক্লৈব্য কারাগার—
ওগো বিশ্বজয়ী,
প্রভু রামকৃষ্ণ বরে—
গাহিলে উদাত্ত স্বরে—
সপ্তসুরে ঝঙ্কারিয়া ঋক্ সাম যজু মন্ত্রত্রয়ী
যে শুভ-মুহূর্ত্তে হ'ল স্বামী শিষ্য পরম সাক্ষাৎ
সেই দিন ভারতের পুণ্যময় নব সুপ্রভাত
হ'ল অকস্মাৎ।

(৩)

প্রত্যুষের পূর্ব্বাচলে তেজোপুঞ্জ সূর্য্যোদয় সম
শতাব্দীর তন্দ্রা ভাঙ্গি এসেছিলে ওগো প্রিয়তম
তিমির বিদারী,—
ধূলিময় মর্ত্ত্যলোকে
উদ্ভাসিয়া জ্ঞানালোকে
জড়ত্বের শিরে বজ্র নিক্ষেপিলে ওগো দর্পহারী,
জলদ গম্ভীর সুরে 'অভী'মন্ত্র তব কণ্ঠ হ'তে
নবীন জাতির বুকে শক্তি দিল জীবনের রথে,
জয়যাত্রা পথে।

(৪)

উদ্ধারিতে অভিশপ্ত মৃতকল্প ভারত সন্তানে
ভগীরথ সম গঙ্গা এনেছিলে নবজন্ম দানে
হে বিজয়ী বীর,
ধূর্জ্জটীর জটা হ'তে
জ্যোতির্ম্ময় বন্যাস্রোতে
জীর্ণতা জঞ্জালরাশি ভাসাইলে শত শতাব্দীর।
লাঞ্ছিত ভুলিল ব্যথা, অব্রাহ্মণ মেলিল নয়ন,
লভিল দুর্ব্বার গতি দুর্ব্বলের কম্পিত চরণ
ভুলিয়া মরণ।

(৫)

যারা ছিল সুপ্ত হ'যে হেরি' ঘোর তমো অন্ধকার
তাহাদের খুলে দিলে অমৃতের জ্যোতির্ম্ময় দ্বার
ওগো সত্যব্রত,
বিশ্বপ্রেম মন্ত্র বলে
স্বার্থান্ধ ভুজঙ্গ দলে
কুটিল উদ্যত ফণা করে দিলে শান্ত অবনত।
শুনিল ব্রহ্মাণ্ডবাসী সবিস্ময়ে তব রুদ্রগান
রূপমণ্ডুকতা নহে ভারতের আদর্শ মহান
নমো মহীয়ান্!

(৬)

যৌবনের দ্বিপ্রহরে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া
জয় রামকৃষ্ণ বলি' কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলে নামিয়া
জয়তু ভৈরব!
সর্ব্বকাম ধ্বংস করি
হুতাশন মূর্ত্তি ধরি
ভস্মীভূত করিলে হে তুচ্ছতম বিষয়-বৈভব।
আজি এ তরুণ কবি অর্ঘ্য দিল তোমার উদ্দেশে
হে আদর্শ গুরু মোর দুর্ব্বলতা হরো হে নিঃশেষে
মৃত্যুঞ্জয় বেশে।

পথের আলোক

সম্পাদক

ধর্ম্মভূমি ভারতের আত্মারাম পুরুষ বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভারতের শত শত শতাব্দীর আধ্যাত্মিকতা জমাট-বদ্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই দেব-মানবের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-সাধন জগৎকে আধ্যাত্মিকতার নবালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। তাঁহার বাণীর ভিতর দিয়া ভারতের শাশ্বত বাণী বিশ্ববাসীর মর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়াছে। এই অতি-মানবের সৌম্য প্রশান্ত ধ্যানমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই মনে হয়, তিনি যেন দেশকাল পাত্রাতীত সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে মীনের মত নিমজ্জিত হইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন প্রকৃতই এক অশ্রুতপূর্ব্ব পারমার্থিক সাধন-জীবনের ইতিহাস। তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের অমূল্য সম্পদ অর্জ্জনের জন্য যে অনন্যসাধারণ তপস্যা করিয়াছেন, জগতের ধর্ম্মেতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ধর্ম্ম-রাজ্যের সর্ব্বোচ্চস্তরে উপনীত হইয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বহুত্বকে দেখিয়াছিলেন তিনি একের বিভিন্ন অভি-ব্যক্তিরূপে। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বিভিন্ন নাম-রূপ যে এক "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ, এই সততপরিবর্ত্তনশীল জগৎ যে এক অপরিবর্ত্তনীয় শক্তির সদাপরিবর্ত্তনশীল পরিচ্ছদ, সকল দেব-দেবী যে একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপাভিব্যক্তি, সকল ধর্ম্ম যে এক শাশ্বত ধর্ম্মের আশ্রয়, সকল মানব যে আত্মাহিসাবে এক ও অভেদ, তাহা তিনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই একত্ব—অভেদত্বের অনুভূতি শাস্ত্র, যুক্তি বা বিচারপ্রসূত ছিল না, তাঁহার অনুভূতি ছিল প্রত্যক্ষ—বস্তুগত—বাস্তব। এই প্রত্যক্ষানুভব সম্বন্ধে অতি সহজ সরল ভাষায় তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন,—"দেখি কি—যেন, গাছ-পালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো। বালিসের খোল যেমন হয়, দেখিসনি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য কাপড়ের, কোনটা চারকোণো, কোনটা গোল—সেই রকম। আর বালিসের ঐ সব রকম খোলের ভিতরেই যেমন একই জিনিষ—তুলোভরা থাকে, সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্ব্বত সব খোলগুলোর ভিতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাইরে, মা যেন নানারকমের চাদর মুড়ি দিয়ে দিয়ে নানারকম সেজে ভিতর থেকে উঁকি মারছেন। একটা অবস্থা হয়েছিল, যখন সদা-সর্ব্বক্ষণ ঐ রকম দেখ্‌তুম। ঐ রকম অবস্থা দেখে বুঝতে না পেরে সকলে বোঝাতে, শান্ত করতে এল, রামলালের মা-টা সব কত কি ব'লে কাঁদতে লাগলো, তাদের দিকে চেয়ে দেখছি কি যে, (কালী মন্দির দেখাইয়া) ঐ মা-ই নানা-রকমে সেজে ঐ রকম কর্‌চে। ঢং দেখে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম্, আর বলতে লাগ্‌লুম্, 'বেশ সেজেচ'। একদিন কালীঘরে আসনে ব'সে মাকে চিন্তা কর্‌চি, কিছুতেই মার মূর্ত্তি মনে আনতে পারলুম্ না। পরে দেখি কি—রমণী বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান্ করতে আস্‌ত, তার মত হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে মা উঁকি মার্‌চে। দেখি হাসি আর বলি—'ওমা, আজ তোর রমণী হ'তে ইচ্ছে হয়েছে—তা বেশ, ঐ রূপেই আজ

পূজো নে।' ঐ রকম করে বুঝিয়ে দিলে—'বেশ্যা ও আমি—আমা ছাড়া কিছু নেই।' আর এক দিন গাড়ী ক'রে মেছোবাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি,—সেজেগুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ্ প'রে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে, আর মোহিনী হ'য়ে লোকের মন ভুলাচ্ছে। দেখে অবাক্ হ'য়ে বল্লুম,—'মা! তুই এখানে এইভাবে রয়েছিস্?'—বলে প্রণাম করলুম।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ১৬৭—১৬৮ পৃষ্ঠা)। এইরূপে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" (দেবী-মাহাত্ম্যম্, ৫।৭৩), "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" (ঈশোপনিষৎ, ১), "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" (কঠোপনিষৎ, ২।২।৯), "ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ" (গীতা, ৬।২৯) প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যের সত্যতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিল। জগৎ বুঝিল, 'একত্ব বা অদ্বৈত' প্রাচীন ঋষিগণের প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য।

হিন্দুশাস্ত্রসমূহ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এই একত্বের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে তৎপর। হিন্দুশাস্ত্র-শিরোমণি বেদান্তদর্শন এবং উপনিষদ্‌সমূহ এই অদ্বৈততত্ত্বের একনিষ্ঠ প্রচারক। জগতের ধর্ম্মা-চার্য্যগণ সমস্বরে এই সমদর্শনকে ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্ম্মমত সাধন করিয়া উহাদের চরমলক্ষ্যে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন—"সব শিয়ালের এক রা।" বর্ত্তমান যুগে জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া এবং যুক্তিজাল মানুষকে বহির্মুখী করিয়া তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস মানুষের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছিল। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রেই নিবদ্ধ ছিল। আধ্যাত্মিক অনুভূতি এ যুগে অবিশ্বাসের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। "শ্রীরামকৃষ্ণরূপ প্রদীপ ইহাকে পুনঃ প্রকাশ করিল।" তাঁহার সাধনালোকে সকল ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অনুভূতি—'অদ্বৈত' উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে অদ্বৈতাবস্থায় আরূঢ় হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য-গণের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার কৃপায় ধর্ম্মরাজ্যের এই উচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। মানুষের ভিতরে ধর্ম্মভাব সঞ্চারণের আশ্চর্য্যশক্তি তাঁহার মধ্যে বিকাশলাভ করিয়াছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে তদীয় জীবন-বেদভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন—"কাশীপুরের বাগানে বহুকাল ব্যাধির সহিত সংগ্রামে ঠাকুরের শরীর যখন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাঁহার অন্তরের ভাব ও শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—মা দেখিয়ে দিচ্চে কি যে, (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর এখন এমন একটা শক্তি এসেছে যে, এখন আর কাহাকেও ছুঁয়ে দিতেও হবে না, তোদের বলবো ছুঁয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাতেই অপরের চৈতন্য হ'য়ে যাবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ২১৫ পৃষ্ঠা)। আধ্যাত্মিকতা সংক্রমণের এমন শক্তি জগতের শক্তিশালী ধর্ম্মাচার্য্যগণের জীবনে তিহাসেও দেখা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পর্কে আসিয়া তদীয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ অদ্বৈততত্ত্বে কিছুমাত্র বিশ্বাসবান ছিলেন না। নিরাকার সগুণ ব্রহ্মকে তিনি দ্বৈতমতে উপাসনা করিতেন। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে নাস্তিক্যবাদের কোন প্রভেদ তিনি দেখিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তবেদ্য অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দান করিলে, তিনি একদিন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"উহা কি কখন হইতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যাহা কিছু দেখিতেছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর।" একদিন নরেন্দ্রনাথ এবং হাজরা মহাশয় উভয়ে মিলিয়া অদ্বৈত মতবাদ

সম্বন্ধে ঐরূপ হাসি-ঠাট্টা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্দ্ধবাহ্য দশায় তাঁহার পরিধানের কাপড়খানা বগলে লইয়া হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিলেন। ইহার ফলে নরেন্দ্রনাথের যে অবস্থা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন—"ঠাকুরের ঐ দিনকার অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্ত্তমধ্যে আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্য সত্যই দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই নাই। ঐরূপ দেখিয়াও কিন্তু নীরব রহিলাম, ভাবিলাম—দেখি, কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ভাব থাকে। কিন্তু সেই ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমিল না। বাটীতে ফিরিলাম, সেখানেও তাহাই, যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম, সকলই তিনি, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন করিতেছেন, সে সকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। * * এইরূপ খাইতে, শুইতে, কলেজে যাইতে, সকল সময়ই ঐরূপ দেখিতে লাগিলাম এবং সর্ব্বদা যেন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম। * * ঐরূপে কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম, উহাই অদ্বৈতজ্ঞানের আভাস। তবে ত শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা নয়। তদবধি অদ্বৈততত্ত্বের উপর আর কখন সন্দিহান হইতে পারি নাই।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ১৩৬—১৩৭ পৃষ্ঠা)।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পর্শমাত্রে নরেন্দ্রনাথ 'অদ্বৈততত্ত্ব' নিজ জীবনে প্রত্যক্ষানুভব করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের আলোকে তিনি উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দরূপে বেদান্ত প্রতিপাদ্য 'অদ্বৈত'কে ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত 'রাজযোগে' তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—

"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

বাহ্যিক ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, ইহার মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

ইহাই ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।"

মানবাত্মার ব্রহ্মভাব ব্যক্তকরারূপ মহান্ লক্ষ্য সাধনায় জগতের নরনারীকে প্রবুদ্ধ করিতে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তশক্তি ও জ্ঞানের অফুরন্ত উৎসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অব্যক্তভাবে সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত অথবা মানুষ মাত্রই স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বরূপ, এই জ্ঞানে মানুষ প্রবুদ্ধ হইলে তাহার আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভিকতা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক দল ক্ষমতাপ্রিয় ধূর্ত্তলোকের কৌশলে জগতের অধিকাংশ নরনারী প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা-চক্রে আবর্ত্তিত হইয়া আপনাদিগকে দীন হীন পাপী তাপী ও দুর্ব্বল মনে করিয়া দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার গুরুভারে নিষ্পেষিত হইতেছে। তাহারা যদি তাহাদের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপের সন্ধান পাইত, তাহা হইলে জগতের অনেক সমস্যা দূরীভূত হইত। আত্মার অনন্ত শক্তিমত্তা এবং অমিত বীর্য্যবত্তায় বিশ্বাস—আপনাতে বিশ্বাস, মানুষের সকল উন্নতির মূল। এই জগৎ যে সকল মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আজও গৌরবান্বিত, তাঁহাদের সকলেরই অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়—যে সকল জাতি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-

পরায়ণ, তাহারাই বীর্য্যবান ও শক্তিমান বলিয়া পরিচিত এবং তাহাদের দ্বারাই জগতে মহৎকার্য্য-সমূহ সংসাধিত হইয়াছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বে কেহ বা একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ এবং কেহ বা একটী প্রকাণ্ড তরঙ্গরূপে রূপায়িত, কিন্তু উভয়ের পশ্চাতে যেমন অপার অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, তেমন প্রত্যেক মানুষের পশ্চাতে অবস্থিত আছেন অনন্ত শক্তি ও বীর্য্যের ভাণ্ডার আত্মা। প্রত্যেক মানুষ তাহার অভ্যন্তরস্থিত এই অব্যক্ত অফুরন্ত শক্তির উৎসের সন্ধান পাইলে তাঁহা হইতে যদৃচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিয়া মহাশক্তির অধিকারী হইতে পারে। 'অদ্বৈততত্ত্ব' জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের সকল নরনারীকে এই শক্তির সন্ধান দেয়। এই জন্য স্বামী-বিবেকানন্দ আত্মবিশ্বাসহীন ভারতীয় নরনারীর উন্নয়নের জন্য এই মতবাদের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

অদ্বৈত বা একত্ব সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড সমষ্টিরূপে দেখিতে শিখায়। আধুনিক বিজ্ঞানও শিক্ষা দেয়—জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম প্রভৃতি 'সকল মানবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা' (inter-dependence of all men) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের গতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি দূরের কথা, কোন জাতি বা দেশ, অপর কোন জাতি বা দেশ সম্বন্ধে অনন্যনিরপেক্ষ (exclusive) হইয়া এ যুগে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে চলিতে অসমর্থ। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওষ্ট-ওয়াল্ড, পোইনকেয়ার্ এবং আইনষ্টিন পরিদৃশ্যমান জগতের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর যান্ত্রিক সম্বন্ধ (organic relation of all physical phenomena) স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণ জড় ও চেতনের ঐক্য (unity of matter and energy) প্রমাণ করিয়াছেন। এইরূপে জড়-বিজ্ঞানের গতিও ক্রমেই অদ্বৈত বা একত্বের দিকে প্রধাবিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের এবং এক জাতির সঙ্গে অন্যান্য জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিগত সম্পর্ক অলঙ্ঘনীয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র উচ্চশিক্ষা বিস্তার, যাতায়াতের সুবিধা এবং ভাবের আদান প্রদান যতই অধিক হইবে, বিভিন্ন দেশের অধিবাসি-বৃন্দের মধ্যে এই সম্পর্ক ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এক দেশের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমর-নীতি প্রভৃতি অন্যান্য দেশকে অল্পাধিক প্রভাবা-ন্বিত করে বলিয়া প্রয়োজনের তাড়নায় এই সকল বিষয়কে সকল দেশের হিতার্থে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ (League of Nations) গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তির, এক জাতির সঙ্গে অন্যান্য জাতির এবং এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সর্ব্ববিধ সম্পর্ক প্রধানতঃ ভোগাদর্শের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মহান্ উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়াছে। মানবাত্মার একত্ব ও অভেদত্বের আদর্শ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক হইলে জগতের নরনারী আপন আপন ভোগস্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাকিয়া পৃথিবীকে মানুষের বাসস্থানের অযোগ্য করিয়া তুলিত না। উপনিষৎ বলেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
—ঈশ উঃ, ৬।

'যিনি আত্মাতেই অর্থাৎ আপনা হইতে অভিন্ন-ভাবে সমুদয় সৃষ্ট পদার্থকে দর্শন করেন এবং সর্ব্ব পদার্থে আত্মস্বরূপ অনুভব করেন, তিনি কাহাকেও দ্বেষ বা ঘৃণা করিতে পারেন না।' কারণ, এরূপ-স্থলে অপরের অনিষ্ট করা এবং অপরকে হিংসা করা আর আপনি আপনার অনিষ্ট করা এবং আপনি আপনাকে হিংসা করা একার্থবোধক হইয়া দাঁড়ায়।

অদ্বৈতবাদ—একমাত্র অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম। "সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র", "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু", "সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ", "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ", "মা হিংস সর্ব্বভূতানি", "Love thy neighbour as thyself", "Do as you wish to be done by" প্রভৃতি সর্ব্বজনস্বীকৃত নীতিবাক্যের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই পঞ্চমুখ। কিন্তু মানুষ কেন এই উপদেশ মান্য করিবে, তৎসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইতে অনেক সম্প্রদায় অসমর্থ। শাস্ত্র বা মহাপুরুষের উপদেশ বলিয়া কোন নীতি মানিয়া লওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। আর এইরূপ নীতিপরায়ণ হইয়াই বা মানুষের লাভ কি? সকলেই "সর্ব্বত্র সমদর্শন"কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কিন্তু ইহাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা অনেকের নিকট ভীষণ বিভীষিকা। তাঁহারা বলেন—ইহা অতি উচ্চস্তরের মানুষের উপযোগী, সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। জিজ্ঞাসা করি, কোন আদর্শের বিপরীত দিকে চলিয়া কি মানুষ সেই আদর্শলাভে কখনও সমর্থ হয়? কাদা দিয়া কি কাদা ধোয়া যায়? যাঁহারা সমদর্শনের মৌখিক মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াও কার্য্যতঃ ইহার বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নহে। উদ্ধৃত উপদেশসমূহকে বেদান্ত শুধু উৎকৃষ্ট নীতি বলিয়া প্রচার করে না, অধিকন্তু সকল মানুষকে এই 'সমদর্শনে' সম্যক্-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"জীবে দয়া - জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট—তুই জীবকে দয়া কর্‌বি! দয়া কর্‌বার তুই কে? না, না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)। এই কথার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ এক অদ্ভুত আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই আলোকে তিনি "নর-নারায়ণ" সেবা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন। অদ্বৈত জ্ঞানাশ্রিত এই "নর-নারায়ণ"-সেবার যথাযথ অনুশীলন জগতের নর-নারীকে সর্ব্ববিধ ভেদ-বৈষম্যের পারে লইয়া যাইতে সক্ষম।

বর্ত্তমান জগৎ ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক দিয়া ভেদ-বৈষম্য-অনৈক্য-বিরোধ-অসামঞ্জস্যের লীলা-ভূমি। ইদানীং পৃথিবীর স্থানে স্থানে ধর্ম্মমত-বিশেষ ধর্ম্ম অপেক্ষাও বড় হইয়া জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ, লুণ্ঠন ও নরহত্যার প্রশ্রয় দিয়া ধর্ম্মের নামে মানুষের অশ্রদ্ধা আনয়ন করিয়াছে। ধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত। বর্ণভেদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যভেদ, ভোগাধিকারভেদ, ধনবান ও দরিদ্রের এবং জমিদার ও প্রজার স্বার্থভেদ তীব্র আকার ধারণ করিয়া মানুষের সুখ-শান্তি হরণ করিয়াছে। এই মহা অনর্থকর অনৈক্য ও বিরোধের মূলোচ্ছেদ করিয়া মানবজাতির মধ্যে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই মানুষের আভ্যন্তর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন। রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্বার্থ মানুষের মধ্যে বাহ্যিক সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার অনুকূল সন্দেহ নাই কিন্তু এই সকল মতবাদ মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। দেখা যায়—কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্য মানুষের মনোরাজ্যে আজও যেমন অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছেন, কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ তদ্রূপ প্রভাব বিস্তার করিতে এ পর্য্যন্ত সক্ষম হয় নাই। মানবজাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—জগতের আদিম অবস্থা হইতে ধর্ম্মজ্ঞানের ক্রম-বিকাশই মানুষের আভ্যন্তর ও বাহ্যিক প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে ক্রমেই অধিকতর উন্নত-সংস্কৃতির অধিকারী করিতেছে। "সকল ধর্ম্মের

শেষ কথা অদ্বৈত" বর্ত্তমান সুশিক্ষিত মানবের ধর্ম্মজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ। ব্যবহারিক দৃষ্টি অবলম্বনে 'ব্যষ্টি' আপনাকে 'সমষ্টি' হইতে পৃথক মনে করিয়াই সর্ব্ববিধ অনৈক্য ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। 'এক'কে আশ্রয় না করিয়া যেমন ব্যবহারের দিক দিয়া 'দুই' দাঁড়াইতে পারে না, তেমন পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। উপনিষৎ বলেন—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

—শ্বেতাঃ উঃ ৬।১১।

এই একত্বের আদর্শ সর্ব্ববিধ ভেদ বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের সকল মানবকে যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করিতে সক্ষম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপদেশ দিয়াছেন—"অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর।" এই গভীর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশের অর্থ সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে মানবজাতির সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধানরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতের সকল নরনারী যদি "অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া" অর্থাৎ "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে পৃথিবী যথার্থই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে। যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনার আলোকে মানুষের এই মুক্তির পথ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শত সমস্যাসমাকুল মানব এই পথে যাত্রা করিলে সে অমৃতত্বলাভ করিবে।

গিরিশ-নাট্য-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বসু, এম্‌-এ, বি-টি

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব বহুরূপে বহুদিকে জগতে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সর্ব্বত্র তাঁহার অমোঘ প্রভাব দিন দিন আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী আজ দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ জগতের স্থায়ী শান্তির একমাত্র উপায় বলিয়া সুধীজন কর্ত্তৃক গৃহীত। পাশ্চাত্য সভ্যতামূঢ় ভারতের কর্ণে তিনি ত্যাগ ও সেবার যে অমৃতমন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের ম্রিয়মান জাতীয় জীবন আবার অনিবার্য্যবেগে সজীব পরিপূর্ণতার পথে ধাবিত হইয়াছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এই বিপুলভাব-প্রবাহ বিরাট ও সুদৃঢ়-প্রসারী পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। এই প্রভাব মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে, কারণ নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রের জীবনে সাক্ষাৎভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহৈতুকী কৃপা অজস্রধারায় লাভ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সাহিত্যিকগণের মধ্যে অধিকাংশই গিরিশচন্দ্র বা স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর ভিতর দিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবে

প্রভাবান্বিত হন। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য অতি অল্প ব্যক্তিরই হইয়াছিল। আমরা এই প্রবন্ধে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র গিরিশ-নাট্যে এই প্রভাব লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিব।

১২৯১ সালে "চৈতন্যলীলা" রচিত হইবার পর হইতেই গিরিশচন্দ্রের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ প্রভাব প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনে সংশয় ও সন্দেহের মহা আলোড়ন চলিতেছিল। পরে তারকনাথের শরণাপন্ন হইবার পর তাহার মানসিক বিক্ষোভের অবসান হয়, এবং গুরুলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা আসে। বিশ্বাস যখন ভক্তিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব গ্রহণের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে, সেই মহা সন্ধিক্ষণে "চৈতন্যলীলা" রচিত হয়। ইহার পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা অদৃশ্যভাবে কার্য্য করিতেছিল কিনা কে বলিবে? শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ৫ই আশ্বিন, ১২৯১ সালে ষ্টার থিয়েটারে "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দর্শন করেন, তাহার পূর্ব্বে দুইবার গিরিশচন্দ্র তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দর্শনের পর হইতে অল্পে অল্পে তাঁহার মনে এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইতে থাকে। চৈতন্যলীলায় প্রেমভক্তির যে অপূর্ব্ব চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার উদ্ভব একমাত্র একান্ত ভক্তের হৃদয়েই সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আসল নকল এক দেখ্‌লাম।" এবং গিরিশচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "তোমার হৃদয়-আকাশে অরুণোদয় হ'য়েছে, নইলে কি চৈতন্যলীলা লিখ্‌তে পারো? শীগ্‌গীর জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাবে।"

গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। চৈতন্যলীলার অসামান্য সাফল্য এবং ইহার পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবের অনুপ্রেরণায় বঙ্গ-নাট্যশালায় বহুকালব্যাপী নাম-ভক্তি-প্রচারের যুগ আরম্ভ হয়। এই হরিনামের যুগে রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিলেও এখানে কেবলমাত্র গিরিশচন্দ্রের নাট্যাবলীর মধ্যেই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই যুগের প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা শেষ হইবার পরও গিরিশচন্দ্রের নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব উত্তরোত্তর গভীরভাবে কার্য্য করিয়াছে। তাই এই নাটকগুলির মূল সুর ধর্ম্মসমন্বয়, ঈশ্বর-নির্ভরতা, প্রেম-ভক্তি বিশ্বাসের প্রাধান্য এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা। এই সকল নাটকের কোন কোনটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁহার সম্পর্কিত অন্য কোনও চরিত্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, কোনটিতে তাঁহার উপদেশবাণী নানাস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কোনটিতে তাঁহার আদর্শকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন, গিরিশের দ্বারা তাঁহার লোক-শিক্ষা কার্য্যের সহায়তা হইবে এবং তাহার জন্য বিশ্বজননীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, আমি আর এত বক্‌তে পারি না, তুই কেদার, রাম, গিরিশ ও বিজয়কে একটু একটু শক্তি দে, যাতে লোকে তাদের কাছে গিয়ে কিছু শেখ্‌বার পর এখানে আসে এবং দু এক কথাতেই চৈতন্যলাভ করে।" এই শক্তি যে গিরিশ পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নাটকগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১২৯১ সালে গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র" অভিনয় দর্শন করেন। অভিনয় শেষে গিরিশের সহিত তাঁহার নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল:—

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বা! তুমি বেশ সব লিখেছো।

গিরিশ। মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমার ধারণা আছে। সেদিন তো তোমায় বল্লাম, ভিতরে ভক্তি না থাক্‌লে চালচিত্র আঁকা যায় না।

* * *

গিরিশ। মনে হয় থিয়েটারগুলো আর করা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না না, ও থাক্‌, ওতে লোক শিক্ষা হ'বে।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

ইহা হইতে অনুমান হয় শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার অদৃশ্য প্রভাব-সহায়ে গিরিশচন্দ্রের দ্বারা লোক-শিক্ষার কার্য্য-নির্ব্বাহ করাইয়া লইতেছিলেন। গিরিশচন্দ্রও তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও বিশ্বাসের বলে সর্ব্বাংশে এই কার্য্যের উপযোগী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "গিরিশের বুদ্ধি পাঁচসিকে পাঁচ আনা। তার বিশ্বাস,ভক্তি আঁকড়ে পাওয়া যায় না।" তিনি ভাবাবেশে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্‌'ন, তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে যাবে।"

গিরিশচন্দ্রের যে কয়খানি প্রধান নাটক শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, এখানে সেই কয়খানির আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় প্রেমভক্তি-মূলক নাটক "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" ১২৯৩ সালের ২০শে আষাঢ় ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর একদিন গিরিশ তাঁহার মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন। ভক্তের চরিত্রটি আরও ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ভণ্ড চরিত্র অঙ্কন করিবার ইঙ্গিত করেন এবং স্বয়ং কপট সাধুদের হাবভাব যথাযথ অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দেন। এই প্রকার লোকের হাবভাব অনুকরণে শ্রীঠাকুরের যে কিরূপ দক্ষতা ছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়াছেন সকলেই জানেন। এই নাটকের "পাগলিনী"র চরিত্র একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি;—সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে ইহার তুলনা নাই বলিলেও চলে। এই চরিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেমোন্মাদ অবস্থার ছায়া পড়িয়াছে। সেই অবস্থায় তাঁহার ঈশ্বর দর্শনের জন্য যেরূপ মর্ম্মান্তিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল, এই ভগবদ্দর্শনব্যাকুলা পাগলিনীর চরিত্রে তাহার আভাস দেখা যায়। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "গিরিশচন্দ্র" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসিবার বহু পরে এক পাগ্‌লী যাতায়াত করিত। শুনা যায়—ইঁহাদের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই পাগলিনী-চরিত্র পরিকল্পনা করেন। সুতরাং দুইদিক দিয়াই এই চরিত্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাব বিদ্যমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন—"সেই মা-ই সব হ'য়ে রয়েছেন"—পাগলিনীর কথার মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। চিন্তামণি তাহাকে বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মাগো, তুই কে? তুই কি সাক্ষাৎ জগদম্বা?"

পাগলিনী—হ্যাঁমা, হ্যাঁ; আমি সেই আবাগী মা, সেই আবাগী, দেখনা মা, সব্ সেই, সব্ সেই।"

বাহুল্যভয়ে এই পাগলিনীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার ঈশ্বরলাভে ব্যাকুলতা, তাহার দিব্যদৃষ্টি ইত্যাদির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা এইখানে শেষ করিতে হইল। এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। পাগলিনীর চরিত্রে যেমন তাঁহার সাধনোন্মাদ অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনই সোমগিরির চরিত্রে তাঁহার অলোকসামান্য গুরুভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যে ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে এই বিল্বমঙ্গল-উপাখ্যানটি গৃহীত, তাহাতে এই সোমগিরির বিষয়মাত্র দুই

তিন ছত্রে অতি সামান্যভাবে বর্ণিত আছে, এবং পূর্ব্বোক্ত পাগলিনীর চরিত্র তাহাতে আদৌ নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ভক্তমালোক্ত উপাখ্যানটি গিরিশচন্দ্রের হস্তে কিরূপ বিস্ময়কর পরিণতি লাভ করিয়াছে। শিষ্যগণের সহিত সোমগিরির শান্ত, প্রেমপূর্ণ ব্যবহার শিষ্যবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। তৃতীয় অঙ্কে তিনি ধর্ম্মের যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে অনুপ্রাণিত। ধর্ম্মের সার কথাগুলি এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করা অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।" সোমগিরিও বলিতেছেন—কামিনী-কাঞ্চন—

এক মায়া, দুইরূপে করে আকর্ষণ;
বিষম বন্ধনে বহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।
ভ্রমি' এ সংসারে, হের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যজি'?
সেই মহাজন
এ-বন্ধন যে করে ছেদন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেহ "গুরু" বলিয়া সম্বোধন করিলে, তিনি বাধা দিয়া বলিতেন, "কে কার গুরু? এক ঈশ্বরই সকলের গুরু, চাঁদামামা আমারও মামা, তোমারও মামা।" গুরু-সম্বোধন শুনিয়া সোমগিরিও বলিতেছেন, "গুরু? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু, গুরু আর কেউ নাই।" অন্যস্থানে পুনরায় শিষ্যগণকে বলিতেছেন—

কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার?
শিব রাম গুরু-শিষ্য দোঁহে দোঁহাকার,
জগদ্গুরু সেই সনাতন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যার তীব্র বৈরাগ্য, তাঁ'র প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। ভগবান ভিন্ন সে কিছু চায় না। খুব বোধ, খুব বৈরাগ্য না হ'লে মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।" এই নাটকে "গিরিশচন্দ্র" এই তীব্র বৈরাগ্যের চিত্র বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কাতরোক্তি "ওই ত ফুরাল দিন, দিন গেল—কই দেখা হ'ল?" শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল ক্রন্দন স্মরণ করাইয়া দেয়—"মা, আর একটা দিন বৃথা কেটে গেল, এখনও দেখা দিলি না!' রাখালবেশী কৃষ্ণ বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণ-ব্যাকুলতার যে বর্ণনা দিয়াছে, তাহা আমরা শ্রীঠাকুরের সাধকজীবনে দেখিতে পাইয়াছি,—"কখনও মুখ রগড়ায়, কখনও ঢিপ ক'রে মাটিতে পড়ে, কখনও চুল ছেঁড়ে।" শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "গিরিশ-প্রতিভা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, "'চৈতন্যলীলা'য় যাহা অঙ্কুর, 'বিল্বমঙ্গলে' তাহা মহীরুহ।.. দক্ষিণেশ্বরে গিয়া গিরিশ প্রথমেই ঠাকুরকে বলেন, 'আমি উপদেশ শুনিব না, উপদেশ নিজেই অনেক লিখিয়াছি, আমায় কিছু করিয়া দিন।' সেই করিয়া দেওয়ার প্রভাবেই 'বিল্বমঙ্গল' অপূর্ব্ব গ্রন্থ।"

বিল্বমঙ্গলের এই ব্যাকুলতা, এই তীব্র বৈরাগ্য, গিরিশচন্দ্র তাঁহার "রূপ-সনাতন" নাটকে সনাতনের চরিত্রে প্রকটিত করিয়াছেন। এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের প্রভাব লক্ষিত হয়। সনাতন গঙ্গাতীরে ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছেন, "মা, আমায় হরিপাদপদ্মে মতি দাও—আমায় বৈরাগ্য দাও।"—ঠিক যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাতর প্রার্থনা করিতেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য ঈশান সনাতন-পত্নীকে বলিতেছে, "গঙ্গার তীরে ধূলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি, আর 'গৌরাঙ্গ' 'গৌরাঙ্গ' ব'লে চীৎকার! একেবারে উন্মত্ত।" এরূপ অবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনে প্রায়ই লক্ষিত হইত।

ত্যাগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্থ বা ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না। অজ্ঞাতে ধাতুস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া যাইত, এবং
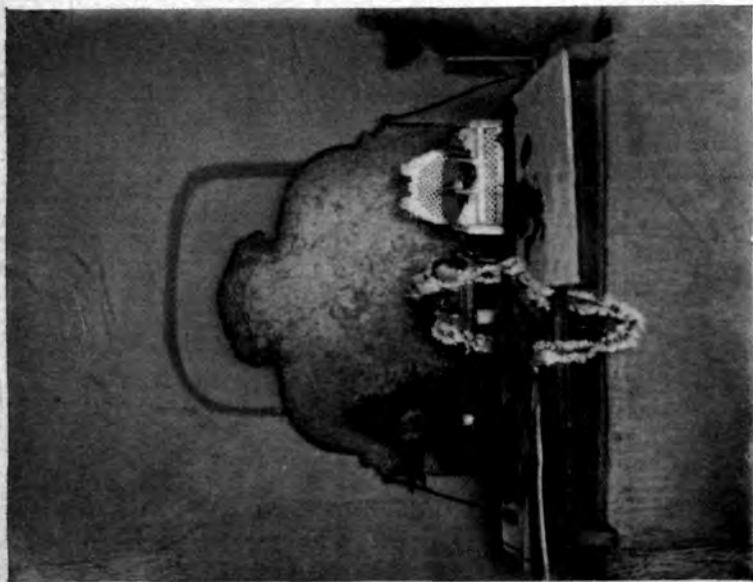
শ্রীশ্রীরঘুবীর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন [৩৮ পৃঃ ও ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য]।
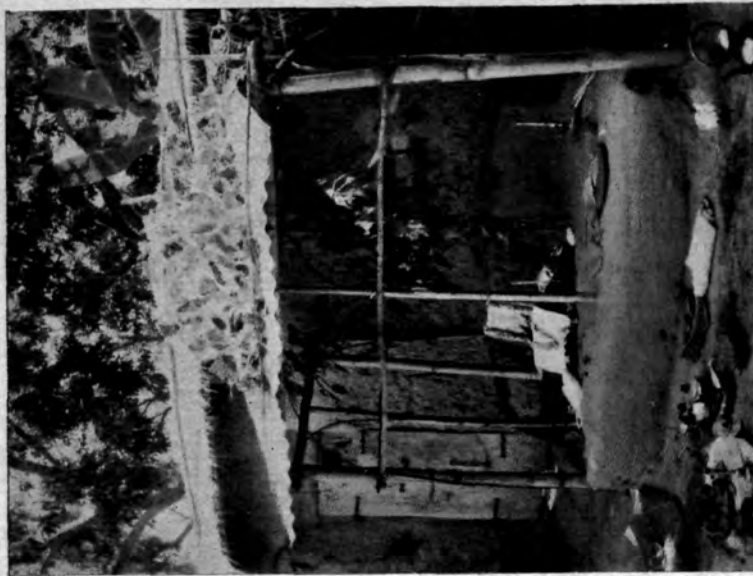
তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে বাহির হইবার সময় ঈশান সনাতনের অলক্ষ্যে পাথেয়স্বরূপ কয়েকটি মোহর একটি ছেঁড়াকাঁথার মধ্যে লুকাইয়া লইয়াছিল। কাঞ্চন-ত্যাগী সনাতন না জানিয়াও বিষম অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, "ঈশান, আমার পায়ে কে যেন শৃঙ্খল দিয়ে টান্‌ছে, আমি চল্‌তে পারছি নি; আমি মহাপ্রভুর দর্শনে যাত্রা করেছি, আমার এ ভাব কেন? ঈশান, তুমি কাছে এলে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যায়; তোমার কাঁথার পানে চাইতে আমার ভয় করে; বোধ হয় এ কাঁথাখানি অতি অপবিত্র।"

এই নাটকে চৈতন্যদেবকর্তৃক ভক্তপদধূলি-গ্রহণ-দৃশ্য দেখিয়া কোনও কোনও গোস্বামী বিরক্ত হইয়াছিলেন। দৃশ্যটিতে এইরূপ কথাবার্ত্তা আছে:—

"২য় বৈষ্ণব। প্রভু করছেন কি?

চৈতন্যদেব। আমি কৃষ্ণ-বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ অঙ্গে ধারণ করছি, ভক্তের কৃপা হ'বে।"

গোস্বামিগণের বিরক্তিতে বিচলিত না হইয়া গিরিশচন্দ্র দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি যে স্বচক্ষে পরমহংসদেবকে ভক্তপদধূলি গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত, ঈশ্বর সর্ব্বদা মঙ্গলময়—তাদের মনে থাকে, হাজার বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না।" গিরিশচন্দ্র তাঁহার "পূর্ণচন্দ্র" নামক নাটকে শ্রীঠাকুরের এই বাণীটিকে প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বাদশবর্ষ নিভৃতে শিক্ষাদানের পর সালিবান-মহিষী পুত্রকে সংসার-প্রবেশের পথে এই সত্য বুঝাইয়া দিতেছেন,—

"ঈশ্বর-প্রত্যয়
একমাত্র আশ্রয় সংসারে;
সে প্রত্যয় জীবনের ধ্রুবতারা যার,
কূল পায় এ দুস্তরে লক্ষ্য রাখি তায়;"

তরুণ যুবক পূর্ণচন্দ্র এই ঈশ্বর-প্রত্যয় সার করিয়া নানারূপ পীড়ন ও কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া সগৌরবে পরম অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হইল। সংসারের কোনও কলুষ, কাম-কাঞ্চনের কোনও প্রভাব তাহার চিত্ত স্পর্শ করিতে পারিল না। আকুমার ব্রহ্মচারী, এই বাল-সন্ন্যাসী গুরুর আদেশে সুন্দরার সহিত সহবাসেও যোগভ্রষ্ট হয় নাই। দাম্পত্য-জীবনকে দেহের সম্পর্ক হইতে আত্মার সম্পর্কে উন্নীত করিয়া পূর্ণচন্দ্র যেন শ্রীঠাকুরের দাম্পত্য-জীবনের আভাস দিতেছে। বিল্বমঙ্গলের ন্যায় পূর্ণচন্দ্রকে কোনও পূর্ব্বসংস্কার অভিভূত করে নাই। শ্রীঠাকুর বলিতেন, "নূতন হাঁড়ির দই সহজে নষ্ট হয় না।"

পুরাণের মদালসার উপাখ্যান হইতে গৃহীত—"বিষাদ" নামক নাটকের বিষয়বস্তুও গিরিশের হস্তে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষভাবে প্রকটিত। "ঈশ্বর মঙ্গলময়"—এই সত্য "পূর্ণচন্দ্রে"র ন্যায় এই নাটকটিরও মূলসূত্র। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের ক্ষেত্রে যে মাতৃ-উপদেশ সংসার-প্রবেশের প্রারম্ভে শ্রুতিমাত্রই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল; অলর্কের ক্ষেত্রে মাতার শেষ উপদেশবাণী এত শীঘ্র কার্য্যকরী হয় নাই। এখানে অলর্কের ভোগ-নিমগ্ন জীবনের অশুভ সংস্কার সমূহই বৈরাগ্য-উদয়ের পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীঠাকুর বলিতেন, "রশুনের বাটি হাজার ধুলেও গন্ধ থাকে।" রাজবয়স্যরূপী বিষয়-বিরাগী সুবাহুর নিম্নোক্ত উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের প্রতিধ্বনিমাত্র—"তাঁর ভাব কোটিকল্প চিন্তা ক'রে কেউ বুঝতে পারে না। তবে যদি কেউ সোনাকে ধূলা জ্ঞান করে, পরস্ত্রীকে মা ভাবে, কেউ যদি আপনাকে দীন বিবেচনা করে, তবে সে-ই দীননাথের কৃপায় বুঝ্‌তে পারে।"

"পূর্ণচন্দ্র" ও "বিষাদ" উভয় নাটকের মধ্যেই এই কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের বাণী মূল-সুররূপে ঝঙ্কৃত।

"নসীরাম" নাটকটি গিরিশচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর মধ্যে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ অবস্থার ছায়া পড়িয়াছে, তেমনই নসীরাম-চরিত্রে এবং পরে "কালাপাহাড়ে"র চিন্তামণির চরিত্রে শ্রীঠাকুরের ভাবময় অবস্থার আংশিক প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত এই দুইটি নাটকে একই ভাবধারা অব্যাহত রহিয়াছে,—ফলে নসীরামের অনেক কথাই চিন্তামণির মুখে পুনরুচ্চারিত হইয়াছে। পাপী, তাপী, দীনদুঃখীর উদ্ধারের জন্য নসীরামের আগ্রহ চিন্তামণির মধ্যে পূর্ণতর পরিণতি লাভ করিয়াছে। নসীরামের অনেক উক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর প্রতিধ্বনি, অথবা তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত। নসীরাম অনাথনাথকে বলিতেছেন,—"চাইবার মত একটা জিনিষ দেখিয়ে দাও, পাই না পাই তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব ভুয়ো। সুন্দরী ছুঁড়ী, পুড়ে ছাই হ'বে; লোকজন কোথায় যাবে তার ঠিকানা নেই। টাকাকড়ি, আজ বলছো তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে তার। না যদি খরচ কর তো দু'হাতে দু'মুঠো ধূলো ধরনা কেন, বল, এই আমার টাকা, এই আমার টাকা।" ইহা যেন শ্রীঠাকুরের "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বিচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা—মায়ের উপর আপনার সম্পূর্ণভার ছাড়িয়া দেওয়া—নসীরামেরও প্রধান ভাব। নির্ভরশীলতার লক্ষণ, ভয় ও ভরসার অতীত হওয়া। নসীরাম বলিতেছেন, "ও ভয়-ভরসা দু'শালাই শত্রু। তোমার ভয়েও কাজ নেই, ভরসায়ও কাজ নেই। আর কথারও কাজ নেই। আয় হরি হরি করি।" পতিতা সোনাকেও নসীরাম আত্মসমর্পণযোগ শিখাইতেছেন, "সেই বেটার উপর ফেলে দে, আর তোর যাই খুসি ক'রে বেড়া।" এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের উপর গিরিশচন্দ্রের "বকল্‌মা" দেওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অহেতুক করুণাবশে থিয়েটারের পতিতা অভিনেত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "তোর চৈতন্য হোক্।" সেইরূপ নসীরামের মধ্যেও পতিতাকে উদ্ধার করিবার মহৎ প্রয়াস দেখিতে পাই। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় পতিতা সোনারও হৃদয় হরি-ভক্তিতে গলিয়া গেল। সে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিল।

অবতার-পুরুষ নর-নারীর বহু জন্মার্জ্জিত পাপ-তাপ হরণের জন্যই আগমন করেন, এইরূপ শাস্ত্রের উক্তি। শ্রীচৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যীশুখৃষ্ট পাপীদের জন্য আপন শোণিত দান করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও শরণাগত অসংখ্য নর-নারীর পাপ, তাপ, জ্বালা স্বশরীরে গ্রহণ করিয়া আপনার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যথাহারী অবতার-পুরুষের আদর্শেই "কালাপাহাড়ে'র চিন্তামণির চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। চিন্তামণি সকলের অন্তরের কথা জানে, তাই সকলের গোপন দুঃখ-পাপ হরণ করিয়া সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য সে ব্যাকুল। মদমত্ত শক্তি-স্পর্দ্ধিত ধর্ম্ম-দ্রোহী কালাপাহাড়কেও সে বলিতেছে, "তোমার জ্বালা আমায় দাও।" পাপকর্ম্মের স্মৃতিতে জর্জ্জরিত বীরেশ্বরকে আশ্বাস দিতেছে, "ভয় কি, তোমার পাপ আমায় দাও।" প্রতিহিংসানল-দগ্ধ চঞ্চলাকে ডাকিয়া বলিতেছে, "ওরে যাস্‌নে যাস্‌নে। দে, দে, তোর জ্বালা আমায় দে।"

একদা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সংশয়-ব্যাকুল নরেন্দ্রনাথ যখন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "মহাশয়, ঈশ্বর কি আছেন?" তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যেরূপ তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, ঈশ্বর ইহা

হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্তু। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইচ্ছা কর, তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পারো।' নিম্নলিখিত কথোপকথন ইহারই প্রতিরূপ :—

কালাপাহাড়। মহাশয়, ঈশ্বর আছেন ?

চিন্তামণি। খুব আছে, সত্যি আছে, তিনি সত্যি আছে। আর কিছু আছে কি না জানিনে।

* * * *

কালা। কোথায় ঈশ্বর ?

চিন্তা। তোমার কাছে, অন্তরে অন্তরে,—সর্ব্বত্রে। এই যে হৃদয়েশ্বর, এই যে আমার হৃদয়ে।

এই নাটকে অষ্টসিদ্ধ পুরুষ বীরেশ্বরকে চিন্তামণি যাহা বলিতেছে, তাহা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণেরই উক্তি।—"তুই সিদ্ধি বস্তু কি ছাই নিলি ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ভগবান কোথায়, একবার খুঁজলি নি ?" এই সিদ্ধাই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "চাইবার জিনিষ থাকতে বাজার বাড়ী গিয়ে লাউ-কুমড়ো মেগে আন্বো কেন ?" এই অসার বস্তু পাইয়া মোহান্ধ ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে। চিন্তামণি বীরেশ্বরের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলে তাহার অজ্ঞান দূর হইল —দিব্য-দৃষ্টি লাভ হইল। অবতার-পুরুষের অযাচিত কৃপা ও অন্যের পাপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে পবিত্রাণ করা গিরিশচন্দ্র স্বীয় জীবনেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপায় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি চিন্তামণিকে দিয়া ইমানকে বলাইতেছেন, "তুই জানিস্ নি, ঈশ্বরের নাম নিলে পাপ দূর হয়, —তবে আর পয়গম্বর এসেছিল কেন ? কার জন্য দেহ-যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছিল ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য-প্রীতি ও শিশু-বাৎসল্য লেটো এবং দুলাল—এই দুই চরিত্র অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আমি এখানে একটিমাত্র স্নেহ-মধুর দৃশ্যের উল্লেখ করিতেছি,—যেখানে দুলাল চিন্তামণিকে মালা পরাইয়া এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দিতে চাহিতেছে এবং চিন্তামণি সেই অবোধ বালককে আদর করিতেছেন। এ দৃশ্য দর্শনে লেটোর নয়ন অশ্রু-সজল। সরল শিশু বলিতেছে, "তুমি হরি, মাকে বলবো, যদি দেখতে চায়, দেখা দিয়ো।' এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্রই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার করেন।

সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত, তত পথ" বাণীও এই নাটকে বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। চিন্তামণি বলিতেছেন—

"যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি,
বোঝায় সলিলে, সেইমত আল্লা, গড্,
ঈশ্বর, যিহোবা, যীশু নামে নানাস্থানে
নানা জনে ডাকে সনাতনে। ভেদ-জ্ঞান
অজ্ঞান লক্ষণ, ভেদ-বুদ্ধি কর দূর।"

"জনা", "পাণ্ডব-গৌরব", "বুদ্ধদেব", "মনের মতন', "স্বপ্নের ফুল' প্রভৃতি নাটকে এবং পরবর্ত্তী সামাজিক নাটকগুলিতেও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু বাহুল্যভয়ে এই নাটকগুলি লইয়া আর আলোচনা করিব না। শুধু "জনা" ও "পাণ্ডবগৌরব" সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাসের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা বলিবার সময় বলিতেন, "রামচন্দ্র, যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তা'র সেতুর দরকার নেই।" এই জ্বলন্ত বিশ্বাস "জনার" বিদূষকে এবং আরও উজ্জ্বলতরভাবে "পাণ্ডব-গৌরবে"র কঞ্চুকী-চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে।

ভক্ত গিরিশচন্দ্রের জীবন রামকৃষ্ণময় ছিল। সুতরাং তাঁহার নাটকাবলী যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু এই ভাবরাশি তাঁহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; বিরাট বিদ্যুতাধারের ন্যায় এই অদ্ভুত ভক্ত-হৃদয় হইতে নানাভিমুখী ভাব-প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। নাট্য-গুরু গিরিশচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে সমসাময়িক নট-নটী, নাট্যকার ও নাট্য-রসিক একত্রিত হন, তাঁহাদের মধ্যে এই ভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং বাংলার রঙ্গ-মঞ্চ লোক-শিক্ষার বাহনরূপে যে প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, এবং এখনও যে সে ধারা অনেকাংশে অব্যাহত আছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। পরে অবশ্য ক্রমবিবর্দ্ধমান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনগুলির সহায়তায় বঙ্গ-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসাবে লোক-শিক্ষক গিরিশচন্দ্র চিরদিনই আমাদের নমস্য। শ্রীঠাকুরের অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে,—তাঁহাকে দেখিয়া সকলে অবাক্ হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।*

* এই প্রবন্ধটি শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সরিষা "বিবেক-ভারতী সাহিত্য-সংসদে" পঠিত। এই প্রবন্ধ রচনায় আমি শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "গিরিশচন্দ্র" এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের "গিরিশ-প্রতিভা" হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধি

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

বেদ হইতে অদ্বৈততত্ত্বের সন্ধান পাইবার পর যুক্তির দ্বারা সেই অদ্বৈততত্ত্বের সম্ভাবনা সিদ্ধির জন্য ঋষিগণ ও আচার্য্যগণ অনুমানাদি প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন। যেহেতু সেই অনুমানাদি প্রমাণ, বেদ হইতে অদ্বৈতের সন্ধান পাইবার পর অদ্বৈতসিদ্ধির জন্য নহে, কিন্তু বেদ হইতে অদ্বৈতের সন্ধান পাইবার পর দ্বৈতের মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্য, আর তাহার ফলে অদ্বৈতসিদ্ধির জন্য। ইহার কারণ দ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়া যদি সিদ্ধ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বৈত মিথ্যা হইলেই অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার কারণ, মিথ্যা দ্বৈতের অধিষ্ঠানরূপে একটী অদ্বৈত বস্তুর সম্ভাবনাই সিদ্ধ হয়। মিথ্যার অধিষ্ঠান আর মিথ্যা হয় না, কিন্তু একটী সত্যই হইয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, সেই সর্প ও তাহার জ্ঞান উভয়ই মিথ্যা হয়, কিন্তু তাহার অধিষ্ঠান রজ্জু, অর্থাৎ রজ্জু-অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, তাহা সত্যই হইয়া থাকে। এইরূপে এই দ্বৈতজগৎরূপ মিথ্যা প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে সত্য এক অদ্বৈত ব্রহ্মই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অবশ্য এই সিদ্ধিতে সংশয় একেবারে যায় না, আর এই জন্যই আবার বেদেরও আবশ্যকতা হয়। কারণ, সেই অধিষ্ঠানটী সত্য হইলেও তাহা এক কি বহু, তাহা শক্তিমান্ কি শক্তিশূন্য, তাহার নিশ্চয় হয় না। এই কারণে এই জগন্মিথ্যাত্বানুমানের দ্বারা অদ্বৈতের সম্ভাবনা সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং অদ্বৈতসিদ্ধির বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কের খণ্ডনও করিতে পারা যায়। এ জন্য অদ্বৈতসিদ্ধিতে যুক্তিপ্রমাণ একেবারে ব্যর্থ নহে। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় তাঁহার "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক গ্রন্থে

বেদবোধিত এই অদ্বৈতের সিদ্ধি করিবার জন্য অনুমানদ্বারা জগন্মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। এ জন্য তিনি উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে অদ্বৈতসিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব এখন দেখা যাউক, উক্ত গ্রন্থে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব কিরূপে সিদ্ধ করা হইয়াছে।

দ্বৈতমিথ্যাত্ব সাধক অনুমান

"অদ্বৈতসিদ্ধি" গ্রন্থে দ্বৈতের মিথ্যাত্বসাধক অনুমান যেরূপ করা হইয়াছে তাহা, এই—

প্রপঞ্চ মিথ্যা··　·　(প্রতিজ্ঞা)

যেহেতু তাহা দৃশ্য জড় পরিচ্ছিন্ন ও অংশ (হেতু)

যেমন শুক্তি-রজত　(উদাহরণ)

অর্থাৎ যাহাই দৃশ্য হয় তাহাই শুক্তি-রজতের ন্যায় মিথ্যা হয়। এইস্থলে প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ—এই বিশ্বচরাচর, ইহা এই অনুমানের পক্ষ। অর্থাৎ "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্ যেহেতু ধূম রহিয়াছে, যেমন "মহানস" এই অনুমানে পর্ব্বতটী যেমন পক্ষ, এস্থলে প্রপঞ্চও তদ্রূপ পক্ষ। মিথ্যাত্বটী এস্থলে সাধ্য, অর্থাৎ উক্ত "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্" এই অনুমানে বহ্নি যেমন সাধ্য, এস্থলে মিথ্যাত্বটীও তদ্রূপ সাধ্য। তাহার পর দৃশ্যত্ব জড়ত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অংশিত্ব গুলি এক একটী পৃথক্ হেতু। অর্থাৎ উক্ত "পর্ব্বতটী বহ্নিমান" এই অনুমানে ধূম যেমন হেতু, এ স্থলেও তদ্রূপ দৃশ্যত্ব জড়ত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব ও অংশিত্বও তদ্রূপ এক একটী হেতু। তাহার পর শুক্তি-রজত এস্থলে উদাহরণ-বাক্যের অন্তর্গত দৃষ্টান্ত; অর্থাৎ যেমন "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্" অনুমানে মহানসটী উদাহরণ-বাক্যের মধ্যে দৃষ্টান্ত, এস্থলেও তদ্রূপ শুক্তি-রজতটী উদাহরণ বাক্যের অন্তর্গত দৃষ্টান্ত। এই অনুমানের দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অর্থাৎ দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে সেই মিথ্যার অধিষ্ঠানরূপ অদ্বৈত একটী সত্য বস্তু বলিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শুক্তি রজতের অধিষ্ঠান শুক্তি অর্থাৎ শুক্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য যেমন সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, এ স্থলেও তদ্রূপ মিথ্যা দ্বৈত বা বিশ্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান-চৈতন্য যে অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু, তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অদ্বৈতের অনুমানসিদ্ধত্বাপত্তি

যদি বলা হয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বেদ ভিন্ন কোন প্রমাণদ্বারাই অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি কেহই অদ্বৈতকে প্রমাণিত করিতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে প্রমাণ-প্রমেয়রূপে দ্বৈতই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু এখন আবার পরম্পরাক্রমে অনুমানকে অদ্বৈতের সাধক বলা হইতেছে কেন? কারণ, দ্বৈত-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমিত হইলে, মিথ্যা দ্বৈতের অধিষ্ঠানরূপে অদ্বৈতই সিদ্ধ হয়—ইহাও অনুমানের দ্বারাই ত সিদ্ধ হইতেছে, কারণ, এস্থলে অনুমান করিব—মিথ্যার অধিষ্ঠান যেমন সত্য, তদ্রূপ মিথ্যাদ্বৈতের অধিষ্ঠান অদ্বৈতও সত্য। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধি অনুমান দ্বারাই সাধিত হইল। সুতরাং ইহাতে ত স্ববিরোধী কথাই বলা হইল, অনুমানদ্বারা দৃশ্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিয়া সেই মিথ্যার অধিষ্ঠানরূপে অদ্বৈতসিদ্ধ হয় বলিলেও অনুমানদ্বারাই অদ্বৈতের সিদ্ধি হইয়া গেল। অতএব বেদভিন্ন অদ্বৈত জানা যায় না—এ কথা ত সঙ্গত হয় না।

অদ্বৈতের অনুমানসিদ্ধত্বরূপ আপত্তির নিরাস

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহাতে স্ববিরোধী কথা বলা হয় নাই। বেদ ভিন্ন অদ্বৈতসিদ্ধ হয় না —এই কথাই সত্য। কারণ, বেদ ভিন্ন অসঙ্গ অদ্বৈত অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত জানা যায় না, কিন্তু দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতির অদ্বৈত জানিবার

বাধা হয় না। এই জন্য বলা হয়—বেদ হইতে অদ্বৈতবাদীর সেই অসঙ্গ অদ্বৈতের সন্ধান পাইয়া অনুমানাদির দ্বারা তাহার সম্ভাবনা সিদ্ধ করা হয়, বা তাহার বিরুদ্ধতর্কের খণ্ডন করিয়া তাহার পুষ্টি-সাধন করা হয় মাত্র। বেদ ভিন্ন অনুমানাদি কোন প্রমাণই অসঙ্গ অদ্বৈতের সন্ধান দিতে পারে না। যেহেতু তাহারা সম্বন্ধজন্য বা সম্বন্ধজ্ঞানজন্য হয়। আর যাহার জ্ঞান না থাকে অর্থাৎ যাহার সন্ধান পর্য্যন্তও না থাকে, তাহাকে অনুমানের সাধ্য করিয়া সিদ্ধ করা যাইবে কি করিয়া? এবং তাহার সহিত ব্যাপ্তি, অর্থাৎ সাধ্য ও হেতুর নিত্যসম্বন্ধই বা কি করিয়া স্থির করা যাইতে পারে? এই জন্যই বলা হইয়াছে, বেদ হইতে অদ্বৈতের সন্ধান পাইলে অনুমানদ্বারা তাহাতে সংশয় বিপর্য্যয় দূর করা হয়, এবং তজ্জন্য তাহার দৃঢ়তা সাধন করা হয় ইত্যাদি। বস্তুতঃ তাদৃশ অনুমানাদিকে এস্থলে লক্ষ্য করিয়া যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধির প্রস্তাবনা করা হইয়াছে।

মিথ্যার অধিষ্ঠানরূপে অনুমানদ্বারাই অদ্বৈতসিদ্ধ হয়—আপত্তি

যদি বলা হয়, মিথ্যার অধিষ্ঠানরূপে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় স্বীকার করিলে ত অনুমানদ্বারাই বেদনিরপেক্ষ-ভাবে অদ্বৈতসিদ্ধ হইয়া গেল। সুতরাং বেদের আবার প্রয়োজন কেন? বেদ তাহার সন্ধান না দিলেও তাহার সিদ্ধিতে বেদের প্রয়োজন কি?

উক্ত আপত্তির নিরাস

কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, মিথ্যার অধিষ্ঠানরূপে একটী সত্য সিদ্ধ হইলেও তাহা যে অসঙ্গ অদ্বৈত, তাহা যে অন্য সত্য দ্বৈত নহে, সে সম্বন্ধে ত সন্দেহ দূর হয় না? এই সন্দেহ বারণের জন্য আবার বেদের আবশ্যকতা আছে, আর বেদই ত সেই অদ্বৈতের সন্ধান দিয়াছে। এই দ্বৈতরাজ্য মধ্যে অসঙ্গ অদ্বৈতের কথাই কাহারও মনে উদয় হইতে পারে না। এজন্য অনুমান অসঙ্গ অদ্বৈতের সন্ধান পাইলে তাহার সম্ভাবনাই সিদ্ধ করে মাত্র।

অনুমানও অসঙ্গ অদ্বৈতের সিদ্ধি করে—আপত্তি

যদি বলা যায়, সমস্ত জগৎকে মিথ্যা বলিলে তাহার অধিষ্ঠান ত অসঙ্গ অদ্বৈতই হইবার কথা? কারণ, তথায় অন্য কিছুই ত আর থাকিল না, সবই যে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে? অন্য কিছু থাকিলে ত সসঙ্গ অদ্বৈত হইবে বা সত্য দ্বৈত হইবে? অতএব বেদ ভিন্ন অসঙ্গ অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া যাইবে না কেন? এস্থলে অনুমান দ্বারাই ত অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া গেল? অতএব বিশ্ব মিথ্যা হইলেই তাহার অধিষ্ঠান অসঙ্গ অদ্বৈতের সন্ধান পাওয়া যায়, আর তজ্জন্য সিদ্ধও হয়। ইহা ত অনুমানই বলিয়া দিবে? অতএব এ জন্য বেদের প্রয়োজন কি? আর বেদ সন্ধান দিলেও ইহা ত অনুমানসিদ্ধই হইল? ইহাতে ত আর সংশয় থাকে না?

বেদ ভিন্ন অসঙ্গ অদ্বৈতের নিশ্চয় হয় না

তাহা হইলে বলিব—এইরূপে সিদ্ধ যে অসঙ্গ অদ্বৈত, তাহার মধ্যে যে সেই মিথ্যার জননী অদৃশ্যা একটী শক্তিও থাকিবে না,—তাহার নিশ্চয়তা কি? এই নিশ্চয়তার অভাবে যে সন্দেহই থাকিয়া যায়। আর সেই সন্দেহনিবারণের জন্য বেদের নির্দ্দেশের আবশ্যকতা হয়, অনুমান—অন্য সংশয় ও বিপর্য্যয় দূর করিলেও এই সংশয়কে ত দূর করিতে পারে না। এই জন্যই বলা হয়, অসঙ্গ অদ্বৈত বেদ ভিন্ন কোন প্রমাণদ্বারা জানা যায় না। সুতরাং সিদ্ধও হয় না। অনুমানেও সংশয়লেশ থাকে, উহাতে উৎকট সম্ভাবনাই সিদ্ধ হয় মাত্র। সুতরাং পূর্ব্ববাক্যের সহিত বর্ত্তমান বাক্যটী বিরুদ্ধ হইতেছে না, আর তজ্জন্য জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে পারিলে

অদ্বৈতের সম্ভাবনাই সিদ্ধ হয়, এ কথা অসঙ্গত হয় না, অর্থাৎ বেদ হইতে অদ্বৈতের সন্ধান পাইয়া অনুমানদ্বারা তাহার যে সিদ্ধি হয়, সেই সিদ্ধিতে একটু সংশয়লেশ থাকে, তাহা নাশ করিবার জন্য আবার বেদের প্রয়োজন হয়। এজন্য উভয়েরই উপযোগিতা থাকিলেও অনুমানদ্বারা অদ্বৈত-তত্ত্ব সিদ্ধ হয় না।

অনুমানদ্বারা অসঙ্গ অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না

তাহার পর বিশ্ব মিথ্যা হইলে তাহার অধিষ্ঠান-রূপে যাহার প্রকাশ হয় তাহা ত তাহার স্বপ্রকাশতানিবন্ধনই হয়—বলিতে হইবে। কারণ, রজ্জু সর্পাদির দৃষ্টান্তমধ্যে সর্প ও রজ্জু উভয়ই দৃশ্য পদার্থ, এজন্য অধিষ্ঠানকল্পনা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু যাবং দৃশ্যকে মিথ্যা বলিলে, তাহার অধিষ্ঠান যাহা কল্পনা করা যাইবে, তাহা ত দৃশ্য হইবে না। সুতরাং তাহার অধিষ্ঠানরূপে অদ্বৈতকল্পনা সঙ্গত হয় না। কিন্তু তথাপি যে একটা অদৃশ্য অধিষ্ঠান স্বীকার করা হয়, তাহা সেই অধিষ্ঠানের স্বপ্রকাশতা নিবন্ধনই স্বীকার করা হয়। সব অস্বীকার করিলে চলে না বলিয়াই স্বীকার করা হয়। রজ্জুসর্প-স্থলেও রজ্জুর জ্ঞানই সেই ভ্রমের নাশক হয়। এস্থলে সবই মিথ্যা হইলে একটা স্বপ্রকাশ বস্তু আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়। তাহাকে আর বুদ্ধি প্রকাশ করে না। সব নাই বলিলেও বক্তা "নাই" হয় না। বক্তা তাহা কল্পনাই করিতে পারে না। বক্তার এই নিজ রূপই সেই স্বপ্রকাশে পর্য্যবসিত হয়। ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এ জন্য যাবৎ দৃশ্য—মিথ্যা হইলে তাহার অধিষ্ঠানের যে প্রকাশ, তাহা অনুমানের দ্বারা প্রকাশ নহে। কিন্তু তাহা স্বতঃপ্রকাশ বস্তু বলিয়া আপনা আপনি প্রকাশিত হয়। এজন্য এই অধিষ্ঠানসিদ্ধি অনুমানের ফল নহে। এজন্য অনুমান অদ্বৈতকে নিঃসন্দেহে সিদ্ধ করিতে পারে না।

জগন্মিথ্যা অনুমানের মূল নির্ণয়

জগতের মিথ্যাত্বসাধক এই অনুমানের স্পষ্টতর আকার আমরা প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে গৌড়পাদাচার্য্যের মাণ্ডুক্য-কারিকা মধ্যে উত্তমরূপে দেখিতে পাই। এই গৌড়পাদকে ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য বলা হয় বলিয়া ইহার সময় কলির প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ তিন হাজার খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বলা হয়। সাধারণতঃ মাধবীয় শঙ্কর-বিজয়ের প্রবাদবলে গৌড়পাদকে শঙ্করাচার্য্যের পরম-গুরু বলিয়া মনে করিয়া খৃষ্টীয় ৭ম ৮ম শতাব্দীর, অর্থাৎ ৬৮৬—৭২০ খৃষ্টাব্দের, শঙ্করাচার্য্যের অন্যূন ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়পাদাচার্য্যের জন্ম বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এই প্রবাদ অপেক্ষা বায়ুপুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণ, শঙ্করাচার্য্যের বাক্য, প্রকটার্থভাষ্যটীকার বাক্য এবং সাম্প্রদায়িক গুরুনমস্কার শ্লোকের প্রমাণ প্রবলতর হইবারই কথা। এজন্য শুকশিষ্য গৌড়পাদকে কলির প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ তিন হাজার খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এ জন্য এই অনুমানের মূল আমরা কলির প্রারম্ভে বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

তাহার পর এই অনুমানের পূর্ণতম আকার শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যবর্ত্তী-কালের গ্রন্থসমূহ লুপ্ত হওয়ায় ইহার ধারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তবে এই অনুমান সম্বন্ধে সকলের সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া শেষ কথা শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্ব্বে যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধি অতি স্পষ্ট করিয়া শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার "বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী" গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-বাক্যটী স্মরণ করা যাইতে পারে। যথা—

"অদৃষ্টদ্বয়মানন্দমাত্মানং জ্যোতিরব্যয়ম্।
বিনিশ্চিত্য শ্রুতেঃ সাক্ষাৎ যুক্তিস্তত্রাভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ 'শ্রুতি হইতে সাক্ষাৎভাবে অদ্বৈত আনন্দ-জ্যোতিঃ ও অব্যয় স্বরূপ আত্মাকে বিনিশ্চয় করিয়া তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে।' এস্থলে শ্রুতি হইতে অদ্বৈতের সন্ধান পাইয়া যুক্তিপ্রদর্শনের কথাই বলা হইল।

জগন্মিথ্যাত্বানুমানের গতি

শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক এই অনুমানটী প্রচারিত হইবার পর অদ্বৈতবিরোধী সম্প্রদায়গুলি ইহার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্বসম্প্রদায়ই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও আবার জয়তীর্থাচার্য্য ও ব্যাসাচার্য্যকে সকলের অগ্রণী বলা যায়। ইঁহারা "ন্যায়সুধা" ও "ন্যায়ামৃত" নামক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এই অনুমানের সর্ব্বপ্রকারে খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইহাতে নৃসিংহাশ্রম "অদ্বৈত দীপিকা" গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং তৎপরে মধুসূদন সরস্বতী "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাদের আক্রমণের উত্তর দেন। মধুসূদনের পরেও উভয় সম্প্রদায়মধ্যে বিবাদ বিরত হয় নাই। "অদ্বৈতসিদ্ধি" এবং "ন্যায়ামৃতের" টীকা, তাঁহার টীকা ইত্যাদি আকারে বহু বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এমন কি এখনও হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও মধুসূদনের কথাই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মধুসূদনের কথা না বুঝিবার ফলেই এই বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছে—ইহা বহু পণ্ডিতের মত।

মিথ্যাত্বের পাঁচটী লক্ষণ

এই অনুমান সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে গিয়া প্রথমেই মিথ্যাত্বের লক্ষণ অবলম্বন করিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল। সেই আপত্তির উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী পাঁচটী লক্ষণকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। সেই লক্ষণ পাঁচটী এই—

১। সৎ ও অসৎ হইতে যাহা ভিন্ন অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় তাহাই মিথ্যা। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও বন্ধ্যা-পুত্র হইতে যাহা ভিন্ন তাহাই অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা।

২। প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধের যাহা প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা। অর্থাৎ যাহা যেখানে দেখা যায়, সেখানে যদি তাহা না থাকে, তবে তাহা মিথ্যা।

৩। যাহা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় তাহাই মিথ্যা। অর্থাৎ যাহা জ্ঞান হইলে থাকে না তাহাই মিথ্যা।

৪। যাহা নিজের আশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা। অর্থাৎ যাহা যেখানে থাকে, তাহা যদি সেখানে বস্তুতঃ না থাকে, তবে তাহাই মিথ্যা।

৫। যাহা সৎ হইতে বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ তাহাই মিথ্যা। অর্থাৎ যাহার সত্তা তিনকালে বাধিত, তাহাই মিথ্যা।

ইহাদের বিষয় বিশদভাবে "অদ্বৈতসিদ্ধি" মধ্যে আলোচিত হইয়াছে, সে সব কথা এস্থলে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। তবে ইহাদের স্থূলতঃ তাৎপর্য্য এই যে, **যাহার সত্তা নাই অথচ যাহা দৃশ্য হয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই মিথ্যা।** যেমন রজ্জুতে সর্প কোন কালেই থাকে না, কিন্তু ভ্রমকালে রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়। এ জন্য রজ্জুসর্পকে অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা শব্দের এইরূপ অনির্ব্বচনীয় অর্থে উপরিউক্ত অনুমানের দ্বারা যাবৎ দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থকে অর্থাৎ এই বিশ্ব প্রপঞ্চকে অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলা হয়। অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ নাই অথচ দৃশ্য বা জ্ঞাত হইতেছে বলিয়া ইহাকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা শব্দের একটী অর্থ—অপহ্নব

এবং একটী অনির্ব্বচনীয়। এস্থলে অনির্ব্বচনীয় অর্থেই জগৎ মিথ্যা বলা হয়।

সদসদ্‌ভিন্ন পদার্থে আপত্তি

যদি বলা যায়—যাহা সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন এরূপ কোন পদার্থই হইতে পারে না। পদার্থ হইলেই তাহা হয় "সৎ" হইবে, না হয় "অসৎ" হইবে। সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই কল্পনা করা যায় না। যাহার কল্পনাও করা যাইবে তাহা কল্পনাকালেও নিশ্চয়ই "সৎ"ই হইবে, অর্থাৎ আছে বলিয়া বোধ হইবে। অন্যকালে তাহা অসৎ হইতে পারে, কিন্তু কল্পনাকালেও সৎই হইবে। তাহাকে আছে বলিতেই হইবে। এজন্য সদসদ্‌ভিন্ন কোন কিছুর কল্পনাও করিতে পারা যায় না। সদসদ্‌ভিন্ন কিছুই নাই বা হইতেও পারে না।

রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তদ্বারা সদসদ্‌ভিন্ন বস্তুর সিদ্ধি

তাহা হইলে বলিব—না, একথা সঙ্গত নহে। কারণ, রজ্জুসর্প ও শুক্তিরজত প্রভৃতি দৃষ্টান্ত মধ্যে ঐ সদসদভিন্ন একটী ভাব দেখা যায়। রজ্জুতে যখন সর্প দেখা যায় তখনও রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্প হয় না, অথচ রজ্জুতে সর্প দেখা যায়। এ কথা ত কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শুক্তিকাকে যখন রজত বলিয়া বোধ হয় তখনও শুক্তিকা শুক্তিকাই থাকে, রজত হয় না। এ কথা ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। রজ্জুতে যে সর্প, তাহা দেখা যায় বলিয়া তাহাকে "অসৎ" বলা যায় না, কারণ অসৎ দৃশ্য হয় না। এবং সর্পটী সৎ হইলে অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পটী থাকিলে রজ্জুর জ্ঞান হইলে সেই সর্প বিনষ্ট হইয়া যাইত না। কারণ, সতের কখনও নাশ নাই। এই জন্য রজ্জুসর্প—সৎ নহে এবং অসৎও নহে। অতএব সদসদভিন্নের কল্পনা অসঙ্গত হয় না। অর্থাৎ ভ্রম ও তাহার যে বিষয় তাহাই সদসদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ মিথ্যা পদার্থ হইয়া থাকে। সদসদ্‌ভিন্ন একটী পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে।

সদ্ ও অসতের লক্ষণ

যদি বলা যায়—তাহা হইলে সৎ ও অসতের লক্ষণ কি বলিতে হইবে। তাহা হইলে বলিব—যাহা তিনকালেই একভাবে অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয়-ভাবে থাকে, এবং যাহা "আছে" এই বুদ্ধির বিষয় তাহাই সৎ, এবং যাহা তিনকালেই থাকে না এবং "নাই" এই বুদ্ধির বিষয়, তাহাই অসৎ। সতের দৃষ্টান্ত সৎ চিৎ ও আনন্দ পদলক্ষিত ব্রহ্ম বা অদ্বৈত বস্তু, এবং অসতের দৃষ্টান্ত বন্ধ্যার পুত্র, আকাশের কুসুম, শশের শৃঙ্গ, কমের লোম ইত্যাদি। সৎ কখনও দৃশ্য হয় না। অসৎও কখন দৃশ্য হয় না। যাহা দৃশ্য হয় তাহা এজন্য সদসদ্‌ভিন্ন। ইহাই মিথ্যা। ইহারই অপর নাম কল্পিত বলা হয়। ইহাকেই অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। আর ইহা ভিন্ন যাহা তাহা হয় সৎ না হয় অসৎ। অতএব সৎ ও অসদ্ ভিন্ন একটী সদসদ্‌ভিন্ন নামক পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য।

সদসদ্‌ভিন্ন কিছু নাই বলিয়া আপত্তি

যদি বলা যায়—ভ্রমকালে যাহা দেখা যায় তাহাকে সৎ বলিব না কেন? যাহা কখনও দেখা যায় না তাহা যখন অসৎ পদবাচ্য হয়, এবং ভ্রমকালে দৃশ্যবস্তু যখন সদ্ বলিয়াই বোধ হয়, তখন তাহা তাদৃশ অসৎ হইতে ভিন্নই বলিতে হইবে, এজন্য তাহাকে সৎই বলিব? বস্তুতঃ রজ্জুসর্পকেও "আছে" বলিয়াই বোধ হয়। উহা যখন "আছে বুদ্ধির" বিষয় হয়, তখন তাহাকে সৎই বলিব? তদ্রূপ ভ্রমান্তে সেই সর্পকেই "নাই" বলা হয়, সুতরাং কালান্তরে তাহা "নাই" বুদ্ধির বিষয় হয় বলিয়া তাহাকে অসৎও বলিব। আর ভ্রম ভিন্ন বিচার-কালে ভ্রমের বিষয় এইরূপ একবার সৎ ও অন্যবার

অসৎ—এই উভয়রূপ হয় বলিয়া সেই ভ্রম-ভিন্ন বিচারকালে ভ্রমের বিষয় সৎ ও অসৎ উভয়ই বলিব। কিন্তু তাহাকে সদসদ্‌ভিন্ন কেন বলিব?

সদসদাত্মকে আপত্তি

যদি বলা হয় সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তাহারা একই কালে একই বিষয়ে জ্ঞানের বিষয় হয় না, অতএব ভ্রম ভিন্ন বিচারকালে তাহারা একই জ্ঞানের বিষয় হয় না? সুতরাং ভ্রমের বিষয় সদসদাত্মক হয় না?

সদসদাত্মকের সিদ্ধি

তাহা হইলে বলিব—তাহারা উভয়ই যখন সেই ভ্রমভিন্ন বিচারকালে জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহা অনুভূতই হয়,—সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও যখন সেই বিচারকালের জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন অনুভবানুরোধে ভ্রমের বিষয়কে সদসদাত্মকই বলিব? অর্থাৎ ভ্রমের বিষয় রজ্জুসর্পকে, বিচার-কালকে লক্ষ্য করিয়া সদসদাত্মকই বলিব। তাহাকে সদসদ্‌ভিন্ন আর বলিব না। যাহা যেরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাকে তাহাই বলাই ত সঙ্গত? সদসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না কেন বলিব? জ্ঞান ত বস্তুতন্ত্রই হইবার কথা, আর তাহা হইলেই তাহাকে সত্যজ্ঞান বলা হয়। কর্তৃ-তন্ত্র জ্ঞানকেই কল্পিত মিথ্যা বা আহার্যজ্ঞান বলা হয়। এস্থলে সদসতের মধ্যে যে বিরোধের কথা বলা হইতেছে, তাহা তাহাদের জ্ঞানের বিরোধ, তাহাদের নিজের বিরোধ নহে, অর্থাৎ তাহা তাহাদের স্বরূপের বিরোধ নহে। আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়া কোন বস্তুকে অস্বীকার করা ত উচিত হয় না। একই রজ্জুসর্পকে লক্ষ্য করিয়া বিচারকালে যখন "আছে" ও "নাই" বলি, তখন বিভিন্নকালে "আছে" ও "নাই" বলা হইলেও লক্ষ্য বস্তুটী কেন অন্যথা হইয়া যাইবে? অতএব রজ্জুসর্প সৎও বটে এবং অসৎও বটে। আর জগৎ তাহার ন্যায় বলিয়া সদসদাত্মকই বলিব? সদসদ্‌ভিন্ন বলিব না।

সদসদ্‌ভিন্ন স্বীকারে যুক্তি

কিন্তু এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, উক্ত যে বিচারকালের কথা বলা হইল, সেই বিচারকালেই রজ্জুসর্প একবার সৎ ও একবার অসৎ এইরূপই প্রতিভাত হয়। একই কালে তাহা সদসদ্রূপে প্রতিভাত হয় না। বিচারকালের মধ্যেও সতের কাল ও অসতের কাল পৃথক্‌রূপেই গৃহীত হয়। ইহাও ত অনুভবসিদ্ধ। সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

একই কালে সদসৎকে বুদ্ধির বিষয় করিতে হইলে বুদ্ধি নির্ব্বিষয়ই হয়, তখন বুদ্ধির একটা স্তব্ধীভাবই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই নির্ব্বিষয় বুদ্ধির বিষয় বা সেই স্তব্ধীভাবাপন্ন বুদ্ধির বিষয় "না সৎ না অসৎ" এইরূপই ত প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ বিচারকালে রজ্জুসর্পটীকে একই কালে জ্ঞানের বিষয় করিতে গেলে সদ্‌বুদ্ধি ও অসদ্‌বুদ্ধি কেহই উদিত হয় না, তখন কেবল "একটা কিছু" এইরূপ বলিয়াই তাহাকে বোধ হয়। যাহা যৎকালে সৎ, তাহা তৎকালে অসৎ—এই ভাবটী কখনই উদিত হয় না। এই অনুভবটীর অপলাপ করিয়া উপরে আপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল, বিচারকালের সদসৎ একই কালের সদসৎ নহে। এই অনুভব অস্বীকার করা চলে না। এই জন্য সেই রজ্জু-সর্পকে সদসদ্‌ভিন্ন 'একটা কিছু' বলা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আমরা যে বিচারকালে রজ্জু-সর্পকে সদসদাত্মক বলি, তাহা ভিন্নকালের সম্বন্ধকে বাদ দিয়াই বলি। কিন্তু কালসম্বন্ধ বাদ দিলে তাহা কল্পিত নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, তাহা সত্য অবস্থার পরিচয় নহে। আর এই যে "একটা কিছু বোধ" ইহা যে কেবল ভ্রমকালে থাকে তাহা নহে। ইহা ভ্রমের পূর্ব্বেও থাকে। ইহাকেই সামান্যজ্ঞান বলা হয়, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বিশেষজ্ঞানকালে ভ্রম হইয়া যায়। রজ্জুকে প্রথমে "এই" বলিয়া জানিবার পর দোষ-বশতঃ রজ্জুত্ব এই বিশেষধর্ম্মের ভান না

হইয়া সর্পত্ব এই বিশেষধর্ম্মের ভাণ হয় বলিয়া রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। অতএব এই "একটা কিছু বোধ" সৎ কি অসৎ—এই বিরুদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষকালে আবার আসিয়া উপস্থিত হয়। এই "একটা কিছুর" বোধই এ স্থলে সদসদ্‌ভিন্নের বোধ বলা হয়। এ জন্য সদসদ্‌ভিন্ন ভাবটী অবশ্য স্বীকার্য্য। অনুভব অনুরূপ কল্পনা করাই উচিত, ব্যবহারানুরূপ নির্ণয় করাই সঙ্গত। অতএব সদসদ্‌ভিন্ন ভাবটী অবশ্য স্বীকার্য্য। অনুভবের অননুরূপ কল্পনা করাইত ভ্রম।

অসতের দৃশ্যত্বে আপত্তি

যদি বলা হয়—অসৎ কখনও দৃশ্য হয় না, কেন বলিব? অসৎও দৃশ্য হয়—বলিব। কারণ, কোন একটা তৃণখণ্ডকে দেখিয়া তৃণখণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিয়াও ইচ্ছাবশতঃ যদি তাহাকে একটী কৃমি বা কীট বলিয়া দেখিতে থাকি, এবং তাহা যেন কম্পিত হইতেছে বা অঙ্গচালনা করিতেছে বলিয়া ইচ্ছা করিয়াই দেখিতে থাকি, তাহা হইলে ক্ষণকাল পরে তাহা যেন সত্যসত্যই কম্পিত হইতেছে বা অঙ্গচালনা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। উহা আমার মনঃকল্পিত জানিলেও কম্পিত বা সচল বলিয়া দেখি। তদ্রূপ অন্ধকারে "ঐ ভূত হস্তপ্রসারণ করিতেছে" বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ভাবিলে সত্য সত্যই যেন ভূত এক একবার হস্তপ্রসারণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। অথচ আমি জানি যে উহা আমার মনঃকল্পনা। জাগ্রত অবস্থাতেও কামিনীচিন্তা করিলে কামিনীপ্রত্যক্ষ হয়, ইহাও শাস্ত্রকারগণ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত হইতে স্বীকার করিতে হয় যে, যাহাতে সদ্‌বুদ্ধি নাই প্রত্যুত অসদ্‌বুদ্ধি আছে তাহাও সদ্ বলিয়া দৃষ্ট হয়। অতএব অসৎও দৃশ্য হয় বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে শূন্যবাদী বৌদ্ধের মতে যেমন জগৎকে অসৎ বলা হয় এস্থলেও তদ্রূপ এই অসদ্ ভ্রমের মূলে কোন সৎ অধিষ্ঠান নাই বলিব? সুতরাং সদ্ অদ্বৈত বস্তু আর সিদ্ধ হইবে না?

উক্ত আপত্তির নিরাস

তাহা হইলে বলিব—এস্থলেও অসতের দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, তৃণখণ্ডকে সদ্রূপ কৃমি বা কীট বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে কৃমি বা কীট বলিয়া দেখিতে থাকি। কৃমি কীট অসৎ বলিয়া ভাবিয়া ত কৃমি কীট দেখি না। এস্থলে আমরা আমাদের মনের কল্পিত সদ্রূপ কৃমি বা কীটই দর্শন করি। অতএব এ স্থলেও আমরা অসৎকে দৃশ্য করি না? কল্পিত সৎকেই দৃশ্য করি। আর তাহা হইলে শূন্যবাদীর ন্যায় জগৎ দৃশ্যের মূলে অধিষ্ঠানরূপ কোন সদ্‌বস্তু নাই—এরূপ শঙ্কা থাকিল না।

দৃশ্যের সদসদ্‌ভিন্নত্বে আপত্তি

যদি বলা হয়—তাহা হইলে এইস্থানে সদসতের দৃশ্যত্ব হইল বলিব? কারণ, অসৎ কৃমি কীটকে সৎ বলিয়া দেখি। ইহা দৃশ্য বলিয়া ইহাকে সদসদ্‌ভিন্ন আর বলিব না। আর তাহা হইলে যাহা দৃশ্য তাহা সদসদ্‌ভিন্ন এ কথা আর সিদ্ধ হইল না।

উক্ত আপত্তির নিরাস

কিন্তু এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, ঐ স্থলেও সৎ ও অসৎ একই কালেই প্রতিভাত হয় না। তৃণখণ্ডটী যৎকালে তৃণ বলিয়া বোধ হয় তৎকালে কৃমি বা কীট বলিয়া বোধ হয় না। অথবা যৎকালে কৃমি বা কীটের অভাবজ্ঞান হয়, তৎকালে কৃমি বা কীটের সত্তার জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ তৃণখণ্ড ও কৃমিকীটের জ্ঞান—ইহারা দুইটী জ্ঞান এবং ইহারা দুইটী বিভিন্ন কালেই হয়। কিন্তু তৃণ ও কীট জ্ঞানের মধ্যে একটী সাধারণ ভাবরূপ যে "একটা কিছু" তাহারই জ্ঞান উক্ত তৃণ বা কৃমি কীটের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই যে 'একটা কিছুর' জ্ঞান ইহাই সেই সদসদ্‌ভিন্নেরই জ্ঞান; অতএব স্বেচ্ছাকৃত কল্পিত ভ্রমে বা আহার্য্যজ্ঞানেও সদসদ্‌ভিন্নত্বেরই জ্ঞান হয়। অসতের জ্ঞান হয় না।

সামাজিকতায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর পূজক ঠাকুরটী সামাজিকতার যে অপূর্ব্ব আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, তা ভাল ক'রে আলোচনা করলে অবাক্ হতে হয়। ধর্ম্মরাজ্যে তাঁর যে দান—যে অপূর্ব্ব সাধনা—যে অদৃষ্টপূর্ব্ব সিদ্ধি—সে সবতো ধর্ম্মজগতের অক্ষয় ভাণ্ডার। মানুষ চিরকাল তার আলোচনা ক'রে ধন্য হবে—অশান্ত নরনারী শান্তির পীযূষধারা পান করবে।

আজ সে কথা তুলব না—লোক-ব্যবহারে তিনি যে অপরূপ সামাজিকতা দেখিয়েছেন, সকল সম্প্রদায়, সকল রকমের, সকল দরের লোকের সঙ্গে ঠিক মিশে গিয়ে তার ভাবটী বুঝ্‌তেন আবার তার মঙ্গলের জন্য যেটুকু সাহায্য করার আবশ্যক সেটাও করতে ত্রুটী করতেন না। শুধু তাই নয়, এমন সরল নম্র ব্যবহার, এমন প্রাণঢালা আলাপ-আলোচনা, এমন মিষ্টিমুখে বিদেয় করা জগতে বড় একটা দেখা যায় কি? তাঁর আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা শুনে কে বল্‌বে যে তিনি একটা অজ পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু বামুন? তাঁর জীবনটী আলোচনা করলে দেখতে পাবা যায়, তিনি হুগলী ও বাঁকুড়া জেলাদ্বটীর প্রান্তসীমায় একটা দুর্গম পল্লীগ্রামে অতি দীন দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন, লেখাপড়াতো পাঠশালার সামান্য বিদ্যে—তা-ও আবার আঁক দেখ্‌লে ধাঁধা লাগ্‌তো। গাঁয়ের এক কোণে মাণিকরাজার আমবাগানে ঘুরে বেড়াতেন, যারা গরু চরাত হয়তো তাঁদের সঙ্গে খেলা করতেন, নয়তো গাঁয়ের বড়লোক লাহাদের বাড়ীর সমবয়সী ছেলের সঙ্গে মিতালি করতেন। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে-ছেলেদের আর বাপ মা ভাই বোনের আদরেই গদাই ঠাকুরটীর ছেলেবেলা কেটে গেল। শিক্ষার ভেতর যাত্রাগান, পালাগান আর কথকতা শুনে বেড়াতেন। নিজে আবার গানগুলি শিখে নিয়ে নকল করে গাঁয়ের লোকদের হাসিয়ে হাসিয়ে মজা দেখ্‌তেন। কিন্তু এই ছেলেবেলাতেই তাঁর লোকের সঙ্গে মেশবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কোথায় "ছিনিবাশ" বুড়ো, কোথায় ধাইমা ধনী কামারণী, কোথায় গাঁয়ের বড়লোকের ছেলে গয়া বিষ্ণু স্যাঙ্গাৎ আবার কোথায় গাঁয়ের অতিথিশালার সাধু পরিব্রাজক আর পণ্ডিতের দল। সাধুদের সঙ্গে নিজেকে এমনি করে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা তাঁকে নিজেদেরই একজন মনে করতো—তাই তারা সত্যিসত্যি একদিন তাঁকে সাধু সাজিয়ে দিয়েছিল। প্রবাসে পর্য্যটনে এই সব পথেহাঁটা অতিথির দলের ছিলেন তিনি একজন মস্ত আকর্ষণকারী সাথী। গদাইর আলাপে যত্নে ও আপ্যায়নে তারা মুগ্ধ হয়ে যেত। এই সব অতিথির মধ্যে কেউ হয়তো ছিলেন জ্ঞানী পরমহংস, কেউ ছিলেন বাবাজী আবার কেউবা বাউল কর্ত্তাভজা। এই সব অতিথিদের মধ্যে কেউ ছিলেন সদাচারী, কেউ অনাচারী আবার কেউ আচার অনাচার কোনটাই গ্রাহ্য করতেন না। গদাই এই সব নানাভাবের লোকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ কখনও হারান নি। গেঁয়ো সামাজিকতার মধ্যে তিনি এই অতিথশালায় সামাজিকতার একটী নূতন ভাবের বীজ দেখ্‌তে পেয়েছিলেন—সে বীজটীকে তিনি জীবনের শিক্ষাক্ষেত্রে সযত্নে রোপণ ক'রেছিলেন, উত্তরকালে তারই বিশিষ্টপ্রকাশ দেখ্‌তে পাই - দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আর কাশীপুরের বাগানে।

পাড়াগেঁয়ে লোকের সঙ্গে ঠিক একটী গেঁয়ো বামুনের মতই চল্‌তেন। তাদের চাষ-আবাদের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের খুঁটিনাটি খবর, তাদের আশা-ভরসা সব এই ঠাকুরটী এক পলকে বুঝে নিতেন আবার তারা কোথায় থাকবে—কি খাবে ইত্যাদির খবরও তিনি নিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁর গাঁয়ের নিকটবর্ত্তী লোকেরা আস্‌তো, তাঁর গ্রাম্য আত্মীয় স্বজনেরা মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে থাকত—তাদের দিকে তাঁর ঠিক লক্ষ্য ও যত্ন রাখ্‌তে ভুল্‌তেন না। আবার এদিকে হয়তো পরণের কাপড় কোমর থেকে খুলে যেত। দিগম্বর ঠাকুর সেদিকে বড় হুঁস রাখ্‌তে পারতেন না। শিউর শ্যামবাজার প্রভৃতি জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী গ্রামের চাষা মুদী ব্যবসায়ী থেকে বড় বড় বোষ্টম গোঁসাইদের সঙ্গে মিশে তিনি তর্কের ছলে শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তগুলির বিচার করেছেন—তাদের পাঠ শুনেছেন আবার কীর্ত্তনে খোল করতাল নিয়ে নেচে গেয়ে তাদের মন হরণও করেছেন। তারা মনে কর্‌তো যেন তারা একজন যথার্থ দরদী বন্ধু পেয়েছে। তাঁর পাড়াগেঁয়ে জীবনে দেখ্‌তে পারা যায় তিনি যার যা প্রাপ্য মর্য্যাদা তা দিতে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর সামাজিকতার এটাও একটা প্রধান অঙ্গ। আবার যখন তাঁর অগ্রজের সঙ্গে কামাপুকুরে চলে এলেন, বাড়ী বাড়ী পুরুতগিরি ক'রে ঘুরে বেড়াতেন, পড়াশুনার ধার দিয়ে যেতেন না—তখনও খাবারওয়ালা মুদী থেকে লোকের বাড়ীই অন্দরমহল পর্য্যন্ত এমন ভাবে মিশে যেতেন যে তাদের মনের উপর একটা দাগ থাক্‌ত।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস দর্শন করতে বা পেনেটীর রাঘব পণ্ডিতের প্রাঙ্গণে মহোৎসবের উচ্চ কীর্ত্তনে তারা সেই পূর্ব্বেকার আলাপী গদাই ঠাকুরকেই দেখ্‌তে পেত। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যেমন তারা গদাই ঠাকুরের সরল ও অমায়িক ব্যবহার পেয়েছিল—এখনও ঠিক সমানভাবে তেমনিই আদর যত্ন পাচ্ছে—যদিও দলে দলে কলকাতার বাবুর দলের ভিড়ের ভিতর এই ঠাকুরটী বসে আছেন। কিন্তু সকলের চেয়ে অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় যে তেজস্বিনী রাণী রাসমণি ও দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মথুর বিশ্বাস এই পাগলা পুরুত ঠাকুরের পায়ে মাথা নুয়িয়েছেন।

ঠাকুর আবার কাউকেই স্পষ্ট কথা বল্‌তে ছাড়্‌তেন না। রাণীর হুকুমে "ছোট ভট্‌চাজ" ভবতারিণীর মন্দিরে অনুরাগভরে মায়ের গান শোনাচ্ছেন বটে কিন্তু সাবধান করে দিলেন —"মায়ের সাম্‌নে বিষয় চিন্তা।" কি রাণী রাস-মণি, কি মথুর বিশ্বাস বা তাঁর পত্নী জগদম্বা—কেউ কখনও তাঁর উপর বিরক্ত হন নি। মন্দিরে যখন চাকুরী নিয়েছিলেন—তখন তাঁর কাজকর্ম্ম হেলা তো করেনই নি বরং অনুরাগের সঙ্গেই করেছেন। তাই যখন মন্দিরের আমলারা রাণী রাসমণিকে জানিয়েছিলেন যে ছোট ভট্‌চাজ মায়ের পূজোয় গণ্ডগোল করছে—তখন রাণী ও জামাতা দেখ্‌তে পেলেন—যে উচ্চ অবস্থার মানুষ ঠিক বৈধী পূজো করতে পারে না—তিনি তা করবার চেষ্টা করছেন। —যখন ফুল তুল্‌তে গিয়ে ফুল তুলতে পারেন না—জগন্মাতা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন বিরাটের মাথায় কেমন ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছে, তখন স্পষ্ট-ভাবে তাঁর মনিবদের জানিয়ে দিলেন—"আমার দ্বারা হবে না—দোসরা লোক দেখ।" ছোট ভট্‌চাজের ব্যবহারে চালচলনে কেমন একটা আকর্ষণীশক্তি ছিল যে তাঁরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে তো রেখেছিলেনই পরন্তু তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে সেবা যত্ন ও সঙ্গ করেও তাঁদের তৃপ্তি মিট্‌তো না।—অথচ যখন "সেজোবাবু" তাঁর অনুগত সেবক, তখন তিনি কখনও তাকে কোনও বিষয়ে অনুরোধ উপরোধ করেন নি কিম্বা তাঁর শক্তির যাচাইও করেন নি।

সাধারণ মানুষের যে সব সাধারণ দুর্ব্বলতা থাকে, এই ঠাকুরটীর কাছে তা বড় ঘেঁসতে পারত না।—এমন সবল সুস্থ মন নিয়ে তিনি বাস করতেন বলেই মহাশক্তি সমন্বিতা পরম-বিদুষী ভৈরবী যোগেশ্বরী কৌপীনসম্বল বৈদান্তিক ন্যাংটা তোতাপুরী, রামাবৎ জটাধারী, কেনারাম ভট্‌চাযি, সুফী গোবিন্দ প্রভৃতি সকলের নিকট সমভাবে শিক্ষা নিতে পেরেছিলেন। আদান প্রদানেই সামাজিকতা প্রকাশ পায়। এই ঠাকুরটী যেমন তাঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সবাইকে তেমনি তাঁর—"মার বাশ ঠেলে দেওয়া"—বাণী ও জ্ঞানভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্নমাণিকগুলিও অযাচিতভাবে মুক্তহস্তে বিতরণ করেছিলেন। ইঁদেশের গৌরীপণ্ডিত, নারায়ণ মিশ্র, বৈষ্ণবচরণ, শশধর তর্কচূড়ামণি এবং বহু পণ্ডিত ও অধ্যাপকের দল এই "মূর্খোত্তমে"র পদতলে বসিয়া নিরক্ষরের জ্ঞানরত্ন আহরণ করেছিলেন। ঠাকুরটীও প্রশ্ন করে তাদের শাস্ত্রচর্চ্চা শাস্ত্রজ্ঞান শুনতেন। তাই পররর্ত্তীকালে তিনি বলতেন—"আমি শুনিছি কত।"

এই আদান প্রদানের ভাবটী তাঁর সর্ব্ববিষয়েই ছিল। যে কেউ তাঁর নিকটে আস্‌তো, তাকে কিছু না-খাইয়ে ছাড়তেন না, আবার নিজেও যখন বেড়াতে যেতেন তখন সকল গৃহেই "মিষ্টমুখ" বা "জলযোগ কর্‌তে দ্বিধা করতেন না। তিনি একদিকে দক্ষিণেশ্বরের ম্যাগাজিন ঘরের শিখদের সঙ্গে—কুঁয়োরসিংএর সঙ্গে, নিষ্ঠাবান নেপালের রাজ-প্রতিনিধি কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের সঙ্গে যেমন মিশ্‌তে পারতেন, আবার ঠিক বাংলার নবযুগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সংস্কারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, স্বামী দয়ানন্দ, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠকর্ম্মী প্রচারক আচার্য্য কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র, ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির সঙ্গে তেমনিই আন্তরিক অন্তরঙ্গের মতই মিশেছেন। শুধু তাই নয়—কৃষ্ণ-যাত্রায় সাধক নীলকণ্ঠ বিদ্যাসুন্দরের যাত্রাগায়ক এবং রঙ্গালয়ের অভিনেতারা সমান তাঁর নিকট আদরে অভ্যর্থিত ও আপ্যায়িত হতেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল "সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" তাই তাদের নিকট গান শুনতেন আর জ্ঞান বিলাতেন। ন্যাংটা পরমহংস, ধর্ম্ম-প্রচারক মনীষিবৃন্দ, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর—তাঁহার নিকট সমভাবে আদরণীয় ছিলেন। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট বালকের সঙ্গে এই ঠাকুরটী ঠিক যেন বালক হয়ে যেতেন, রঙ্গরস নৃত্যগীত ও খেলা করতেন। আবার কিশোর বা তরুণ দল যখন নৌকাযোগে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করতে করতে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে হাজির হত তখন মিঠাই মোণ্ডা জলখাবার দিয়ে তাদের তৃপ্তি করতেন। ছেলের দল যারা এই সংবাদ জানতো তারা—অনেকে দক্ষিণেশ্বরে ভিড় করত। তাঁদের সঙ্গে ঠিক কিশোর বা তরুণ বালকের রঙ্গ পরিহাস কর্‌তে কর্‌তে মিঠাই দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর জ্ঞানামৃতও দিতেন।

তাঁর এই সামাজিকতা শুধু পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আত্মভোলা নিরক্ষর পুরুতঠাকুরটী নারীজাতিকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন তা জগতে এপর্য্যন্ত কেউ করেছে কিনা সন্দেহ। ঠিক মাতৃভাবেই তাঁদের জগদম্বার মহাশক্তিস্বরূপই দেখ্‌তেন। কি কুমারী বালিকা, কি সধবা, কি বিধবা কিম্বা উদাসিনী, সন্ন্যাসিনী ও উচ্চসাধিকা—সকলের সঙ্গে তিনি একরূপভাবে আলাপ ব্যবহার করতেন যে, তারা ভুলে যেত—এই ঠাকুরটী তাদের জাতির অন্তর্গত নয়। তারা মনে করত যে তিনি যেন তাঁদেরই একজন। এই কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগীপুরুষ এই বৈরাগ্য-মূর্ত্তি পরম-যোগী

সন্ন্যাসী পরমহংস ঠাকুর বালক বয়সে মেয়ে সেজে যেমন লোকের অন্তঃপুরে গিয়ে হাঁটুরে মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি মেয়েলি পোষাকে কাঁচুলি ও ওড়না পরে কখনও কখনও ব্রজ-গোপিকার ভাবে আর কখনও মায়ের সখী ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন। সখী সেজে বরের ঘরে কনেকে শোয়াতে যেতেন, মেয়ে সেজে মেয়ে ভাবে অন্তঃপুরে থাক্‌তেন। অবিকল মেয়েদের হাবভাব কথাবার্ত্তা চালচলন এই রসিক ঠাকুর নকল ক'রে দেখাতেন। আবার বুড়োদের সঙ্গে এই পাগলা ঠাকুর এমনভাবে মিশ্‌তে পারতেন যে, তাঁরা মনে কর্‌তেন—তাঁরা 'বৃদ্ধের' জ্ঞানোপদেশ শুন্‌ছেন। সংসারের নানাভাবের লোক আস্‌ত—তারা তাদের হৃদয়ের পানপাত্র পূর্ণ ক'রে নিয়ে যেত।

এই যে নানাভাবের লোকের সাথে ভাবের আদান প্রদান, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দেখান—তাদের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুলতা ও সহায়তা—এইগুলিই তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্যকে অনুপম করে রেখেছে। তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি কোনও সম্প্রদায়গত বা ধর্ম্মগত ভেদ-বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর কাছে বামুন কায়েৎ বেনে শূদ্দুর ব'লে কোন জাতিগত ভেদবিদ্বেষ ছিল না—তাঁর কাছে ছোট বড় গরীব ধনী পণ্ডিত মূর্খ সাধু পাপী কোনও গুণগত ভেদ-বিদ্বেষ ছিল না—তাঁর কাছে বৃদ্ধ যুবা কিশোর তরুণ বালক বা শিশুর বয়সগত ভেদবুদ্ধি ছিল না—তাঁর কাছে নরনারীর অধিকারগত ভেদবিদ্বেষ ছিল না কারণ তিনি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের বিকাশ—তাঁর লীলাবিলাস দেখতেন, তাই তাঁর সামাজিকতায় কোনও কৃত্রিমতার পোষাক ছিল না।

সমাজেও সভ্যতার কৃত্রিমতা ও কপটতা দূর করবার জন্যই তিনি ব্রহ্মবিদ্যার সাধনা করে-ছিলেন। জগৎকে তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন—ব্রহ্মবিৎ হলে মানুষ কেমনভাবে—সকল লোককে এক করে নিতে পারে। তাঁর সামাজিকতার দ্বারাই তিনি সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন ধারা ঢেলে দিয়েছেন—যেখানে ধনিক শ্রমিকের সংগ্রাম নেই,—আভিজাত্য ও অবনতের বিবাদ নেই—সাম্যের দোহাইতে বৈষম্যের জয়গীতি নেই, যেখানে আছে শুধু আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের চরম অনুভূতি, বৈষম্যে সাম্যের লীলাবিলাস, শান্তির অমৃত নির্ঝর ধারা।—আজ চারদিক হাহাকার আর্ত্তনাদ রণহুঙ্কার হত্যা পরস্বাপহরণ—অন্তরের দারুণ বুভুক্ষা অভাব কৃত্রিমতা অভিসারগ্রস্ত! তাই জগতের এই বিষম অবসাদ মুহূর্ত্তে ঠাকুরের সামাজিকতার আদর্শ কি আমাদের সৎ পথে চালিত করবে না? তাঁর এই আদর্শ আমরা কি জীবনে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ব না? একশ বছর পার হয়ে গেল তবুও আমরা ফাঁকা মনে ফাঁকা ভাবে কি শুধু তাঁর নামের জয়ধ্বনি কর্‌ব?—জীবনে তিনি যে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন—তা কি আমরা ভুলে যাব? জাতির অগ্রগতিতে সমাজতন্ত্রে এই সামাজিকতার আদর্শের কি কোন মূল্য নেই?

অর্ঘ্যাঞ্জলি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

সাংখ্যের প্রকৃতি তুমি, হে মাতা চিন্ময়ী,
জীব-লীলা প্রয়োজনে এ ভুবনে নামরূপ বহি,
হে দেবী সারদে, সৃষ্টি-কোকনদে তুমি আচম্বিতে—
ধরণীর পুঞ্জীভূত পাপ-তাপ গ্লানি মুছাইতে—
মহাকাল গর্ভ হ'তে হে অমৃত-সুতে, অয়ি দিব্যাঙ্গনে,
পুরুষ ব্রহ্মের সাথে সুধা ভাণ্ড হাতে দাঁড়াইলে বিশ্বের প্রাঙ্গণে।
প্রচারিতে মর্ত্ত্যভূমে তব আগমনী —
ত্রিদিবে বাজিল শঙ্খ, অসংখ্য মঙ্গল বাদ্য, দিব্য হুলুধ্বনি।
তোমা লভি' ওগো দেবী, ধরণীর প্রতি তৃণ, প্রতি রেণুকণা
পুলকের রোমাঞ্চনে, চেতনার ভূমানন্দে হইল উন্মনা।
রামকৃষ্ণ সাথে, মাতা, হেরি তব অভিনব বিদেহী-মিলন
সৃষ্টি হলো আত্মহারা, বিপুল বিস্ময়ে বিশ্ব হলো নিমগন।
সেই মহা মিলনের তীব্র তপ-হোমানলে স্মরদেব হয়ে ভস্মীভূত
সপ্তদশ ঋষিরূপী তোমার মানস-পুত্রে হলো সমুদ্ভূত।
অয়ি অজননী, করুণা ঈশ্বরী তুমি বিশ্ব-প্রজননী,
নিখিল সন্তান তরে চিরপ্রসারিত তব স্নেহ-বক্ষ খানি।
তব স্বামী, রামকৃষ্ণ স্বামী, নিখিলের স্বামী,
জীবের অন্তর মাঝে বিরাজিত চির-অন্তর্যামী—
মানস-সন্তানগণে পরিপূর্ণ দেবশক্তি করিয়া প্রদান—
অব্যক্তের কোলে যবে ব্রহ্মানন্দে করিল প্রয়াণ -
তব মাতৃপ্রাণ তাপস-কুমার তরে স্নেহ বক্ষে পাতিয়া আশ্রয়
পিতৃহারা পুত্রগণে সযতনে দিল, মাতা, প্রেম-বরাভয়,
সঞ্চারিল প্রতিবক্ষে, হে জননী, তপস্যার যে শক্তি দুর্জ্জয়—
সেই শক্তি-প্রহরণে প্রতিজনে দিকে দিকে লভিল বিজয়।
শিরে তুলি তব পদধূলি তোমার সন্তানগণ তপস্বী দুর্ব্বার
অভিযান-চক্রতলে বিনাশিল ধরণীর সর্ব্ব গ্লানি-ভার।
মৃতেরে দানিল প্রাণ, কাপুরুষ ভীত-ত্রস্তে দানিল নির্ভয়,
কলুষে দানিল শুচি, কাঙ্গাল আতুর জনে দানিল আশ্রয়!

বুভুক্ষা-কাতর জনে নিজ অন্ন দিয়া তার মিটাইল ক্ষুধা,
পাষণ্ডে দানিল ভক্তি মুমুক্ষুরে বুকে তুলি' দিল মুক্তি-সুধা।
(এবে) সাঙ্গ হলো, তবলীলা, ওগো ব্রহ্মময়ী—
এ হেন সন্তান সৃজি' প্রতি চিত্তে আপনার ঐশ্বর্য্য সঞ্চরি'
নিজেরে করিয়া রিক্ত, মূর্ত্তরূপে মর্ত্ত্য-অর্থহীন—
তুমি, মাগো ব্রহ্মময়ী, পুনরায় ব্রহ্মানন্দে হইলে বিলীন।
অকস্মাৎ হে জননী, সৃষ্টি-পটে তব মূর্ত্তি নাহি নিরখিয়া
কাঁদিয়া উঠিল বিশ্বে মাতৃহারা সন্তানের শোকতপ্ত হিয়া।
চকিতে বুঝিনু ভ্রান্তি। তোমারে চিনিনু মাগো, তব অদর্শনে,
হেরিনু তোমার মূর্ত্তি লক্ষ কোটি মানবের আকুল ক্রন্দনে।
তুমি মা, অনন্তশক্তি, ধরণীর মাতৃবক্ষে তুমি স্নেহধারা
তুমি মাগো মহামায়া, তব প্রেমে বসুন্ধরা হলো আত্মহারা।
সৃজনের প্রতি অঙ্গে কল্যাণ-তরঙ্গে নাচে তব পদধ্বনি,
ও পদ স্মরিয়া যদি ও পদ লভিতে পারি তবে ভাগ্য গণি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও "শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত"

স্বামী পবিত্রানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের ছিল সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা। তাহার চরিত্রের ছিল বিভিন্ন দিক। তজ্জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন কারণে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একটা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন যন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যন্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শক্তির আধার স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেই শক্তির ক্রীড়া, যদিও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রতিফলন মাত্র, তথাপি এমন অনেক লোক দৃষ্ট হয়, যাহারা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি খুব অনুরক্ত, কিন্তু তাহাদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পৌঁছায় না, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহার প্রধান কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিতেন উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মোপদেশ, ঐ উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য খুব কম লোকই উপযুক্ত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মোপদেশ ব্যতীতও ব্যক্তিগত জীবনের, দেশের ও জাতির বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্থূল শরীর থাকিতে স্বামী বিবেকানন্দ অনেক লোককে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতেন, যাহাতে তাহারা তাঁহার পূত-সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইতে পারে, আর স্বামী বিবেকানন্দ যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, তখনও তিনি যেন সকলের জাগতিক সমস্যারও সমাধান করিয়া তাহাদিগকে

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনিবার ও তাহা জীবনে পরিণত করিবার উপযুক্ত অধিকারী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টা হইলেও, শিক্ষা, সংস্কার, অর্থনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

যুবক সম্প্রদায় অথবা বয়স্ক হইলেও যাহারা যুবাজনোচিত মনের সজীবতা হারায় নাই, তাহারা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন, তেজ, বল, বীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। স্বামী বিবেকানন্দের মতে আদর্শ মানব সেই, যাহার দেহের মাংস হইবে লৌহনির্ম্মিত, স্নায়ু হইবে ইস্পাত দ্বারা গঠিত, আর তাহার মধ্যে এমন একটি সুদৃঢ় মন থাকিবে, যাহা স্বয়ং ইন্দ্রের হস্ত হইতে অশনি-নিপাত হইলেও বিকম্পিত হইবে না। তিনি বলিতেন, প্রথমতঃ চাই নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস, তারপর ভগবানের উপর বিশ্বাস আসিবে। যদি তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রতিও তোমার বিশ্বাস থাকে এবং তোমার নিজের উপর নিজের বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কিছুই লাভ হইবে না। উপনিষদের চরিত্রসমূহের মধ্যে বহুবার তিনি নচিকেতার চরিত্রের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কারণ নচিকেতা ছিল নিজের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন। ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা যখন নচিকেতাকে মৃত্যু-দেবতাকে প্রদান করিয়াছিলেন, নচিকেতা কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া বলিয়াছিলেন,

"বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্‌যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি॥"

—আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম—আমি নিকৃষ্ট নহি। যম আমার দ্বারা আজ তাঁহার কি কর্ত্তব্য সাধন করাইয়া লইবেন। নচিকেতা নিজেকে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে নাই, ইহাই ছিল তাহার বিশেষত্ব। স্বামী বিবেকানন্দও যুবক সম্প্রদায়কে ঐরূপ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও লেখার মধ্যে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত রহিয়াছে: যে কোন লোক ঐগুলি পাঠ করে, সেই প্রাণে নূতন বললাভ করে, অন্ধকারের মধ্যে আলোকের নির্দ্দেশ পায়, হতাশ অবস্থায় তাহার মধ্যে আশার সঞ্চার হয়।

অন্য এক শ্রেণীর লোক স্বামীজির প্রতি আকৃষ্ট হয়, কারণ তিনি ছিলেন ভারতের গৌরব। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথমতঃ জগৎসভায় ভারতের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যেরূপ নির্ভীকভাবে পাশ্চাত্য সমাজে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সেরূপ করিতে পারেন নাই। যখন ভারতবাসীরাও ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় ভারতীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৌদ্ধযুগের পর তিনিই প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসী ভারতের বাহিরে যাইয়া অবিসংবাদিতভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই সাফল্যের জন্য তাঁহার প্রত্যেক দেশবাসীই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ ছিল তীব্র ও অপরিমেয়। তিনি ভারতের রাজা মহারাজা, দীন দরিদ্র, সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন ও তাহা দ্বারা ভারতের স্বরূপ স্পষ্টভাবে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দেশাত্মবোধ ক্ষণিক উত্তেজনার ফলস্বরূপ ছিল না। তিনি একদিকে ভারতীয় সভ্যতার মহিমা ও অন্যদিকে বর্ত্তমান ভারতের শোচনীয় অবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার দেশাত্মবোধ এত সংক্রামক—তাঁহার আহ্বানে শত শত লোকের মনে দেশপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণাই তাহার নিকট ছিল পবিত্র—ভারতের দৈন্যাবস্থা তাঁহার প্রাণে দাবানল

প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল। তাই ধর্মগুরু হইয়াও স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম-জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।" বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে নব জাগরণের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন, তাহার অগ্রদূত। তাঁহার স্পর্শে যেন এক মরণোন্মুখ জাতি নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব ছিল, গরীব-দুঃখীদের প্রতি তাঁহার অশেষ সহানুভূতি। তিনি নিজের জীবনে এক সময় উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের কি অপরিসীম যাতনা। পরে পরিব্রাজক অবস্থায় ভারতের দারিদ্র্যের মূর্ত্তি তাঁহার নিকট ভীষণভাবে প্রকটিত হইয়াছিল—যাহার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। ভগবানের উপর তিনি যেন অভিমান করিয়াই বলিতেন:—যে ভগবান গরীব-দুঃখীকে দুই মুঠো অন্ন দিতে পারে না, সেই ভগবানকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি মুক্তি ফুক্তি চাই না। আমি সহস্র সহস্র জন্মগ্রহণ করিতে রাজি আছি, যদি তাহার দ্বারা দীন দুঃখীর সেবা করিতে সক্ষম হই। গরীব দুঃখীদের সেবার জন্য সকলকে তিনি আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
　　ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম ক'রে যেই জন,
　　সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামী বিবেকানন্দই সংঘবদ্ধভাবে দুর্ভিক্ষ-বন্যা-প্রপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। দুঃখ-দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট লোকের প্রতি এত সহানুভূতি স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ের পরিচায়ক। আর তাঁহার এই বিশাল হৃদয়ের জন্যই অনেক লোক তাঁহাকে ভক্তিনম্র মস্তকে প্রণাম করিয়া থাকে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এমন কোন কোন লোক বলিয়া থাকেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নব-জাগরণের জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার জন্য 'স্বামী বিবেকানন্দ' হইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, 'শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত' থাকিলেই তাহা করিতে পারিতেন। তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করেন, কিন্তু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আস্থাসম্পন্ন নহেন, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসকে বাদ দিয়া তাঁহাকে দেখিতে চান। ইহা ঠিক যে সন্ন্যাসী না হইয়াও দেশসেবা করা যায়, গরীব, দুঃখী ও আর্ত্তের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ, সকলের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি খুব কম লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী না হইলে হয়তো এটর্ণী হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করতঃ অনেক দেশ-হিতকর কাজ করিতে পারিতেন, কিন্তু 'স্বামী বিবেকানন্দে'র ভারতের জাতীয় জাগরণে যাহা দান, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতাম।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বরূপ জানিতে হইলে, আমাদিগকে একটু গভীরভাবে তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, তাঁহার দুই একটা মাত্র কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা তাঁহাকে বিচার করিলে চলিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সন্দর্শন করেন, তখনই তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি নররূপী নারায়ণ, জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।" এই কথা কয়টি যদি কাহারও নিকট দুর্ব্বোধ্য হয়, তবে তাহা মোটেই দোষের

নহে; কারণ স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঐ কথাগুলি শ্রবণ করেন, তখন তিনি নিজেও তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐসব কথায় মনে মনে হাসিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অর্দ্ধ উন্মাদ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যখন নিজেই নিজের জীবনের পথ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তখনই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার জীবনের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনভাবে মানুষ জগতের উপকার করিতে পারে। প্রথমতঃ অন্নদান, দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাদান, তৃতীয়তঃ ধর্ম্মদান দ্বারা। এই তিন প্রকার লোকসেবার মধ্যে যিনি ধর্ম্মদান করিতে পারেন, তিনিই মানবের শ্রেষ্ঠ উপকার সাধন করেন। কারণ অন্ন ও বিদ্যালাভ করিলে জীবনে উপকৃত হওয়া যায়, কিন্তু সত্যের পথ আবিষ্কার করিতে পারিলে, জীবন মরণের সমস্যার সমাধান হইয়া যায়, জন্ম জন্মান্তরের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠদান তিনি মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় বহুলোক তাঁহার নিকট হইতে অনন্ত সুখের সন্ধান পাইয়াছে, এখনও অনেক লোক তাঁহার বাণীর সাহায্যে সত্যলাভের পথ আবিষ্কার করিয়া থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মবহুল জীবনে ধর্ম্মই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, একথা ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের উৎস ছিল, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন। বাল্যকালেই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশ আরম্ভ হয়। বাল্যকালেই দেব দেবীর মূর্ত্তিধ্যান করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত। যৌবনের প্রারম্ভে ইংরেজী শিক্ষার ফলে তাঁহার মধ্যে নাস্তিকতার ভাব আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা যেন তাঁহার আস্তিক্য বুদ্ধিকেই আরও দৃঢ় করিবার জন্য সাময়িকভাবে দেখা দিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্ম-জীবনে পূর্ণ-বিকাশ হয়, তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। একবার ঐ উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক অনুভূতির আস্বাদলাভ করিয়া, উহাতে ডুবিয়া থাকাই স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মৃদুভর্ৎসনা সহকারে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের উদ্দেশ্য আরও মহান্।

তাহার পর হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে প্রতিনিয়ত এক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার মন যেন সর্ব্বদা জাগতিক ব্যাপারের অতি উচ্চে একস্থানে অনবরত ধাবিত হইতেছে, অথচ কে যেন জোর করিয়া তাহার দ্বারা নানাভাবে কাজ করাইয়া লইতেছে। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনাবসানের প্রায় প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "নরেন যখন তাহার স্বরূপ অবগত হইবে, তখন আর তাহার শরীর থাকিবে না।" স্বামী বিবেকানন্দের স্বরূপ তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছিল বলিয়াই যেন শরীর রক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন। * * * যতই যা হ'ক, * * * আমি এখন সেই পূর্ব্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের বাণী অবাক হ'য়ে শুনতো আর বিভোর হ'য়ে যেতো। ঐ বালকভাবটাই হ'চ্ছে আমার আসল প্রকৃতি আর কাজকর্ম্ম পরোপকার যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতির উপরে কিছুকালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। * * *

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ

চলে গেছে—পড়ে আছে এটা কেবল পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস। অনেকদিন হ'লো নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিইছি। কোন বিষয়েই "এইটে আমার ইচ্ছে" বলবার অধিকার আর নাই। * * * * আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হ'য়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চল্‌ছি। যাই, মা, যাই। তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যা'চ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই।"

যাঁহারা প্রাচীনপন্থী তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ সন্দেহ করেন, ধর্ম্মই যদি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান সুর ছিল, তবে, লোকসেবা, দেশসেবা, পরোপকার ইত্যাদির উপর তিনি এত জোর প্রদান করিয়াছিলেন কেন? সকলেই তো জানে যাহারা ধর্ম্মকে কেবল পোষাকী ব্যাপার না করিয়া প্রাণের জিনিষ করিতে চায়, যাহারা একমাত্র ভগবানকেই জীবনের অবলম্বন করে, তাহারাই তো ধ্যান, ভজন, পূজা, পাঠ ইত্যাদিতে সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করে, তাহারা তো আর হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, স্থাপন করিতে যায় না, দুর্ভিক্ষ, বন্যায় সাহায্য বিতরণ করিতে ছুটিয়া যায় না—সুদূর অতীতকাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এরূপ তো কেহ করেন নাই—স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ করিতে বলিলেন কেন? তিনি কি ধর্ম্মের আবরণে শুধু জনহিতকর কার্য্যের প্রতিই লোকের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়া যান নাই? এখানেও কি "স্বামী বিবেকানন্দের" ভিতর হইতে "শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত" বাহির হইয়া পড়ে নাই?

এই বিষয়ে অনেকে একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কর্ম্ম করিতে বলেন নাই, কর্ম্মযোগ করিতে বলিয়াছিলেন; দরিদ্রের উপকার করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিতে লোককে আহ্বান করিয়াছিলেন। আর তাহা করিলে ধর্ম্ম-জীবনে পূজা পাঠ, ধ্যান জপ ইত্যাদির মত ফললাভ করিবার নিশ্চিত সম্ভাবনা।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশ-সেবা-নীতির মূলেও ছিল, গভীর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ হইতেই আধ্যাত্মিক বন্যা বাহির হইয়া সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইবে। যদি ভারতবর্ষ জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে, তবে জগৎ হইতে আধ্যাত্মিকতা লুপ্ত হইবে। তজ্জন্যই তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভ করিয়া আধ্যাত্মিকতাকে সজীব রাখিবে। এবং তাহাদ্বারাই জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হইবে ও পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে। তিনি বলিতেন, The World wants twenty men and women who will stand on the roadside and say that they want nothing but God জগতের খাঁটি কল্যাণের জন্য শুধু জন কুড়ি লোকের প্রয়োজন, যাহারা শুধু ভগবানকেই লাভ করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার জন্য জাগতিক যত কিছু জিনিষ বিসর্জ্জন দিবে। এই কথাটি কেবল একটা কল্পনার বিষয় মনে হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি দেখিতে পাইতেছি না যে, লোক ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া জীবনপথে চলিয়াছে বলিয়াই জগতে যত অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের উৎপত্তি?

স্বামী বিবেকানন্দের মতে মানবজাতির ভবিষ্যৎ আদর্শ, সমাজের সেই অবস্থা যে অবস্থায় এক সময়ে অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা, অনেক ঋষি বাস করিবে। বর্ত্তমান অবস্থায় পাঁচশত বা সহস্র বৎসর পরে পরে একজন বুদ্ধদেব বা যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ভবিষ্যতে এক সময়েই বহুসংখ্যক বুদ্ধ বা যীশুখৃষ্ট জগতে বাস করিবে। আর তখনই জগতে স্বামী

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যদি ক্রমবিকাশবাদ বিশ্বাস করি, তবে দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র amoeba হইতে ধীরে ধীরে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, আর সেই মানুষ ক্রমোন্নতির ফলে ভগবানকে লাভ করিয়াছে, এমনকি ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধের অভিজ্ঞতাও উপলব্ধি করিয়াছে। যদি একজন লোকেরও এই অভিজ্ঞতালাভ করা সম্ভব হয়, তবে ভবিষ্যতে—সুদূর ভবিষ্যতে, বহু লোকের একসঙ্গে তাহা উপলব্ধি করা অসম্ভব হইবে কেন? সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে স্বামী বিবেকানন্দের এই স্বপ্ন মিথ্যা নয়—আপাত দৃষ্টিতে বিপরীত গতি দৃষ্ট হইলেও ধীরে ধীরে জগৎ সেই অবস্থার দিকে চলিয়াছে।

ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ও বিভূতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

বৌদ্ধেরা সমস্ত জগৎকে পাঁচটি ধর্ম্মের সমষ্টি বলেন—রূপ ধর্ম্ম, বেদনা ধর্ম্ম, সংজ্ঞা ধর্ম্ম, সংস্কার ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান ধর্ম্ম। ইহারা তুলনায় কোনটি প্রত্যয় ও কোনটি প্রতীত্য। খ্যাতি শব্দের অর্থ পঞ্চশিখাচার্য্য করেছেন, 'বুদ্ধি বৃত্তি,' আর বৌদ্ধেরা করেছেন 'প্রকাশ'। বৌদ্ধেরা বলেন, 'প্রত্যয় ও প্রতীত্য' রূপে এই ধর্ম্ম সন্তান চলেছে। হেতুর অভাবে প্রতীত্য নাশ পায়। বৌদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদ (পটিচ্চ সমুপ্পাদং অনুলোমং) চক্র এইরূপ—অবিদ্যা হতে সংস্কার, সংস্কার হতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হতে নামরূপ, নামরূপ হতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হতে স্পর্শ, স্পর্শ হতে বেদনা, বেদনা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতে উপাদান, উপাদান হতে ভব, ভব হতে জাতি, জাতি হতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, বিরহ, ব্যাধিরূপ পঞ্চ সংসার দুঃখ। এক্ষণে "ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি"—যদি এই কারণ না থাকে, তা হলে এই ফল হয় না—এর (কারণের) নিরোধে এর (কার্য্যের) নিরোধ হয়। যেমন "যদিদং অবিজ্জা নিরোধা সঙ্খার নিরোধো, সঙ্খার নিরোধা বিজ্ঞাণনিরোধো" ইত্যাদি—অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ ইত্যাদি। একে বলে পটিচ্চ সমুপ্পাদং পটিলোমং—প্রতিলোম প্রতীত্য সমুৎপাদ। (উদান, বোধি-সুত্তং ২)। কিন্তু অবিদ্যা নিরুদ্ধ হয় কিরূপে? একটি প্রত্যয় দ্বারা অপর প্রত্যয় নিরুদ্ধ হয়—কাজেকাজেই অবিদ্যা কিসের দ্বারা নিরুদ্ধ হয়? নিশ্চিত বিদ্যা প্রত্যয় দ্বারা, কাজেকাজেই এই বিদ্যা প্রত্যয় বা নির্গুণ সন্তানই থেকে যাবে—এ হচ্ছে বেদান্তীদের সৎ ব্রহ্ম। কোনও কোনও বৌদ্ধেরাও এই শুদ্ধ-ভাব-সন্তান (যদি কথাটা ব্যবহার করা যায়) স্বীকার করেন।

পাতঞ্জল মতে ধর্ম্মের অনুপাতী ধর্ম্মীরও স্বরূপতঃ পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁরা বলেন ধর্ম্মের তিনটি অবস্থা (বিভূতি পাদ, ১৪ সূ)—(১) শান্ত—একটা ব্যাপারের পর যে প্রধ্বংসাভাব বা শান্তি, (২) উদিত —বর্ত্তমান ব্যাপারযুক্ত প্রকাশ বা বুদ্ধভাব এবং (৩) অব্যপদেশ্য—শক্তি বা বৈশ্বরূপ্য সংস্কাররূপে

(in potential form) অবস্থান। ব্যাস বলচেন, "যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্মঃ"—ধর্ম্মি সকলের (যথা অগ্নির) যোগ্যতা (দহন ক্রিয়া) দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশেষিত) যে শক্তি—তাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দু রকম—(১) প্রত্যক্ষ ও (২) বৈকল্পিক। (১) প্রত্যক্ষ ধর্ম্মকালে শব্দ সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। এ আবার দুরকম—(ক) যথার্থ ধর্ম্ম—যেমন সূর্য্যের প্রভা এবং (খ) আরোপিত ধর্ম্ম—যেমন মরুতে মরীচিকা। (২) বৈকল্পিক ধর্ম্ম—যা কল্পনা মাত্র—যার বাক্যই মাত্র সার—বাহ্য উপলব্ধি (ভ্রান্ত অথবা) বাস্তবতাহীন। যথার্থ ধর্ম্ম আবার দুরকম—(১) বাহ্য ও (২) আন্তর। (১) বাহ্য আবার ত্রিবিধ—(ক) প্রকাশ্য, যথা শব্দাদি, (খ) কার্য্য, যথা উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণাদি এবং (গ) জাড্য, যথা কাঠিন্যাদি। (২) আন্তর ধর্ম্মও ত্রিবিধ—(ক) প্রখ্যা ও ধৃতি, (খ) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং (গ) প্রযত্ন।

সমগ্র প্রত্যক্ষ বা বৈকল্পিক ধর্ম্মের মূল হলো তিনটি ধর্ম্ম- (১) পরিণাম বা রজঃ, (২) প্রকাশ বা বুদ্ধত্ব (সত্ত্ব), নিরোধ (তমঃ)।

ধর্ম্মের উদিত অবস্থায়ই বর্ত্তমান। বর্ত্তমান ব্যাপার শেষ হলে উদিত অবস্থা শান্ত অবস্থায় পরিণত হয়—অর্থাৎ বর্ত্তমান অতীতে আত্মগোপন করলো। মৃৎপিণ্ড ঘটের প্রাগভাব। যখন ঘট উদিত বা বর্ত্তমান হলো, তখন মৃৎপিণ্ড শান্ত বা অতীত হলো বটে, কিন্তু তা বলে বর্ত্তমানের প্রাগ্‌-ভাব অতীত বলা চলে না। কারণ যা একবার অতীত হয়েচে তা আর সেই দেশ কালাবচ্ছিন্নরূপে উদিত হতে পারে না। তবে "ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন" বা History repeats কথাটার মানে—তজ্জাতীয় বা তৎসদৃশ ঘটনার আবির্ভাব। বর্ত্তমানের প্রাগভাবকে অনাগত বলা চলে। অর্থাৎ উদিত বা বর্ত্তমান অনাগতে শক্তিরূপে অবস্থান করে। আবার বর্ত্তমান ঘট যখন প্রধ্বংসাভাব প্রতিযোগী অর্থাৎ বর্ত্তমানে যখন ধ্বংস শক্তি বা সংস্কাররূপে আত্মগোপন করে থাকে, তখন তাকেও অনাগত বা ভবিষ্যৎ বলা যেতে পারে। অবশ্য প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব কথা দুটোতে মীমাংসক ও সাংখ্যেরা আপত্তি করবেন বটে, কিন্তু এ দুটোকে আমরা অনভিব্যক্তি পর্য্যায়েই ধরে নিয়ে বিচার করছি।

আচ্ছা এখন এই অব্যপদেশ্য বা শক্তি জিনিষটি কি? ব্যাস বলচেন—"সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি"—যা থেকে সব হয়েচে, যা সকলের আত্মস্বরূপ, অথবা সর্ব্ববস্তু সর্ব্বাত্মক। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—"জলভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদি-বৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমাণাং স্থাবরেষু।" —যেমন, এক জল ও ভূমির পরিণাম দেখা যায় বৃক্ষের রস ও শরীরের অসংখ্য বৈচিত্র্যে, এক বৃক্ষের পরিণাম দেখা যায় অসংখ্য বৃক্ষভোজীর শরীরাদির বৈচিত্র্যে, আবার এক জঙ্গম (organic) শরীরের পরিণাম দেখা যায় স্থাবরাদির বৈচিত্র্যে।

কিন্তু এক জিনিষ থেকেই যদি সব জিনিষ হয়, তা হলে ঈশ্বর-কৃষ্ণ যে সৎকার্য্যবাদ প্রমাণ করতে গিয়ে (সাংখ্যকারিকা, ৯), বিভিন্ন কার্য্য সৃষ্টির পূর্ব্বে যে বিভিন্ন উপাদানের শক্তি-সম্বন্ধ-রূপ কারণ-বৈচিত্র্য স্বীকার করেচেন, তার উপায় কি হবে? শূন্য বা অসৎ হতে সতের উৎপত্তি হতে পারে না। কেন না শূন্যের কোনও ভেদ নেই। শূন্য হতে যদি কার্য্য হয়, তা হলে যে কোনও বস্তুর অভাব বা শূন্য হতে যে কোনও কার্য্যের সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু আমরা দেখছি সৃষ্টি-উপাদানের ভেদ আছে—তিল থেকে তেল হয়, বালি থেকে তেল হয় না। কিন্তু ব্যাস বলচেন, "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং"—সর্ব্ব বস্তুই সর্ব্ব বস্তুময়। অর্থাৎ সর্ব্ববস্তু এক শক্তির পরিণাম বলে—"সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং।"

উত্তরে পাতঞ্জলেরা বলেন, 'ব্যাস কারণে এক শক্তিরূপ উপাদান স্বীকার করেচেন—শূন্য বা

অভাব স্বীকার করেন নি।' ব্যাস বলেন, 'এই এক শক্তি—দেশ, কাল, আকার (আভ্যন্তরিক পুনঃসংস্থান), ও নিমিত্তের বৈচিত্র্য, তারতম্য বা আপেক্ষিকতা হেতু সমান ধর্ম্মের সৃষ্টি না কোরে—বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কোরচে; সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির সহিত সামান্য ও বিশেষভাবে ধর্ম্মীও তাদাত্ম্য লাভ কোরচে। যেমন দেশ ব্যবধানে একই বস্তু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বলে বোধ হয়, কাল ব্যবধানে একই ব্যক্তি শিশু ও বৃদ্ধ, বিভিন্ন আকারে জলের রূপ বিভিন্ন এবং নিমিত্ত ভেদে একই বিজ্ঞানোপকরণ সৃষ্টি ও ধ্বংস করে। বিদ্যুৎ-কণ-ভুকেরা এর দ্বারা কি করে হেলিয়াম (Helium) হাইড্রোজেনে (Hydrogen) বা রূপা সীসায় পরিণত হতে পারে বুঝতে পারবেন।

এক্ষণে শক্তির পরিণাম বা অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির ক্রম কি তাই পাতঞ্জলেরা দেখাচ্চেন (৩।১৫)—একটি ধর্ম্মীর একটি পূর্ব্ব ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থার নিবৃত্তি ও নব ধর্ম্ম-লক্ষণ ও অবস্থার অভিব্যক্তি হতে বোঝা যায় যে ধর্ম্মীর শক্তি বা সংস্কারের অভিব্যক্তির ক্রমের অন্যত্বই পরিণামের হেতু। এই ক্ষণাবচ্ছিন্ন ক্রমগুলি অতি সূক্ষ্ম বলে সাধারণ চক্ষে দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মীর ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা ধীরেধীরে অনেকগুলি ক্রম অতিক্রম করলে পরিবর্ত্তনটা যখন বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়, আমরা তখন পূর্ব্ব ধর্ম্ম-লক্ষণ ও অবস্থার সহিত তুলনা কোরে তার ক্রম-পরিবর্ত্তনটা বুঝতে পারি। যেমন প্রকৃতির সাত্ত্বিক পরিণামের আধিক্যে বুদ্ধি, রাজসিক পরিণামের আধিক্যে অহং এবং তমঃ পরিণামের আধিক্যে স্থিতিশীলতা আমরা বোধ করি। ধর্ম্মের (লক্ষণ ও অবস্থার সহিত) ক্ষণাবচ্ছিন্ন ক্রমগুলি যখন তমঃ প্রযুক্ত অতি ধীর হয়, তখনই চির পরিবর্ত্তনশীল অভিব্যক্ত জগৎদৃশ্যকে স্থিতিশীল বলে বোধ হয়। কিন্তু অনভিব্যক্ত শক্তিভাবে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা একেবারে স্থিতিশীল। সাধারণ চিত্তের পরিদৃষ্ট ধর্ম্ম হচ্চে—প্রমাণাদি ও রাগাদি এবং অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম হচ্চে—(১) নিরোধ সমাধি, (২) কর্ম্মাশয় বিপাক জনিত পুণ্য ও পাপ, (৩) স্মৃতি-তৃষ্ণা হেতু বাসনা (বাসনা বুঝতে গেলে তার ফলই মাত্র দৃষ্ট হয়), (৪) পরিণামের সূক্ষ্মক্রম, (৫) জীবন (প্রাণের ফল নিঃশ্বাসাদিই আমরা দেখি, এ স্বরূপতঃ অদৃষ্ট), (৬) ইচ্ছা, (এরও ফলের দ্বারা একে অনুমান করতে হয়, এও অদৃষ্ট) এবং (৭) শক্তির প্রথম অভিব্যক্ত অবস্থা। তন্ত্রে এগুলিকে "অদৃষ্ট-সৃষ্টি" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েচে।

বাস্তবিক miracle বা যাদু বলে কিছু নেই। যোগীরা সূক্ষ্মের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জ্ঞাত হয়ে যে কাজ করেন সেইটাই আমাদের মত স্থূল ইন্দ্রিয়ের নিকট অলৌকিক ব্যাপার। নিরন্তর জগৎ পরিণামের সূক্ষ্মসূক্ষ্ম ক্রমগুলির উপর মনের সংযম বা সমাধি করতে পারলেই অলৌকিক কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর চেতন-জগৎ প্রতিভাত হয়। চিত্তের সত্ত্ব বৃদ্ধির দ্বারাই সমাধিশক্তি বা অগ্রা বুদ্ধি লাভ করা যায়। যে কোন ধর্ম্ম বা বস্তুর ধার্ম্মিক, কালিক এবং দৈশিক পরিণামের ক্ষণাবচ্ছিন্ন ক্রমগুলির উপর চিত্তের সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করতে পারলেই সেই বস্তু সম্বন্ধীয় অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়। পূর্ব্বেই বলা হয়েচে যে বর্ত্তমানের ভেতরেই অতীত ও অনাগত সংস্কার রয়েচে। পরিণামের পূর্ব্বক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম নাশ হয়ে পর বা বর্ত্তমান-ক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হয় না, পরন্তু পূর্ব্বক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম, বর্ত্তমান-ক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হয়ে, সংস্কাররূপে বর্ত্তমান-ক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীকেই আশ্রয় করে থাকে এবং অনাগত বা ভবিষ্যৎ ধর্ম্মও সংস্কাররূপে বর্ত্তমান-ক্ষণাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীকেই আশ্রয় করে আছে। যাই তার দেশ, কাল, আভ্যন্তরিক

সংস্থান ও নিমিত্তরূপ প্রতিবাধা অপসারিত হবে, অমনি ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপে প্রকটিত হবে। সেই জন্য বর্ত্তমানাবচ্ছিন্ন যে কোন বস্তুর ওপর মনঃ সংযমের দ্বারা তার অতীত ও ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম ও অবস্থা জানা যেতে পারে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে পাতঞ্জলেরা শব্দ ও অর্থের বিভাগ মানেন এবং মীমাংসকেরা বলেন যে উভয়ের পৃথক জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু উভয়কে বিভক্ত করা যেতে পারে না। ব্যাসের মত হচ্ছে—বাগীন্দ্রিয়ের বিষয় বর্ণ এবং শ্রোত্রের বিষয় ধ্বনি। এই ধ্বনি সাহায্যে জীব কৃত্রিম ভাষা বা শব্দ প্রতীক সৃষ্টি করে শব্দ-পদ-বাক্যাদির স্থূল অভিব্যক্তি দেয়। ধ্বনিপর শব্দ উৎপত্তি ও নাশশীল। শব্দের মূল হচ্ছে নাদ বা অ আ, ক খ প্রভৃতি স্বর ও ব্যঞ্জন। এদের "একত্ব বুদ্ধিনিগ্রাহ্য' হতে মানস-শব্দ এবং মানস-শব্দের যথাযোগ্য একত্র সমাবেশে পদের সৃষ্টি হয়। মানস পদ ধ্বনির দ্বারা বহিঃ প্রকাশ্য। ধ্বনিপর পদের বাহক হচ্ছে নানাবিধ কৃত্রিম লিপি-সংগঠিত ভাষা। প্রত্যেক বর্ণ, শব্দ তথা পদের উপাদান এবং প্রত্যেক বর্ণের "সর্ব্ব-অভিধান-যোগ্যতা" আছে। মীমাংসকেরা বর্ণ বা নাদের সর্ব্ব-অভিধান (অর্থ) যোগ্যতারূপ সম্বন্ধকে অনাদি-নিধন বলেন। বেদান্তীরা একে আকাশবৎ নিত্য বলেন, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাবের তুলনায় অনিত্য। তান্ত্রিকেরা বর্ণের সারকে ওঁ বলেন। এই ওঁই যথার্থ নাদ। পাণিনীয়েরা শব্দের নিত্য-রূপকে স্ফোট বলেন। এ মানস-বোদ্ধ অর্থাৎ বর্ণের একত্ব-বুদ্ধি-নির্গাহ্য-মানস-শব্দ এবং পদ। তাঁরা বলেন, "অনুপূর্ব্বিক্রমে বিন্যস্ত বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার শব্দ বিশেষের নাম স্ফোট।' গো' এতদ্রূপ ধ্বনি হইলে তাহা হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় অন্য একটি নিঃশব্দ শব্দ জন্মে। তা 'গো' ইত্যাকার জ্ঞানে ব্যক্ত হয়। সেই সূক্ষ্ম 'গো' শব্দই স্ফোট। এ নিত্য, এরই সামর্থ্যে গলকম্বল পশু বিশেষ গোর প্রতীতি হয়ে থাকে।" কিন্তু পাণিনির গুরু উপবর্ষ বলেন, মাত্র বর্ণই আদি নিত্য শব্দরাশি। উদাত্তাদি উচ্চারণ ভেদে একই বর্ণের বিভিন্ন ভেদ হয় না ; অথবা 'সেই শব্দ এই', 'সেই বর্ণ এই' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও বলা চলে না। ব্যক্তি নানা হতে পারে, কিন্তু জাতি কিরূপে নানা হবে? যদি বল, বর্ণ অনেক, অনেক কখনও এক জ্ঞানের বিষয় হয় না, কাজেকাজেই স্ফোটরূপ শব্দের একত্ব স্বীকার্য। তথাপি অনেকের এক জ্ঞান গ্রাহ্যতার দৃষ্টান্ত আছে, যেমন পঙ্ক্তি, বন, সেনা, দশ, শত, সহস্র ইত্যাদি। আচ্ছা বর্ণই যদি এক-জ্ঞানগম্য হয়ে পদত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বোধক হয়, তা হলে রাজা জারা, পিক কপি, এ সকল শব্দ ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন? উত্তরে উপবর্ষ মতাব-লম্বী শাঙ্কর বেদান্তীরা বলেন, "প্রদর্শিত প্রয়োগে বর্ণসাম্য আছে বটে, কিন্তু ক্রমসাম্য নেই। বর্ণ সকল নিত্য ও বিভু হলেও ব্যবহারকালে উচ্চারণ ক্রমের অনুগ্রহে বস্তু বিশেষের সহিত তাদের সম্বন্ধ থাকা প্রতীত হয়, পরে এক বর্ণের পর অপর বর্ণ, তৎপরে অন্য বর্ণ এবং ক্রমে সমস্ত বর্ণ জ্ঞানগোচর হয়, পশ্চাৎ তা অর্থ প্রতীতির কারণ হয়।" এ সম্বন্ধে আচার্য্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৮ সূত্র হতে ৩০ সূত্রে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এইরূপে সর্ব্ব-অভিধান-যোগ্যতা-সম্পন্ন পূর্ব্বমূল বর্ণ সকলের সহিত উত্তর বর্ণ সকলের বিচিত্র সম্বন্ধ বশতঃ অসংখ্যরূপ সম্পন্ন হওয়ায় অসংখ্য ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে। শব্দ বা পদ যখন জ্ঞানারূঢ় হয় তখন তাকে বলে প্রত্যয় (Concept, idea)। বৃদ্ধেরা শিশুদের কৃত্রিম-ভাষা-প্রতীক সহায়ে ধ্বনিপর বাক্যের মধ্য দিয়ে শব্দ ও অর্থকে অন্তঃকরণে প্রত্যয়রূপে জ্ঞানারূঢ় করিয়ে দেন। শিশুকাল হতে অবিশ্লিষ্ট ভাবে, পাতঞ্জলেরা বলেন, শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়কে গ্রহণ করতে আমরা শিক্ষিত হই না বলে, তারা পরস্পর পরস্পরে

অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়ে একটি সংকীর্ণ বা মিশ্র পদার্থরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। পতঞ্জলি বলেন, ওদের প্রবিভাগে সংযম অভ্যাস করলে, সর্ব্বপ্রাণীর ভাষাজ্ঞান হয়। জনৈক যোগাচার্য্য বলেন, "ভাবনা কুশল যোগী কোন অজ্ঞাত-অর্থক শব্দ শুনিলে, সেই শব্দ মাত্রে সংযম করিয়া তদুচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্রে উপনীত হন। তথায় উপনীত জ্ঞানশক্তি বাগ্‌যন্ত্রের প্রযোজক যে উচ্চারকের মন, তাতে উপনীত হন। অনন্তর যে অর্থে সেই মন সেই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে যোগীর সেই অর্থের জ্ঞান হয়।'

ধ্যানেতে মানুষ যখন তার সুপ্ত চিত্তবৃত্তি সকল লক্ষ্য করে, তখন পূর্ব্ব-জন্মের জ্ঞান হয়। এ সব সুপ্ত চিত্তবৃত্তি বা সংস্কার কী রূপ? স্মৃতি ক্লেশ হেতু বাসনারূপ সংস্কার ও কর্ম্মাশয় বিপাক হেতু ধর্ম্ম (পুণ্য) ও অধর্ম্ম (পাপ)-রূপ সংস্কার। ভাষ্যে (৩।১৮) জৈগীষব্য ও আবট্য সংবাদ আছে। জৈগীষব্য সংস্কার সাক্ষাৎ হেতু তার দশ মহাসর্গের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হন এবং বলেন যে—"বিষয় সুখাপেক্ষয়া এব ইদং অনুত্তমং সন্তোষসুখমুক্তং, কৈবল্যাপেক্ষয়া দুঃখমেব।"—বিষয় সুখ হতে সন্তোষ সুখ অনুত্তম, কিন্তু কৈবল্য অপেক্ষা দুঃখময়।

প্রত্যয়ে সংযম করলে, পরচিত্ত জ্ঞান হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, 'স্বচিত্তে সংযম (Self-study, introspection) করলে পরচিত্ত-জ্ঞান (thought-reading) হয়। ভোজরাজ তাঁর বৃত্তিতে বলেন, "মুখরাগাদিনা' অর্থাৎ পূর্ব্বে নিজের ভেতর বিভিন্ন প্রত্যয়ের আবির্ভাব হলে, শরীরে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলি অধ্যয়ন করলে, অপরের মুখরাগাদি দেখে তার মনের ভাব বলা যায়। আরণ্যকাচার্য্য বলেন, 'যাহার চিত্ত জানিতে হইবে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজের চিত্তকে শূন্যবৎ করিলে তাহাতে যে ভাব উঠে, তাহাই পরচিত্তের ভাব।" পরচিত্তে যে সব জ্ঞানারূঢ় প্রত্যয় ভাসে তারই জ্ঞান হয়, তাদের উত্তেজক কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না, কারণ তা সংযমের বিষয় করা খুব কঠিন। কেউ দেখা করতে এলো, তার মনে তখন যে আনন্দ বা কুৎসিত ভাব সেইটাই পরচিত্ত-জ্ঞানীর চিত্তে তরঙ্গের ন্যায় এসে ছায়ার মত পড়বে। দেখা করতে আসবার পূর্ব্বে তার সেই আনন্দ বা কুৎসিত ভাবের আলম্বন, আশ্রয়, উত্তেজক বা প্ররোচক কী—তা মনে উঠবে না। কিন্তু যে সব প্রত্যয় আলম্বনকে ত্যাগ করে থাকতে পারে না (অর্থাৎ সহভাবী বা সহচর বা অযুতসিদ্ধ), সেই সব প্রত্যয়ে সংযম করলে তার আলম্বনের জ্ঞানও হয়। জ্বালার সঙ্গে অগ্নিজ্বালারই জ্ঞান হয়।

দেহের রূপে সংযম করলে, সেইরূপের যে শক্তি প্রবাহ, যা অপরের চক্ষে তরঙ্গাকারে গিয়ে আঘাত করে, স্তম্ভিত হওয়ার, অপরের নিকট সেই শরীর অন্তর্দ্ধান হয়—অপরের চোখের আলোকও আর তাকে প্রকাশ করতে পারে না। বেদান্তীরা চোখ দিয়ে দেখা জিনিষটা দুটো পরীক্ষার দ্বারা বোঝান। চোখের আলো অর্থাৎ চিত্তের জ্ঞান-শক্তি যা ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাহ্য দৃশ্যের আবরণ অপসারিত কোরে তাকে প্রকাশিত করে। এ না থাকলে স্ফীতালোক মধ্যবর্ত্তী বস্তুও দেখা যেত না। আবার অন্ধকারে সুশ্রীও বিগতশ্রী—যতক্ষণ না সূর্য্য বা তার বিকৃত কোনও শ্বেত কিরণের কয়েকটি মিশ্রিত বা একটি মৌলিক কিরণ তার ওপর পোড়ে প্রতি-হত (rebounding) হয়ে দ্রষ্টার চক্ষে স্পর্শ না দেয়। প্রত্যেক রূপবান বস্তুই সূর্য্যের সপ্তরশ্মির কয়েকটি নিজ শরীরে লীন (absorb) করে এবং কয়েকটি মিশ্রিতভাবে অপরের চক্ষে প্রক্ষেপ করে। তাই হচ্ছে দ্রষ্টার নিকট সেই বস্তুর রূপ। এখন, প্রথমে, বস্তু হতে রূপ তরঙ্গ চোখের ভেতর দিয়ে গিয়ে চিত্তে একটা বেদনার (sensation) সৃষ্টি করে, তখন চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে বুদ্ধ্যালোক ইন্দ্রিয় দিয়ে এসে তার বিশিষ্টতার পরিচয়

অন্তঃকরণের নিকট উপস্থাপিত করে, তারপর বুদ্ধি ও চিত্ত অহং-এর নিকট প্রত্যয় সৃষ্টি করে। এখন বস্তুর রূপ-তরঙ্গ যদি স্তম্ভিত হয়, তা হলে চিত্তে বেদনাই উঠবে না এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বুদ্ধ্যালোকের বহির্গতি যাকে আমরা সোজা ভাষায় মনোযোগ বলি তাও ঘটবে না, কাজেকাজেই শরীরও দেখা যাবে না। কারণ এটা আমাদের বেশ অভিজ্ঞতা আছে যে অমনোযোগীর নিকট দিয়ে মঞ্জীর, মূর্তি, কণ্ঠ, সুর ভেসে গেলেও সে চিন্তে পারে না। বিষয়ে অমনোযোগী শুকদেব সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখেও অপ্সরারা বস্ত্র গ্রহণ করলে না, কিন্তু ব্যাসকে দেখে তারা লজ্জায় জড়ীভূত হলো। একজন সাধুকে তাঁর গুরু শিক্ষা দেন যে নারীর নিকট যদি যৌবনভাবকে নিরুদ্ধ করে শিশুভাবকে প্রবুদ্ধ করা যায়, তা হলে সে নারী তাকে পুত্রভাবে ছাড়া অন্যভাবে দেখতেই পারবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের দান

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এদেশেরই একটি ক্ষুদ্র অখ্যাত পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মের শত বৎসর পূর্ণ হয়েছে, তাই দেশে দেশে নগরে নগরে তাঁর শতাব্দী-জয়ন্তি উৎসবের অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি।

রামকৃষ্ণদেব পাণ্ডিত্যে বিদ্যার দেবী বীণাপাণির বিশেষ কৃপা লাভ করতে পারেন নি। দেবী কমলাও মুক্তহস্তে তাঁর ধনভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়ে যান নি। বিশ্বসাহিত্যে তিনি এমন কিছু দেন নি, এমন কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন নি বা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা জগতের হিতের জন্য দান করে যান নি, যে উপকারের জন্য সমগ্র জগত তাঁকে স্মরণ করবে, কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। যেভাবে আজ সারা বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিক জন্মোৎসবের আয়োজন আড়ম্বর দেখতে পাচ্ছি, অন্য কোন মহামানবের জন্মোৎসব এভাবে জগতের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা সন্দেহ, বোধহয় হয় নি। আমরা কেন তাঁর উৎসব করছি? যেসব জাতি আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজকে সর্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখে এসেছে, তাদের মহা মহা রথিগণ কেনই বা আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রামকৃষ্ণ উৎসবে যোগদান করছেন? বিশ্বমানব দরবারে রামকৃষ্ণের কোথায় স্থান, কি তাঁর অবদান, বিশেষ করে ভাববার দেখবার সময় আজ এসেছে।

যতদূর আমাদের দৃষ্টি যায়, যতদূর আমরা কল্পনা করতে পারি—মনে হয়, মানব সৃষ্টির আদি-যুগ থেকে এক মহাসংগ্রাম চলে আসছে মানব সমাজে। এ সংগ্রাম ত্যাগ ভোগের দ্বন্দ্ব। উপনিষদে আমরা যে শ্রেয় প্রেয়র কথা পাই, পুরাণে যে আমরা দেবাসুর যুদ্ধের কাহিনী পাই, তা ঐ ত্যাগ ভোগ, শ্রেয় প্রেয়, দেবাসুর সংগ্রাম। খৃষ্টানশাস্ত্রে আছে—ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের-মত করে সৃষ্টি করেছিলেন। সত্যিই মানুষের

মধ্যে পরমেশ্বরের অনন্তশক্তি রয়েছে আর এ শক্তির জন্যই মানুষ ভগবানের অনুরূপ। মানুষের অন্তরে অনন্তশক্তির বীজ দান করে তার বিকাশের পথে একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতেও ঈশ্বর ভুল করেন নি। কস্তুরী মৃগের নাভিতে কস্তুরী যখন পূর্ণতা লাভ করে, তার গন্ধে দিক আমোদিত হয়ে ওঠে। সে গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে হরিণ ছুটে বেড়ায় সারা বনময়—কোথায় সে সুবাসের উৎস? দুর্গমে পর্বতে ছুটে বেড়ায় তবু তার আপন নাভি-দেশের কস্তুরীর সন্ধান পায় না। ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে শেষকালে বাঘের মুখে প্রাণ দেয়।

মানুষের সব ইন্দ্রিয়গুলো ভগবান বহির্মুখী করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ অপর সকলের মুখ দেখতে পায়, কেবল নিজের মুখখানিই তার দৃষ্টির মধ্যে আসে না। মানুষ চায় আনন্দ, আনন্দের জন্য সে সারা জগতময় ছুটে বেড়াচ্ছে। সে সন্ধান পায় নি,—সব আনন্দ, সব শক্তি তার আপন অন্তরেই বিরাজ করছে। শক্তির বিকাশের পথে অথবা যথার্থ আনন্দলাভের পথে আমাদের জ্ঞানের এ বহির্মুখ প্রতিবন্ধকই আমাদের দেবত্বলাভ করতে দিচ্ছে না। আনন্দের উপাসক কস্তুরী মৃগের জাতীয় এই যে বহির্মুখী মানব, এরাই ভোগবাদী, এরাই প্রেয় পথের পথিক, এরাই অসুর। এদের মতবাদ—'যতদিন বাঁচ, সুখে সুখে বাঁচ, ঋণ করে খাও ঘি।' এরা ঈশ্বর মানে না, শাস্ত্র মানে না, মহাজন মানে না; এসব মনে করে—স্বার্থপর বুদ্ধিমানদের প্রবঞ্চনা মাত্র।

আর এক ভাবের মানুষ আমরা দেখতে পাই, তাঁরাও আনন্দেরই উপাসক। তাঁরা তাঁদের অন্তরের মণিভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরাই শ্রেয় পথের পথিক, তাঁরাই ত্যাগী, তাঁরাই দেবতা। ভোগবাদ, অসুরবাদ ভারতকে বহু বার আক্রমণ করেছে, কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় এদেশে তার স্থান হয় নি।

যেদিন ভারতের ঋষিগণ এক পরম দেবতার সন্ধান পেয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,—"অমৃত-সন্তান—"

সেদিন তাঁরা সারা বিশ্ববাসীকে অমৃত-সন্তান বলে সম্বোধন করেছিলেন।

"অমৃত-সন্তান শুন বিশ্বজন,
দিব্যধামবাসী যত শুন শুন সবে,
জানিয়াছি আমি সেই মহান্ পুরুষে
অন্ধকার পরপারে আদিত্যের রূপ।
কেবল জানিলে তায় যাবে মৃত্যু-পার,
অন্য পন্থা নাহি আর, নাহি অন্য পথ।"

সেদিন থেকে ভারতের জাতীয় জীবনে সেই 'মহান্ পুরুষ' চরম স্থান লাভ করলেন। সেদিন থেকে ভারত সন্তানের ব্যক্তিগত সমাজগত, ধর্ম কর্ম শিক্ষা দীক্ষা সকলের লক্ষ্য হল সেই পরম দেবতা। সেদিন থেকেই ভারত ধর্মের দেশ।

গত শতাব্দীতে পশ্চিমের ভোগবাদীরা যখন ভারতের চিন্তাধারাকে আক্রমণ করেছিল, তাদের সাথে তাদের বিজ্ঞান জাহাজ গাড়ি কামান বন্দুক কলকারখানা এসে ভারত সন্তানকে একেবারে অভিভূত করে দিয়েছিল; সেদিনের মত দুর্দিন ভারতের ইতিহাসে আর এসেছিল কিনা একমাত্র ভারতের ভাগ্য বিধাতাই বলতে পারেন। ভারত সভ্যতার হাজার হাজার বৎসরের কঠিন ভিত্তি সেদিন কম্পিত হয়ে উঠেছিল। ভারত সন্তানেরা মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে সুখের স্বপ্নে বিভোর ছিল। সে দুর্দিনের ভীষণতা তারা অনুভব করলে না, জানতেও পারলে না। এ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা তাদের একদিন ভাঙতই। জেগে তারা আগের সে ভারতকে আর খুঁজে পেত না, দেখত—ভারত শরীরে ফ্রান্স বা ইংলণ্ড নূতনরূপে বিরাজ করছে।

পুরাণ কথায় আমরা শুনেছি—দেবাসুর সংগ্রামের মহা সঙ্কট সময়ে দধীচি মুনি জগত রক্ষার

৺দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

৺নবগোপাল ঘোষ

৺মাতঙ্গিনী ঘোষ

৺কৃষ্ণভাবিণী বসু

৺নিস্তারিণী ঘোষ

জন্য নিজের অস্থিরাজি অকাতরে দান করেছিলেন। বর্তমান দেবাসুর সংগ্রামে, ত্যাগ ভোগের সংঘর্ষে আমরা এক নবীন সাধককে দেখতে পেলাম,—যিনি তপস্যার হোমানলে তিল তিল করে নিজের জীবন সমর্পণ করলেন, সাধনার পূত অস্থি দিয়ে তিনি অসুরবাদ ভোগবাদকে পরাজিত করে করলেন—দেববাদ আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা। বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন,—"ঈশ্বর লাভই মানবজীবনের লক্ষ্য, কাম-কাঞ্চন-বর্জ্জনেই মানবতার পূর্ণত্ব।" প্রদীপ দেখে পতঙ্গের পাল যেমন ছুটে যায় বিনাশের পথে, আমরাও সেদিন পশ্চিমী বিজলি আলোকে ছুটে চলেছিলাম। আমাদের চোখ আমাদের মন এক মোহনীয় রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মত একটি জীবন সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন আমাদের গতিরোধ যদি না করত, কোথায় গিয়ে আমাদের এ রঙিন যাত্রার শেষ হত—আজ কে বলবে?

শুধু ভারতের নয় সমগ্র জগতের কাছে ভারত-সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক রামকৃষ্ণের এইটিই প্রথম দান। রামকৃষ্ণদেবের চরিতকার এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন,—যে বৎসর পাশ্চাত্যভাবের বাহন ইংরেজি ভাষাকে আইন করে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠ করা হয়, ঠিক সে বৎসরই রামকৃষ্ণদেবের জন্ম। রোগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাগ্যবিধাতা ঔষধও যেন প্রেরণ করেছিলেন।

আমাদের পরিবেষ্টনীর গণ্ডি ছাড়িয়ে যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিকে একটু দূর প্রসারিত করতে পারি, তা হলে কি দেখি? পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বত্রই শুধু জঠরানল হিংসানল সমরানল। কোটিপতির প্রাসাদ থেকে, ভিকিরির পর্ণকুটির হতে মুমূর্ষু রোগীর আকুল আর্তনাদের মত ক্রন্দনের রব—"শান্তি কই, শান্তি কই, শান্তি কই?" ধনবিভব রাজসম্পদ মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি, মান যশ প্রভুত্ব মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি। জড়বিজ্ঞান মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি। মান যশ প্রভুত্ব মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি। মানব সমাজকে শান্তি দিতে পারে একমাত্র ধর্ম।

আবার ধর্মের নামে জগতে যত অশান্তি অত্যাচার অবিচার রক্তপাত হয়েছে, এমন আর কিছুতেই হয় নি, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। জগতে বহু ধর্ম, বহু মত, প্রত্যেকে আবার ভিন্নমুখী। এক জন যদি বলে—'পূর্বদিকে যাও', অপর জন বলবে,—'না না, ও কথা মুখে এনো না, ও যে মহাপাপ, পশ্চিমে যাও, নইলে অনন্তকাল ধরে নরকে পচতে হবে।' অনেক ধর্মেই ধর্ম-প্রচারকে ধর্ম-সাধনের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে মনে করা হয়। সব ধর্মই সত্য, সব পথই সেই পরমেশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, তবুও মানব পরের ভাবকে ক্ষুণ্ণ করে নিজের ভাব প্রচার করবার চেষ্টাই করে আসছে বরাবর। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে যাতায়াত ও প্রচারের এত সুবিধা হয়েছে যে, সকলেই সর্বত্র অবাধে অক্লেশে গমনাগমন করছে, নিজের ভাব পুস্তকে পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করে দুর্গম দেশেও প্রচার করছে। দুর্বলচিত্ত মানুষের কাছে অন্য ভাবের লোক এসে যখন বলে,—'তোমার বিশ্বাস মিথ্যা, তোমার পথ ভুল, তোমার ভাব অর্থহীন'; তখনই সে ভয় পেয়ে যায়। যারা সবল মনের লোক তারা পাল্টা জবাব দেয়, তারপর কি হয়, না বললেও চলে। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক সমাজের সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু, অধিকাংশ লোকেরই বিচার-শক্তি খুব প্রখর নয়। একে আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তার উপর এই সব নানা ধর্মভাবের ধর্মমতের সংঘাতে পড়ে মানব মন সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছে। তাতে একদল লোক মরিয়া হয়ে ধর্মকে মানবজীবন থেকে একেবারে বাদ দিয়ে শান্তিলাভের চেষ্টা করছে, আর আধুনিক বিজ্ঞানও তাদের এ প্রচেষ্টায় সহায়তা করছে।

সারা পৃথিবীর মহা মহা রথিগণ যুগ যুগ ধরে ভেবে ঠিক করতে পারেন নি, কি করে ধর্মসমস্যার সমাধান হতে পারে। কেউ ভাবলেন—সমগ্র মানবজাতিকে যদি এক ধর্মে দীক্ষিত করা যেতে পারে, তাহলেই আর ধর্মবিবাদ থাকবে না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি আমরা ভাবতে একটা নূতন প্রচেষ্টা দেখতে পাই। তাতে বিভিন্ন ধর্ম থেকে বেছে বেছে কতকগুলো সমান সমান মতবাদ দিয়ে আর একটা নূতন ধর্ম গড়বারও চেষ্টা হয়েছিল।

বর্ত্তমান বৈপ্লবিকযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মত একটি মহাজীবনের সত্যই বড় আবশ্যক ছিল। শিশু তার শরীরের ব্যথার কথা বলতে পারে না, কোথায় ব্যথা তাও সে জানে না, তবুও যাতনায় সে কাঁদে। তেমনি সমগ্র মানবসমাজ ধর্মসংঘর্ষে পড়ে সত্যই ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তার দুঃখ হয়তো সে প্রকাশ করে বলতে পারে নি, তবুও যথার্থই সে কেঁদেছিল। সারা বিশ্বের এ অশান্তি অনলের উপর রামকৃষ্ণজীবন শান্তিবারি বর্ষণ করছে।

পৃথিবীর বড় বড় মনীষিগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে 'মহাসমন্বয়াচার্য' আখ্যা প্রদান করেছেন। যে সমন্বয়ধারা হিন্দুশাস্ত্রে এতদিন চলে আসছিল, যে সমন্বয়ভাবকে আমরা হিন্দু ধর্মে নানাস্থানে কোরকাবস্থায় দেখি, রামকৃষ্ণ জীবন সে ভাবের পূর্ণ-বিকশিত শতদল। ধর্মের যে সব বিরুদ্ধ মত, পথ, অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে আমরা কোন প্রকার সামঞ্জস্য খুঁজে পাই নি, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দেখেই আমরা এই সব আপাতবিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছি। রামকৃষ্ণদেবের মুখের কথার চেয়ে তাঁর অলৌকিক জীবন জগতের উপকার করেছে ঢের বেশি। রামকৃষ্ণ-জীবনে আমরা বিভিন্ন ধর্মেরই যে সমন্বয় পাই, তা নয়, আমাদের চির-বিবাদের—জ্ঞান ভক্তি কর্ম, শৈব শাক্ত বৈষ্ণব, দ্বৈত অদ্বৈত, গার্হস্থ্য সন্ন্যাস, সাকার নিরাকার, এগুলোরও এক চমৎকার সমন্বয় পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় দান—এই সমন্বয়বাদ। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনকে ভিত্তি করে এ অপূর্ব সমন্বয়বাদ শীঘ্রই জগতে যুগান্তর আনবে, একথা নিশ্চিতই বলা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় দান—'স্বামী বিবেকানন্দ'। রামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"তুই কি চাস।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—"আমাকে এমন করে দাও, যেন দিবানিশি সমাধিতে ডুবে থাকি, সংসারের কোন জ্ঞান যেন আমার না থাকে।' গুরু তাতে ভর্ৎসনা করেছিলেন,—"আমি ভেবেছিলুম তুই বিশাল অশ্বত্থ গাছের মত হবি, আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তাপিত জীব তোর আশ্রয়ে এসে শান্তিলাভ করবে। তুইও কিনা শেষকালে শুধু নিজের আনন্দের জন্য পাগল হলি।' এ ঘটনায়ই বুঝতে পারা যায়,—পৃথিবীর পীড়িতের আকুল ক্রন্দন, দলিতের নয়নের জল, ব্যথিতের হৃদয়-বেদনা একদিন যেমন করে আমাদের রাজকুমার সিদ্ধার্থকে গৃহছাড়া রাজ্যছাড়া করেছিল, তেমনি মায়ের আদুরে ছেলে রামকৃষ্ণকেও পাগল করে তুলেছিল। যে সমাধি মানবজীবনের চরম কাম্য, যার আনন্দের শতাংশের সঙ্গেও জাগতিক কোন আনন্দের তুলনা হয় না, শুধু জগতের কল্যাণের জন্যই প্রাণপ্রিয় শিষ্যকে তিনি তা দিতে চাইলেন না। এ ঘটনায়ই বুঝতে পারা যায়, কেন রামকৃষ্ণ যুবক নরেন্দ্রকে তিলে তিলে গড়ে স্বামী বিবেকানন্দ রূপ দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেব যেমন তাঁর পূত হোমাগ্নি-সম্ভাত অমূল্য রত্ন 'স্বামী বিবেকানন্দ' জগতকে দান করে গেলেন, বিবেকানন্দও তেমনি বিশ্বমানব-সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণকে দান করে গেছেন। সত্যই, স্বামী বিবেকানন্দকে না পেলে জগত আজ শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝত কি না, কে বলবে? রামকৃষ্ণদেবের যদি আর

অন্য কোন বিশেষত্ব নাও থাকত, তবু একমাত্র বিবেকানন্দরূপ অপূর্ব্ব জীবনের রূপকার বলে তিনি জগতে চিরকাল পূজ্য হয়ে থাকতেন।

ডক্টর কালিদাস নাগ বলেন,—"১৯৩১ সালে আমেরিকা এসে দেখি রোমাঁ রোলাঁর 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' পুস্তক ইংরেজি অনুবাদ হয়ে সেদেশে ঘরে ঘরে হাতে হাতে ফিরছে। পাশ্চাত্য জগত এখনও ভোগের নেশায় ও ভোগের উপাদান সংগ্রহে মত্ত, তবু তার মর্ম্মস্থানে ত্যাগের দীপ্ত ধর্মের প্রেরণা জাগছে,—একথা রোলাঁ প্রাণ দিয়ে অনুভব করছেন। তাই তিনি সারা বিশ্ব খুঁজে বাংলার গ্রামের এই মরমী সাধককে যেন নূতন করে আবিষ্কার করেছেন। * * যে যুগে ক্যাথারিণ মেওর 'মাদার ইণ্ডিয়া'ই বুঝি ওদেশে প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়ে উঠত, ঠিক সেই সময়ই রোলাঁর 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ' ভারতবর্ষকে ও ভারতীয় সভ্যতাকে তার অখণ্ডরূপে ও শাশ্বত মহিমায় উদ্ভাসিত করে বিশ্বমানবের দরবারে ধরেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ভারত কি পেয়েছে, সারা বিশ্ব কি পেয়েছে, তা পরিপূর্ণরূপে অনুভব করবার বা বিচার করবার সময় এখনও আসে নি।

মানব সাধনার ভিত্তি

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

ভগবানের সৃষ্টিতে অসংখ্য প্রাণিবর্গের মধ্যে মানুষও একটি দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণী। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষেরও সুখদুঃখ আছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, রাগদ্বেষভয় আছে, রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দের অনুভূতি আছে, হেয় ও উপাদেয়ের ভেদজ্ঞান আছে, উপাদেয়-লাভ ও হেয়-পরিহারের জন্য কর্ম্ম-প্রেরণা আছে। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যুর অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ সকল বিষয়ে মানুষ অপরাপর প্রাণিসমূহের সহিত সমান ভূমিতেই বিচরণ করে। যদিও মানুষের দৈহিক গঠন, ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ, এবং সর্ব্বোপরি মনোবৃত্তির বৈচিত্র্য এসব ক্ষেত্রেও মানুষকে যে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে, তাহাতে প্রাণিজগতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত, কিন্তু তথাপি মানুষের জীবন যদি ইহার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, তাহা হইলে মানুষ এই জগতে যে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, তাহা ভিত্তিহীন হইত। সমজাতীয় বহুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এক কথা, জাতিগত-ভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব অন্য কথা। মানুষ যে সৃষ্টির একটি উন্নততর স্তরে বিচরণশীল, তাহার প্রমাণ প্রাণি-সাধারণ শক্তি ও বৃত্তিসমূহের পরিমাণগত তারতম্যের ভিতরে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, প্রাণি-সাধারণ কর্ম্ম, ভোগ ও অনুভূতির বৈচিত্র্য ও জটিলতার অধিকতর বিকাশদ্বারা তাহা নিরূপিত হওয়ার যোগ্য নয়। মানুষের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাতে তাহার সমগ্র জীবনটিকেই, জীবনের সব বিভাগকেই, একটি উন্নততর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাবতীয় প্রাণী অপেক্ষা তাহাকে উচ্চতর অধিকার প্রদান করিয়াছে।

মানুষের এই বৈশিষ্ট্য কি? কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,

> শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
> স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

এই যে শ্রেয় ও প্রেয়ের বিবেক,—ইহা মনুষ্য-জাতির বৈশিষ্ট্য, ইহাতে মনুষ্যজাতি অপরাপর যাবতীয় প্রাণিজাতি হইতে বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

করিয়াছে। অন্যান্য প্রাণীর স্বভাব প্রেয়ের অনুবর্তন করা। যাহা তাহাদের ভাল লাগে, তাহাদের জীবনধারণের জন্য ও দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য যাহা আবশ্যক বোধ হয়, তাহার দিকেই তাহারা স্বভাবতঃ নির্বিচারে ধাবিত হয়। প্রেয়প্রাপ্তি ও অপ্রেয় ত্যাগের জন্যই তাহাদের কর্ম্মপ্রেরণা। অপ্রেয়-সংযোগ ও প্রেয়োবিয়োগেই তাহাদের দুঃখ। তাহাদের রাগদ্বেষ ভয়াদি সবই প্রেয়কে কেন্দ্র করিয়া প্রকটিত হয়। এক প্রেয়ের সহিত অপর প্রেয়ের ভেদ তাহাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, এবং অধিকতর প্রেয়ের আশায় অল্পতর প্রেয়কে তাহারা বিসর্জ্জন করিতেও শিখে। কিন্তু প্রেয় হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন শ্রেয়ের জ্ঞান প্রাণিসাধারণের চিত্তে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না।

মানুষের চিত্তবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেয় হইতে শ্রেয়ের একটা পার্থক্যবোধ জাগ্রত হয়। উচিত ও অনুচিত, ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, শুভ ও অশুভ, পুণ্য ও পাপ,—এই জাতীয় ভেদবুদ্ধি মানবচিত্তে স্বভাবতই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা অনুচিত, মন্দ, অন্যায়, অশুভ বা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা প্রেয় হইতে পারে, দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহা কখন কখন আবশ্যক বোধ হইতে পারে, জীবনধারণের জন্যও তাহা কখন কখন প্রয়োজনীয় মনে হইতে পারে, তথাপি মানববুদ্ধি তাহা অনুমোদন করে না, তাহা পরিহার্য্য বলিয়াই নির্দ্ধারণ করে। মানব চিত্তবিকাশের নিম্নতর স্তরসমূহে প্রাণিসাধারণ প্রেয়োলিপ্সা মনুষ্যোচিত শ্রেয়োলিপ্সা অপেক্ষা স্বভাবতই প্রবলতর থাকে, এবং সেই হেতু শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়াও অনেক সময় মানুষ প্রেয়ের অনুধাবন করে। কিন্তু তখনও শ্রেয় ও প্রেয়ের ভেদবুদ্ধির অভাব হয় না। আবার, একজন যাহা শ্রেয় মনে করে, অপরে তাহা অশ্রেয় মনে করে, এবং একই ব্যক্তি এক সময়ে বা এক অবস্থায় যাহা শ্রেয় বলিয়া আলিঙ্গন করে, অন্য সময়ে বা অন্য অবস্থায় তাহা অশ্রেয় বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু শ্রেয় ও অশ্রেয়ের ভেদবোধ সর্ব্বাবস্থাতেই সকল মানুষের চিত্তকে আন্দোলিত করে। শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, মনুষ্যোচিত বিবেকবুদ্ধি যাহা অশ্রেয় বলিয়া ঘোষণা করে, দেহেন্দ্রিয় মন যখন তাহাই প্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত হয়, এবং বিবেকবুদ্ধি যাহা শ্রেয় বলিয়া আদর্শরূপে মনের সম্মুখে উপস্থিত করে, দেহেন্দ্রিয় মন যখন তাহা অপ্রেয় বলিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখনই মানুষের অন্তঃকরণে একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই দ্বন্দ্ব আছে বলিয়াই মানুষের জীবনে নানারূপ সমস্যা চিরকালই সমুদ্ভূত হয়, এবং এই হেতুই তাহার জীবন সাধনাময়। ইতর প্রাণীদের অন্তরে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব, আদর্শ ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব, নাই বলিয়াই, তাহারা সাধনার অধিকারী নয়, তাহাদের জীবনে জ্ঞাতসারে কোন গুরুতর সমস্যা নাই এবং সমস্যা সমাধানের কোন সবিচার প্রচেষ্টাও নাই।

শ্রেয় ও প্রেয়ের ভেদানুভূতি ও তজ্জনিত সাধনাই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই কারণেই অপরাপর প্রাণী সাধনারহিত ও মানুষ সাধনার অধিকারী। এই কারণেই এই প্রকৃতিরাজ্যে মানুষের যে স্বাধীনতাবোধ আছে, অপর প্রাণীদের তাহা নাই। এই কারণেই মানুষের জীবন অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা অনন্তগুণে জটিলতাময় ও রহস্যময়। প্রেয়োবিবিক্ত শ্রেয়োবোধের উপরেই মনুষ্যজীবনের যাবতীয় মনুষ্যোচিত সাধনা ও সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে প্রাণিসাধারণ বৃত্তি ও মনুষ্যোচিত বৈশিষ্ট্য উভয়ই বিদ্যমান থাকায়, সে প্রেয়ের বন্ধনও ত্যাগ করিতে পারে না, শ্রেয়ের আদর্শও অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে না পারিলে, তাহার অন্তর্যুদ্ধ কিছুতেই নিবারিত হয় না। ইহার

মধ্যে আরো মুস্কিল এই যে, যথার্থ শ্রেয় কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা অতিশয় কঠিন। নিজের দেহেন্দ্রিয় মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া প্রেয়কে সহজেই ধরা যায়, কিন্তু শ্রেয় সম্বন্ধে অনন্ত মতভেদ। সুতরাং মানব-জীবনের প্রধান সমস্যাই এই যে, শ্রেয়ের যথার্থ স্বরূপ কি? তাহার ভিতরে কর্ম্ম-শক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ভোগশক্তি স্বভাবতই বিদ্যমান, এবং বহির্জ্জগতের সহিত আদানপ্রদান ও ঘাত প্রতিঘাতে তাহার শক্তিসমূহ উদ্বুদ্ধ হইয়া বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। জগতের বিবিধ বিষয়ের সহিত স্বাভাবিক ভাবেই তাহার পরিচয় হয় এবং আরো ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক পরিচয়লাভের জন্যও তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। বিচিত্র ভোগ্য সামগ্রী তাহার দেহেন্দ্রিয় মনে অনুকূল ও প্রতিকূল বেদনা উৎপাদন করে, এবং অনুকূল বেদনালাভ ও প্রতিকূলবেদনা পরিহারের জন্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি হেয়োপাদেয় বিভাগপূর্ব্বক ভোগ ও ত্যাগে প্রবৃত্ত হয়। তাহার কর্ম্মশক্তিও এইরূপে সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্যে নানাভিমুখী হইয়া প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই প্রকার প্রাণি-সাধারণ স্বভাব হইতে প্রসূত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভোগে তাহার শ্রেয়োলাভের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তাহার অন্তরে অনবরত প্রশ্ন উঠিতে থাকে, কিরূপ জ্ঞানলাভ করা উচিত, কিরূপ কর্ম্ম করা উচিত, কিরূপ ভোগ গ্রহণ করা উচিত, কি প্রকার কর্ম্ম জ্ঞান ও ভাবের অনুশীলন করা উচিত, কি প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম, ভোগ ও ভাবের অনুশীলনে মনুষ্যজীবন সম্যক্‌রূপে সার্থকতা মণ্ডিত হইতে পারে? শ্রেয়স্কর জ্ঞান, শ্রেয়স্কর কর্ম্ম, শ্রেয়স্কর ভোগ ও শ্রেয়স্কর ভাব স্বরূপত কি, এবং কি উপায়ে তাহা লাভ করা সম্ভব? প্রেয়কে কিরূপে শ্রেয়ের অনুবর্ত্তী করা সম্ভব হইতে পারে? মানববুদ্ধির ক্ষেত্রে ইহাই চিরন্তন প্রশ্ন।

মানববুদ্ধি শ্রেয়ের আদর্শ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ প্রেয়ের মধ্যেই শ্রেয়কে অনুসন্ধান করিতে থাকে ও সিদ্ধান্ত করে যে সুখই বস্তুতঃ শ্রেয়। সুখ যে পরিমাণে দুঃখমিশ্রিত ও অস্থায়ী হয়, সেই পরিমাণেই তাহা অশ্রেয়; স্থায়ী গভীর ও অবিমিশ্র সুখই শ্রেয়, এবং তদনুকূল কর্ম্ম জ্ঞান ও মনোবৃত্তির অনুশীলনই শ্রেয়ের পথ। ভবিষ্যতে স্থায়ী গভীর ও অবিমিশ্র সুখলাভ করিবার উদ্দেশ্যে, অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালের ক্ষণিক অগভীর দুঃখমিশ্রিত পশ্চাত্তাপপ্রদ সুখ আপাততঃ দেহেন্দ্রিয় মনকে আকর্ষণ করিলেও তাহা বিসর্জ্জন করা সমুচিত বলিয়া বিবেচিত হয়। সুখই যাবতীয় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাবানুশীলনের আকাঙ্ক্ষণীয় ফল, এবং এই ফলের তারতম্যেই কর্ম্মজ্ঞানাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। এই সুখের জন্যই ঐশ্বর্য্য আহরণ ও সঞ্চয় করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হয়, এবং অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারিলে ঐশ্বর্য্যেরও সার্থকতা বোধ হয় না। অতএব সুখ ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব এই তিনটিকেই কর্ম্মজ্ঞানাদির আদর্শ বলিয়া অপরিপক্ক মানববুদ্ধি গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে এই তিনটিকে 'কাম' ও 'অর্থ'—এই দুইটি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব এক অর্থেরই দ্বিবিধ মূর্ত্তি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন পর্য্যন্তও এই তিন দেবতার আরাধনাতেই নিয়োজিত। সুখ, ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বকেই শ্রেয়রূপে গ্রহণ করিয়াই পাশ্চাত্যদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে. এই তিনটিকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই সেখানে মানবীয় কর্ম্মশক্তির অদ্ভুত জাগরণ ও সংগঠন হইয়াছে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধও ঐ তিনটি পুরুষার্থকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্ত্তিত হইতেছে। ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ শ্রেয়ঃ সম্বন্ধীয় এইরূপ ধারণাকে আসুরিক ধারণা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তৎপ্রতিষ্ঠ সভ্যতাকে আসুরিক

সভ্যতা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। সৃষ্টিবিধানে নানাবিধ সংঘর্ষের সৃষ্টি দ্বারা এই সভ্যতা নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করে। প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৈরভাবপোষণ, আত্মসম্পদ্ বৃদ্ধি ও পরসম্পদ্ হরণের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘসংগঠন, মহাযন্ত্র-সংস্থাপন ও মারণাস্ত্রাবিষ্কার, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার—এ সকলই এই সভ্যতার নিত্য সহযাত্রী, এবং ইহার ফলেই ক্রমশঃ এই সভ্যতা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। ইহাতে মানবীয় জীবন সমস্যারও সমাধান হয় না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলেও দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণের অন্নসমস্যারও সমাধান ইহা দ্বারা সম্ভব হইতেছে না। অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে মানবীয় শক্তির অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ দৃষ্ট হইলেও, অধিকাংশ লোক সামান্য অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের জন্যই অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত। সভ্যতার চাকচিক্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাও ক্রমশই বিকট আকার ধারণ করিতেছে। এই সমস্যাই এই সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে এবং তৎসহগামী জাতিগত শ্রেণিগত ও সম্প্রদায়গত বিরোধ এই ধ্বংসযজ্ঞে পূর্ণাহুতির ব্যবস্থা করিতেছে। প্রাচীন ইতিহাসও বহুবার ইহার প্রমাণ দিয়াছে। প্রেয়কে শ্রেয়ের আসনে বসাইয়া মানবসমাজ কিছুতেই শান্তিলাভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। ইহাতে বৈষম্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী, এবং ধ্বংস অনিবার্য্য।

তবে, শ্রেয়ের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়? মানবপ্রাণের মধ্যে প্রেয়োবিবিক্ত শ্রেয়ের অনুভূতি যে মূল উৎস হইতে আসিয়াছে, মানবপ্রাণকে শ্রেয়ের অনুসন্ধিৎসু করিয়া যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রেয়ের সন্ধানও মানুষ সেখান হইতেই পাইয়া থাকে। প্রেয়ের বাসনা মানবের দেহেন্দ্রিয় মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে বলিয়াই, শ্রেয়ের স্বরূপ প্রকাশ অন্তরে অন্তরে হইলেও মানুষ বিচারবুদ্ধিতে তাহা ধরিতে পারে না। মানুষের বিচারবুদ্ধিও প্রেয়োবাসনা দ্বারা কলুষিত হয়। মানবের জীবন-পথে প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক অবস্থায় প্রেয় যেমন স্বভাবত তাহার দেহেন্দ্রিয়মনকে আকর্ষণ করে, শ্রেয়ও তেমনি প্রেয়ের শক্তিকে সংযমিত করিয়া আপনার দিকে মানুষকে টানিয়া লইতে চায়। কিন্তু প্রেয়োবাসনার প্রাবল্যহেতু শ্রেয়ের আকর্ষণ সাধারণ মানুষের চিত্তকে একটু দোদুল্যমান করিয়াই নিবৃত্ত হয়, আপনার স্বরূপটি তাহার প্রত্যক্ষগোচর করিতে সমর্থ হয় না এবং প্রেয় অপেক্ষা উজ্জ্বলতররূপে আপনাকে প্রকটিত করিতে পারে না। যাহাদের চিত্তে প্রেয়ের বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়, অন্ততঃ সাময়িকভাবেও যাহাদের বুদ্ধি প্রেয়ের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহাদের নিকট শ্রেয়ের যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষীভূত হয়। তাঁহারা শ্রেয়োদ্রষ্টা হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মনুষ্যগণ ঋষিপদবাচ্য। এই জাতীয় মনুষ্য যে বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালেই আবির্ভূত হন, তাহা নহে। তবে, সৃষ্টিবিধানে মানবসমাজের প্রয়োজনানুসারে কোন বিশেষ কালে ও বিশেষ দেশে এইরূপ ঋষিশ্রেণীর মনুষ্য অধিক সংখ্যায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মানবসমাজের বিচিত্র রুচি বুদ্ধি শক্তি প্রকৃতিসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের মানব-মণ্ডলীর জীবন-সমস্যাগুলি যেন ঐ সব ঋষিদের চিত্তে প্রতিফলিত হয়, এবং সেই সব সমস্যার সমাধানও তাঁহাদের বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মপ্রকাশ করে।

স্মরণাতীতকালে প্রাচীন ভারতে এইরূপ বহুসংখ্যক ঋষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রেয়ের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভাব ও ভোগ কি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইলে, যথার্থ কল্যাণলাভ হয়, মনুষ্যত্ব সার্থকতামণ্ডিত হয়, মানুষের দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি শ্রেয়ের অনুগামী হইয়া সম্যক্‌রূপে বিকাশ-

প্রাপ্ত হয়, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সৌসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সমগ্র মানবসমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হয়, তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ বিধান সেই ঋষিদের চিত্তে প্রকাশিত হইয়াছিল। দৈহিক ও মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, অসংখ্যপ্রকার ভেদ-বিভিন্ন মানবগণ নিজ নিজ অবস্থার নানারূপ সুযোগ ও দুর্য্যোগের মধ্যে কোন্ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কি ভাবে নিজেদের কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ভোগশক্তি সুনিয়ন্ত্রিত করিলে, কোন কোন্ জাতীয়-মনোবৃত্তি কিভাবে অনুশীলন করিলে, সকলেই সম্যক্ কৃতার্থতার পথে অগ্রসর হইতে পারে, ঋষিগণের অনন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন বিশাল চিত্তে সেইসব সনাতন সত্য প্রকটিত হইয়াছিল। ঋষি-সংঘদৃষ্ট সেইসব চিরন্তন সত্যসমূহের নামই বেদ।

বেদে শ্রেয়ের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার পক্ষে কি কর্ত্তব্য ও কি অকর্ত্তব্য, কি প্রাপ্তব্য ও কি হাতব্য, কি জ্ঞাতব্য ও কি অবজ্ঞাতব্য, কি সম্ভোগ্য ও কি পরিহার্য্য,—এ সকলই বেদে নিরূপিত হইয়াছে, এ সকলই সেই অনন্যসাধারণ ঋষিবৃন্দ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বেদের অনুশাসন মানিয়া চলাই মানবের ধর্ম্ম। মানবসাধারণের ধর্ম্মই বিধি-নিষেধাত্মক। কি উচিত ও কি অনুচিত, তাহা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অনুচিতের বর্জ্জন ও উচিতের অনুবর্ত্তনই মানুষের সাধনা। দেহেন্দ্রিয় মন যাহা প্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে চায়, তাহার মধ্যে যাহা কিছু অনুচিত বলিয়া বৈদিক দৃষ্টিতে নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহাও বর্জ্জনীয়, এবং তজ্জন্য দেহেন্দ্রিয় মনের প্রবল বাসনাকেও সংযত করা আবশ্যক। বেদ এই ধর্ম্মই শিক্ষা দেয়। বেদের অনুশাসন কোন জাতি-বিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা দেশবিশেষের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, মানুষমাত্রের পক্ষেই প্রযোজ্য। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্ম 'মানব ধর্ম্ম' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুনশ্চ, বেদের অনুশাসন কোন পুস্তক-বিশেষের উপদেশ নয়, কোন মহাপুরুষবিশেষের বা পুরুষসমষ্টির আদেশ নয়, কোন বিশেষ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কোন বিশেষ সাধন প্রণালীর অঙ্গীভূত নয়। মানুষের চিত্ত শ্রেয়োবুদ্ধি বা পাপ-বুদ্ধি দ্বারা অভিভূত না হইলে, যে অবস্থায় যাহা করণীয় ও যাহা বর্জ্জনীয় বলিয়া তাহার বিশুদ্ধ চিত্তে স্বভাবতই প্রতিভাত হইত, বেদ তত্ত্বতঃ তাহাই অনুশাসন করে, এবং তদনুরূপমার্গে চলিবারই উপায় নির্দ্দেশ করে। মানব প্রকৃতিনিহিত শ্রেয়ো-বোধের উপরই বেদ-বিধান প্রতিষ্ঠিত।

মানববুদ্ধি যখন শ্রেয়ের প্রতি অনুরাগ দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রভাবিত হয়, তখন জ্ঞেয়, কার্য্য ও ভোগ্য সম্বন্ধে তাহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়, সত্য, মঙ্গল ও সুখের আদর্শ নূতন আকার গ্রহণ করে, জগৎ তাহার নিকট নূতনভাবে প্রতিভাত হয়, মানুষের সহিত মানুষের, এবং মানুষের সহিত ইতর প্রাণিসমূহের ও বহির্জ্জগতের সম্বন্ধ সে নূতন দৃষ্টিতে অবলোকন করে। শ্রেয় অনুগত দৃষ্টিই বৈদিক দৃষ্টি। এই দৃষ্টিই যথার্থ মানবদৃষ্টি। এই দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাই যথার্থ মানব সভ্যতা।

বৈদিক দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বপ্রকৃতি কেবলমাত্র একটা জড় জগৎরূপে প্রতিভাত হয় না, লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যবিহীন অন্ধ নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত কতকগুলি জড় পদার্থ ও ব্যাপারের সমষ্টিমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বৈদিক দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ স্বীয় প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটি চেতন নিয়ামকের সত্তা ও শ্রেয় অভিমুখী প্রেরণা অনুভব করে, জড় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিবিধির মধ্যে যেমন স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট একটি অবিক্রিয় চেতনের স্বাধীন কর্ম্মের প্রকাশ উপলব্ধি করে, তেমনি বিশ্ব-প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনা পরম্পরার অন্তরালেও সে এক বা একাধিক চেতন নিয়ামকের সত্তা উপলব্ধি করে, আপাততঃ লক্ষ্যহীন কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা ও

অন্ধ নিয়তির ভিতরে সে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট চেতনের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মের প্রকাশ দেখিতে পায়। বৈদিক দৃষ্টিতে জড় সর্ব্বত্রই চেতনের আশ্রিত, চেতন কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, চেতনের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সুশৃঙ্খল নিয়মে পরিচালিত। বৈদিকজ্ঞানে প্রাকৃতিক কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অন্তরালে অলঙ্ঘনীয় ধর্ম্মবিধান আত্মপ্রকাশ করে।

আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের উপাসকগণ জড়-জগতের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন জাতীয় ব্যাপার পরম্পরার নিয়ামকরূপে যে সব সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন, বৈদিক দৃষ্টিতে সেই সব নিয়মগুলিই চরম সত্য নয়। যে সব ঘটনা সাধারণ অভিজ্ঞতায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনাপূর্ব্বক শ্রেণী বিভাগ করিয়া সামান্যরূপে ব্যাপক ভাষায় প্রকাশ করিলেই এক একটি সাধারণ নিয়ম (Law of Nature) হইল। এই সব নিয়ম, যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহারই সাধারণ বর্ণনা মাত্র, কেন ঘটে, তাহার নির্দ্দেশক নহে। বৈদিক বিজ্ঞানের উপাসকগণ এই সব নিয়মেরও নিয়ামক সত্যের আবিষ্কার করিয়া থাকেন। যে বিধান দ্বারা এই সব প্রাকৃতিক নিয়ম প্রশাসিত হয়, তাহার নাম ধর্ম্মবিধান। অর্থাৎ যাহা হওয়া উচিত, তাহা দ্বারাই, যাহা হয়, তাহার স্বরূপ ও গতিবিধি নির্দ্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রেয়ের শক্তি দ্বারা যাবতীয় জাগতিক ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত হয়। দৃষ্ট কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার মূলে অদৃষ্ট ধর্ম্মবিধি বিদ্যমান আছে। প্রাকৃতিক ব্যাপার প্রবাহের নিয়ামকরূপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রেরণা আছে। বিশ্বপ্রকৃতি কেবলমাত্র একটি জড়প্রবাহ (physical process) নয়, ইহা একটি ধর্ম্মবিধান (moral order)। বৈদিক দৃষ্টি জগৎকে এই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে।

যেখানে ধর্ম্মবিধান, সেখানেই চেতন নিয়ামক স্বীকার করিতে হয়। বিশ্ব প্রকৃতিকে ধর্ম্মাদর্শ দ্বারা পরিচালিত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সিদ্ধির অনুকূলরূপে নিয়ন্ত্রিত, শ্রেয়ের উদ্দেশ্যে সুশৃঙ্খলভাবে প্রশাসিত বলিয়া যদি উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে জাগতিক ব্যাপারসমূহের অন্তরালে শ্রেয়োবুদ্ধি-সম্পন্ন বিশালশক্তি সমন্বিত স্বতন্ত্র চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বভাবতই অনুভূতি-গোচর হয়। চেতন ব্যতীত শ্রেয় ও অশ্রেয়ের বিবেক হয় না, উদ্দেশ্য ও উপায়ের সম্বন্ধ হয় না, ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানের পরিচালনা সম্ভব হয় না, বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন দেশের ব্যাপার-সমূহের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগ সম্ভব হয় না। জগৎ-প্রবাহের মধ্যে এই সকলের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের আশ্রয়রূপে চেতন বিচারশীল ধর্ম্মপ্রাণ এক বা একাধিক পুরুষের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য হয়। এইরূপ চেতন শক্তিশালী নিয়ত কর্ম্মময় পুরুষের বা পুরুষসমূহের জীবনধারাই উক্ত প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত পরম্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ধর্ম্মাধার শাসিত ব্যাপারসমূহের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বৈদিক দৃষ্টিতে এইরূপ পুরুষগণ প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকেন। তাঁহারা 'দেবতা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগতের বিভিন্ন বিভাগের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তারূপে বিভিন্ন দেবতাগণ বিরাজমান। বিশ্ব-প্রকৃতি দেবতাবৃন্দের শ্রেয়োবোধপ্রসূত ধর্ম্মবিধি-শাসিত আত্মপ্রকাশ ক্ষেত্র। তাঁহারা চেতন, স্বয়ং দীপ্তিশীল, নিত্য ক্রীড়ারত বলিয়াই দেবতা নামে অভিহিত। জাগতিক ব্যাপারসমূহের সহিত যোগাযোগের ভিতর দিয়া বস্তুতঃ দেবতাদের সহিতই মানুষের সম্বন্ধ হয়, দেবতাদের সঙ্গেই মানুষের আদান প্রদান হয়।

এই বৈদিক দৃষ্টি অনুসারে, মনুষ্যজাতি যে এই বিচিত্র বিশাল জড়-জগতে জড় আবেষ্টনীর মধ্যে, জড়শক্তিসমূহের উদ্দেশ্যবিহীন ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা অনির্দ্দিষ্টভাবে বিচাল্যমান হইয়া, স্বকীয় অনন্ত-

সাধারণ বোধশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও উদ্দেশ্যময় জীবন লইয়া বিচরণ করিতেছে, তাহা নয়; এই জগতের অন্তরালেও বোধশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও উদ্দেশ্যময় জীবন আছে, মানবীয় কর্ম্মের ন্যায় জাগতিক ব্যাপারসমূহও বোধশক্তি, সজাগ কর্ম্মশক্তি ও লক্ষ্যাভিমুখী জীবনেরই অভিব্যক্তি। বৈদিক দৃষ্টি উন্মীলিত হইলে, ইহাও উপলব্ধিগোচর হয় যে, জগদন্তরালবর্ত্তী জগদ্‌ব্যাপার নিয়ামক সেই সব শক্তির সহিত মানবীয় শক্তির অনেকটা সজাতীয় সম্পর্ক আছে, সেই সব শক্তির আধার দেবতাদের সহিত মানুষের আদান প্রদান ও ভাববিনিময় চলিতে পারে। তখন ইহাও অনুভূতিগোচর হয় যে, মানবজীবনের সহিত দেবতাদের জীবন এক সূত্রে গ্রথিত, মানবের কর্ম্মের সহিত বাহ্যপ্রকৃতির ঘটনা-সমূহের অচ্ছেদ্য যোগবন্ধন বিদ্যমান আছে, মানুষ যেরূপ কর্ম্মদ্বারা যেরূপ সুখদুঃখময় ফললাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করে, বাহ্যপ্রকৃতির ব্যাপার প্রবাহের ভিতর দিয়া তদনুরূপ ভোগই তাহার নিকট উপস্থিত হয়। যে জাতীয় কর্ম্মের যেমন ফল। তাহা যেমন ধর্ম্মবিধান দ্বারা নিয়মিত, সেই ধর্ম্মবিধান দ্বারাই শাসিত এই বাহ্যপ্রকৃতির কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া সেইরূপ ফলই তত্তৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মানুষের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেবতাগণ তাঁহাদের কর্ম্মের প্রবাহের মধ্যে কর্ম্মানুরূপ ফলই মানুষকে প্রদান করিয়া থাকেন।

জগতের সহিত সম্পর্কেই মানুষের সুখদুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। তাহার যাবতীয় ভোগ্যসম্ভার জগতের মধ্যে। জগৎ যদি তাহার নিকট অনুকূল বেদনীয় ভোগ উপস্থিত করে, তবেই সে সুখ আস্বাদন করিতে পারে, তাহার প্রেয় লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, জগৎ যদি তাহার নিকট প্রতিকূলবেদনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও অবস্থানিচয় উপস্থিত করিতে থাকে, তবে তাহাকে দুঃখই ভোগ করিতে হয়, অপ্রেয়ের সহিত যুক্ত হইয়া আর্ত্তনাদই করিতে হয়। তাহার ভোগ্যবস্তু, ভোগায়তন দেহ, ভোগেন্দ্রিয়ের শক্তি সবই জগতের অন্তর্ভুক্ত, এবং জাগতিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং জগৎ অনুকূল হইলেই মানুষের প্রেয়োলাভ সম্ভব হয়, জগৎ প্রতিকূল হইলে প্রেয়ের প্রতি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া মানুষ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়। অতএব জগৎকে অনুকূল করিবার কৌশল না জানিলে ও তদনুরূপভাবে জীবন গঠন করিতে সমর্থ না হইলে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। জগতের আনুকূল্য সম্পাদনের কৌশল আয়ত্ত করিতে হইলে, জাগতিক ব্যাপারসমূহের নিয়ামক বিধির সহিত পরিচয় আবশ্যক। প্রেয়ের অনুকরণে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়া, সুখ, ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বলাভের জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিয়া, মানুষ যতকাল জগৎকে সুখপ্রদ করিতে চেষ্টা করে, ততকাল জাগতিক ব্যাপারসমূহের প্রতিকূল আঘাতই তাহাকে অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হয়, জগৎকে বস্তুতঃ অনুকূল ও সুখপ্রসূ করা সম্ভব হয় না।

শ্রেয় অনুগত দৃষ্টি বা বৈদিক দৃষ্টি লাভ হইলে উপলব্ধি হয় যে, জগৎ দেবতা কর্ত্তৃক শাসিত, ধর্ম্মবিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। তখন অনুভূতি হয় যে, জগৎও শ্রেয়েরই অনুবর্ত্তন করে, শ্রেয়কে লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ জাগতিক ব্যাপার সকল পরিচালিত করিয়া থাকেন। সুতরাং ধারণা হয় যে, মানুষ যখন শ্রেয়ের অনুসরণ করে, ধর্ম্মের পথে, ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, আপনার শক্তি প্রয়োগ করে, তখনই দেবতাগণেরও আনুগত্য ও আনুকূল্য করা হয়, জগদ্বিধানের সহিত জীবনের সৌসামঞ্জস্য সংঘটিত হয়, এবং তখনই দেবতাগণ অনুকূল হন ও জগদ্বিধান অনুকূল হয়। অতএব, প্রেয়লাভ করিতে হইলেও প্রেয়ের অনুসরণ করা সমীচীন পন্থা নয়, শ্রেয়ের পথে চলাই সমীচীন পন্থা। বিশ্ব-

নিয়ামক ধর্মবিধানে প্রেয় শ্রেয়ের অনুবর্ত্তী হয়, সুখকল্যাণের সেবায় নিয়োজিত হয়।

ইহাই যদি বিশ্বপ্রকৃতির সুনিয়ত বিধান হয়, তবে মানুষের কর্ত্তব্য পথ কি? মানুষ কোন্ পথে স্বকীয় স্বাধীন কর্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া জীবনের সম্যক্ কৃতার্থতা সম্পাদন করে? বৈদিক দৃষ্টি অনুসারে ইহার উত্তর যজ্ঞনীতি। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী যজ্ঞসম্পাদনই মানবজীবনের কৃতার্থতার পথ। যজ্ঞ কি? শ্রেয়ের সেবায় প্রেয়ের উৎসর্গই যজ্ঞ। যাহা উচিত, যাহা বিশ্ববিধানের অনুকূল, যাহা ঋষিদৃষ্ট মঙ্গল, তাহার লাভ কামনায়, মানুষের যে সব প্রেয় সামগ্রী আছে, তাহা বলি প্রদান করা বা আহুতি প্রদান করার নামই যজ্ঞ। যাহার যে কর্ম্মশক্তি আছে, যে জ্ঞানশক্তি আছে, যে ভোগ্য পদার্থ আছে, যে সুযোগ সুবিধা আছে, তাহা যদি শ্রেয়োলাভের উদ্দেশ্যে, প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্তা মঙ্গলময় দেবতাগণের প্রীতিসাধন মানসে উৎসর্গীকৃত হয়, তাহা হইলেই যজ্ঞসম্পাদন হইল। দেবতার প্রীতিসাধনের অর্থই শ্রেয়ের অনুবর্ত্তন, কল্যাণের পথে আত্মনিয়োগ। দেবতার সহিত বিরোধের অর্থই মঙ্গলের সহিত বিরোধ, শ্রেয়ের প্রেরণাকে অবমাননা করিয়া প্রেয়ের পথ অনুসরণ, বিশ্ববিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া দেহেন্দ্রিয় মনোবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের প্রচেষ্টা। বিশ্ববিধানের প্রতিকূল পথে মানবীয় স্বাধীনতার ব্যবহার করিয়া প্রেয়ের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবারও সম্ভাবনা নাই, স্থায়ী সুখৈশ্বর্য্য প্রভুত্বলাভেরও সম্ভাবনা নাই, মানবতার যথার্থ গৌরব যে শ্রেয়ের মধ্যে তাহা হইতে ত বঞ্চিতই হইতে হয়।

অতএব দেবতার প্রীত্যর্থে, অর্থাৎ বিশ্ববিধানের আনুকূল্যলাভের উদ্দেশ্যে, স্বকীয় শক্তি, স্বকীয় ভোগ্য সামগ্রী, স্বকীয় অবস্থাপুঞ্জকে নিয়োজিত করাই মানবের সমীচীন কর্ত্তব্য পথ। এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করাই যথার্থ ধর্ম্ম। সবিচারে স্বেচ্ছায় যজ্ঞব্রতী জীবনযাপন করাই মানবীয় ধর্ম্ম। এই যজ্ঞই শ্রেয়েরও পথ, উন্নততর ব্যাপকতর স্থায়িতর প্রেয়োলাভেরও উপায়। মানুষ দেবতার প্রীত্যর্থে আপনার প্রাপ্ত বস্তুসমূহ ত্যাগ করিলে, দেবতাও প্রীত হইয়া তাহার প্রীতিসাধন করেন। বিশ্ব-প্রক্রিয়ার নিয়ামক ধর্ম্মবিধানের অনুকূলপথে মানুষ আপনার শক্তির সদ্ব্যবহার করিলে বিশ্বব্যাপারসমূহ তাহার অনুকূল হইয়াই উপস্থিত হয় এবং তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্থায়িসুখকর বস্তুসমূহ তাহাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করে। দেবতা এবং মানুষের, বিশ্বনীতি ও মানবীয় স্বাধীনতার, এইরূপ পরস্পরানুকূল্যে, মানুষের জীবনও সার্থকতামণ্ডিত হয়, জগদ্ব্যাপারসমূহও মঙ্গলে ভরপুর হইয়া দেখা দেয়। ইহা দ্বারা ব্যষ্টির কল্যাণ ও সমষ্টির কল্যাণ, ব্যক্তির মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গল, বর্ত্তমানের সম্ভোগ ও ভবিষ্যতের নিশ্চিত সৌভাগ্য, একই সঙ্গে সৌসামঞ্জস্যের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগ, বহুর কল্যাণে আত্মনিয়োগ দ্বারা নিজের কল্যাণ লাভ, বিশ্বের সেবাদ্বারা নিজের অভীষ্টসিদ্ধি, দেবতার প্রীতিসম্পাদনদ্বারা নিজের শ্রেয় ও প্রেয়ের সামঞ্জস্য বিধান,—এই যজ্ঞনীতিই বৈদিক ধর্ম্মনীতি। এইরূপ দেবোত্তর জীবন যাপনই অভিষ্টসিদ্ধির সুনিশ্চিত উপায়। জীবনকে যজ্ঞময় করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের সমুচিত বিকাশ হয়।

এই বৈদিক নীতি অবলম্বন করিলে মানুষের সহিত মানুষের সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে সম্মেলন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতা, কাড়াকাড়ির পরিবর্ত্তে আদানপ্রদান, স্বার্থ সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে প্রেমসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের অধিকারের তারতম্যে, শক্তিজ্ঞান ভোগ্যাদির পরিমাণভেদে ও প্রকারভেদে, দেশকাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে,

রুচি বুদ্ধি প্রকৃতি ও সামর্থ্যের নানাবিধ বৈচিত্র্যহেতু, বিভিন্ন মানুষের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। ধনীর যজ্ঞ ও দরিদ্রের যজ্ঞ, রাজার যজ্ঞ ও প্রজার যজ্ঞ, জ্ঞানীর যজ্ঞ ও মূর্খের যজ্ঞ, বীরের যজ্ঞ ও দুর্ব্বলের যজ্ঞ, একই প্রকার হইতে পারে না, একই প্রকার হইলে যজ্ঞনীতির সার্থকতা হয় না। সেই হেতু বিবিধ প্রকার যজ্ঞ বেদবিহিত, ঋষিগণের ভিতর দিয়া বিবিধ প্রকার অধিকার সম্পন্ন মানুষের জন্য এবং বিভিন্ন জাতীয় অভিষ্টসিদ্ধির উপায়রূপে বিচিত্র প্রকার যজ্ঞ বিধান মানব-সমাজে উপদিষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু যজ্ঞের মূলনীতি সকলের পক্ষেই সমান। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী যজ্ঞদ্বারা উন্নততর অধিকার লাভ করিতে পারে। যজ্ঞময় জীবন যাপন করিতে মানুষমাত্রেরই অধিকার, এবং মানুষমাত্রেই এই উপায়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহা দ্বারা মানুষমাত্রেরই চিত্ত উদার হয়। দেহেন্দ্রিয় পবিত্রতাসম্পন্ন হয়, ভোগ্য-বিষয়াশক্তি ও তজ্জনিত বন্ধন শিথিল হয়, দৃষ্টি ব্যাপক ও গভীর হয়, জীবন নিম্নভূমি হইতে ক্রমশঃ উন্নততর ভূমিতে আরোহণ করে ও চিরস্থায়ী সুখ লাভ করে।

বৈদিক দৃষ্টি অবলম্বনে শ্রেয়ের অনুবর্ত্তন করিতে করিতে চিত্ত যত পবিশুদ্ধ হয়, প্রেয়ঃকামনা যত অভিভূত হয়, ততই উন্নত হইতে উন্নততর আদর্শ মানবপ্রাণকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে, উন্নত হইতে উন্নততর যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অধিকার ও প্রবৃত্তিলাভ হইতে থাকে। অবশেষে জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, ইহার 'অন্ত' কোথায়? বৈদিক জ্ঞান, বৈদিক কর্ম্ম, বৈদিক ভাবসাধনা—এ সকলেরই চরম আদর্শ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। মানব-জীবনের চরম শ্রেয় কি? এমন কি কোন চরম সত্য আছে, যাহা পরিজ্ঞাত হইলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না? এমন কি কোন সম্ভোগ্য বস্তু আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে যাবতীয় ভোগবাসনার পর্য্যবসান হইয়া যায়? এমন কি কোন কর্ম্ম আছে, যাহার মধ্যে সকল কর্ম্মের ঐকান্তিক পরিসমাপ্তি হয়? হৃদয়ে কি এমন কোন ভাবের অনুশীলন করা সম্ভব, যাহার ভিতরে অপরাপর সব ভাব-প্রবাহ বিলীন হইয়া যায়? এই যে নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, ইহাই বৈদান্তিক জিজ্ঞাসা। বৈদিক দৃষ্টিকে যেমন শ্রেয়ো দৃষ্টি বলা যায়, বৈদান্তিক দৃষ্টিকে তেমনি নিঃশ্রেয়স দৃষ্টি বলা যাইতে পারে। বৈদিক সাধনা শ্রেয়ের সাধনা, এবং বৈদান্তিক সাধনা নিঃশ্রেয়সের সাধনা।

মানবীয় সত্যানুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে দুইটি প্রবল প্রেরণা অনুভূত হয়,—একটি কারণ জ্ঞানের প্রেরণা ও অপরটি ঐক্য জ্ঞানের প্রেরণা। মানবের বুদ্ধি এই দুইটি প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়া সত্যের অনুসরণ করে। তাহার নিকট কার্য্য অপেক্ষা কারণ অধিকতর সত্য, বহুত্ব অপেক্ষা ঐক্য অধিকতর সত্য। ইন্দ্রিয় ও মনের নিকটে সমুপস্থিত কার্য্যসমূহের কারণ ও তাহাদের মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেই এই সব যথার্থতঃ ব্যাখ্যাত হইল, ইহাদের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, ইহাদের সম্যক্ পরিচয় লাভ হইল বলিয়া মানববুদ্ধির উপলব্ধি হয়।

মানুষের এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধি ক্রমশঃ বিকাশ-প্রাপ্ত ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত হইয়া অসংখ্য কার্য্যপরম্পরার সমষ্টিস্বরূপ এই বিশাল জগতের মূলকারণের অনুসন্ধানে প্রধাবিত হয় এবং ইহাকে এক অখণ্ড তত্ত্বের বিচিত্র অভিব্যক্তিরূপে দর্শন করিতে প্রযত্নশীল হয়। এই অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার ফলে বিচারশীল মানুষ উপলব্ধি করে যে, এই সংখ্যাতীত জড় ও চেতন পদার্থ ও ব্যাপারসমূহের মূলে এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু নিত্য বিদ্যমান আছে; একমাত্র সেই সদ্বস্তুই স্বসত্তায় সত্তাবান্, এবং অন্য সকল পদার্থ তাহা হইতেই উৎপন্ন, তাহার সত্তাতেই

সকলের সত্তা, তাহার সত্তার বিচিত্র অভিব্যক্তিতেই সকলের স্থিতি ও গতি, এবং পরিণামে তাহাতেই সব লয়প্রাপ্ত হয়। সেই স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট অদ্বিতীয় বস্তু স্বয়ংপ্রকাশ, সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ। তাহা সকল দেশকালের অতীত, সর্ব্ববিধ পরিচ্ছেদ-রহিত, এবং তাহাই দেশ কালের মধ্যে অসংখ্য পরিচ্ছিন্ন বস্তু ও ব্যাপাররূপে খণ্ডদৃষ্টির সমীপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই অনন্ত অখণ্ড স্বরাট্ স্বপ্রকাশ বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা 'বৃহৎ' বলিয়া 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হয়, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় বলিয়া 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত হয়, সর্ব্বকালাতীত ও সর্ব্বকালাশ্রয় বলিয়া 'অকাল' ও 'মহাকাল' নামে অভিহিত হয়। শ্রেয়ো দৃষ্টিতে তাহাই সর্ব্বমঙ্গলালয় নিঃশ্রেয়সস্বরূপ বলিয়া 'শিব' নামে অভিহিত হয়। প্রেয়োদৃষ্টিতে তাহাই চরম প্রেয়, চরম আকাঙ্ক্ষণীয়, চরম আস্বাদ্য বস্তু বলিয়া প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ ইত্যাদি ভাবে পরিজ্ঞাত হয়। সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং', 'আনন্দ-রূপমমৃতং' 'শান্তং শিবং' পরম ও চরমতত্ত্ব অধিগত ও আস্বাদিত হইলেই জ্ঞানের চরম সার্থকতা, কর্ম্মের ঐকান্তিক পর্য্যবসান, ভোগের আত্যন্তিক কৃতার্থতা, সর্ব্বভাবের এক মহাভাবে নিত্যপ্রতিষ্ঠা। এই পরম তত্ত্বের অধিগমেই জ্ঞানের অন্ত, কর্ম্মের অন্ত, ভোগের অন্ত, ভাবের অন্ত, সুতরাং ইহাই বেদান্ত।

এই বৈদান্তিক দৃষ্টি লাভ হইলে, বিশ্বজগৎ অকারণ লক্ষ্যহীন প্রাকৃতিক নিয়মাবলীদ্বারা পরিচালিতও বোধ হয় না, ইহার বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন স্বভাবান্বিত শ্রেয়োবোধ-বিশিষ্ট চিন্ময় দেবতাবৃন্দ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়াও প্রতীয়মান হয় না, বহু দেবতার সমবেত শক্তিদ্বারা বিশ্বশৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইতেছে বলিয়াও ধারণা হয় না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এক ব্রহ্ম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। এক ব্রহ্ম সমগ্র জগতের ও তদন্তর্ভুক্ত যাবতীয় পদার্থের—'যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', সে সকলেরই—প্রাণস্বরূপে, অন্তরাত্মা স্বরূপে, অন্তর্যামী নিয়ন্তারূপে বিরাজমান। সুতরাং সমগ্র জগৎ মূলতঃ এক, ইহার সকল বস্তু ও ব্যাপার একসূত্রে গ্রথিত, এক পরম বিধান অনুসারে পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে মিলিত হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত। বৈদিক দৃষ্টিলব্ধ সকল দেবতা সেই এক ব্রহ্মেরই বিচিত্র বিভূতি, জগতের বিভিন্ন বিভাগে প্রতিফলিত তাঁহারই বিভিন্ন মূর্ত্তি। তাঁহারই প্রকৃতি সমুদ্ভূত বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র কার্য্যাবলীর সম্পর্কে, বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক, বিভিন্ন রূপগুণশক্তি কর্ম্মাদি ভূষিত হইয়া, তিনিই বিচিত্র দেবতারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। সমস্ত কার্য্যই তাঁহারই কার্য্য, তাঁহারই লীলা, তাঁহারই আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিত। জগতের মধ্যে দেবতাবৃন্দের যে বিচিত্র শক্তির খেলা পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেই সব শক্তি এই বৈদান্তিক দৃষ্টিতে এক মহাশক্তিরই বিচিত্র প্রকাশ-রূপে উপলব্ধিগোচর হয়। এই মহাশক্তি সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরমমঙ্গলালয় ব্রহ্মেরই শক্তি। এই মহাশক্তি অঘটনঘটনপটীয়সী, বৈচিত্র্য নির্ম্মাণ-কারিণী, আপনার আশ্রয়স্বরূপ নিত্যচৈতন্যানন্দ-ঘন ব্রহ্মের পারমার্থিক স্বরূপ অবিকৃত রাখিয়া, অথচ তাহা অত্যাশ্চর্য্যভাবে সমাবৃত করিয়া, তাঁহাকেই দেশকালপরিচ্ছিন্ন অসংখ্য খণ্ডিত জড় পদার্থরূপে প্রতীয়মান করিবার অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য এই মহাশক্তির স্বভাবে নিত্য বিদ্যমান। এই হেতু এই মহাশক্তিকে 'মায়া' আখ্যা প্রদান করা হয়। শক্তি শক্তিমান্ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, এবং শক্তির কার্য্যও শক্তি হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। এই যুক্তি অনুসারে মায়া ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং জগৎ মায়া হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং জগৎও ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। ব্রহ্মই স্বকীয়া মায়াশক্তি অবলম্বনে

আপনাকে জগদ্রূপে প্রতীত করাইতেছেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তাই জগতের নাই। ব্রহ্মই সব,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

পক্ষান্তরে, নিজের জীবনের আত্যন্তিক সার্থকতা পরম নিঃশ্রেয়স কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, নিজের স্বরূপটি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। 'আমি কে', 'আমার স্বরূপ কি',—তাহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, আমি সাধারণজ্ঞানে আমাকে যাহা মনে করি, সে সবই অপরাপর বস্তু, ব্যক্তি ও কর্ম্মের সম্পর্কে আমার পরিবর্ত্তনশীল উপাধিমাত্র, পরের নিকট ধার-করা পরিচয়মাত্র। তবে, আমার নিজস্ব পরিচয় কি? আমার নিরপেক্ষ স্বরূপ কি? এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে, সকল উপাধি হইতে, ধার-করা পরিচয় হইতে যখন নিজেকে মুক্ত করিয়া চিন্তা করা যায়, তখন উপলব্ধি হয় যে, আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, সুতরাং পরমার্থতঃ ব্রহ্মের সহিত আমার কোন ভেদ নাই, কোন পার্থক্য নাই। অতএব আমার জ্ঞানকর্ম্মাদির বিষয়রূপে যে বিশাল জড়জগৎ বিদ্যমান, তাহারও মূলকারণ তাত্ত্বিক স্বরূপ যে ব্রহ্ম, এই বিষয় জগতের বিষয়ীরূপে—জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তারূপে বিদ্যমান আমার তাত্ত্বিক স্বরূপও সেই একই ব্রহ্ম। "যোঽসাবসৌপুরুষঃ সোঽহমস্মি", "অহং ব্রহ্মাস্মি"। নিজেকে যেমন স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তেমনি প্রত্যেক জীবকেই—প্রত্যেক তুমি-কেই—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দর্শন হয়। "তত্ত্বমসি", জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

এই বিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে, একই অদ্বিতীয় নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম বা আত্মা অসংখ্য বিষয়ী ও অসংখ্য বিষয়রূপে,—অসংখ্য জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা এবং অসংখ্য জ্ঞেয়, কার্য্য ও ভোগ্যরূপে,—অসংখ্য চেতন ও অসংখ্য জড়রূপে—আত্ম-প্রকট করিয়া অনাদি অনন্তকাল লীলা করিতেছেন। পরমার্থতঃ এক ব্রহ্ম বা আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পদার্থ না থাকায়, তিনি সর্ব্বসম্বন্ধাতীত, সর্ব্বভাবাতীত, সর্ব্বগুণাতীত, নিরুপাধিক, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, পক্ষান্তরে, স্বীয় মায়াশক্তিযোগে অসংখ্য নাম ও রূপে আত্মপ্রকট করায়, তিনিই সবিশেষ, সগুণ, অনন্তগুণাধার, অনন্তভাবাধার, সর্ব্বসম্বন্ধময়, সর্ব্বোপাধিভূষিত। ইহাই বৈদান্তিক দৃষ্টি।

এই দৃষ্টি লাভ হইলে, আমার পরমার্থতঃ কোন কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, প্রাপ্তব্য বা ত্যক্তব্য, শ্রেয় বা অশ্রেয় কিছুই থাকিতে পারে না। আমি ত বস্তুতঃ নিত্যপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং আমার সাধ্য বা সাধন কিছুই নাই। তবে যে আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হেয়োপাদেয়াদি দ্বন্দ্বের অনুভব হয়, তাহার কারণ এই যে, আমি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, আমার অতাত্ত্বিক অনিত্য উপাধিগুলিকেই আমার স্বরূপ বলিয়া বোধ করিতেছি। আমার যথার্থ স্বরূপ জানিলেই সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়, সকল দুঃখতাপের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সুতরাং আমার যথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাই আমার একমাত্র সাধনা। অজ্ঞানতার সম্যক্ নিরাকরণ দ্বারা এই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষজ্ঞানই মানবজীবনের চরম আদর্শ, ইহাই নিঃশ্রেয়স, নূতন কিছুই লাভ করিবার নাই।

অতএব যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার নিবৃত্তি না হয় এবং সেই হেতু আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার না হয়, সেই পর্য্যন্তই দ্বন্দ্ব আছে, শ্রেয় ও অশ্রেয়ের ভেদ আছে, বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তোষ ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যসিদ্ধির প্রয়োজনবোধ আছে, এবং ততদিন পর্য্যন্তই সাধনারও আবশ্যকতা আছে। দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধিকে তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনুকূল করিয়া তোলা এবং সেই চরম তত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই তখন একমাত্র সাধনা। তদুদ্দেশ্যে যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ সংযম, যেরূপ উপাসনা, যেরূপ

ভাবানুশীলন আবশ্যক, তাহাই সাধনার অঙ্গীভূত। বৈদিক দৃষ্টিতে যে প্রকার যজ্ঞ সম্পাদনের ভিতর দিয়া দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিকে সুসংস্কৃত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেয়ের অভিমুখে জীবনকে পরিচালিত করা হইতেছিল, বৈদান্তিক যজ্ঞে তাহার সম্যক্ প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির উদ্দেশ্যে অহন্তাস্পদ ও মমতাস্পদ সর্ব্ববিষয়ের ঐকান্তিক ত্যাগই মহাযজ্ঞ। 'আমি' ও 'আমার' বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া অহং-মম-শূন্য ব্রহ্মাত্মভাবে প্রতিষ্ঠালাভই যজ্ঞের চরম সার্থকতা। সকল প্রাণকর্ম্ম, ইন্দ্রিয়কর্ম্ম, মানসিক কর্ম্ম সুসংযত করিয়া বুদ্ধিকে ব্রহ্মাকারাকারিত করাই সংযমের পরাকাষ্ঠা। যাবতীয় চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বাত্মভাবসমন্বিত একমাত্র প্রেমবৃত্তিতে পরিণত করিয়া আত্মাভিন্ন নিখিলরসামৃতসিন্ধু সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের উপাসনা করা ও জীবনকে ঐকান্তিকরূপে ব্রহ্মময় মহাভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই উপাসনার পরাকাষ্ঠা। এইভাবে বৈদিকধর্ম্ম বৈদান্তিক ধর্ম্মে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া সম্যক্ সার্থকতায় প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই বেদ বেদান্তই সকল মানবসাধনার ভিত্তি।

"যস্য দেবে পরা ভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

বাণি নমস্তে

পণ্ডিত শ্রীহরিপদ ভারতী

জাগৃহি বাঙ্ময়ি নবরসরঙ্গে
মৃদুমধুকম্পিত পবন তরঙ্গে।
জয় জয় ভারতি মধু মধু মাসে
নব নব ঝঙ্কৃতি নব নব ভাষে॥

রাজ বাগীশ্বরি মানসকুঞ্জে
বিকসিত সুমনো মধুকরগুঞ্জে।
ভক্তিকুসুমময়ি নয় সুরবন্দ্যে
মানসমধিবস বিবুধানন্দে॥

সুরাসুরবন্দিনি সুমধুরহাসে
বোধবিকাশিনি নিগমবিকাশে।
শাশ্বত শিব শুভ শুদ্ধ বিবেকে
ঘনমোহতিমিরং নাশয় লোকে॥

শ্বেতবসন সিত মৌক্তিকহারে
পুণ্য শ্রুতিকথামৃতরসভারে।
এহি সরস্বতি পুস্তকহস্তে
জ্ঞান বিধায়িনি দেবি নমস্তে॥

সঙ্গীতের রূপ ও মাধুর্য্য

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীত-শাস্ত্রে যদিও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের মিশ্রণকে সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া হোয়েছে, তথাপি কণ্ঠ-সঙ্গীতই প্রধানতঃ সঙ্গীত নামে পরিচিত। এ সঙ্গীতের উৎপত্তি, শাস্ত্রকার বলেন—নাদ হোতে। নাদ বা ওঙ্কার, যাকে যোগশাস্ত্রে ব্রহ্মের বাচক ও শ্রুতিতে আলম্বন ও প্রতীক বলা হোয়েছে, তা ই তমোগুণান্বিতা হোয়ে 'নিরোধিকা' ও রজোগুণান্বিতায় 'অর্দ্ধেন্দুরূপে' ও পরে মূলাধারে 'পরা', স্বাধিষ্ঠানে 'পশ্যন্তি', অনাহতে 'মধ্যমা' ও বিশুদ্ধে 'বৈখরী' রূপে দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা দিয়ে স্বর সংযোগে সঙ্গীত আকারে প্রতিভাত হয়। 'অব্যক্ত'বস্থায় নাদ 'অনাহত' নামে ও ব্যক্তাবস্থায় 'আহত' বা লোকের শ্রুতিগোচর চিত্তরঞ্জক 'সঙ্গীত' নামে কথিত হয়।

এই সঙ্গীত সুরমাত্রে পর্য্যবসিত। সুর মহাদেবের পঞ্চমুখ দিয়ে নিঃসৃত হোয়ে পঞ্চরাগ ও দেবীর মুখ কমল দিয়ে 'নটনারায়ণ' মোট ছয় মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। প্রতি রাগের ভিত্তি সুর হোলেও স্বরমূর্ত্তি সম্পূর্ণ পরস্পরের বিভিন্ন। রাগ হোতে রাগিণী, উপরাগ ও উপরাগিণী ক্রমে সৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রতি রাগ ও রাগিণীতে অনুস্যূত সপ্তস্বর পুনরায় উৎপন্ন হোয়েছে পশু-পক্ষীর অস্ফুট স্বর হোতে শাস্ত্রকর্ত্তার মতে। যেমন ময়ূর হোতে ষড়জ, বৃষ হোতে ঋষভ, অজ হোতে গান্ধার, ক্রৌঞ্চ বা সারস হোতে মধ্যম, কোকিল হোতে পঞ্চম অশ্ব হোতে ধৈবত ও হস্তী হোতে নিষাদের উৎপত্তি।

এই সপ্তস্বর বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়েছে কম্পনের আকারে। সঙ্গীত শাস্ত্রকার এই কম্পন গুলিকে সূক্ষ্মস্বর বা শ্রুতি বোলে নির্দ্দেশ কোরেছেন। এই শ্রুতি তাঁদের মতে দ্বাবিংশতিটী, সপ্তস্বরের ব্যবধানে বা অন্তরে অবস্থিত, স্বরানুসারে বিভক্ত তাদের নাম যথা—

ষড়জে—তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী	৪টী
ঋষভে—দয়াবতী, রঞ্জনী ও রতিকা	৩টী
গান্ধারে—রৌদ্রী ও ক্রোধা	২টী
মধ্যমে—বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জ্জনী	৪টী
পঞ্চমে—ক্ষিতি, রক্তা, সন্দিপনী ও আলাপনী	৪টী
ধৈবতে—মদন্তী, রোহিণী ও রম্যা	৩টী
নিষাদে—উগ্রা ও ক্ষোভিণী	২টী
মোট	২২টী

এখন বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণে এগুলি শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ বা আকার বোলে অভিহিত হোলেও সঙ্গীতের মাঝে বিশেষত্ব এই যে, শ্রুতি বা স্বরগুলি লোকরঞ্জক, কোমল গম্ভীরাদিভাব ও বিভিন্ন রসের উৎসস্বরূপ অথবা নানাভাব ও রসের বিকাশে পরিপুষ্ট।

এখন আমরা দেখ্‌ব, সঙ্গীতের যথার্থ রূপ ও মাধুর্য্যটা কী? সঙ্গীতের পরিপুষ্টি যদিও দৃশ্যতঃ শ্রুতি, স্বর ও রাগ-রাগিণী নিয়ে, তথাপি সুর ও মনোহরণ-করণেই এ দুটীর সার্থকতা নিহিত, আর সঙ্গীতের প্রকৃত মূর্ত্তিই এ দুটীর সমবায়ে গঠিত।

কিন্তু তা আমরা সহজে কেউ ধর্‌তে বা বুঝতে পারি না। সঙ্গীতে ছন্দ, কথা, তাল, তান ও বিস্তারাদি সংযোজিত হবে। কতকটা নাম-যশ ও কতকটা নিজেদের কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে উৎগ্রীব হোয়ে আমরা সুরের দিকটা ভুলে গিয়ে বৈচিত্র্য নিয়ে খেলা করি, ভাব ও রসকে তত

আমলই দিই না। এতে আসলে হয় কী—সঙ্গীতের রূপ অব্যাহত থাকে না, মাধুর্য্যও নষ্ট হয়। তাই পূর্ণাবয়ব নিয়ে ফোটার জন্য তান, বিস্তার, বাঁট ইত্যাদি বৈচিত্র্যকে স্থান দিলেও সঙ্গীতে আমাদের লক্ষ্য থাকে যেন সুরে, আর সে সুর ও হবে ভাব ও রসের উদ্বোধক। এজন্য যথার্থ সঙ্গীত-সাধকগণ মাত্র একটী স্বরকেই বহুদিন সাধনা কোরে তার আসলরূপ চিনতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের একটী কথা এখানে মনে পড়ে,—তিনি বলেছেন "এই যে পর্দার সুরের ধ্বনি সাজান হোল, মানুষ তাতে দেখ্‌তে পেলে যে, তার অব্যক্তভাব—মনের পরিচয় এতে যেন ফুটে উঠ্‌ছে। হাসি-কান্না, প্রেম-অভিমান, নিরাশা-আশা সব ফুটে ফুটে প্রকাশ পাচ্ছে। * * মানুষ তাতে আনন্দ পেলে, বুঝ্‌লে গানে এক আনন্দ এক অপূর্ব্ব রসের অনুভূতি ভিতরে বাইরে একাকার হোয়ে যায়।" * এই একাকার কোরে ফেলার যে শক্তি, তা থাকে ভাব ও রসে, আর সুর এই ভাব ও রসের আকর, অবশ্য স্বরেও তাই তারা অনুক্রমিত হোয়েছে। স্বরে রস ও ভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে শাস্ত্রকার বোলেছেন—

ষড়জ—সকল রসের মূল ও বিশ্রাম দায়ক।
ঋষভ—করুণ রসাত্মক, উৎসাহসূচক।
গান্ধার—শান্ত রসাত্মক, শান্তিপ্রদ।
মধ্যম—ভয়ানক রসাত্মক, নিরাশা ও ভয়সূচক।
পঞ্চম—বীররসাত্মক, জমকাল।
ধৈবত—করুণরসাত্মক, শোকসূচক।
নিষাদ—রৌদ্র ও বীররসাত্মক, তীক্ষ্ণভাবদায়ক।

এই সপ্তস্বরের নবরস ও ভাব অব্যক্ত সুর হোতেই ক্ষরিত—তা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং সুর বা সঙ্গীতকে প্রাণবাণ কর্‌তে হোলে ভাব ও রসের একান্ত আবশ্যক, তারপর যখনই রাগ-রাগিণীকে আমরা দেখ্‌ব সুরের উপদান বা অলঙ্কার-রূপে, তখনই দেখি যেন তার আসল-মূর্ত্তি সুরকে।

তবে এই সুর যে কী, তা ঠিক মুখে বলা যায় না। বাঁশীর সুর শুনলে প্রাণ মোহিত হয়, কেন? তা ঠিক বলা যায় না, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, তাতে মনোহরণ করবার শক্তি অথবা যাদুমন্ত্র নিহিত রয়েছে। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা কর্‌ব—বাঁশীর সুরে মনোহরণ করার শক্তিই বা আসে কোথা হোতে? তখন বল্‌ব—বাঁশীর সুরে ভাব ও রসের উচ্ছ্বাস থাকে বোলে, উল্লাস ও বিষাদ নানাভাবের তরঙ্গ কার্য্যরূপে আনন্দাদি নানারসের ফল উৎপাদন করে।

কিন্তু মাত্র সুরকে চিনে, তাতে আনন্দ লাভ করতে পারে ক'জন? এজন্য অনেকের মতে সুর হোচ্ছে নগ্ন, তান, অলঙ্কার ও মূর্চ্ছনাদি আভ-রণস্বরূপ সে সুরকে সাজিয়ে তুলতে, কাজেই আভরণ বা অলঙ্কারকে বিসর্জ্জন দিয়ে সে নগ্নমূর্ত্তির মাধুর্য্য থাকে কোথায়? অবশ্য আপাততঃ এ যুক্তিটী নেহাত নগণ্য বোলে মনে না হোলেও একথা কিন্তু সত্য নয় যে, অলঙ্কারকে ত্যাগ কোরে সুরের সুষমা বা মূল্যের কিছু হানি হয়, শুদ্ধ সুর যেখানে বিমল আনন্দের মাঝে শান্তির প্রস্রবণ ঢেলে দিতে সক্ষম হয়—মূর্চ্ছনা, তান ও গমকাদি নিরপেক্ষ হোয়েও, সুরের প্রাধান্য ও মূল্যেরই সমাদর সেখানে অধিক বুঝ্‌তে হবে।

যাইহোক, সুর সহসা ধরা-ছোঁওয়া না দেও-য়ার জন্যে সুর বিজড়িত স্বরের গঠনে রাগ-রাগিণী প্রকটিত হয়, তাদের ঠিক ঠিক ফোটানর ওপরই সাধকের সঙ্গীতের রূপ ও মাধুর্য্য বজায় রাখবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে রাগ-রাগিণীর যে স্বর-মূর্ত্তি, আলাপ ও বিস্তারে সে স্বরকে অক্ষুণ্ণ রেখে শাস্ত্রবর্ণিত মূর্ত্তিকে ভাব ও কল্পনার তুলিকায় অঙ্কিত কোরে তদনুযায়ী রসে প্রাণ সঞ্চার কর্‌লেই

* শ্রীযুত কুমুদবন্ধু সেন প্রণীত "গিরিশচন্দ্র ও নাট্য-সাহিত্য।"

তা রূপায়িত হোয়ে ওঠে আসল মূর্ত্তিতে। অবশ্য এ রূপায়িত কোরে তোলার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সাধকের। সাধক ভৈরবরাগ গঠন করতে প্রচেষ্ট হোলে তাকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে সময় ও স্বরমূর্ত্তির ওপর। ষড়জ, কোমল ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত ও উভয় নিষাদ এই হোল ভৈরবের ঠাট (রূপ)। এই ঠাট অনুলোম-বিলোম মুখে স ঋ গ ম প দ ন র্স, র্স ন দা প ণ দ প ম গ ঋ স—মাত্র আবৃত্তি করলেই ভৈরব রাগের রূপ গঠিত বা রাগের জীবন্ত মূর্ত্তি সাধকের সম্মুখে প্রতিভাত হোতে সক্ষম হবে না, কিন্তু বিস্তার করতে হবে তাকে যথাযথ রীতিতে। প্রত্যেক স্বরকে প্রকাশ করতে হবে আপনার হৃদয়ের ভাব ও অভিব্যক্তি দিয়ে। কোন্ স্বরকে কতটুকু বিস্তার করলে কোমলতা ও গাম্ভীর্য্য অটুট থাকে, তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, কোন স্বরটীতে অধিক স্থিতিলাভ করলে প্রকৃত রাগের প্রাণের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, তাও জানতে হবে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে এজন্য বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী—এই চারি প্রকারের স্বর বিভাগ করা হোয়েছে। তন্মধ্যে বাদী হোচ্ছে জান্ বা প্রাণ, এটীতে স্থায়িত্ব অধিক, এজন্য উচ্চ স্থান দিয়ে সঙ্গীতকলাবিদ্‌গণ বলেছেন এটীকে রাজা। তারপরই সম্বাদী, বাদীর পরই এর স্থান এজন্য মন্ত্রী নামে এ' কথিত। অনুবাদী তৃতীয় স্থান অধিকার কোরে ভৃত্য নামে কথিত সঙ্গীতে। বিবাদী স্বর বিরুদ্ধবাদী—শত্রু তুল্য। সঙ্গীতসাধক রাগ-রাগিনীর রূপ যখন গঠন করবেন, তখন এগুলির দিকে যেমন লক্ষ্য রাখ্‌বেন, তেমন শৃঙ্গার, বীভৎস্য, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়, করুণ, অদ্ভুত ও শান্ত এই নব রস ও হর্ষ-বিষাদাদি ভাবের প্রতিও দৃষ্টি রাখ্‌বেন, কারণ সঙ্গীতের রূপ এতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে, আর মাধুর্য্যও তখনই প্রকাশ পাবে, যখন রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি বা রূপ গঠনে সাধক আপনি আত্মহারা হোয়ে অপরকে সেই ভাব ও রসে পরিপ্লুত করতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে সে গঠনের ধারা ও রাগ-রাগিণীর গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের বোলেই অনুমিত হয়। সঙ্গীত-রত্নাকর, পারিজাত, দামোদর, সঙ্গীত দর্পণ, নারায়ণ, মকরন্দ, রাগ-বিবোধ ও বৃহদ্দেশী প্রভৃতি সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগ-রাগিণীর যে মূর্ত্তি বা রূপের বর্ণনা আছে, বর্ত্তমানের সহিত তা বহু অংশে মিলে না। অবশ্য সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণের মধ্যেও যথেষ্ট মতদ্বৈত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ—সঙ্গীত রত্নাকরের সহিত পারিজাতের স্থানে স্থানে মতানৈক্য থাকলেও, বর্ত্তমানে রাগ-রাগিণীর স্বর মূর্ত্তির সহিত যে বহু পার্থক্য, তা অবশ্য স্বীকার্য্য তার ওপর ঘরাণাভেদে রীতি, চাল (গাইবার প্রণালী) ও রাগ-মূর্ত্তিও আবার তিন চার রকমের, কাজেই কোন্‌টা ঠিক্, কোন্‌টা বিকৃত, শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয়, তা বোঝা দুরূহ।

তবে শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত যে অনেকাংশেই গরমিল রাগ রাগিণীর মধ্যে আছে, তা সহজেই বোঝা যায়। আর এজন্যই বোধহয় রাগ-মূর্ত্তি গঠিত হোয়ে ঠিক ঠিক রূপের ও ভাবের পরিচয় দিতে পারে না। দীপকে আগুণ, মল্লারে জলের সঞ্চার, বসন্তে চম্পকের গন্ধ, তোড়িকায় হরিণের সমাগম—এজন্যই হেঁয়ালিতে পরিণত হোয়েছে বোলে মনে হয় আজ কাল।

শুধু তাই নয়, রাগ-রাগিণীকে স্ত্রী ও পুরুষ এই দু'ভাগে ভাগ করা হোয়েছে। উত্তেজক ও বীরভাব ব্যঞ্জকই পুরুষ রাগের স্বরূপ, আর কোমলতা ও শান্তভাব সঞ্চারই স্ত্রী রাগিণীর স্বভাব। স ণ্ দ্ ণ স ম, গ জ্ঞ ম দ ণ র্স, ণ দ ম, ম জ্ঞ ম জ্ঞ স—এই মালকৌশের রূপ যাই ব্যক্ত হয়। অম্‌নি গম্ভীর ও বীরভাবের এক অনুপ্রেরণা যেন হৃদয়ে সংক্রমিত হয়। শাস্ত্রকারও তা স্বীকার করেছেন, যথা—রাগোঽয়ং মালকৌশির্মৃতল গমনধ্বনিঃ—

গম্ভীরঃ সুস্বভাবঃ” ইত্যাদি। আর—স ঋ জ্ঞ ঋ স, ণ্ স ঋ জ্ঞ ঋ স, প ক্ষ জ্ঞ, জ্ঞ ক্ষ প দ প, প দ ণ র্স, ঋ র্জ্ঞ ঋ র্স, ণ দ প ক্ষ প ক্ষ জ্ঞ, ঋ স ণ্ স—এই শুদ্ধ ‘তোড়ি রাগিণী’ যখন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, তখন কোমল ও মৃদু ভাবের এক তরঙ্গ যেন হৃদয়কে উদ্বেলিত কোরে তোলে, শাস্ত্রকার “তুষার শুভ্রোজ্জ্বল দেহযষ্টিঃ—বিনোদযন্তী হরিণং বনান্তে—” ইত্যাদি ভাবে তার রূপ বর্ণনা কোরেছেন। সুতরাং রাগ ও রাগিণীর স্বরবিস্তার ও ধ্যানের প্রভেদ বজায় রেখে রূপ ও মাধুর্য্যে লীলায়িত করাই হোচ্ছে বাহাদুরী। সাধকের কণ্ঠে এই বজ্রকঠোর ও কুসুম-কোমল ভাবধারা যুগপৎ নৃত্য কোরে রাগ-রাগিণীকে নানা ছন্দে সাজিয়ে তুল্তে যখনই সক্ষম হবে, তখনই সুরের রূপ ও মাধুর্য্য আপন অস্তিত্বকে বাস্তবতার মাঝে ফুটিয়ে তুলে স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হবে, সঙ্গীতও যথার্থ তখন সার্থক হবে।

পরিশেষে আমরা এই বোলেই প্রবন্ধ শেষ কর্ব যে, স্থূলতঃ রাগরাগিণীকে গুরু প্রদর্শিত রীতি অনুযায়ী ও শাস্ত্রীয় মর্য্যাদাকে রক্ষা কোরে লীলায়িত ও প্রাণবান কর্তে যত্নবান হোলেও, সাধক মাত্রেরই লক্ষ্য থাকা উচিত,—রাগ-রাগিণী যে অব্যক্ত নাদ বা সুরের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে ভাব ও রসে সঞ্জীবিত কোরে তোলা, তবেই সঙ্গীতের আসল রূপ ও মাধুর্য্যকে প্রকাশ কর্তে সক্ষম হব আমরা। রাগ রাগিণীর ছাঁচে সুরের ভাবময় মূর্ত্তিই সঙ্গীতের রূপ, আর আত্মহারা বা তন্ময় করণই সঙ্গীতের মাধুর্য্য। এই রূপ ও মাধুর্য্য নিয়েই সঙ্গীত সক্রিয় ও মহিমামণ্ডিত। সাধক যখন রাগরাগিণীর জাল বুনে এই রূপও মাধুর্য্যকে ষোলকলায় পূর্ণ কোরে আপনার হৃদয়ে সে সুরব্রহ্মের অনুভূতি আনন্দের উদ্বোধনায় লাভ কর্তে সক্ষম হবেন, তখনই ‘গানাৎ পরতরং নহি’ বাক্য প্রকৃত সার্থক হবে জীবনকে ধন্য ও পুণ্যময় কোরে।
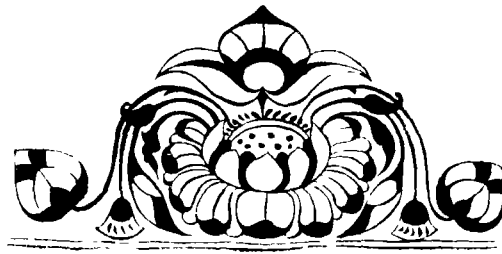
মহাপুরুষ শিবানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

"শিবে যস্য পরাভক্তিঃ ত্যাগোঽপি রতিরুত্তমাঃ।
অহৈতুক কৃপাসিন্ধুং শিবানন্দং নমাম্যহং॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ অভেদ। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ ও সারদানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্যোতিষ্কের এক একটী উজ্জ্বল রশ্মি। সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহ যেমন সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তানগণও তদ্রূপ তাঁহার শক্তির অধিকারী ছিলেন! "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" বাইবেলে যিশুখ্রীষ্ট স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, অবতার ও তৎশিষ্যগণ সমান শক্তি-সম্পন্ন।

নবযুগেও আমরা এই বাক্যের জ্বলন্ত উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎশিষ্যগণের মধ্যে দেখিতে পাই। আধ্যাত্মিকতার ভাবঘনমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটী ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন তাঁহার এক একজন শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থূল চক্ষে দেখিবার যাহাদের সৌভাগ্য হয় নাই তাঁহারা তৎশিষ্যগণের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। যিশুখ্রীষ্ট সত্যই বলিয়াছেন যে, অবতারকে দর্শন করিলেই যেমন ভগবানকে দর্শন করা হয়, সেইরূপ অবতারের শিষ্যগণকে দর্শন করিলে অবতারকেই দর্শন করা হয়। স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া লোক-কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সূর্য্যের দিকে সোজা তাকাইলে চক্ষু ঝলসিয়া যায় মাত্র, সূর্য্য কিরণের ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত-সূর্য্য-দর্শনে সৌরজ্যোতির অনুমান করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভূতপূর্ব্ব ও অলৌকিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ক্ষুদ্র মানব-মন এত বিস্ময়াবিষ্ট হয় যে, তাঁহার অসীম আধ্যাত্মিকতার কোন কল্পনা করিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে তাঁহার সিদ্ধ সন্তানগণের জীবন ও সাধনা বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা আবশ্যক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম ব্রহ্মলীন শিষ্য স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান করা সেইজন্য আমাদের কর্ত্তব্য। মহাপুরুষ শিবানন্দের বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে তিনখানি পুস্তক * প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে জনৈক শিষ্যকে লিখিত পত্রাবলী এবং তদ্দৃষ্ট ঘটনাসমূহ হইতে এই লোকোত্তর মহাপুরুষের দিব্য জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস গ্রহণের চেষ্টা করা হইল। এই সকল ঘটনা ও পত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ শিবানন্দ মহারাজকে যে, 'মহাপুরুষ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আক্ষরিকভাবে সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে শিবানন্দ মহাপুরুষ নামেই অভিহিত হইতেন। সত্যই শিবানন্দ ছিলেন মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন ত্যাগতপস্যার ঘনীভূত মূর্ত্তি। যে ভাবস্রোত বাংলা হইতে প্রবাহিত হইয়া আজ ধর্ম্ম-জগতের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে, শিবানন্দ তাহার অন্যতম স্রষ্টা। তাঁহার মত জিহ্বা সংযত এবং চিত্ত-সংযত ব্যক্তি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দেওঘরে এক ধনীগৃহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া আহারে বসিয়াছিলেন, সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ প্রকার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার্য্য দর্শনে মুক্ত মহাপুরুষ শিশুর

* "মহাপুরুষজীর কথা" ও "মহাপুরুষজীর পত্র"—প্রকাশক, "উদ্বোধন কার্য্যালয়," বাগবাজার, কলিকাতা। "শিবানন্দের অনুধ্যান"—লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৃহকর্ত্রী ভাবিয়াছিলেন 'স্বামিজী আজ আকণ্ঠ-ভোজন করিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ সার্থক করিবেন'। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিল। শিবানন্দ কোন কোন দ্রব্যে মাত্র অঙ্গুলি ডুবাইয়া তাহা জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া বলিলেন 'চমৎকার হয়েছে'। তিনি স্বল্পাহার করিয়া আসন ত্যাগ করিলেন। সত্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"জিতং সর্ব্বং জিতে রসে"। আহার-সংযম বোধ হয় তাঁহার অশীতিবর্ষাধিক দীর্ঘ জীবন-লাভের একটী কারণ।

শাস্ত্রমতে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্বস্মৃতি ও পূর্ব্ব সংস্কার লুপ্ত হয়। "অমনীভাব" বা "মনোনাশ"ই জীবন্মুক্তি। মনের পরপারে যাইবার কৌশল রাজযোগেও বিবৃত আছে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব এত বাহ্যজ্ঞানহীন এবং অন্তর্ম্মুখীন ছিলেন যে, গোপালকে ব্রজবালক, গঙ্গাকে যমুনা এবং নিত্যানন্দকে বলরাম ভ্রম করিয়াছিলেন। দিব্যোন্মাদের সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও জাগতিক স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ যখন সংসার ত্যাগপূর্ব্বক সত্যলাভের জন্য সংকল্প করিয়া তপস্যামগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহারও উক্ত অবস্থা হইয়াছিল। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের অবস্থান সংবাদ পথিকদিগের নিকট পাইয়া পিতা শুদ্ধোধন সিদ্ধার্থের বাল্য বন্ধু মন্ত্রী-পুত্র উদঙ্গীকে তাহার কুশল আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। উদঙ্গী আসিয়া বুদ্ধদেবকে বলিলেন, "সিদ্ধার্থ, আমি তোমার বাল্য-সখা উদঙ্গী। তোমার পিতা শুদ্ধোধন তোমার জন্য ব্যস্ত। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর।"

গৌতমের শুধু যে পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পাইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার নিজ নাম পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল না। তিনি বলিলেন—"সিদ্ধার্থ কে? শুদ্ধোধন কে? এবং উদঙ্গী কে?"

স্বামী শিবানন্দের জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাংসারিক সম্বন্ধস্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তখন কাশী-বাসিনী। তিনি যখন শেষবার কাশী গমন করেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারিগণ 'পিসিমা' বলিয়া সম্বোধন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিও সাধুদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। একদিন শীতের সময় সকালবেলায় মহাপুরুষজী শিষ্যস্থানীয় সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ। তাঁহার ভগিনী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আমার এই ছোট ভাইটিকে লালনপালন করিবার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু সে আজ আমার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। মহা-পুরুষ মহারাজ তাহাতে শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাবা, দেখ পাঁচ বছর পূর্ব্বে এঁকে দেখ্‌লে মনে হত, যে এর সঙ্গে কখনও কোন পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন বাস্তার কোনও অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত উঁহার কোনও পার্থক্য দেখি না। তোমরাইত আমার মা, বাপ, ভাই বোন সব।" শিবানন্দ মহারাজ ঐহিক সম্পর্কের স্মৃতি এমন ভাবে মুছিয়া ফেলিয়া-ছিলেন যে তাঁহার রক্তসম্বন্ধেরও স্মৃতি পর্য্যন্ত ছিলনা—ইহাই প্রকৃত 'বিদেহাবস্থা'। কেবল ব্রহ্ম-জ্ঞানিগণেরই এরূপ অবস্থা লাভ হইয়া থাকে।

শিবানন্দজী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ন্যায় নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি "Light of Asia" বইখানি পড়িতে ভালবাসিতেন। ভগবান বুদ্ধের মত উদাসীনতা তাঁর মধ্যে এত মূর্ত্ত হইয়াছিল যে তাঁহাকে এই জগতের লোক বলিয়া মনে হইত না। বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, ডানপায়ের আঙ্গুল

হইতে একগজ দূরে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে খুব ধ্যান হয়। শিবানন্দজী চলিবার সময়ও পথ-নিবদ্ধ দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যান করিতে করিতে চলিতেন। স্বীয় ধ্যানপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"মহাব্যোম বা মহাশূন্যের ভিতর চুপ ক'রে ব'সে নিরাকার বা নির্গুণ ধ্যান করি, কোনও চিন্তা মনে উঠ্‌তে দিই না, দ্রষ্টা বা সাক্ষী রূপে থাকি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের সাকার সগুণ স্থূলস্বরূপ জ্ঞানে ধ্যান করিতেন, এবং কোন কোন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ও ধ্যান করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি আমিত্ব এমন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তিত্ব হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করিতেন এবং চিন্তায় ও কাজে তাহা প্রকাশ করিতেন। যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়মন্দিরে সদা বিরাজমান। গীতায় আছে, সর্ব্বভূতের ভিতরে ভগবান অধিষ্ঠান করেন, শিবানন্দজী তাহা স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একবার তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে গিয়াছিলেন। বিদ্যাপীঠের অনতিদূরে 'বিপিন-কুটীরে' অবস্থানকালে মিশনের স্থানীয় সাধু-ব্রহ্মচারিগণ একদিন প্রাতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। জনৈক সাধু প্রণামান্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—"স্বামিজী, আমার মনে হয়, আপনারা আমাদের স্তোকবাক্য দিয়ে কাজকর্ম্ম করিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু ভগবান লাভ করবার জন্য আমাদের সাধনভজন করতে হবে।" তিনি তাহাতে অতিশয় রাগান্বিত হইয়া শিষ্যকে খুব বকিলেন, এবং বলিলেন—"আরে, একি আমি বল্‌ছি, আমার মুখ দিয়ে ৺ঠাকুর বল্‌ছেন; আমার মধ্যে আমি নাই, শ্রীশ্রীঠাকুরই জাগ্রত ও জীবন্ত আছেন। আমাদের মুখ দিয়ে তিনি যা বলেন তা' বিশ্বাস করো, পূর্ণ (perfect) হ'য়ে যাবে। কবে বুদ্ধ শঙ্কর প্রভৃতি অবতার এসেছিলেন কে জানে। এই সেদিন তিনি এলেন, তাঁর কথা বিশ্বাস করো আর চিন্তা করো, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না, তোমাদের দেবত্বলাভ হবে।"

যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষ মহারাজ শিষ্যসন্তান-দিগকে পূর্ণত্বলাভের জন্য সদা উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র হইতে নিম্ন-লিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। "তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব। কৃপার জন্য তাঁর কাছে প্রাণের সহিত প্রার্থনা করা ব্যতীত আর কোনও উপায় আমি জানি না। তিনি তোমার হৃদয়েই আছেন, ডাকিলেই দেখ্‌তে পাবে। এপথে তাড়াতাড়ি কিছুই হয় না। এই প্রার্থনা করিলে আর পরমুহূর্ত্তে তাহার ফল হইল কিনা দেখিতে চাহিলে, তাহা হইবার নয়। প্রার্থনা সদাসর্ব্বদাই করিতে থাক, যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে; তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন। প্রার্থনা দ্বারা তিনি বড়ই নিকট হইয়া পড়েন, বড়ই আপনার হইয়া পড়েন, তখন মানব শান্তি পায়। ব্যস্ত হইলে চলিবে না, বড়ই ধৈর্য্যের প্রয়োজন। প্রাচীন কুসংস্কার সকল তাঁহার সতত স্মরণে দমিত হইয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারা সব সম্ভব হয় তাঁর কৃপায়। ঠাকুর বড় দয়াময়, প্রত্যক্ষ চৈতন্যময়। অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া নররূপ ধারণ করিয়াছেন সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত। অতএব আমি তাঁর একজন দাস হইয়া তোমাকে বলিতেছি, তিনি তোমার অন্তরে, হৃদয়ের অন্তস্তলে রহিয়াছেন। প্রার্থনা কর কাতরে, যেরূপ বালক পিতামাতার নিকট আব্দার করিয়া কোনও জিনিষ চায়, তাহা হইলে শান্তি পাইবে।"

শিবানন্দজী এত গম্ভীর ও স্বল্পভাষী ছিলেন যে, তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে সাহস করিত না। বাহিরের লোকে ত দূরের কথা তাঁহার নিত্যসঙ্গী শিষ্য ও সেবকগণও নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার রাগ

ছিল জলের দাগের মত। পূর্ব্বমুহূর্ত্তে জ্বলন্ত অগ্নির মত যিনি ক্রুদ্ধ ছিলেন পরমুহূর্ত্তে তাঁহাকে ননীর মত কোমল দেখা গিয়াছে। একবার তিনি কোন শিষ্যকে ভীষণভাবে গালমন্দ করেন, শিষ্য অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইয়া তাঁহার দিকে যায়ই না, অথচ সেদিন কোন ধনীভক্তের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। বেলা অতিক্রান্ত প্রায়, শিষ্য ভয়ে অত্যন্ত জড়সড় হইয়া শিবানন্দজীর সম্মুখে এই সংবাদ প্রদান করিতে উপস্থিত; শিবানন্দজী তখন হাস্যমুখে শিষ্যটীর সহিত এমনভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি যে ঐ একই শিষ্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা মনেই হইল না। সত্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 'সাধু প্রকোপিত হইলেও তাঁহার মনে কোন বিকৃতি উপস্থিত হয় না, তৃণের অগ্নি যেমন সাগরের জলকে উত্তপ্ত করিতে পারে না—ক্রোধ তদ্রূপ সাধুকে বশীভূত করিতে পারে না'।

শিবানন্দজীর দেহাত্মবুদ্ধি আদৌ ছিল না। তিনি দেহের আদৌ যত্ন নিতেন না। তপস্যা-কালীন সমস্ত রাত্রি ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেন এবং দিনের বেলায় গঙ্গায় তিন ডুব দিয়া আহারে বসিতেন। তাহাতে ধূলি কাদায় তাঁহার শরীরে একটা আবরণ পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার গায়ের রং এত ঢাকিয়া গিয়াছিল যে তাঁহাকে চিনিতে পারা যাইত না। পা ফাটিয়া রক্ত পড়িত, দাড়ি ও মাথার চুল জটা পাকাইয়া-ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ঋষিপ্রতীম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহিমবাবু একবার তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া শরীর ভালরূপে ধুইয়া তৈল মাখাইয়া দেন।

তিনি খুব উজ্জ্বল বর্ণ ছিলেন না, কিন্তু তপস্যালব্ধ জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল সদা উদ্ভাসিত থাকিত। ঠাকুরঘর হইতে ধ্যান করিবার পর যখন তিনি বাহির হইতেন তাঁহার বর্ণ এত উজ্জ্বল হইত যে, পরিহিত গেরুয়া বস্ত্রের সহিত তাহা এক হইয়া যাইত। শেষ বয়সে তিনি হাঁপানিতে অতিশয় কষ্ট পাইতেন, কিন্তু রোগ তাঁহাকে মুহ্যমান ও নিরানন্দ করিতে পারিত না। একবার তিনি যখন দেওঘরে অবস্থান করিতে ছিলেন তখন তিনি হঠাৎ কঠিন হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। রাত্রে তিনি হাঁপানিতে এত কষ্ট পান যে আদৌ ঘুমাইতে পারিলেন না, সারারাত্রি বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া কাটাইলেন। প্রাতঃকালে সাধুগণ যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া কুশল প্রশ্ন করেন, তখন তিনি ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার ত কোনই কষ্ট হয় নি, আমি বেশ জানি যে আমি শরীর নয়।। শরীরটা আমা হইতে তফাৎ, আমার কষ্ট হবে কি করে? সারারাত্রি তাঁর ধ্যানে ডুবিয়া আছি।" তখন তাঁহার মুখে অসুখজনিত কোন কালিমার দাগ ছিল না।

নিজের ঠিকুজিখানি তিনি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। জন্ম তারিখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "আমি আনন্দস্বরূপ আত্মা, আমার আবার জন্মমৃত্যু কি? আম-ই বিক্রী হইয়া গেল, আর আঁটির কি দরকার?" তাঁহার জীবন তপস্যাময় ছিল। তিনি এত অভিমান শূন্য ছিলেন যে কোন উৎসবের সময় স্থান ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিবার আবশ্যক হইলে তিনি নিজেই অপরের জুতাগুলি কোলে করিয়া সরাইয়া অন্যত্র রাখিতেন। মানুষকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করা ও ভালবাসা তিনি বড় সাধন মনে করিতেন। একবার তিনি গঙ্গাপূজা করিতে গিয়া স্নান-নিরত একটী লোকের মাথায় ফুল ও মুখে মিষ্টি দিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। তিনি বলিতেন 'গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়।'

একবার স্বামিজীর জন্মোৎসবের রাত্রে কলিকাতা হইতে আগত জনৈক যুবক কর্ম্মীর বমি ও উদরাময় হয়; তিনি তাহাকে সেবা শুশ্রূষা

করিয়া আরোগ্য করেন। শিবানন্দজী মুক্ত পুরুষ ও জ্ঞানী ছিলেন। তাই শুচি ও অশুচি বিধি-নিষেধ মানিতেন না। একবার কাশীতে গ্রহণের সময় তাঁহার শিষ্য কয়েকজন গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাদের জপ ধ্যান করিয়া রাত্রি কাটাইতে উপদেশ দেন। তাঁহার দীক্ষা দান প্রণালীতেও বিশেষ অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ছিল না। দীক্ষাদান বিষয়ে তিনি বলিতেন যে, ঠাকুরই একমাত্র গুরু—তিনি গুরু নন। দীক্ষাদান অর্থে তিনি আশ্রিতজনকে ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করাই বুঝিতেন। অবিশ্বাসী শিষ্যদের তিনি বলিতেন, "তোমাদের আমি ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়াছি এবং তিনিও তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়রূপে জানি।—ইহার অধিক কিছু জানি না বা বুঝি না।" ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে গুরু, শ্রেয়কামী মধ্যস্থ। শিবানন্দজী গুরু হইয়াও গুরুগিরি করেন নাই।

মহাপুরুষ শিবানন্দজী কোন অনুরক্ত শিষ্যকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে স্বহস্তে একটী চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।—"আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনা মন কারু ঘরে। যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥ পরম ধন এই পরশ-মণি যা চাবি তা দিতে পারে। ওরে কত মণি আছে পড়ে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥" ঠাকুর এই গানটী প্রায়ই গাহিয়া অনেককে উপদেশ দিতেন। এই হইল পাকা বেদান্ত জ্ঞান। ইহা উপলব্ধি হয় কেবল তাঁর নাম হৃদয়ে জপ করিলে ও এইভাবে আন্তরিক প্রার্থনা করিলে—'প্রভু উদয় হও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, অন্তচক্ষু খুলে দাও। তুমিই হৃদয়ের চৈতন্য—উদয় হও, অজ্ঞান নাশ হইয়া যাউক,—মানবজনম সফল হউক।' নামকরা, ধ্যানকরা উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য সেই প্রাণনাথ চৈতন্যদেব। যিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকিয়া প্রাণ-মন-বুদ্ধি সকলকে চালাইতেছেন তাঁকে লাভ করা। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া।' অতএব এই হৃদয়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে ভক্তি-ভরে তাঁর নাম, প্রার্থনা ও ধ্যান করিয়া। ঠাকুরই হৃদয়ের সেই আত্মচৈতন্য দেব। প্রণব সংযুক্ত করিয়া মন্ত্র জপ করা উত্তম। উপলব্ধি তাঁর কৃপায় হয়। সেই অন্তরস্থ চৈতন্যদেব ঠাকুরের কৃপাতেই জাগ্রত হয়। আমি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হৃদয়নাথ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। হতাশ হইও না। এ রাজ্য স্কুলের পরীক্ষা পাশ করিবার মত নয়। পড়িলাম, মনে রাখিলাম, প্রশ্ন আসিল, উত্তর দিলাম, আর পাশ হইল। এ সকল নিয়ম স্কুল কালেজে পড়া ও পাশকরা সম্বন্ধে। তবে ইহার মধ্যে কোনটুকু ধর্ম্মকার্য্যে লাগাতে হবে,—মনঃসংযম। যে ছেলেরা খুব মনঃসংযম করে পড়তে পারে তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মনঃ-সংযমের সহিত তাঁর কৃপায় যদি তিনি তাঁহার নাম জপ করিতে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু আনন্দ ও প্রেম দেন, তাহা হইলে জীব শীঘ্রই কৃতকার্য্য হয়। হৃদয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি ধারণা করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেই সমস্ত হইবে। অবশ্য অন্য যেরূপ করিয়া থাক, যথা,—হৃদয়ে মা, ঠাকুর, স্বামিজী এবং মস্তকে শ্রীগুরু ও ঠাকুরের ভক্তগণ ও প্রাচীন আচার্য্যগণকে চিন্তা করিয়া যম নিয়ম ইত্যাদি কতগুলি গুণের ধ্যান করাও উত্তম। মন্ত্রের অর্থ আর কিছুই নয়—সেই ভগবানই মন্ত্র। নাম ও নামী অভেদ। যে নাম সে হরি। নাম ব্রহ্ম—ইহাছাড়া মন্ত্রের অর্থ আমি আর কিছুই জানি না। ঠাকুরের কাছে আমি ইহা শিখিয়াছি। মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দের অর্থ ঈশ্বর। বাহ্যিক মন্দিরাদি দর্শন—শাস্ত্রাদি পাঠ, সাধুসঙ্গ এ সব ভাবোদ্দীপক। এ সব করাও চাই—উদ্দীপনার জন্য।"

রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মসমীকরণ-প্রচেষ্টা

বনাম

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়

শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্

শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নানা দিক দিয়া এবং নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী আলোচিত হইতেছে। ধর্ম্মজগতে তাঁহার সবচেয়ে বিশিষ্ট দান—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় সম্বন্ধে বলিতে ও লিখিতে গিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেনও পরমত সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মবিষয়ক প্রচেষ্টাকে সর্ব্বমত সহিষ্ণুতা, সর্ব্বধর্ম্মগ্রহণ ও সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয় (Tolerance, acceptance and synthesis of all religions) বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই সকল সংস্কারকগণের তুলনা করিতে গেলে যে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মসমন্বয় ও অখণ্ডভাবে সর্ব্বমতগ্রহণের বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করা হয় এমন নয়, পরন্তু কতকগুলি প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক সত্যেরও অপলাপ করা হয়।

বিষয়টি একটু বিশদরূপে আলোচনা করা যাউক। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের যে ধর্ম্মপত্রানুষ্ঠান বা ট্রাষ্ট্‌ডিড্ লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে স্বয়ং বলিয়াছেন, "ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, অনাদ্যনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরের উপাসনার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। অন্য কোন প্রকার নামে ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারিবে না। কোন প্রকার ছবি, প্রতিমূর্ত্তি, বা খোদিত মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হইবে না।' ইত্যাদি। "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় লিখিত আছে,—"রামমোহন রায় কলিকাতা নগরে আগমনপূর্ব্বক বিচারদ্বারা ও গ্রন্থাদিপ্রকাশদ্বারা সত্যধর্ম্ম স্থাপনে অত্যন্ত উদ্যোগী হইলেন। ·রাজা পৌত্তলিক ধর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক যখন সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অনেকেই তাঁহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও আলাপাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। রাজার যত্ন দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থসকল প্রকাশ হওয়াতে উত্তরোত্তর লোকদিগের শত্রুতা বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।"

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "রাজা রামমোহন সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে মনুষ্য স্বভাবতঃ এক অনাদি পুরুষকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন। সুতরাং ইহা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। ·····যখন দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে এবং ধর্ম্মের মতগত ও কার্য্যগত বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মত রহিয়াছে। তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এ সকল মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। বিশেষ বিশেষ প্রকার দেবতায় ও বিশেষ প্রকার

উপাসনা প্রণালীতে বিশ্বাস, শিক্ষার ফল। এসকল স্বাভাবিক নহে। জনশ্রুতি, শাস্ত্র ও চতুঃপার্শ্বের অবস্থাদ্বারা এই সকল মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। রামমোহন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে জগতে প্রচলিত সকল ধর্ম্মই কি সত্য? অথবা সকল ধর্ম্মই মিথ্যা? কিম্বা কোন কোন ধর্ম্ম সত্য এবং কোন কোন ধর্ম্ম মিথ্যা? তিনি বলিতেছেন, সকল ধর্ম্মই সত্য, ইহা সম্ভব নহে। কেননা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ঈশ্বর সম্বন্ধে বিপরীত প্রকার মত দৃষ্ট হইতেছে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে যে, এক ধর্ম্মে যে কার্য্যের বিধি রহিয়াছে, অন্য ধর্ম্মে তাহাই নিষিদ্ধ। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা-নিচয় কখন সকলই সত্য হইতে পারে না। এস্থলে রাজা আরবী ভাষার তর্কশাস্ত্র হইতে 'অবিরোধ-নীতির' সূত্র উদ্ধৃত করিতেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মই সত্য হইতে পারে না। রাজার মতে, সকল ধর্ম্মের লোক যখন পরমেশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তখন সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে। আবার সকল ধর্ম্মেই যখন বিশেষ বিশেষ অমূলক মত ও বিশেষ বিশেষ অযুক্তিসিদ্ধ বাহ্য অনুষ্ঠান রহিয়াছে, তখন সকল ধর্ম্মেই অসত্য বিদ্যমান। (১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাজা রামমোহন উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়ং" এবং বাইবেল ও কোরানের একেশ্বরবাদের সহিত যুক্তিবাদের সামঞ্জস্য স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বহুদেবতায় বিশ্বাসের সহিত ইহার ঐক্য স্বীকার করেন নাই। এইজন্য রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে বহুদেবতার বিশ্বাস স্থান পায় নাই। রামমোহনের ধর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাদর্শের প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণুতা, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাদর্শের সম্পূর্ণ গ্রহণ স্থান পায় নাই। ঔপনিষদিক যুগের পরবর্ত্তী দুই সহস্র বৎসর ব্যাপী হিন্দুধর্ম্মের ক্রমাভি-ব্যক্তি, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি এবং মধ্যযুগের ভক্তিবাদকে রামমোহন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাদর্শ, বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন রুচি, প্রকৃতি, অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং অদ্যাবধিও স্বমহিমায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে। যে ধর্ম্ম এই সকল ক্রমবিকাশের ধারাকে অগ্রাহ্য করে, উহাকে কোন ক্রমেই সার্ব্বভৌম ও সমন্বয়মূলক বলা যাইতে পারে না। রামমোহন সকলধর্ম্ম, সকল মতবাদ ও সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, সকল ধর্ম্মের, সকল মতবাদের, সকল আদর্শের ও সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন নাই; সকল ধর্ম্ম নিজ জীবনে আচরণ করিয়া, সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই চরম লক্ষ্য শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় এই প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করেন নাই; কঠোর সাধন দ্বারা হৃদয়ের অন্তস্তলে বিভিন্ন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত মূল একত্বের সন্ধান পাইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টাও করেন নাই। তিনি কেবল এসিয়া ও ইউরোপের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলির তুলনামূলক পাঠ ও আলোচনা করিয়া বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিচারের সাহায্যে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। রামমোহনের এই কাজটিকে অবিসংবাদিতরূপে ধর্ম্মসমীকরণ-প্রচেষ্টা (attempt at eclecticism) বলা যাইতে পারে—ইহা কোন প্রকারেই ধর্ম্মসমন্বয় (Synthesis of Religions) নামে অভিহিত হইতে পারে না।

রাজা রামমোহনের ন্যায়, কেশবচন্দ্র সেনও "এক-মেবাদ্বিতীয়ং" এর উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে তীব্রভাষায় হিন্দুগণের মূর্ত্তি-

(১) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—পৃষ্ঠা ৫৫৩-৫৪, ৫৫৭।

কথিত "পৌত্তলিকতার" বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে গিয়া তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, "যতই স্বাধীনভাব বৃদ্ধি হইল, দেখিলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশকে পৌত্তলিকতাদির দাস করিয়া রাখিয়াছিল। তৎসমুদয়কে কাটিবার জন্য খড়্গহস্ত হইলাম। যাই দেখিলাম, ভ্রম, কুসংস্কার, পিতা, পিতামহকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাড়াতে উপদ্রব করিতেছে, অমনই অস্ত্র বাহির করিলাম।" (১) ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে উপনিষদের পরবর্ত্তী যুগের হিন্দুধর্ম্মের ক্রমবিকাশ, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের উপাসনা-পদ্ধতিসমূহ এবং মধ্যযুগের ভক্তিবাদকে কেশবচন্দ্র প্রথমজীবনে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বেদ, কোরাণ ও বাইবেলকে অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ ও অন্যান্য জগৎত্রাণকারী মহাপুরুষগণকে পূর্ণ আদর্শ মানুষ বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "কোন এক পুস্তককে কেন অভ্রান্ত ভাবিব? কোন পুস্তক নাই যাহাতে পূর্ণজ্ঞান পাইতে পারি, এইজন্য বইকে আদর্শ করিয়া লই নাই। কেন একটি মানুষকে অবলম্বন করিব? মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউক। শ্রীগৌরাঙ্গকে যথেষ্ট ভক্তি করি, কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না। কোন মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না।" (২) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি নিজে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন উহাকে অভ্রান্ত বাণী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যত বাণী ধরিতে পারিয়াছি প্রত্যেকটিই অভ্রান্ত সত্য দৈববাণী।" (৩)

আমার ধর্ম্মই ঠিক, আমি যাহা ভাবিয়াছি,

(১) জীবনবেদ—৫ম অঃ।
(২) জীবনবেদ—৫ম অঃ।
(৩) জীবনবেদ—৬ষ্ঠ অঃ।

তাহাই সত্য, আর অন্যান্য সকলের মত ও চিন্তা মিথ্যা—এই একদেশী ভাবকে মতুয়ার বুদ্ধি বলে। ইহা অত্যন্ত অনুদার ও ভগবান লাভের পরিপন্থী। পরবর্ত্তী জীবনে কেশবচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্যসংস্পর্শে আসিয়া সকল ধর্ম্মাদর্শ, সকল মতবাদ, সকল যোগমার্গ, সকল দার্শনিক চিন্তাধারা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ সাধু-সন্ত এবং বিশেষরূপে মাতৃ-ভাবে ঈশ্বরোপাসনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ ও কেশবের প্রথম সাক্ষাৎকার ১৮৭৫ সনের মার্চ্চ মাসে ঘটিয়াছিল। কেশব সেন ১৮৮২ খৃঃ আশ্বিন মাসে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এখন শাক্ত-বৈষ্ণবে মিল হইয়াছে। কালা-কৃষ্ণ এক সঙ্গে বসিলেন। কালীকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে কালী দেখিতেছেন ভক্ত। শাক্তের মন্দির ও ভক্তের মন্দির দুই একত্রে মিলিয়া এবার এক সোনার মন্দির হইবে।" (১) আবার বলিয়াছেন, "যাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ, পুণ্যের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের চরণ রেণু মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, সমস্ত পৃথিবী যাঁহাদিগকে ভক্তি করে, যাঁহাদিগের নিকট হইতে পরিত্রাণের সাহায্য লাভ করিয়াছে। সেই সকল সাধুর নিকট পাপী পরিত্রাণপ্রার্থী হইয়া যাইব। একাসনে বসিব না।" (২)

পরমহংসদেবের দিব্যসংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রথমভাগের ভাবসমূহ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবের মধ্যে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইত। কেশব সংবাদ-পত্রে, পুস্তক ও ধর্ম্মপত্রিকায় রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্ম-জীবনের উচ্চাদর্শের কথা প্রচার করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, "কেশবসেনকে আমি বললাম,—কেন ছাপালে?

(১) জীবনবেদ—১১ অঃ।
(২) জীবনবেদ—১৬ অঃ (১৮০৪ শকাব্দ)।

তা বললে, তোমার কাছে লোক আসবে বলে।" (১) দিব্যভাবের আবেগে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদিগকে ব্যাকুলচিত্তে ডাকিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। যেখানে সংবাদ পৌঁছিলে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা প্রায় সকল ভক্তগণ জানিতে পারিবেন, জগদম্বা তাঁহাকে সে কথা প্রাণে প্রাণে বলিয়া বেলঘরিয়ার উদ্যানে লইয়া গেলেন এবং ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। কেশবচন্দ্রের পরমভক্ত ও অনুরাগী শিষ্য গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "১৮৭৫ সনে মার্চ্চ মাসে একদিন পূর্ব্বাহ্নে ৮।৯ টার সময় পরমহংস-দেব হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে উপস্থিত হন। পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন। পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তখন হইতে উভয়ের আত্মার গূঢ় যোগ হয়। সময়ে সময়ে আচার্য্যদেব দলবলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকট যাইতেন, পরমহংসও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া আচার্য্য ভবনে আসিতেন। পরমহংসদেবের উচ্চধর্ম্মভাব ও চরিত্র পুস্তকে ও পত্রিকায় আচার্য্যদেব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, "মিরার" ও "ধর্ম্মতত্ত্বে" তাঁহার বিবরণ সকল লেখা হইল, "পরমহংসের উক্তি" নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল। তখন হইতে তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃ-ভাব অনেক পরিমাণে ব্রাহ্ম-সমাজে উদ্দীপিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এ অবস্থাটী তাঁহা হইতে আচার্য্যদেব অধিকরূপে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্তিসত্ত্বেও বিশ্বাস ও জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে অনেক সরস করিয়া তুলে।... তখন তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়া ব্রাহ্মসাধকদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। উহা বিধাতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমহংস-দেবের সমুদায় ধর্ম্মমতে যদিচ আমরা ঐক্যস্থাপন করিতে পারি না, তথাপি তাঁহার যোগভক্তিপ্রধান সমুন্নত জীবন যে, নববিধানের উন্নতিসাধনে বিধাতা-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না। পরমধার্ম্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকট শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে একপার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন, কোনদিন কোনরূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান জিনিষ সকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদর করিতেন। (১)

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না; ছিল বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, তিনই শুষ্ক কঠোর। ভক্তি অতিশয় আবশ্যক, ইহা তখন মনে হয় নাই। মাতৃচরণকমল কি তাহা বুঝিতাম না। আনন্দময়ীর পূজা ব্যতীত আনন্দ হয় না। আনন্দবাদীদের মধ্যে আমার যে প্রবেশ হইবে, এরূপ আশা ছিল না, মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের মধ্যেও কতরূপ দেখিলাম। যাহা আমাদের ছিল, তাহার উৎকর্ষ হইয়াছে, যাহা নাই, এসময় তাহাই আনিতে হইবে। যে আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারে নাই, তাহার ব্রহ্মদর্শন ভাল হয় নাই।" (২) এই উক্তি হইতে আনন্দময়ীর পূজক, আনন্দময়ী-গতপ্রাণ পরমহংসদেবের নিকট কেশবচন্দ্রের মাতৃ-ভাবে ঈশ্বরোপাসনা শিক্ষার কথা স্পষ্টই অনুমিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সম্বন্ধে ১৮৮৫ খৃঃ ৯ই আগষ্ট দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণকে

---

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(১) শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন (চতুর্থ সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৫৪-৫৯।

(২) জীবন বেদ—৭ম অঃ (১৮৮২ খৃঃ প্রদত্ত বক্তৃতা)।

বলিয়াছিলেন, "কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখ্‌লাম। সমাধি অবস্থায় দেখ্‌লাম কেশব সেন আর তার দল। একঘর লোক আমার সাম্‌নে বসে রয়েছে। কেশবের মাথায় দেখ্‌লাম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বল্‌ছে,—'ইনি কি বল্‌ছেন, তোমরা সব শোনো।' মাকে বল্‌লাম, মা এদের ইংরাজী মত,—এদের বলা কেন। তারপর মা বুঝিয়ে দিলেন যে, কলিতে এ রকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদিসমাজে গেল না।" (১)

হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন মত, বিভিন্ন যোগমার্গ, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরবাদ, মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম নিজ জীবনে সাধন করিয়া প্রত্যেক মত ও পথের চরম উপলব্ধি লাভ করিবার প্রায় ১০ দশ বৎসর পর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কেশব সেন শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মাদর্শ ও যোগমার্গের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছিলেন। কেশব কি বাস্তবিকই রামকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন? কেশবের উক্তি হইতে দেখা যায় তিনি গোঁড়া দ্বৈতবাদী ছিলেন; অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি দ্বৈতবাদী, দুই বিচারপতি দেখিতেছি, এক আত্মা, আর একজন আত্মাকে চালাইতেছেন; হে ঈশ্বর, তোমার কথা, আমার কথা, উভয়কে এক বলিতে কোন মতেই পারি না।" (২)

আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের তুলনামূলক পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্মে যাহা যাহা ভাল ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন সেইগুলি গ্রহণ করিয়া, এবং যাহা যাহা আপাত-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সেগুলি বর্জ্জন করিয়া তাঁহার নববিধান প্রবর্ত্তিত করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বধর্ম্মের, সর্ব্বমতের, সর্ব্বপথের সবটুকুই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কেশবের প্রচেষ্টাকে কোনরূপেই প্রত্যক্ষানুভূতিলব্ধ সমন্বয় ও ও অখণ্ডভাবে সর্ব্বমতগ্রহণ বলা যাইতে পারে না। যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিপ্রসূত সমীকরণ-প্রচেষ্টা ব্যতীত ইহা আর কিছু নয়। এই জন্যই মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন, "আমাদের জানা উচিত যে, ধর্ম্ম বিদ্যা-বুদ্ধি যুক্তি ও বিচারের করবৎ নয়, ইহা অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষানুভূতির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও বিচারের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যুক্তি-বিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে উহা এক মুহূর্ত্তও টিকিয়া থাকিতে পারে না।"

পূর্ব্বে উল্লিখিত ধর্ম্মপ্রাণ উদারহৃদয় সমাজ সংস্কারকগণের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাসমূহ বিচার করিয়া, ধর্ম্মসমন্বয় কার্য্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত স্থান কোথায় উহা আমরা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মসমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আন্তরিক নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা সহায়েই তাঁহার ইষ্ট শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তৎপর হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন মত, এমন কি, হিন্দুধর্ম্ম বহির্ভূত ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া পরিণামে সেই একই চরম সত্যকে লাভ করা যায় কিনা জানিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি ভিন্ন ভিন্ন গুরুর উপদেশে নির্দ্দিষ্টকাল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত আচরণ করিয়া, প্রত্যেক ধর্ম্মমত, ধর্ম্মাদর্শ ও যোগমার্গের আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিয়া, কোনও অংশকে অপ্রয়োজনীয় বা

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ—পৃঃ ২৮০।
(২) জীবনবেদ ৬ষ্ঠ অঃ।

অসত্য বলিয়া বর্জ্জন না করিয়া, এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মত, পথ ও মার্গ ই সত্য এবং সাধককে পরিণামে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে পৌছাইয়া দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও আদর্শের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি এবং আপাতবিরুদ্ধ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাদর্শের মধ্যে কোনও প্রকার অসামঞ্জস্য না দেখিয়া সর্ব্বমত ও সর্ব্বাদর্শকে সত্য বলিয়া গ্রহণেই তাঁহার ধর্ম্মসমন্বয়কে একাধারে অভূতপূর্ব্ব, বিশিষ্ট ও মানব জাতির ভবিষ্য মহাকল্যাণের হেতুভূত করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'আমায় সব ধর্ম্ম একবার নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এসব পথ দিয়ে আস্‌তে হয়েছে। দেখ্‌লাম—সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলেই আস্‌ছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। অনন্ত পথ;—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ—যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে। মত—পথ। ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আরও কত কিছু। ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যাঁর যে নামে ও যে ভাবে ডাকৃতে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাক্‌লে দেখা পায়। বৈষ্ণব, শাক্ত, বেদান্তবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী, আবার খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই ঈশ্বরকে পাবে, আন্তরিক হলে। আমার ধর্ম্ম ঠিক, আমি যা ভাব্‌ছি তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা—এই মতুয়ার বুদ্ধি খারাপ। বস্তু এক, নাম আলাদা। এক রাম তাঁর হাজার নাম।"(১) শ্রীরামকৃষ্ণের পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা কেবল পরধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেই পর্য্যবসিত হয় নাই—তাঁহার সহিষ্ণুতার অর্থ 'সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ'। ইহা ধর্ম্মসমীকরণ নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মূল একত্বকে বুদ্ধি, যুক্তি ও বিচার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ব্বভৌম দৃষ্টি সাধনালব্ধ প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি আপাতবিরুদ্ধ মত ও আদর্শ সমূহের অনৈক্যগুলিকে সাধনার কষ্টিপাথর দ্বারা একে একে পরীক্ষা করিয়া উহাদের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে কেবল বিভিন্ন পথই ফলপ্রদ ও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু বিভিন্ন দার্শনিক ও আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মাদর্শও তুল্যরূপ সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। কারণ—এই সকল পথ ও আদর্শ একই চরম সত্যের বিভিন্ন দিক্ মাত্র। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মাদর্শ ও পথকে বিন্দুমাত্রও অনুপযোগী ও অসত্য বলিয়া বর্জ্জন না করিয়া, সকল গুলিকেই সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সার্ব্বভৌম সমন্বয়মূলক দৃষ্টি প্রকৃতপক্ষেই অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্ম্মসমন্বয়ই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মহতী বাণী এবং জগতের সংস্কৃতি ভাণ্ডারে শ্রেষ্ঠ দান। এই সমন্বয় বার্ত্তার অমোঘ প্রভাব সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মান্ধতা, মতুয়ার বুদ্ধি, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, এবং লেখনী, বাক্য ও বল-প্রয়োগ দ্বারা ধর্ম্মপীড়নের মূলে চিরতরে কুঠারাঘাত করিবে এবং সকলকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিতে চিরসম্বদ্ধ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ, সর্ব্বব্যাপক ও ঔদার্য্যব্যঞ্জক ধর্ম্মসমন্বয় পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাসে পূর্ব্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব সমন্বয় বাণীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পাশ্চাত্য মনীষী রোমাঁ রোলাঁ যথার্থ ই বলিয়াছেন, "পরমহংসদেবের মহাপ্রেম এবং বিবেকানন্দের বলবান বাহুতে মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত সকল দেবতার, সত্যের সকল প্রকার অভিব্যক্তির এবং সকল মানবীয় স্বপ্নের, যেরূপ

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃত।

মধুর সংযোগ ও গ্রহণ দৃষ্ট হয়, এরূপ সকল যুগের ধর্মভাবে আর কোথাও দেখি নাই। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যাঁহারা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, যাঁহারা ঈশ্বরেও বিশ্বাস করেন না আবার স্বপ্নরাজ্যেও বিচরণ করেন না, কিন্তু অকপট চিত্তে তত্ত্বান্বেষী, যাঁহারা শুভেচ্ছাপ্রণোদিত, যাঁহারা যুক্তিবাদী, যাঁহারা প্রকৃত ধর্মপ্রাণ, যাঁহারা প্রধান ধর্মগ্রন্থ সমূহে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা সাকারবাদী, যাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী, যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, যাঁহারা বুদ্ধিজীবী এবং যাঁহারা নিরক্ষর—সকলের নিকটই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহতী বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন।" (১) শ্রীঅরবিন্দও বলিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমরা এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতে পাই। এই শক্তির প্রভাবে তিনি সোজাসোজি প্রথমেই শ্রীভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন, মনে হয় যেন জোর করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। তৎপর একে একে সমস্ত যোগমার্গই অনুসরণ করিয়া এবং অতি ক্ষিপ্রতার সহিত প্রত্যেক যোগমার্গের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া। প্রেম, স্বতঃস্ফূর্ত্ত অধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুভূতির সাহায্যে সর্ব্বদাই সেই চরম উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণে পৌঁছিয়াছিলেন। এরূপ সমন্বয় অনন্যসাধারণ।" (২)

সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে পৃথিবীর নরনারী সকলই হৃদয়ঙ্গম করুক যে, অদূর ভবিষ্যতে সসাগরা পৃথিবী এক সার্ব্বভৌম শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া ধন্য হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে সকল জাতি, সকল দেশ, প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক মহিমময় মিলনক্ষেত্রে সম্মিলিত হইবে এবং পরস্পরের বিবাদ ও অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া "যত মত, তত পথ"-রূপ সমন্বয়-বাণীর আশ্রয়ে এক সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ঐক্য বন্ধনে সম্বদ্ধ হইবে।

সমালোচনা

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—মহাকবি চণ্ডীদাস বিরচিত, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ—সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—সং ৫৮। মূল্য পরিষদের সদস্যপক্ষে—৩৲ এবং সাধারণ পক্ষে—৪৲ টাকা।

এই পুস্তকের রচনাকাল লইয়া সাহিত্য সমাজে বহু তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং পরেও হইতে পারে কিন্তু তাহাতে এই পুস্তকের গৌরব বাড়িবে ছাড়া কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হইবে না। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুসাহিত্যিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ বিশ্লেষণ ও তথ্যপূর্ণ গবেষণাদ্বারা বিচারে স্থির করিয়াছিলেন যে, শ্রীযুত বসন্তবাবুর আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার শক্তি বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ আছেন কিনা—তাহা জানিনা। যদি কেহ থাকেন—তবে এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন শক্তিশালী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ রাখালবাবুর মন্তব্যের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন নাই। সুতরাং অদ্যাবধি এই পুঁথিটী বাঙ্গলা ভাষায় লিপি হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেপাল হইতে আনীত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন হইলেও তাঁহার আনীত পুঁথি তত পুরাতন নয়। এতৎসম্বন্ধে রাখালবাবুর লিখিত "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের লিপিকাল" প্রবন্ধটী গ্রন্থে সংযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক ইহা

---

(১) রোমাঁ রোলাঁর "বিবেকানন্দ চরিত"।

(২) শ্রীঅরবিন্দের "যোগ-সমন্বয়" (আর্য্য ৩য় সংখ্যা)

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের লিখিত পুঁথি কি না এমন কি ইহা অপর কোনও চণ্ডীদাসের রচনা কিনা—ইহা লইয়া বিশেষজ্ঞরা তর্ক বিতর্ক করুন ইহা লইয়া আমাদের আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা সাহিত্যের দৃষ্টিতেই—"শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা 'সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম' প্রভৃতি পদ পড়িয়াছেন এবং কীর্ত্তনে তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—তাঁহারা "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" পড়িয়া স্বতঃই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—ইহা কি সেই চণ্ডীদাসের লেখা? তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিবেন না যে পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের অমৃত নিস্যন্দিনী কবিতা কখনও এরূপ আকারে বাহির হইতে পারে। ইহাতে পদাবলী মত পদলালিত্য নাই—প্রাণের ঝঙ্কার নাই—অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা নাই—আছে শুধু স্থূল কামের বিলাস। এই চণ্ডীদাস যেন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ভাবের মণি-কোঠায় প্রবেশ করেন নাই—তাহার "বাহির দুয়ারে" দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু প্রকৃত কি তাই? আমাদের মনে হয় প্রাচীন বাংলার ইহা "গীতি-নাট্যের" একটা রূপ। তাৎকালীন কথ্যভাষায় ইহা রচিত—সর্ব্বসাধারণের জন্য তাই প্রাকৃত ভাষার আধিক্য "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে" দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রূপ বা প্রকৃতির বর্ণনায় "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে" পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে দুই একটী 'গীতি' নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

যথা তাম্বুলখণ্ডে—

> "কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
> সজল জলদে যেহ্ন উইল নব শুর॥
> কনক কমলরুচি বিমল বদনে।
> দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥ ১।
> মুনিমন-মোহিনী—রমণী অনুপামা।
> পদুমিনী আঙ্কার নাতিনী রাধা নামা॥
> ললিত অলক পাঁতি কাতি দেখি লাজে।
> তমাল কলিকাকুল রহে বনমাঝে॥
> আলস লোচন দেখি কাজলে উজ্জল।
> জলে পসি তপ করে নীল উতপল॥
> কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে
> সত্বরে পশিলা সাগরের জলমাঝে॥

কিম্বা বৃন্দাবন খণ্ডে—

> একেঁ একেঁ ঋতুগণে বিলাস কৈল আপনে
> কুসুমিত সব তরুগণে।
> তীন ভুবন মাঝেঁ কথাঁহো না দেখিলেঁ
> দৈব নিয়োজন হেন থানে॥
> ফুটিল গুলাল মাহলী মালতী মাধবী লতা
> লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী।
> শেবতী কনক যুথী যুথী কনক কেতকী
> পারলি দুলালী॥
> সরস কর মন সত্বরে কর গমন
> দেখি আসি মোর বৃন্দাবনে।
> দিবস রজনী এথাঁ একোহি না জানী
> নাহিঁ লাগে রবির কিরণে॥
> আসই আসাঢি ভুমিচম্পক চম্পক
> চান্দটগর বনমাহলী।
> নাগেশর কেশর আর তিণিশ শিরিষ
> বহুল মহুল সে আশী॥—ইত্যাদি

এখানে চণ্ডীদাস আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত ভাষা ভুলিয়া—তাঁহার কবিত্বের ভাষা বাহির করিয়াছেন। তবে "পদাবলী"তে অনন্তের মণিমন্দিরে প্রবেশ করিয়া উচ্ছ্বসিত রসপূর্ণ-মাধুর্য্য ধারায় চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—তাহা অপার্থিব—অলৌকিক ও অপূর্ব্ব। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে" আনন্দসম্ভোগে সে স্পর্শ-মণির পরশ নাই। ইহা গীতিনাট্য-রাধাকৃষ্ণ লীলা বিলাসে নৃত্যগীতে রসকৌশলে সর্ব্বসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই রচিত। প্রাচীন বাংলার সমাজে প্রাচীন গীতিনাট্যের একটি ধারার নিদর্শন হিসাবে ইহার আদর হইবে। বসন্তবাবুর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য ও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। পুঁথির আদ্যন্ত পরিচয় তিনি দিয়াছেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ-গবেষণা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা আলোকসম্পাত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—বাংলার প্রাচীন রচনারীতি তথা সামাজিক জীবনচিত্রের বেশ একটা আভাস পাওয়া যায়। পরলোকগত বাংলাসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক দেশপূজ্য পণ্ডিত স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "মুখবন্ধ" পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন "সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা বসন্তরঞ্জন বাবু খাঁটি চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আরও অনেক সুধীব্যক্তি ইহা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও সে বিষয়ে সংশয় করি না। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে—চণ্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালাসাহিত্যের সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা

উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদ সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি নানা ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।" আমরা বলি বাঙ্গালা গীতিনাট্যেরও একটা ইতিহাস এই গ্রন্থে রহিয়াছে।

শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালীকে চিরঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শুধু বাঙ্গালী বলি কেন—অমর চণ্ডীদাস মানব সমাজের অতি ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়াছেন। বৃন্দাবনের শ্যামের বাঁশীর মত তাঁহার কবিতার সুর মানবসাহিত্যে নিত্য ধ্বনিত হইতেছে। প্রেমের কথা চণ্ডীদাস যেমন করিয়া শুনাইয়াছেন তেমন করিয়া আর কেহ কি শুনাইতে পারিয়াছেন? স্বয়ং শ্রীচৈতন্য যাঁহার পদাবলী শুনিয়া মোহিত হইতেন তাঁহার পরিমাপ কে করিবে? কত সাধক মহাজন মহাপুরুষ ভাবুক তাঁহার রচিত পদে আত্মহারা ও সজলচক্ষু—তাঁহার রচনা আধ্যাত্মিক প্রেম সাধনার পরম প্রিয়বস্তু। আমরা আশা করি—বাঙ্গালী নির্ব্বিচারে এই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। তবে স্বামি বিবেকানন্দের বাণী আমরা এখানে সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—"too sacred to be understood until the soul has become perfectly pure"

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

জ্ঞানেশ্বরী—(প্রথম ষট্‌ক)—অনুবাদক শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী এম-এ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন ও শ্রীশঙ্কর গণেশ শার্ঙ্গপাণি—মূল্য ১৲, দুইশত বার' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রকাশক শ্রীজীবন-কিশোর গোস্বামী। ২৪৬ নং নবাবপুর, ঢাকা।

ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও তদুপরি মহারাষ্ট্র ভক্তকুলতিলক জ্ঞানদেব কৃত ভাবার্থ দীপিকা নামক ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থখানির প্রথমে শ্রীজ্ঞান-দেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। শ্রীজ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর মহারাজ মহারাষ্ট্রীয় দেশবাসীর অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, ইঁহার গীতাভাষ্য সকলেই আদর করিয়া থাকেন। যেথানে গীতাপাঠের সময় জ্ঞানেশ্বরের প্রবচন হয় সেইখানেই সকলে দলে দলে গমন করিয়া থাকেন। ভাষ্যটীর মূল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদকদ্বয়ের একজন বাঙ্গালী ও একজন মহারাষ্ট্রীয়—উভয়েই সুপণ্ডিত ও স্ব স্ব ভাষায় অভিজ্ঞ—সুতরাং আলোচ্য অনুবাদটী মূলের সহিত মিল রাখিয়া করা হইয়াছে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, বলিতে হইবে।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

রহস্য-লহরী—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীমনোহর দাসগুপ্ত, বি-এ, প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক, ২২ রমানাথ পাল রোড, খিদিরপুর। ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

ইহাতে প্রথম খণ্ডে উপদেশচ্ছলে ৭৫টি আখ্যায়িকা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৫টী উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা সহজ ও সুন্দর। আখ্যায়িকাগুলি বাস্তবিকই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। এইরূপ সংপুস্তক যত প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য মন্দির, ৯০।৩ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বত্রিশ পৃষ্ঠা, দাম তিন আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক। জাতীয় সাহিত্যে শিশুপাঠ্য পুস্তকের স্থান কোথায় এবং কি দায়িত্ব, তাহা বোধ হয় আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ যে ভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, সেই তুলনায় শিশু-সাহিত্য বিভাগ তেমন উন্নতিলাভ করে নাই। যে বয়সে শিশুরা ভূত বেতাল রাক্ষস খোক্কসের কাহিনীর গণ্ডি পার হইয়া উচ্চতর সাহিত্যের অধিকার লাভ করে, এদেশে সেইরূপ পুস্তকের অভাব বড় বেশি।

এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। বাংলার সন্তান দীপঙ্কর অতীশ ও মহাস্থবির শীলভদ্রের কাহিনী লইয়া পুস্তকখানি লিখিত। ইহার ভাষা সরল সহজ ও সুন্দর। বিস্মৃত-গৌরব বাংলার বালকদের মনে ইহা অমৃতের কাজ করিবে। পুস্তকের ছাপা, মলাট সবই সুন্দর। কতকগুলি সুন্দর চিত্র পুস্তকের

শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। এই পুস্তকখানাকে যথার্থ শিশুপাঠ্য পুস্তক বলা যায়। ছেলেমেয়েরা কেন, তাহাদের পিতামাতারাও ইহা পাঠে আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

অমিতাভ দত্ত

মানুষের অধিকার—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায, মূল্য তিন আনা। প্রকাশক—শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; ১নং নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলিকাতা।

"মানুষের অধিকার"—২৮ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। লেখক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায প্রবন্ধ লেখক হিসাবে বাংলাদেশের বহুলোকের নিকট সুপরিচিত। বিখ্যাত ইংরাজী অধ্যাপক ও Political thinker হ্যারল্ড ল্যাস্কির 'Grammar of Politics' গ্রন্থের সূত্রানুসরণ করিয়া আলোচ্য পুস্তিকাটি লিখিত হইয়াছে।

সমগ্র জগৎ জুড়িয়া আজ পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণি-হাওয়া ছুটিয়াছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই মানব আজ তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। একদিকে আভিজাত্যের পৃষ্ঠপোষক Imperialism ও Fascism ক্ষমতার যদৃচ্ছ ব্যবহারে বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অর্থ ও অর্জ্জিত সুখ সুবিধা অটুট রাখিতে বদ্ধপরিকর—অন্যদিকে অতীতের শত নিষ্পেষণের জগদ্দল পাথর দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাম্যবাণী কণ্ঠে গণশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে কৃতসঙ্কল্প। Socialism এবং Nationalism এর মধ্যদিয়া তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবী ও অধিকারের বাণী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। "মানুষের অধিকারেও" সেই দাবী এবং অধিকারের কথাই বলা হইয়াছে।

বহুজনের বহু শ্রমের উপসত্ত্ব আর একজন বসিয়া বসিয়া বিলাসে এবং ভোগে ব্যয় করিবে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা মানুষ যে আর কতকাল নীরবে সহ্য করিবে তাহা সত্যই ভাবিবার কথা। জনসাধারণের চিরবঞ্চিত ক্ষুব্ধ-চেতনা আজ অকুতোভয়ে এই প্রশ্নই তুলিয়াছে যে,—"আমার নিজের কঠোর শ্রমের অন্ন পেট ভরিয়া খাইবার অধিকার কি আমার থাকিবে না?" অদৃশ্য রাজ্য হইতে গণদেবতা তীব্রস্বরে সে প্রশ্নের উত্তরে হাকিয়া কহিতেছেন—'সে অধিকার তোমার অবশ্যই আছে; শক্তি সহায়ে তাহাকে প্রতিষ্ঠা কর।' বর্ত্তমানযুগ সেই অধিকার প্রতিষ্ঠারই যুগ।

বিজয়বাবু মানবের এই মূল এবং সাধারণ অধিকারটুকুর কথাই অতি সংক্ষেপে "মানুষের অধিকারে" কহিতে চাহিয়াছেন। পুস্তকখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

লেখকের ভাষার জোর আছে, শুধু একটু বেশী দ্রুত বলিয়া যেন আমাদের বোধ হইয়াছে। বইখানির ছাপা ভালই।

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এস্ সি, বি-টি

পরমহংসদেবের উক্তি—শ্রীকুমার-কৃষ্ণ নন্দী সঙ্কলিত। ১৫৫ পৃষ্ঠা, মূল্য।০ চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলীর এই নূতন সঙ্কলন গ্রন্থখানি পাইয়া আমরা সুখী হইলাম। বিষয় বিভাগগুলি বেশ চমৎকার হইয়াছে। তবে কতকগুলি উপদেশকে ঠিক ঠিক বিভাগ অনুযায়ী ফেলা হয় নাই। কয়েকটী অশিষ্ট শব্দ পরিবর্জ্জিত করিয়া দিলে ভাল হইত। ছাপা ও কাগজ বেশ সুন্দর। অল্প দামের মধ্যে এই সুন্দর বইখানি প্রকাশ করিয়া কুমার বাবু বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘবার্ত্তা

বেদান্ত সোসাইটী (স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কো)—

অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী গত জানুয়ারী মাসে "শতাব্দী ক্লাব" এবং "বেদান্ত সোসাইটী হলে" নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন :—

(১) "খৃষ্ট উপদিষ্ট পুনর্জন্ম"
(২) "বাহস্থিক ওঁ এর শক্তি"
(৩) "সোজা প্রবেশ দ্বার, সঙ্কীর্ণ পথ"
(৪) "মৌনের শক্তি"
(৫) "খৃষ্টধর্ম্ম ও বেদান্তমতে আত্মা"
(৬) "ভারতের গুপ্ত জ্ঞান"
(৭) "কে যোগের অধিকারী ?"
(৮) "মনকে কি উপায়ে সংযত করা যায় ?"

এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যেক শুক্রবার "বেদান্ত সোসাইটী হলে" উপনিষদের ক্লাস করিয়াছেন এবং সমাগত ভক্তদিগকে ধ্যান ধারণাদি শিক্ষা দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন (রেঙ্গুন)—

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ভক্তদের আহ্বানে গত ৮ই ডিসেম্বর রেঙ্গুনে পদার্পণ করিয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। স্বামীজির শুভাগমনে বহু ভক্ত তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন।

গত ৪ঠা জানুয়ারী, ব্রহ্মদেশের শাসনকর্ত্তা স্যার এ, ডি, কক্‌রেন্ স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের চক্ষু-চিকিৎসার জন্য নবনির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

গত ১১ই জানুয়ারী, বড়লাট পত্নী লেডি লিন্‌লিথ্‌গো এবং তদীয়া কন্যা লেডি এনি হোপ্ ব্রহ্মদেশের শাসনকর্ত্তার পত্নী লেডি কক্‌রেণের সহিত রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ জ্ঞাপন করেন।

স্বামী বিজয়ানন্দ—

গত ২৬শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বুয়েনোস্ আইরেস্ (দক্ষিণ আমেরিকা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দজিকে কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা এলবার্ট হলে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতার মেয়র স্যর হরিশঙ্কর পাল মহাশয় বাংলায় এবং ডাঃ এ, এম্, চাটার্জ্জি মহাশয় ইংরাজীতে অভিনন্দন পাঠ করেন। ইহার উত্তরে স্বামী বিজয়ানন্দজি ওজস্বিনী ভাষায় এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি এবং অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের বক্তৃতার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু" উৎসব—

ঢাকা জেলার বেজগাঁগ্রাম নিবাসী ভক্ত শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয়ের কলিকাতা গোয়াবাগানস্থিত বাসভবনে গত ১লা জানুয়ারী তারিখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "কল্পতরু" উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি বিশেষভাবে সজ্জিত করিয়া পূজা, ভোগ, ভজন ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছে, এবং সমাগত ভদ্রমণ্ডলী ও দরিদ্র-নারায়ণদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছে। বেলুড় মঠের সাধু, বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচারক শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু, রায় বাহাদুর প্রভাতনাথ মুখার্জ্জি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (কলম্বো)—

গত ৪ঠা জানুয়ারী অধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দজি কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি সম্পন্ন হওয়ার পর আড়ম্বরের সহিত "শ্রীরামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী মন্দিরে"র ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারত সরকারের এজেণ্ট ডাঃ ই, ভি, পাত্রম্, এফ্-আর্-সি-এস্, সিলোনের কলেজ ও স্কুলসমূহের পরিদর্শক ডাক্তার টি, কে, জয়রাম, সিটিফাদার ডাঃ এস্, মুত্তিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমাগত ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণান্তে এই অনুষ্ঠানের ক্রিয়া শেষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংবাদ

কামারপুকুর ও জয়রামবাটী—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং শ্রীমার জন্মস্থান পুণ্যভূমি কামারপুকুর ও জয়রামবাটী গত ২৮শে ডিসেম্বর, সোমবার এবং পরবর্তী মঙ্গলবার উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের ও শ্রীমার জন্ম-স্থান এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য বাংলাদেশের নানাস্থান হইতে আগত ভক্তগণ এবং বোম্বাই, আসাম, দক্ষিণ-ভারত, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে অর্দ্ধ লক্ষাধিক নরনারী তথায় উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসবের পরি-কল্পনা অনুসারেই ঠাকুরের ও শ্রীমার জন্মস্থানে এই উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে উক্ত উৎসবে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের জন্য হাওড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত একখানি স্পেশ্যাল বগি গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তাঁহারা বিষ্ণুপুর পৌছিলে স্থানীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অনুকূল সান্যাল মহাশয় ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করেন। তৎপর তাঁহারা সকলে একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরে গমন করেন। ইঁহারা কামারপুকুরে পৌছিলেই প্রথম দিবসের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, ভোগ, কীর্ত্তন ও কথকতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সমাগত সকলেই ভক্তিনত হৃদয়ে এই সব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকজন আর একটী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হইল দরিদ্র-নারায়ণ ভোজন ও জনসভা। সভায় স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশে সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

জয়রামবাটীতেও সমাগত ব্যক্তিবর্গের অবস্থানের জন্য একটী বিশাল বটবৃক্ষতলে কুটীরসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুসজ্জিত পূর্ণাকৃতি প্রতিকৃতি উহার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয়। আমোদর নদের তীরে অবস্থিত এই স্থানটি নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ।

জয়রামবাটী প্রাতে 'মাতৃমন্দিরে' বিশেষ পূজা হয়। তৎপর কীর্ত্তন ও ভজন গান হয়। বেলা আন্দাজ ১১টার সময় এক জনসভা হয়। তাহাতে অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ডাঃ সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজি, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজি শ্রীযুক্ত গিরীন সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় জনৈক পণ্ডিত এই উপলক্ষে রচিত তাঁহার কয়েকটী সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় এক নাতিদীর্ঘ প্রাঞ্জল বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করার ও স্বামী বিবেকানন্দের সহিত স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব

কর্তৃক পরিচয় করাইয়া দেওয়ার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

সভার পর প্রায় ১২শত দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়।

ভুবনেশ্বরে "ছাত্রদিবস"—

গত ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার হইতে ২৮শে ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভুবনেশ্বরে মহাসমারোহে "ছাত্রদিবস" প্রতিপালিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বর হইতে ১০ মাইল পরিধি মধ্যস্থ ৪টী মধ্য ইংরাজী স্কুল এবং বহু প্রাইমারী ও বালিকা বিদ্যালয় এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। ৩।৪শত ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন ভুবনেশ্বর পল্লীর মধ্য দিয়া বাগুসহ মার্চ্চ করিয়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, এবং ক্রীড়া অন্তে মার্চ্চ করিয়া ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিয়াছে। সন্তরণ, অর্দ্ধ মাইল দৌড, অবষ্ট্রাকল রেস, স্যাক রেস, প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় ২৫ প্রকার প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রায় ৭০টী পুরস্কার বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উড়িয়া ভাষায় মুদ্রিত শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবনী ও বাণী' প্রায় তিন সহস্র খণ্ড এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ ২।৩শত খণ্ড বিতরণ করা হইয়াছে। "ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী কমিটী" দূরবর্ত্তী সমুদয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিমিত্ত আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চার জন অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাত্র-ছাত্রীগণের স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। কটক ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, বি-টি, মহাশয় পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল—

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলব্যাপী যে রচনা-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল তাহার ফল বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের এবং ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইংরাজী, বাংলা, আসামী, উড়িয়া, হিন্দি, সিন্ধি, উর্দ্দু, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং কানাড়ী ভাষায় রচনা প্রেরিত হইয়াছিল। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের রচনার বিষয় ছিল, "ভারতে সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের দান।" রচনাটী ইংরাজী ভাষায় লিখিবার কথা ছিল এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশ" সম্বন্ধে লিখিতে বলা হয়।

নিম্নলিখিত ছাত্র-ছাত্রী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের নামের পার্শ্বে পুরস্কারের প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইল। ধর্ম্মমহাসম্মেলনের পর কলিকাতা টাউন হলে একটী জনসভায় পুরস্কারগুলি প্রদত্ত হইবে।

কলেজ প্রতিযোগিগণ (ছেলে)—

১। শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য—স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা ১ম পুরস্কার। ২। পি, এন্ বিশ্বনাথন্ এলফিনষ্টোন কলেজ বোম্বে—দ্বিতীয় পুরস্কার।

কলেজ প্রতিযোগিগণ (মেয়ে)—১। কুমারী রাণী ঘোষ—য়ুনিভার্সিটি কলেজ, রেঙ্গুন—প্রথম পুরস্কার। ২। কুমারী বৎসলা এইচ্ আঙ্গারিয়া, এস্, এন্, ডি, টি, কলেজ ফর উইমেন্, বোম্বে—দ্বিতীয় পুরস্কার।

স্কুল প্রতিযোগিগণ—

বাংলা (ছেলে)—১। শ্রীগৌরহরি ধর, অন্নদা হাইস্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—১ম পুরস্কার।

২। শ্রীসুধীরকুমার কুণ্ডু, টাউন স্কুল, কলিকাতা—দ্বিতীয় পুরস্কার।

বাংলা (মেয়ে)—১। কুমারী সুষমা রায়, সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা—প্রথম পুরস্কার। ২। কুমারী শোভারাণী গুহ—বার্লো গার্লস স্কুল, মালদহ—২য় পুরস্কার।

আসামী (ছেলে)—১। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস, গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, নওগাঁ—২য় পুরস্কার।

আসামী (মেয়ে)—শ্রীমতী নীহারবালা দাস, মিশন্ গার্লস্ ট্রেণিং স্কুল, নওগাঁ—প্রথম পুরস্কার।

উড়িয়া—কল্পতরু ওটী, টাউন ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল, কটক—২য় পুরস্কার।

হিন্দি—পতিরাম, এস্ এম্ ভি, হাইস্কুল, কানপুর—২য় পুরস্কার।

আরবী—১। শরদ মুলহেরকার—এস্, পি, হাকিমজী হাইস্কুল, বান্দি—১ম পুরস্কার। ভি, ডি, কুলকর্ণি, মহারাষ্ট্র বিদ্যালয় হাইস্কুল, পুণা—২য় পুরস্কার।

গুজরাটী—১। জটিল রায় কে ব্যাস, ভাবসিংজী হাইস্কুল, পোর বন্দর—১ম পুরস্কার। ২। জে, পি রাভেল্—হাণ্টার ট্রেণিং কলেজ ফর মেন্, রাজকোট—২য় পুরস্কার।

উর্দ্দু—কাব্বাপ্রসাদ মিসতুরী, বি, এন্ এস্ ডি ইণ্টার কলেজ, কানপুর—২য় পুরস্কার।

তামিল—১। পি এস্, বীররাঘবম্—রামকৃষ্ণ রেসিডেন্সিয়াল হাইস্কুল, মাদ্রাজ—১ম পুরস্কার ২। কে পেরুমল্, বোর্ড হাইস্কুল—নামাকাল—২য় পুরস্কার।

সিন্ধি—১। লুকমল্ কিমাবরাম নটানি, কে, সি, একাডেমি, ভিরিয়া—১ম পুরস্কার। ২। জে, সি, সিপাহিমালানি, এন্, জে, হাইস্কুল, করাচী—২য় পুরস্কার।

তেলেগু—আর সবল রামরাও, এস, আর, হাইস্কুল, চুনি—দ্বিতীয় পুরস্কার।

পিনমানা (ব্রহ্মদেশ)—গত ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে পিনমানা শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সব-কমিটীর উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব স্থানীয় হিন্দুসভা গৃহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট্ (লণ্ডন) মহাশয় উক্ত দুই দিবস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রথম দিবস (৩০-১২-৩৬) পিনমানার উকীল উহ্লামং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর রচনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু হঠাৎ সেদিন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার স্থানে উকীল উবাঐ রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে রেভারেণ্ড জে, এম্, স্মিথ খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষে সভাপতি মহাশয় ঐ দিনের বক্তৃতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করার পর প্রসাদ বিতরণ হয় এবং প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিবস (৩১-১২-৩৬) প্রাতে অনূন ৫০০ দরিদ্র নরনারীগণকে অর্দ্ধ বিশা (প্রায় ৴১ সের) পরিমাণ চাউল প্রত্যেককে বিতরিত হইয়াছিল। তৎপরে বৈকালে ৩টার সময় স্থানীয় ডাক্তার আহম্মদ মিঞা সাহেব ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজি "হিন্দুধর্ম্ম এবং রামকৃষ্ণ সংঘ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বাঙ্গালোর—শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন কালে মহীশূরের যুবরাজ বাহাদুর বিগত

১৮৯২ সালে বেদান্ত প্রচার কল্পে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাইবার ব্যাপারে মহীশূর রাজ-পরিবার যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা উল্লেখ করেন এবং বর্ত্তমান জগতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট প্রভাবের কথা বলেন।

শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠানাদি নয় দিন ব্যাপী চলে এবং প্রত্যহ অনুমান তিন হাজার লোক উহাতে যোগদান করে। শেষ দিবসে ছাত্রদের অনুষ্ঠান হয় এবং মাননীয় বিচারপতি মিঃ নাগেশ্বর আয়ার উহার সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্বামী আগমানন্দজি ও স্থানীয় দুই জন শিক্ষক পরমহংসদেবের জীবনী আলোচনা করেন। মহিলা দিবসেও বহু মহিলা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উৎসবের তৃতীয় দিবসে সহরে একটা শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। স্থানীয় কয়েকখানি সংবাদপত্র এতদুপলক্ষে তাহাদের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। ঐ সকল সংখ্যায় পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী এবং তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

পাটনা--১২ই ডিসেম্বর—স্থান—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বাঁকিপুর--প্রভাতে স্বামী বাসুদেবানন্দজি কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, পাঠ ও হোমাদি সম্পন্ন হয় এবং সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক এবং স্বামী রামানন্দ কর্ত্তৃক ভজন কীর্ত্তন গীত হয়।

১৩ই ডিসেম্বর—স্থান বিশ্ববিদ্যালয় সভাগৃহ—ধর্ম্মসভা—সন্ধ্যা ৬৮—সভাপতি মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ ভাইস্ চ্যান্সেলার, বার-এট্-ল। রায় বাহাদুর অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি প্রস্তাব করেন এবং বাবু সন্তপ্রসাদ সমর্থন করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দজি মঙ্গলাচরণ করার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রধান বক্তা দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শর্ব্বানন্দজি। সর্ব্ব প্রথম বক্তৃতা করেন—মাননীয় মিঃ জাস্টিস খাজা মাহাম্মাদ নূর, সি, বি, ই। তাহার পর মিসেস ধর্ম্মশীলা, বার-এট-ল। "রামকৃষ্ণ ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টাব্যাপী ওজস্বিনী ভাষায় স্বামী শর্ব্বানন্দজির বক্তৃতার পর অলিম্পাস ক্লাব কোরাস গানের দ্বারা সকলকে মোহিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও উপদেশ নামক পুস্তিকা এবং স্বামীজির বাণী এই সভায় বিতরিত হয়।

১৪ই ডিসেম্বর—ধর্ম্মসভা—স্থান বিশ্ববিদ্যালয় সভাগৃহ, সময়—সন্ধ্যা—৬৮—সভাপতি মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, প্রধান বক্তা—স্বামী শর্ব্বানন্দজি মহারাজ। বিষয়—"ধর্ম্মের সমন্বয় তত্ত্ব।" তাঁহার পূর্ব্বে বক্তৃতা করেন—মাননীয় মিঃ জাস্টিস এস্, বি, ধাবলে, আই, সি. এস্, ডাঃ পি, কে, সেন, বার-এট ল, এবং ডাঃ কে, পি, জয়সল, বার-এট-ল। অলিম্পাস ক্লাব—সঙ্গীত। সভাপতি ও স্বামী শর্ব্বানন্দকে ধন্যবাদ দেন অধ্যাপক বি, বি, মজুমদার এম্-এ, পি-আর-এস্।

১৫ই ডিসেম্বর—প্রভাতে গর্দ্দানীবাগ ঠাকুর বাড়ীতে স্বামী বাসুদেবানন্দজি পূজা হোম ও পাঠ এবং স্বামী রামানন্দজি ভজন কীর্ত্তনাদি করেন। সন্ধ্যা ৬৮ পাটনা হাইস্কুল হলে স্বামী শর্ব্বানন্দজি "ভক্তি-যোগ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি হন রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস। প্রস্তাব করেন রায়-সাহেব হরিপদ ঘটক এবং সমর্থন করেন শ্রীযুত বিপিনবিহারী চন্দ। সভাপতি ও স্বামী শর্ব্বানন্দজিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রায়সাহেব বিমানবিহারী বসু।

১৬ই ডিসেম্বর—স্থান--রামকৃষ্ণ আশ্রম—বৈকাল ৩টা—৫টা কথামৃত পাঠ, ৫টা—৬টা অলিম্পাস ক্লাব কর্ত্তৃক ভজন কীর্ত্তন। ৬টা লঙ্গরটোলী ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শন। এই উপলক্ষ্যে হিমাংশুকুমার পালকে একটী পদক দান করা হয়।

১৭ই ডিসেম্বর—মহিলা ধর্ম্মসভা। স্থান—রামকৃষ্ণ আশ্রম। সময় বৈকাল ৩টা—৫টা।

সভাপতি—মিসেস অমলা মুখার্জ্জি। শ্রীমতী রত্নপ্রভা দেবী প্রস্তাব করেন এবং মিসেস সেন সমর্থন করেন। কুমারী সাধনা মিত্র এবং স্বপনা মিত্রের সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বক্তৃতা করেন মিস্ সুমিত্রা, মিসেস টি, পি, ভট্টাচার্য্য, মিসেস সুধা ঘোষ, শ্রীমতী শাশ্বতী দেবী এবং সর্ব্বশেষে স্বামী বাসুদেবানন্দজি। অতঃপর কুমারী হাসি মিত্র ও প্রণতি মিত্রের গান হয়। সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন—শ্রীমতী দুর্গাবাণী দেবী। তাহার পর সন্ধ্যা ৬-৮টা শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখার্জ্জি ম্যাজিক দেখান এবং এক মূক ও বধির বালক শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শন করে।

১৯শে ডিসেম্বর—শোভাযাত্রা বৈকাল ৩টা—৭টা। হস্তিপৃষ্ঠে, মোটর ও ফিটনে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামিজী ও অন্যান্য অবতারবৃন্দের ছবি সুসজ্জিত করিয়া বাহির করা হয়। দর্শকদের নিকট হিন্দী ও ইংরাজী রামকৃষ্ণ জীবনী ও উপদেশ বিতরণ করা হয়।

২০শে ডিসেম্বর—স্থান—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—বেলা ১টা হইতে ৫টা দরিদ্রনারায়ণ সেবা। দুই সহস্রের উপর নারায়ণদের লুচী প্রভৃতির দ্বারা ভোজন করান হয়।

গর্দ্দানীবাগ হাইস্কুল হলে মহিলা ধর্ম্মসভা। সময়—৫টা হইতে ৬টা বক্তা স্বামী বাসুদেবানন্দজি, শ্রীযুত বিপিনবিহারী চন্দ এবং মিসেস এউ, সি, সেনগুপ্ত।

রায় বাহাদুর অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রায়সাহেব অন্নদা ঘোষ, ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীযুত বিপিনবিহারী চন্দ এবং স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের এ্যাড্ভাইসারী কমিটির সভ্যগণের তৎপরতায় এই বিরাট উৎসব সুসাধ্য হইয়াছে।

হেঁড়্যাকাঁথি (মেদিনীপুর)—গত ২৩শে জানুয়ারী কাঁথির অন্তর্গত হেঁড্যা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ছাত্রগণের মধ্যে ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং দেশ-সেবক জননায়ক শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এম্-এ, মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী বিরাট সভা সম্পন্ন হয়। সভান্তে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রায় সাত শত ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সভায় ব্রঃ অমোঘচৈতন্য এবং মহারাজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ হাইত ঠাকুরের জীবনী ও ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহোদয় সুললিত ভাষায় বর্ত্তমান সমস্যায় যুগাবতারের বাণীর সার্থকতা সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। উক্ত স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সাহু মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপনের ও ঔষধ সররবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

খাজুরা—গত ১৯শে ডিসেম্বর যশোহর খাজুরা বাজারে অবস্থিত কালীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীযুত হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব সভার অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে।

যশোহর হইতে শ্রীযুত আনন্দমোহন চৌধুরী, কবিরাজ অবলাকান্ত মজুমদার, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুত নিশিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত অবিনাশ-চন্দ্র সরকার, শ্রীযুত গৌরীচরণ ঘোষ, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি এই সভায় যোগদান করেন এবং বক্তৃতাদ্বারা রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷ টায় উৎসব শেষ হয়।

রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী—গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক সভা হয়। বিশ্বের সমগ্র জাতির সাহায্য পাইয়া শতবার্ষিকী কমিটী সুন্দরভাবে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে যে চেষ্টা

করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আগামী মার্চ্চ মাসে এই কমিটীর উদ্যোগে একটী আন্তর্জ্জাতিক ধর্ম্মমহাসভা হইবে। এই ধর্ম্ম মহাসভা যাহাতে সর্ব্বৈবভাবে সুন্দর হয়, সোসাইটী সেজন্য কমিটীকে তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভারত-সচিবের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন—ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ-শত-বার্ষিকী ধর্ম্ম মহাসম্মেলনের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিয়াছেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহার পক্ষে ভারতবর্ষে আসা সম্ভব হইবে না, তাহা না হইলে তিনি আনন্দের সহিত ইহাতে যোগদান করিতেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

স্বামী পরমানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরমানন্দজি বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্তের উচ্চাদর্শ প্রচার করিতেছেন। তারযোগে জানাইয়াছেন যে, তিনি আগামী ধর্ম্ম মহাসম্মেলনে উপস্থিত হইবার জন্য ভারতযাত্রা করিতেছেন। স্বামীজি আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই পৌঁছিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী শোভাযাত্রা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গত ৩১শে জানুয়ারী কলিকাতায় যে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সেইরূপ শোভাযাত্রা কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, জৈন প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায় ও মতাবলম্বী নরনারী এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন, সকল ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তককে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং সমস্ত ধর্ম্মের অন্তর নিহিত একত্ব প্রচার করিয়াছেন। তাই সকল ধর্ম্ম ও মতবাদের নরনারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এই বিরাট শোভাযাত্রায় নিজ নিজ পতাকা ও নিদর্শন লইয়া যোগ দিয়াছিলেন। অনেক কালীকীর্ত্তন, হরিনাম সংকীর্ত্তন, রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, রামনাম সংকীর্ত্তনের দল, ব্যাণ্ড ও কনসার্ট পার্টি যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বি, সি, চ্যাটার্জ্জি প্রমুখ নেতৃবর্গ শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস ১॥টার সময় শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্ক হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের পতাকা, নিদর্শন, বাণী, প্রতিকৃতি এবং গীতবাদ্যাদি সহ এক মাইলেরও উপর দীর্ঘ শোভাযাত্রাটী বাহির হয়। শোভাযাত্রা রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, অপার সারকুলার রোড, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এবং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ঘুরিয়া অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় ময়দানে অক্টরলোনী মনুমেন্টের নিকট পৌঁছে।

কলিকাতার যে যে রাস্তা দিয়া শোভাযাত্রাটী গিয়াছিল সেই রাস্তার দুই ধারের অনেক বাড়ী পত্র পুষ্প এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতিকৃতি দিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শোভাযাত্রাটী যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল তখন অনেক বাড়ী হইতে মুহুর্মুহু শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সুসজ্জিত প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্প ও লাজ বর্ষিত হইতেছিল।

শোভাযাত্রাটী কিভাবে সাজান হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, ২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি সম্বলিত একটি বিরাট সুসজ্জিত তোরণ। ৩। উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আকালী দল, ৪। বহুবাজার নিঃস্ব হিতৈষিণী সভার ব্যাণ্ড পার্টি, ৫। বিবেকানন্দ সেবাদল,

৬। অমৃত সমাজ, ৭। কলিকাতা গাড়োয়ান সমিতি, ৮। বিপণ কলেজিয়েট স্কুল, ৯। নারিকেলডাঙ্গা হাইস্কুল, ১০। শাঁখারীটোলা কৈবর্ত্ত সঙ্ঘ, ১১। সানকীডাঙ্গা শ্যামাসঙ্গীত-সঙ্ঘ, ১২। বিবেকানন্দ সোসাইটী, ১৩। সরস্বতী সমিতি, ১৪। শ্রীগুরুনানক বিদ্যালয়, ১৫। ভারত-সঙ্গীত বিদ্যালয়, ১৬। রামকৃষ্ণ সোসাইটী, ১৭। রয়েজ স্কাউট দল, ১৮। হিন্দু কর্ম্মবীর সঙ্ঘ, ১৯। সিদ্ধেশ্বরী কালী-কীর্ত্তন সম্মিলনী, ২০। অনঙ্গমোহন হরিসভা, ২১। পাথুরিয়াঘাটা অবৈতনিক বৈজয়ন্তী নাট্য-সমাজ, ২২। কলিকাতা অনাথ আশ্রম, ২৩। মুসলিম সম্প্রদায়, ২৪। ইটালী শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়, ২৫। আর্য্য কন্যা বিদ্যালয়, ২৬। কলিকাতা আর্য্য-সমাজ, ২৭। আর্য্য বিদ্যালয়, ২৮। আন্দুল কালী কীর্ত্তন সমিতি, ২৯। শ্রীরামকৃষ্ণ কালী-কীর্ত্তন সমিতি (নিবেদিতা লেন), ৩০। ব্যাণ্ডপার্টি, ৩১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট প্রতিকৃতিসহ সুসজ্জিত গাড়ী, ৩২। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের এম্বুলেন্স ব্রিগেড, এতদ্ভিন্ন বহু মোটর, প্রায় একশতখানি রিক্সা গাড়ীর উপর বিভিন্ন ধর্ম্মের নিদর্শন মন্দির, মসজিদ, স্তূপ প্রভৃতি এই শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিল।

অপরাহ্নে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। অনারেবল বি, কে, বসু এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় হিন্দি ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, বক্তৃতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরকার তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা।

সভাপতি মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায়, রামকৃষ্ণ মিশন জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া জনসাধারণকে সেই মহৎ-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ করেন। হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টানকে রামকৃষ্ণ মিশন পৃথক্ ভাবেন না, সকলকেই তাঁহারা সমানভাবে সেবা করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই মহৎ ভাব, এই মহৎ দৃষ্টান্ত যদি জনসাধারণ অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন এবং সেইভাবে ব্যবহার করেন তবে তাঁহারা এই সর্ব্বনাশকারী সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যদি তাঁহারা এইভাবে এই সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করিতে পারেন, তবে তাহার দ্বারাই তাঁহারা দেশের এবং জাতির যথার্থ সেবা করিবেন।

শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ বসু, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, সদ্দার জনায়েৎ সিংহ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধন—শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গত ১লা ফেব্রুয়ারী ভবানীপুর নর্দার্ণ পার্কে ভারতীয় সংস্কৃতি কলা শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র স্তর হরিশঙ্কর পাল মহাশয় মূলপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় কলা-বিভাগ, নদীপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় স্বাস্থ্য-বিভাগ, ডাঃ সত্যচরণ লাহা মহাশয় সংস্কৃতি-বিভাগ এবং সন্তোষের মহারাজার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী রায়চৌধুরী মহাশয়া মহিলা-বিভাগের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়, স্তর হরিশঙ্কর পাল মহাশয়কে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পৃথিবীময় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, আগামী মার্চ্চ মাসে কলিকাতা টাউন হলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের

মনীষীদের একটী ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে আহ্বান করা হইয়াছে। এই মহাসম্মেলনে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী—যে বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তৎসম্পর্কে আলোচনা হইবে। চিকাগো ধর্ম্ম সম্মেলনের পর এইরূপ ধর্ম্ম সম্মেলন আর হয় নাই।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে স্যর হরিশঙ্কর পাল মহাশয় বলেন যে, বর্ত্তমান যুগ বস্তুতান্ত্রিক যুগ এই যুগে মানুষ আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। পার্থিব সুখ-সম্পদই মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই হিংসা-দ্বেষপূর্ণ জগতে শান্তির বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় স্যর হরিশঙ্কর পাল মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলেন যে, কলিকাতা মহানগরীতে শিল্পকলা প্রদর্শনী কোন নূতন জিনিষ নহে এবং কলিকাতার মেয়রের পক্ষে শিল্পকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করাও কোন একটা নূতন কাজ নহে। কিন্তু এই প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কলিকাতা নগরীর তথা বাঙ্গলার তথা পৃথিবীর সমগ্র জাতির ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত একজন মহাপুরুষের নামে একটী প্রদর্শনী করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মানব জাতির একজন শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা।

বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় কলা বিভাগের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শুধু যে একজন ধর্ম্মপ্রবণ মহাপুরুষ ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন ঋষিও ছিলেন। তাঁহার বাণী সমগ্র ভারতবর্ষ তথা সমগ্র জগতে প্রচারিত হইয়াছে। অনেকে হয়ত ভাবিতে পারেন যে, এইরূপ প্রদর্শনীর সহিত সঙ্গীত-কলা প্রভৃতির কি সম্পর্ক থাকিতে পারে সঙ্গীত সাধারণতঃ মানুষকে নির্ম্মল আনন্দ দিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার কথামৃতে যে সব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি সঙ্গীতের মত মানবকে আনন্দ দেয় না? সঙ্গীত হইতে মানুষ যে শান্তিও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকে, শত শত ভারতবাসী কি সেইরূপ অনুপ্রেরণা ও শান্তি কথামৃত পাঠ করিয়া লাভ করে না?

ডাক্তার সত্যচরণ লাহা মহাশয় প্রদর্শনীর সংস্কৃতি বিভাগ উদ্বোধন করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, সকল ধর্ম্মই যে শাশ্বত সত্য ও সকল ধর্ম্মই যে মূলতঃ এক, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা এই বাণীই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাণীর মর্ম্ম কথা হইতেছে—বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই শত-বার্ষিকী উৎসব কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষ এই নানাবিভাগ সম্বলিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যেন জনসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমত সহিষ্ণুতা, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় প্রভৃতি আদর্শ যে বাস্তবক্ষেত্রেও সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারে। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ভুক্ত সেবকগণ এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে যাহাতে প্রীতি ও সৌহৃদ্য স্থাপিত হয় তজ্জন্য এই সম্প্রদায় প্রাণপাত চেষ্টাও করিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বহু সভ্য-দেশের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি দেশেই যুগে যুগে নানাধর্ম্ম ও মতবাদ দেখা দিয়াছে এবং এই সব ধর্ম্ম ও মতবাদ প্রায়শঃই পরস্পরবিরোধী। বস্তুতঃ যে মহাপুরুষ ঐ সব পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম ও মতবাদের সমন্বয় সাধনের বাণী প্রচার করিয়াছেন, তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত। এই মহাপুরুষের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেছে বহুর ভিতর ঐক্যের সন্ধান। এই ধর্ম্মের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত।

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ

মহাসমাধি—২৫শে মাঘ, ১৩৪৩ (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭)—দিবা ৩টা ৭ মিনিট

বর্ত্তমান প্রদর্শনী এই বিরাট আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই করা হইয়াছে।

ডাঃ লাহা মহাশয় অতঃপর প্রদর্শনীর সংস্কৃতি বিভাগের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই বিভাগে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ কিরূপভাবে ঘটিয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে দেখাইবার প্রয়াস এইখানে করা হইয়াছে। ভারতের চিন্তাধারা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি কিভাবে কখন কোন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, এই বিভাগ তাহারই একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

নসীপুরের রাজা বাহাদুর শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় স্বাস্থ্য-বিভাগ উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী কলিকাতায় বহু হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এইরূপ প্রদর্শনীর যে কোন প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা বলা চলে না। বরঞ্চ এইরূপ প্রদর্শনীর উপযোগিতা বর্ত্তমানে আরও বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রাজা বাহাদুর বলেন যে, বর্ত্তমানে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণও যে এইরূপ প্রদর্শনীতে উৎসাহ দেখাইতেছে, উহা বস্তুতঃই সুখের বিষয়।

ডাঃ এ, সি, উকিল মহাশয় রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিলে পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীযুত মাখনলাল সেন, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়, শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী, কুমার এইচ, কে, মিত্র, শ্রীযুত জানকীনাথ মুখার্জ্জি, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত, মহীতোষ রায় চৌধুরী, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, শ্রীযুত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুত হরিদাস মজুমদার, কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুত কিশোরীমোহন ব্যানার্জ্জি, কিরণচন্দ্র দত্ত, ভূতনাথ মুখার্জ্জি, ডাঃ ডি, পি, ঘোষ, ডাঃ এস, সি, উকীল, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সদার জগবেৎ সিং, শ্রীযুক্তা মিথি বেন, অমৃতকুমারী, মিসেস এ, এন, চৌধুরী প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহাসমাধি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম মন্ত্রশিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ গত ২৫শে মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ ৩টা ৭মিনিটের সময় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমধামে চলিয়া গিয়াছেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও কঠোরতায় তাঁহার শরীর বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি গত কয়েক বৎসর যাবত বহুমূত্র ও ব্লাড-প্রেসার রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। ইদানীং কিছুকাল হইতে তাঁহার অসুস্থতা খুবই বাড়িয়াছিল।

গত শুক্রবার ২৩শে মাঘ, হঠাৎ তাঁহার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, প্রায় ১৪ ঘণ্টা প্রস্রাব বন্ধ থাকে। ইহাতে তিনি অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ তারযোগে বেলুড়মঠে জানান হয়। ইতিমধ্যে রাত্রেই বহরমপুরের বিখ্যাত ডাক্তারগণ আসিয়া পড়েন। তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার জন্য বেলুড়মঠ হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী অবিলম্বে সারগাছি রওনা হন। সেখানে গিয়া তাঁহারা তাঁহাকে কতকটা সুস্থ দেখিতে পান। পরদিন তিনি পুনরায় অসুস্থ বোধ করেন। বহরমপুরের ডাক্তার পাঠক ও ডাক্তার বাগচি তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতা স্থানান্তরিত করা উচিত বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সকলে স্বামীজিকে লইয়া

ট্রেণযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন। বাণাঘাট ষ্টেশনের নিকট আসিতেই তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। রাত্রি ১০টা ৩মিনিটে ট্রেণ কলিকাতা পৌঁছে। তখন তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ষ্টেশনে এম্বুলেন্স উপস্থিত ছিল। ডাক্তার অজিতনাথ রায় চৌধুরী, ডাক্তার জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ, স্বামী ওঙ্কারানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ এবং আরও অনেক সন্ন্যাসী ও ভক্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। চিকিৎসার সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহাকে লইয়া সকলে বাগবাজার ১, মুখার্জ্জি লেনস্থ শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে উপস্থিত হন।

সেখানে উপস্থিত হইলে ডাক্তারগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া অবস্থা বিশেষ সংকটজনক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তখন মঠের প্রবীন সন্ন্যাসী ও চিকিৎসকগণের মিলিত পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে এম্বুলেন্সে করিয়াই প্রায় ১টার সময় বেলুড়মঠে লইয়া যাওয়া হয়। চিকিৎসকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। ডাক্তার জ্যোতিষবাবু মঠেতেই রাত্রি অতিবাহিত করেন।

বহুমূত্রজনিত মূর্চ্ছা অতিশয় গুরুতর ব্যাধি, তদুপরি শেষ উপসর্গ নিউমোনিয়া দেখা দেয়, কাজেই জীবনের ক্ষীণ আশাও লোপ পায়। রবিবার ৯টার পর হইতে তাঁহার শ্বাস কষ্ট দেখা দেয় এবং অপরাহ্ণ ৩টা ১মিঃ তাঁহার অন্তিম শ্বাস বহির্গত হয়। সন্ন্যাসিপ্রবর মহাসমাধি মগ্ন হইলেন। মঠের সন্ন্যাসিগণ তাঁহার ঘরে সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া যায়। তাঁহার দর্শন মানসে দলে দলে ভক্ত নরনারী বেলুড়মঠে গিয়া সমবেত হইতে থাকেন।

সংবাদ পাইয়া পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ গুরুভ্রাতাকে অন্তিম দর্শনের জন্য বেলুড় মঠে গমন করেন এবং অখণ্ডানন্দ মহারাজের শয্যাপার্শ্বে বহুক্ষণ অবস্থান করেন। তিনি স্বহস্তে গুরুভ্রাতাকে পুষ্পে ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া দিলেন এবং শ্মশানের পার্শ্বেও কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া প্রিয় ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। সন্ন্যাসিগণ বিভূতি, চন্দন, মালা প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার দেহ ভূষিত করিলেন।

তাঁহার মুখমণ্ডলে রোগবেদনার চিহ্নমাত্র ছিল না। কি এক প্রশান্ত আনন্দময় সে মূর্ত্তি! না দেখিলে অনুভব করা কঠিন। মায়ের স্নেহের বালক মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইলেন, শ্রীগুরুর আশ্রিত সন্তান গুরুদেবের আদিষ্ট কর্ম্মের জন্য নিজের মন প্রাণ দেহ ক্ষয় করিয়া গুরুপাদপদ্মে বিলীন হইলেন, অরূপ সাগরের যুগলীলারূপ তরঙ্গরাজির একটি শেষ তরঙ্গ আবার অরূপ সাগরে চিরতরে মিশিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সমাধিস্থানের পার্শ্বে চন্দন-কাষ্ঠের প্রজ্জলিত হোমাগ্নিতে তাঁহার তপস্যাপূত দেহ আহুতি প্রদান করা হয়। রাত্রি প্রায় ১১½টার সময় পবিত্র দেহ ভস্মে পরিণত হয়, সন্ন্যাসিগণ "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" মন্ত্রে সর্ব্বতাপ শীতল-কারী পবিত্র জাহ্নবী বারি দ্বারা চিতা নির্ব্বাপিত করেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি

স্বামী অখণ্ডানন্দ

১৮৮৩৮৪ সাল। গ্রীষ্মকাল। লর্ড রিপনের আমলে "কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী"র সময় আমি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই। তখন আমার বয়স ১৫।১৬ হবে, কিন্তু তখনও আমার ন্যাংটা হতে লজ্জাবোধ হত না। ঠাকুরের কাছে যেদিন আমি প্রথম যাই, সেদিন তিনি আমাকে হাসতে হাসতে যত্ন করে নিজের কাছে বসালেন। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই আমাকে আগে দেখেছিলি?' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'হাঁ, একেবারে খুব ছেলেবেলায় আপনাকে একবার দীন বোসের * বাড়ীতে দেখেছিলাম।'

স্বামী অদ্বৈতানন্দ (গোপালদাদা) ঠাকুরের কাছে ছিলেন। তাঁকে ডেকে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন,—'ওহে শোন শোন—এ বলছে কিনা খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল। উ—এ আবার ছেলেবেলায়!' তাঁর কথায় সে রাত্রি দক্ষিণেশ্বরেই

* দীন বোস ওরফে বাবু দীননাথ বসুর কনিষ্ঠ সহোদর ৺কালীনাথ বসু কেশব সেনের ভক্ত ছিলেন। কেশব সেনই ঠাকুরকে তাঁর বাড়ীতে আনেন। কালীনাথ বাবু (Police Superintendent) বাড়ীতে ছোট রকম উৎসবের আয়োজন করেন। কালীনাথ বাবুর বাড়ী হতে দীননাথ বসু তাঁর বাড়ীতে আনেন। ঠাকুরের সঙ্গে হৃদয় এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক ভক্ত ছিলেন। ঠাকুর যখন দীন বাবুর বাড়ীতে আসেন, তখন খুব রোগা ও দু চার কথা বলতেই ভাব সমাধিতে মগ্ন হতেন। যখন যে নামে যে ভাবে সমাধি হত, তখন প্রণবের সহিত সেই নাম শোনালে মন নেমে আসত। নাড়ীজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সমাধিকালে তাঁর নাড়ী এবং অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে পলক পড়ে কি না, পরীক্ষা করে দেখেন যে, নাড়ীর স্পন্দন ও পলক নাই এবং শরীর আড়ষ্ট।

"অসি ত্যজে বাঁশী লয়ে একবার নাচ গো শ্যামা"।

এই গানটি গেয়ে তাঁর সমাধি হয়। ফলে কিছুদিন ধরে সমস্ত পাড়ায় এই গান খেয়াল-ঠুংরী একটা নূতন ভাব দিত। সকলের মুখে "নাচ গো শ্যামা" শোনা যেত।

থাকি। বেলা পড়লে তিনি আমাকে কালীঘর ও বিষ্ণুঘরে প্রণাম করে পঞ্চবটীতে যেতে বলেন। পঞ্চবটী থেকে ঠাকুরের ঘরে প্রায় সন্ধ্যার সময় ফিরে আসি। তখন কালীবাড়ীর দুই নবত খানায় বাজনা বেজে উঠল—আর আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে সুবিশাল কালীবাড়ী মুখরিত হয়ে উঠল। তারপর আমি ঠাকুরের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি। ঠাকুরের ঘরে ভগ নামে এক বুড়ী ছিল, সে তার ঘরে ধুনো দিত। দেখছি ঘর অন্ধকার করে ধুনো দিয়েছে, আর তার মাঝে ঠাকুর বসে আছেন—দেখাই যাচ্ছে না। আর বাহ্যজ্ঞানও নাই।

সে রাত দক্ষিণেশ্বরে থেকে সকালে আমি যখন আসছি, তখন হাসতে হাসতে বললেন, 'আবার আসিস্—শনিবারে।' তখন গোপাল দাদাই তাঁর কাছে থাকতেন। তারপর অল্প কয়েকদিন পরে আবার একদিন শনিবারে তাঁর কাছে গেলে তিনি আর সেদিন আমাকে আসতে দিলেন না। সন্ধ্যার পর আরতি হয়ে গেলে তিনি একেবারে উলঙ্গ হয়ে পশ্চিম-দিকের বারান্দায় আমাকে একখানা মাদুর দিয়ে বললেন—'পাত্'। তারপর একটি বালিশ এতে শুলেন। এর আগেই আমার কোমরের কাপড়ের বাঁধ খুলে দিতে বললেন। বললেন, 'মার কাছে যেন ছেলে'। তারপর আমাকে ধ্যান করালেন। সুখাসনে বসতে বললেন। একবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার এমনিও বসতে নেই। 'বাড়া ভাত পেলে তুই যেমন করেই খা পেট ভরবে।' তারপর শুয়ে পড়লেন। আমার কোলে পা রাখলেন এবং পা টিপে দিতে বললেন। তখন একটু একটু কুন্তি করি, আমি একটু জোরে টিপে দিতেই বললেন, 'ওরে করিস কি, করিস কি, ছিঁড়ে যাবে যে, এম্নি করে আস্তে আস্তে।' তখন দেখি, শরীর কি নরম, যেন হাড়ের উপর মাখন দেওয়া রয়েছে। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,, 'তবে আমি কি করে টিপব?'—তিনি বললেন, 'এমনি করে আস্তে আস্তে হাত বুলা।' তখন তাই করলাম। বললেন, 'নিরঞ্জন ঐ রকম (জোরে) করেছিল।'

আমি বৈকালে গিয়ে তাঁর কাছে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে প্রায়ই চলে আসতাম। আমি তখন প্রত্যহ একবার মালসা পুড়িয়ে স্বপাক হবিষ্যি করতাম। বহু সাধাসাধি করেও কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নারায়ণ শিলার (বিষ্ণুর) প্রসাদ কেহ খাওয়াতে পারে নাই। পাছে কালী-বাড়ীতে খেতে হয়, আবার তাঁর কাছে গিয়ে স্বপাক হবিষ্যান্ন খেতেও সাহস হতনা বলে সকালেই আমি কালীবাড়ী থেকে চলে আসতাম। তখন আমি প্রত্যহ চারবার গঙ্গাস্নান করি—বিনা তেলে। মাথার চুল বড় উস্কো খুস্কো, এবং হরীতকী ছিল আমার মুখশুদ্ধি। মুখশুদ্ধিটা কিছু বাড়াবাড়ি রকমের ছিল। হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দের) মুখে হরীতকী সম্বন্ধে দুটি শ্লোক শুনে ঐ বাড়াবাড়িটা হয়েছিল।

"হরীতকীং ভুঙ্ক্ষ্ রাজন্ মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতি মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥
হরিম্ হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবী-জলম্।
অন্তর্মলবিনাশায় স্মরেৎ ভক্ষেৎ জপেৎ পিবেৎ॥"

—"অন্তর্মল দূর করিবার জন্য শ্রীহরি স্মরণ, হরীতকী ভক্ষণ, গায়ত্রী জপ ও গঙ্গাজল পান করিবে।" এ শুনে হরীতকীর বাড়াবাড়িতে ঠোঁট দুটো সর্ব্বদাই সাদা হয়ে থাকত। এই রকম আসি—যাই। ঠাকুরের কাছে তখন হরিশ ও লাটুকে (অদ্ভুতানন্দ) বেশীরভাগ দেখতাম। এইরূপ যাওয়া আসা করতে একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন, 'তুই ছেলেমানুষ, তোর অত বুড়োটেপানা ভাব কেন? অতটা ভাল নয়।'

ঠাকুরের কাছে যাবার আগে থেকেই আমি খুব প্রাণায়াম করতাম,—প্রাণায়াম সন্ধ্যা।

দিন দিন সেই প্রাণায়াম বাড়াতে বাড়াতে আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে স্বেদ ও কম্প হত। গঙ্গায় ডুব দিয়ে নীচে ডুটো কি একটা পাথর ধরে অনেকক্ষণ কুম্ভক করতাম। ঐরূপ প্রত্যহ প্রাণায়াম করতে করতে ওর উপর একটা বড় ঝোঁক চেপে গেল। ঠাকুরের কাছে গিয়ে এই কথা বললে তিনি প্রাণায়াম করতে নিষেধ করেন। তার কারণ প্রাণায়ামের ফলে যদি আমার কোন কঠিন রোগ হয় তবে চিকিৎসা ঠিক হবে না। নিত্য গায়ত্রী জপের জন্য উপদেশ দিলেন। বললেন, 'রোজ গায়ত্রী জপ করবি।'

ঠাকুরকে আমি খুলে না বললেও তিনি বুঝতে পারতেন যে, পাছে কালীবাড়ীতে খেতে হয় বা স্বপাক হবিষ্যান্ন নষ্ট হয়, তাই আমি অনিচ্ছায় তাঁকে ছেড়ে চলে যেতাম। একদিন একাদশীর দিনে কলকাতা থেকে উপোসী আমি, কোঁচার খুঁট গলায় ফেলে ঠাকুরের জন্য একটি তরমুজ নিয়ে ঠিক দুপুরের পর গিয়ে হাজির হই। গ্রীষ্মকাল। একে ছেলেমানুষ, তাতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ঠাকুরের কাছে গিয়ে তরমুজটি দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি ভারি খুসী হয়ে বললেন, 'আজ তুই আবার এখন যাবি নাকি?' আমি বললাম, 'আজ্ঞা না।' বিকালে উঠে তিনি আমাকে একগাড়ু জল নিয়ে পঞ্চবটীর দিকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে বললেন। আমি পঞ্চবটীতে গেলাম। পঞ্চবটীর পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বাস্য হয়ে ধ্যান করতে বললেন। চলে চলে গেলেন। খানিক পরে তিনি আমার কাছে এসে আমাকে ধরে একটু সোজা করে দিয়ে বললেন, 'একটু বেঁকে যাস'। তারপর আবার তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসলাম। ফিরে এসে বললেন, 'আমার সঙ্গে চাঁদনীর ঘাটে চল'। যাবার সময় তিনি আমাকে একটা কমণ্ডলু সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন। ঘাটে গিয়ে আমি তাঁকে স্নান করিয়ে নিয়ে এলাম। ভিজে কাপড়েই এলেন। তাঁর ঘরে এসে তাঁর একখানা কাপড়ে একটু গঙ্গাজলের ছিটে দিতে বললেন। ন্যাংটা হয়ে কাপড় ছাড়লেন। কালীঘাটের মা কালীর পট তাঁর ঘরে থাকত, তিনি সেই পটের কাছে গেলেন। সেখানে ঠাকুরবাড়ীর মহাপ্রসাদ থাকত, তারই ও এক কণিকা নিজের মুখে দিলেন, আমাকেও দিলেন। তারপর মা কালীর পটের কাছে "ওঁ কালী ওঁ কালী" বলে ডান হাতের তিন নখে বাঁ হাতের তালুতে আস্তে আস্তে বুকের কাছে হাততালি দিয়ে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে অনেকক্ষণ রইলেন। তারপর চক্ষু মেলতেই দেখেন, কালীঘর বিষ্ণুঘরের ফলমিষ্টি প্রসাদ এসেছে। সেদিন নিজে বেলপানা খেয়ে আমাকে দিলেন; ফল প্রসাদও একটু একটু খেয়ে আমাকে দিলেন। প্রসাদী বেলপানার কথা খুবই মনে আছে। তারপর তাঁর সেই ছোট চৌকিখানির উপর বসে একটু তামাক খেলেন। ভোগারতির পর তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় দুটো ·· এসে বলছেন, 'গঙ্গাজলে পাক—মা কালীর প্রসাদ—মহাহবিষ্যি—যা খাগে যা।' আমি বললাম—'আচ্ছা'। উঠন দিয়ে যাচ্ছি, পেছু ফিরে ফিরে দেখি, দাঁড়িয়েই আছেন —দেখছেন বিষ্ণুঘরে যাচ্ছি না কালীঘরে যাচ্ছি। মনে মনে ভাবছি, ঠাকুর বিষ্ণুঘরে যেতেও বলতে পারতেন, কিন্তু কালীঘরে—যেখানে মাছটাছ হয় —সেখানে কেন যেতে বললেন? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কালীঘরেই যাওয়া হল। কালীঘরে গিয়ে আমি মায়ের নিরামিষ প্রসাদই খেয়েছিলাম। চাপ চাপ ছোলার ডাল—এখনও মনে আছে। সে সময় প্রত্যহ তখনকার কালে ঐ কালীবাড়ীর নিত্য উৎসব যাঁরা দেখেছেন, এখনকার দিনের ভোগ-রাগের ব্যাপার দেখলে তাঁরা অবাক হয়ে যাবেন। প্রত্যহ প্রায় ২৫০।৩০০ পর্য্যন্ত সাধু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ,

অভ্যাগত ও ইতর সাধারণ প্রসাদ পেত। আর আজকালকার তুলনায় সে রাজভোগ। যত ভাল ভাল মহাপুরুষ কালীবাড়ীতে প্রসাদ পেতেন ও নির্জ্জনে থাকতে সেখানে যেতেন।

খেয়ে ফিরে এসে দেখি ঠাকুর আমার জন্য একটি পানের খিলি হাতে করে তাঁর ঘরের পূর্ব্বদিকের দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আসতেই আমাকে বললেন 'খা। খাওয়ার পরে দুটো একটা খেতে হয়, নইলে মুখে গন্ধ হয়।' এই বলেই তিনি বললেন—'দেখ্ নরেন ১০০টা পান খায়, যা পায় তাই খায়, এত বড় বড় চোখ—ভেতরদিকে টান, কলকাতার রাস্তাদিয়ে যায় আর বাড়ী ঘর দোর ঘোড়া গাড়ী সব নারায়ণময় দেখে। তুই তার কাছে যাস, সিমলেয় বাড়ী।'

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে রইলাম। ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে আমি তার পর দিনই স্বামীজির আদরাণী সিমলেতে গিয়ে হাজির হলাম। বাড়ীতে গিয়ে স্বামীজিকে দেখলাম, বাইরের একখানা ঘরে বিছানার উপরে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বুদ্ধগয়া (বুদ্ধগয়া) বইখানি খুলে পড়ছেন। বইখানি প্রায় ওয়েবষ্টার অভিধানের মত বড়। ঘরখানিতে নানা আবর্জ্জনা ছড়ানো—বিছানাটিও 'তথৈবচ'। আমি কিন্তু 'নরেন'কে পেয়েই মুগ্ধ। ঐ সব আমার তখন চোখে পড়লেও কিছু মনে হয়নি। ঘরে ঢুকেই নরেনের শ্মশ্রুবিশিষ্ট গুরুগম্ভীর ভালবাসাময় দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ হয়ে আমি বললাম, 'ঠাকুর আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন'। বললেন, 'বস'। বলেই বাড়ীর ভেতর হতে এসে বসলেন এবং একটু কথাবার্ত্তার পর বললেন, 'ঠাকুরের কাছে গেছলি বুঝি? আবার আসবি।'

তারপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে সব কথা তাঁর কাছে বললাম। ঠাকুর বললেন, 'নরেনের কাছে গেছলি?'

'আজ্ঞা হাঁ; আপনি যা বলেছিলেন—তাই বটে।'

'তুই একদিনের দেখায় কি করে জানলি?'

'আমি গিয়ে দেখলাম, তাঁর সেই বড় বড় চোখ আর একখানা বড় ইংরাজী বই নিয়ে পড়ছেন। ঘরে চারিদিকে আবর্জ্জনা কিন্তু কোনদিকে তাঁর মন নাই। তাঁর মন যেন জগতে নাই।'

'খুব যাবি, খুব তার সঙ্গ করবি।'

স্বামীজির পিতৃবিয়োগের পর অনেক দিন তিনি ঠাকুরের কাছে যান নাই। ঠাকুর তাঁর জন্যে বড় ভাবতেন। ডেকেও যে না পাঠিয়েছেন তা নয়, তবু স্বামীজির তখন মনের অবস্থা বড় খারাপ। বোধ হয়, তাঁর দুঃখের কথা শুনে পাছে ঠাকুর কাতর হন এইজন্য স্বামীজি তখন আসতেন না। তারপর থেকে ঠাকুরের কাছে গেলেই স্বামীজি, মহারাজ, কালী মহারাজ, শরৎ মহারাজ —এদের কারো না কারো সঙ্গে আমার দেখা হত।

একদিন হবিষ্যি করে ঠাকুরের কাছে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসব, সেই সময় একজন লোক দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতা আসছিল। আমাকে কে একজন তার সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার কথা বলায় ঠাকুর বললেন,—'না, না, ও ছেলেমানুষ, বণপেয়ে মানুষটার সঙ্গে ও হাঁটতে পারবে না। এদের সঙ্গে যাবে এখন।' সেদিন ঠাকুরের মেয়ে ভক্ত যোগেনমা, গৌরীমা, কৃষ্ণভাবিনী* এরা সব তাঁর কাছে ঘরে বসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই আমার যাওয়ার কথা বলেছিলেন।

* তাঁকে সকলে 'ভাবিনী' বলে ডাকত, কিন্তু প্রকৃত নাম 'কৃষ্ণভাবিনী'। বাগবাজার নেবুবাগানে তিনি থাকতেন। তাঁর হাতের রান্না অতি উপাদেয় ছিল। ঠাকুর বলরাম বাবুর বাড়ী আসলেই তিনি এসে রেঁধে খাওয়াতেন। ঠাকুর তাঁর হাতের রান্না খেতে ভালবাসতেন। একদিন হঠাৎ তাঁর যে কি হল কিছুই জানা গেল না! কেউ কেউ অনুমান করেন যে, গঙ্গায় তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন।

সেদিন শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ছিলেন। আমরা একসঙ্গে সন্ধ্যারতির পর বরানগরে এসে 'সেয়ারের' গাড়ীতে উঠলাম। ছিলাম দুইজন। শরৎ মহারাজ আমার বড়, তিনি বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ ভিতরে যাও, আমি কোচবাক্সে যাচ্ছি।' তিনজন মেয়ে আর আমি গাড়ীর ভিতরে উঠলাম। এইরূপে বাল্যকালে জীবনের এক একটি মহা শুভদিন—এক একটা দিন যেন আমার জীবনের ঘটনাময় হয়ে উঠল।

নিরালায় আমি মনে তখন ভাবতাম, ঠাকুর যে বলেন, আমার হবিষ্যি করা, তেল না মাখা, মাছ না খাওয়া, কঠোর করা, হরীতকী খাওয়া—ইত্যাদি বড় বুড়োপনা, তা কি ঠিক? ভাবতাম, এগুলো যদি ভাল না নয়, তবে ছেড়ে দিলেই ত হয়। এই রকম যখন মনে করছি তখন একদিন ঠাকুরের কাছে গেছি—প্রসাদও পেয়েছি, তিনি একটু শুয়ে উঠেছেন, এমন সময় কয়েকটি গৃহস্থ ভক্ত তাঁর কাছে এলেন। আমি মেজেয় মাদুর পেতে দিলাম। তাঁরা কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুরকে বললেন, 'মশাই, আপনার কাছে এই যে সব ছোট ছোট ছেলে—সংসারধর্ম্ম না করে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য আসে—এটা কি ভাল?' ঠাকুর উত্তরে বললেন—'বাপু, তোমরা ত এদের এই জন্মটাই দেখছ, আগের জন্মের কথা ত জান না, সেই জন্মে এরা যে সংসারধর্ম্ম শেষ করে এসেছে। এই দেখ মায়ের চারটি ছেলে, তার মধ্যে একটি ছেলে জ্ঞান হওয়ার পর বললে, 'আমি তেল মাখব না—মাছ খাব না—হবিষ্যি করব।' বাপ মা সাধাসাধি ও মারবার ভয় দেখালেও সে ছেলে তার ত্যাগের ভাব ছাড়ে না। আর তিনটি ভোগে মত্ত, যা পায় তাই খায়—যত পায় তত খায়। দেখ, ঐ যে ছেলেটি একটু বড় না হতে হতেই সব ত্যাগ করতে চায় তার সত্ত্বগুণ বেশী—সত্ত্বগুণের উদয় যখন হয় তখন এই সব হয়।' ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে ঐ হবিষ্যি আচারাদির প্রতি আমার শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

ঠাকুরের কথায় মা কালীর ভোগ খেলেও, তারপর গিয়ে আমি বিষ্ণুঘরে ভোগ খেয়েছি। বড় কৌশলে, যাতে ওখানে আর না খেতে হয় —এই রকম করে যেতাম। আর যাকে তিনি ভালবাসতেন, তাকে শনি মঙ্গলবারে আসতে বলতেন। বলতেন, 'এ কালে কলিতে নারদীয়া ভক্তি ভাল। হৃদে কালী, মুখে হরি আর কপালে ত্রিপুণ্ড্রক।' শনি মঙ্গলবারে ধ্যান জপ অধিক করে করতে বলতেন। বলতেন, 'শনিবার মধুবার।'

আর একদিনের কথা। খুব সকালেই গেছি। গঙ্গাস্নানটান করে, প্রসাদ পেয়ে ঠাকুর একটু শুলেন। তাঁর ঘরের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় দরমা দিয়ে ঘেরা একটু জায়গায় বিশ্রাম করবার স্থান ছিল। ওখানে সকলে তামাক টামাক খেত। বিকালে ঠাকুর উঠলে পর কয়েকটি ভক্ত আসল, আমি তাদের মাদুর পেতে দিয়ে পঞ্চবটীর দিকে বাহ্যে গেছি। সেখান হতে কোমরে কাপড় তুলে নবতের কাছের ঘাট দিয়ে গঙ্গায় শৌচ করতে গেছি। তখন ভাঁটা, জল অনেক নেমে গেছে। আমি শৌচে যাচ্ছি—এমন সময় দেখি পেছন হতে ঠাকুর বলছেন, 'ওরে আয়, ওরে আয়, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। এখানে কি ছোঁচাতে আছে—যা হাঁসপুকুরে যা'। আমি বললাম—'যদি অন্য জল না পাই?' ঠাকুর বললেন—'যদি অন্য জল না থাকে তখন ছোঁচাবি।' শৌচাদি করে এসে দেখি, তিনি তাঁর বিছানায় বসে তাঁর সেই মধুর কণ্ঠে গোবিন্দ অধিকারীর—"রাই আমাদের —রাই আমাদের, আমরা রাইএর রাই আমাদের" এই কীর্ত্তন করছেন। কীর্ত্তনটি রঙ্গে ভঙ্গে সম্পূর্ণ করতে তিনি অজস্র অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত এবং সমাধি মগ্ন হয়ে গেলেন। আমি অবাক্ হয়ে বসে রইলাম, এ জীবনে এমন অদ্ভুত

ব্যাপার আর দেখি নাই। কীর্ত্তন অসংখ্য রকমে গাইলেন এবং সমস্ত বিকালটা কীর্ত্তনেই কেটে গেল। সেদিন ঠাকুরের ভক্ত মনোমোহন মিত্র ছিলেন।

আর একদিনের কথা। রবিবার ঠাকুরের কাছে গেছি। তার আগের দিন রাত্রে বোধ হয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসে ছিলেন, তিনি তখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য। কাছা কোঁচা দিয়ে গেরুয়ার কাপড় পরতেন এবং গেরুয়ার একটি জামা গায়ে দিতেন। সঙ্গে তাঁর শাশুড়ী, স্ত্রী, পুত্র (যোগজীবন), কন্যা (যোগমায়া) এবং ঢাকার নিত্যগোপাল গোস্বামীও ছিলেন। ঠাকুরের ঘরখানিতে আরও দুই একজন ছিলেন বলে মনে হয়। ঘরখানি একেবারে ভরে গিয়েছে। মাষ্টার মশায় (শ্রীম) ছিলেন, তিনি প্রায়ই ঠাকুরের ছোট চৌকীখানার নীচে পাপোষের কাছে বসতেন। ব্রাহ্ম ভক্তেরা ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে কেউ কেউ চোখ বুজতেন। ঠাকুর একবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁগা তোমরা অত চোখ বুজে বুজে কি দেখ?' (তিনি কি বলছেন যে এখানে তাঁর দর্শন ও কথাবার্ত্তা উপদেশাদি শ্রবণই কর্ত্তব্য?) তারপর ঠাকুর বিজয় গোস্বামী মহাশয়কে বললেন, 'দেখ বিজয়, তুমি এখন কুটীচক* পূর্ব্বে আমি শুনেছিলাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি গায়িকার মুখে 'এস মা, এস মা, ও হৃদয়রমা, পরাণপুতলী গো! আছি জন্মাবধি তব মুখ চেয়ে—তাত জান মা —ও দীন দয়াময়ী, তাত জান মা, ধরি এ জীবন কি যাতনা সয়ে।' এই গানটি শুনলে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে যেতেন। বিজয় গোস্বামী মহাশয় এলে ঐ মেয়েটি যদি না আসত তবে ঠাকুর বলতেন, 'ওগো ঐ মেয়েটিকে এনো'। সেই মেয়েটিকে সেদিন দেখলাম—কালো বিধবা, নাদুস নুদুস চেহারা, সুকণ্ঠ, গানের 'এস মা এস মা' অংশটি গাইতেই ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। সে যে কি ভাব—বর্ণনাতীত। অশ্রুজলে সমস্ত বুক ভাসায়ে গভীর সমাধিমগ্ন হলেন। তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বরে আরতি যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন। দক্ষিণেশ্বরের শোভাও তখন অপূর্ব্ব ছিল।

ক্রমশঃ

---

* সন্ন্যাসীদের চারিটি অবস্থা, কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস। কুটীচক গৃহের বাহিরে কুটীরে থাকেন। ভ্রমণাদির সামর্থ্য না থাকিলে কুটীচক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। বহূদক বহুতীর্থ ভ্রমণ করেন।
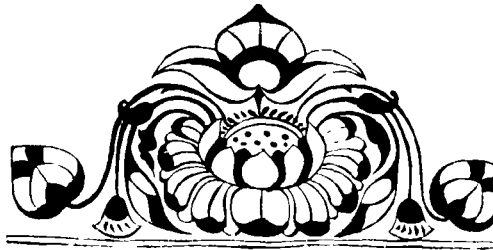
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র

প্রিয় সী—, ৺কাশী

১৩।২।২০

তোমার ১৮ই ডিসেম্বরের পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমার শরীর বেশ ভাল নাই, কোনও প্রকারে চলিয়া যাইতেছে। তোমার প্রশ্ন বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় নাই। যেরূপ আভাস পাইয়াছি তাহারই যথাজ্ঞান উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি।

বেদান্ত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জগৎকে মিথ্যা বলে না, সত্যই বলিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর এই তিন নিত্য ও সত্য। তবে প্রকৃতি ও জীব কখনও প্রকাশ, কখনও অপ্রকাশ ভাবে থাকে, একেবারে মিথ্যা হয় না। এই মতে সাযুজ্যাদি মুক্তি স্বীকার করে। ইহাতে নির্ব্বাণ মুক্তি নাই। নাই বলা অপেক্ষা এই মতাবলম্বীরা নির্ব্বাণ মুক্তির প্রার্থী নহে, এইরূপ বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। ইঁহারা সংসারকে দুঃখময় স্বীকার করিলেও ঈশ্বর কৃপায় দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া সুখময় হইতে পারে, এই কথা বলিয়া থাকেন। আর যাঁহারা এই সংসারকে কেবলই দুঃখময় জানেন, তাঁহারা দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য নির্ব্বাণ লাভের চেষ্টায় জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া কেবল মাত্র অদ্বৈত জ্ঞান অবলম্বনে অবস্থান করেন এবং শরীর পাতের পর ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করেন। ইঁহাদের মতে জগৎ অসৎ। ইঁহাদের জন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"ন স পুনরাবর্ত্ততে"। আমাদের ঠাকুরও একসময় অভেদানন্দ স্বামীকে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। যিনি গীতায় আপনাকে "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" বলিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে উদ্ধবকে ভাগবতে কিরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এখানে আলোচনা করিলে আমাদের বিষয় বেশ স্পষ্টীকৃত হইবে, এই বিবেচনায় আমি তাহার উদ্ধার করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, "যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিবিৎসয়া জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চনোপায়োঽন্যোঽস্তিকুত্রচিৎ।" কাহার পক্ষে কোন যোগ উপযোগী সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥" তারপর "মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্যসিদ্ধিদঃ"। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, যাঁহাদের মন বিষয় হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাঁহাদের জন্যই জ্ঞানযোগ, যাহার ফলে সংসার নিবৃত্তি, অপুনর্ব্বৃত্তি বা নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই মতে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" না হইয়াই পারে না। কিন্তু যাঁহাদের জগতে অল্প বিস্তর আসক্তি আছে, তাঁহারা জগৎ মিথ্যা বলিবেন কিরূপে? ইঁহারা জগৎকে ঈশ্বরের বিভূতি জানিয়া অসৎ বলেন না। কেবল ইহার অবিদ্যাভাগ ত্যাগ করিয়া বিদ্যা অংশ গ্রহণ করেন ও নির্ব্বাণ প্রয়াসী হন না। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অন্য বিশেষ নিয়মও আছে। অর্থাৎ জ্ঞানলাভদ্বারা নির্ব্বাণের অধিকারী হইয়াও কেহ কেহ নির্ব্বাণ গ্রহণ করেন না, পরন্তু অহৈতুকী ভক্তি আশ্রয় করতঃ শরীর গ্রহণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারাই ভাগবতে "আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা

অপ্যারুক্রমে কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের সংসার বাসনা নাই। ইঁহারা ভগবানের লীলার সহচর। স্বামীজি এইরূপ জীবন্মুক্ত ভাবের কথা তাঁহার বক্তৃতায় অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি আপনার সম্বন্ধে মুক্তি তুচ্ছ করিয়া লোকহিতের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম স্বীকার করিতে আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ভাব লাভ করিবার জন্য ঠাকুর "বুড়ি ছুঁয়ে ফেলা", "খুটি ধরে ঘোরা", "পরশ পাথর ছুঁয়ে সোনা হওয়া", "দুধ থেকে মাখন তুলে জলে ফেলে রাখা" প্রভৃতি অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই অবস্থা লাভ করিয়াই ভক্ত সোৎসাহে প্রার্থনা করিয়াছেন, "কীটেষু বৃক্ষেষু সরীসৃপেষু, রক্ষঃ-পিশাচেষ্বপি যত্র তত্র। জাতস্য মে ভবতু কেশব তৎ প্রসাদাৎ, ত্বয্যেব ভক্তিরচলাঽব্যভিচারিণী চ"॥ তবেই দেখা গেল, অবিদ্যা ত্যাগ সকলকেই করিতে হইবে। অবিদ্যার সংসার কাহারই থাকিতে পারে না। আর অজ্ঞান, দৃষ্টিদোষ প্রভৃতি যাহার উল্লেখ তুমি তোমার পত্রে করিয়াছ, তাহাত সকলেরই স্বভাবগত ও স্বানুভবসিদ্ধ, এবং ইহার নামই ত অবিদ্যা। ইহা থাকিতে জ্ঞান ভক্তি হইতেই পারে না। অতএব জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ, এই বোধ কিরূপে সহসা উদয় হইতে পারে? "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বোধ করিতে হইলে জগৎ-ভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। ত্যাগ না করিলে জ্ঞান অথবা ভক্তি কিছুরই উদ্ভব হইতে পারে না। প্রথমে ত্যাগদ্বারা জ্ঞান অথবা শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া তারপর আবার দেহ ধারণ অথবা নির্ব্বাণ লাভ যাহা অভিরুচি করিতে পারা যায়। তথাপি নির্ব্বাণ লাভ অপেক্ষা প্রভুর সহচর হইয়া "বহুজন হিতায়" দেহধারণ শ্রেষ্ঠতর। ইহাই যে ঠাকুরের ও স্বামীজির শিক্ষা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতর-মত অর্থাৎ যাহাতে সংসারে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, সমস্তই ইচ্ছামত সম্ভোগ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন—ব্রহ্মজ্ঞান অনায়াস লভ্য বলিয়া কথিত হয়, তাহা শুনিতে মধুর ও লোভনীয় হইলেও শ্রুতি, যুক্তি ও মহাপুরুষদিগের অনুভূতি বিরুদ্ধ বলিয়া আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আমি ঠাকুরের নিকট এক সময় একজনকে 'সংসার সত্য' এই সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছিলাম। সকল শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, "বাপু, সাদা কথায় বল না কেন যে, তোমার এখনও আমড়ার অম্বল খাইবার ইচ্ছা আছে, অত বুঝ। তর্ক যুক্তির প্রয়োজন কি"? ইহা হইতে প্রবলতর ও অকাট্য উত্তর আর কি হইতে পারে? বাস্তবিক ভিতরে আসক্তি থাকিলে সংসার ত্যাগে ভয় হয়; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া সংসারাসক্তি ত্যাগ না করিয়াও ভগবান লাভ হইতে পারে, এই কল্পনা করা মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুবিরূঢ় মূল সংসার বৃক্ষ "অসঙ্গ-শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং", ভগবানের এই উপদেশ কিছুতেই ব্যাহত হইবার নহে। যাহারা এইরূপ ত্যাগমূলক শত শত শাস্ত্রীয় উপদেশ অমান্য করিয়া আপন আসক্তি বশে সংসারকে সার বলিয়া গ্রহণ করে এবং অভ্রান্ত বেদরাশির সিদ্ধান্ত ত্যাগ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাদের কার্য্য অসম সাহসিক হইলেও যে সমীচীন নহে, ইহা বলা অনাবশ্যক মাত্র। যদি ভবিষ্যতে পারি আবার এ বিষয়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

যত মত তত পথ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান বৎসরে গত আশ্বিন মাসের উদ্বোধনে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রচারিত উল্লিখিত মত-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন (পৃ ৮১৫) ঃ—"আমি ইচ্ছা করিয়াই একটি দিকের উপর বেশী জোর দিয়াছি যাহাতে এই বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ হইয়া সত্য নির্ণীত হইতে পারে। আমি পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করিলাম মাত্র। এই প্রবন্ধকে অন্যরূপে গ্রহণ করিলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হইবে।" তিনি যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহা অতি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। তাই ভুল বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিবার সম্ভাবনা অন্তত আমার কাছে নাই। ভাল, তাঁহার ইচ্ছায় একটু আলোচনাই করিয়া দেখা যাউক, যদিও ইহাতে সত্য নির্ণীত না হইয়া আরো সন্দিগ্ধ হইবারও সম্ভাবনা আসিতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোনো বিষয়কে যতই তন্ন-তন্ন করিয়া বিচার করা যায় ততই তাহা ভাঙিয়া পড়ে।

বলিতে পারা যায় শ্রীযুক্ত রমেশবাবু প্রবন্ধে প্রধানত দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের দোষগুণ, আর 'যত মত তত পথ।' প্রথমেই তিনি বর্তমানে অনেকের চিন্তার ধারার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভালই করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ধর্মের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, ধর্মের নামে জগতে কত অধর্ম, অত্যাচার, নৃশংসতা হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস পড়িলে অনেক সময় সংশয় জাগে যে, ধর্মের দ্বারা পৃথিবীতে মোটের উপর উপকার, না অপকার বেশী হইয়াছে। ইহা সত্য কথা। এখানে স্বভাবত প্রশ্ন হয়, তবে কি এই অবস্থায় ধর্মের উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয় নহে? ইহার উত্তরে একটি প্রশ্ন করিতে পারা যায়—এই যে ধর্মের নামে নানা অনর্থ তাহা ধর্ম না অধর্মের ফল? ধর্ম কখনো অনর্থের জন্য হইতে পারে না। অনর্থের নিবারণই ধর্মের অপর প্রধান কার্য। ধর্মকে কেহ কেহ ঠিক যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না, অথবা অযথাভাবে বা বিপরীতভাবে বুঝে। তাহাতেই অনর্থ হয়। ইহা ধর্মের দোষ নহে। অন্ধ যদি চাঁদকে দেখিতে না পায় তবে তাহা চাঁদের দোষ নহে, সেই অন্ধ পুরুষেরই দোষ। কেবল ধর্ম নহে, অন্যান্য সমস্ত বিষয়ই অজ্ঞানের দোষে অনর্থ হয়। অজ্ঞানের সহিত মানুষের নিত্য সংগ্রাম, যেরূপে হউক উহাকে তাড়াইতেই হইবে। ইহা না করিয়া, যদি ধর্ম আছে বলিয়াই তাহার নামে অনর্থ হয় এই ভাবিয়া ধর্মের উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয় হয় তবে বড় বিপদের কথা। এই যুক্তি অনুসরণ করিলে আমরা দাঁড়াইব কোথায়? আজ পৃথিবীতে যে অনর্থ ও অশান্তি আসিয়াছে, এই যে চারিদিকে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি লাগিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই ইহার কারণ মানুষের কুবুদ্ধি, আর এই কুবুদ্ধির স্থান হইতেছে মানুষের মস্তক বা মস্তিষ্ক। অতএব ইহাকে উড়াইয়া দেওয়াই উচিত। না মাথা থাকিবে, না মগজে কুবুদ্ধি গজাইবে। হাত দিয়াই মানুষ চুরি-ডাকাতি লাঠালাঠি ইত্যাদি খারাপ কাজ করে, অতএব প্রত্যেকেরই হাত কাটিয়া দেওয়া উচিত। আগুনে কত শিশু, কত লোক-জন, কত ঘর-বাড়ী-ইমারত পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়, অতএব

পৃথিবী হইতে আগুন নিঃশেষ করা উচিত। জলপ্লাবনে কত গ্রাম-নগর ভাসিয়া যায়, অতএব যাহাতে একবিন্দু জল না থাকে, তাহাই করা উচিত। সমস্ত বিষয়েই তো এইরূপ ভাবিতে পারা যায়। সকলেরই ভাল-মন্দ দুইটি দিক্ আছে। মন্দ দিক্ ছাড়িয়া ভাল দিক্ দিয়াই চলিতে হয়, এবং মানুষ তাহাই করে। মস্তিষ্ক দিয়া সু ও কু উভয় বুদ্ধিই আসে। সুবুদ্ধি দ্বারা কেহ জগতের প্রত্যেকটি জীবের কল্যাণের চেষ্টা করে। অপর দিকে কেহ কুবুদ্ধির দ্বারা অকল্যাণের সৃষ্টি করে। ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। ধর্মের স্থানে অধর্মকে বা কুধর্মকে বসাইলে, অথবা ধর্মকে না বুঝিলে বা বিপরীত বুঝিলেই অনর্থ হয়, অন্যথা নহে। অন্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও মানুষকে সাবধান থাকিতে হয়।

ধর্মের "শাশ্বত চিরন্তন রূপ ও সত্য" "সাধারণতঃ বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়াই প্রচার হয়, সুতরাং ধর্ম বলিতে আমরা সাম্প্রদায়িক ধর্মই বুঝি। আর যত গোল তা এই সম্প্রদায় লইয়া।" ঠিক কথা। কিন্তু সম্প্রদায়কে কি এড়ান যায়? আমাদের খাদ্য না হইলে চলে না। খাদ্য কাহাকে বলে? যাহা আহার করিলে আমাদের শরীরের প্রতিদিনের ক্ষয়টা পূর্ণ হয়, বৃদ্ধির বয়স থাকিলে যাহা ঐ বৃদ্ধির সহায়তা করে, ও যাহা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সম্পাদন করে তাহাই খাদ্য। এই খাদ্য কোনো-না-কোনো একটা আকারই গ্রহণ করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পায়, ইহা দুধের আকারে, ফলের আকারে, অথবা এইরূপ অন্য কোনো আকারে উপস্থিত হয়। ধর্মের সাধনও এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের বা সম্প্রদায়ের নানাকারণে ভিন্ন-ভিন্ন আচার-ব্যবহারের ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পায়। তাহার একটা-না-একটা আকার থাকিবেই। অপর কথায় তাহার একটা সাম্প্রদায়িক আকার থাকিবেই। যাহা সকলের মধ্যে থাকে তাহাকে অসাম্প্রদায়িক বলা যাইতে পারে। ধর্মের যাহা সাধ্য তাহা অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু ধর্মের সাধন কখনো অসাম্প্রদায়িক নহে। যাহাকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া মনে করা হইবে তাহাও সাম্প্রদায়িক, তাহার অসাম্প্রদায়িক আকারই একটা সাম্প্রদায়িক আকার। অতএব খাঁটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মের সাধনের আশা আমরা করিতে পারি না।

সাম্প্রদায়িকতায় বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হয়, অকার্য করিতেও দ্বিধাবোধ হয় না। আবার কতকগুলি নিয়মব্রত অনুষ্ঠান পালনই ধর্ম বলিয়া পর্যবসিত হয়। জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি পঙ্গু হয়। মনুষ্যত্ব খর্ব হয়। এইরূপ আরো কত দোষ হয়। এ সবই সত্য। কিন্তু রমেশবাবু নিজেই বলিয়াছেন "এই নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, এবং প্রতি ধর্ম-সম্প্রদায়েই এমন অনেক লোক আছেন যাঁহাদের মনের স্বাভাবিক উদারতা তাঁহাদিগকে এই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি হইতে রক্ষা করে।" মনের এই উদারতাই তো ধর্মসাধনার ফল। এই শ্রেণীর লোকেরা ধর্মসাধনায় যে ফল পান, অন্যেরাও তাহাই পাইবে, ইহাই তো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে সকলে তাহা পায় না। কেন পায় না? কোনো বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার সর্ববিষয়ে সুচারু ব্যবস্থা করিলেও প্রত্যেকটি ছাত্র কেন সমান ফল পায় না? আরোগ্যশালায় প্রবিষ্ট প্রত্যেকটি রোগী নীরোগ হইয়া আসে না কেন? দোষ সর্বত্রই বর্জনীয়।

রমেশবাবুর উদ্ধৃত বাক্যটির মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি বলিতেছেন, প্রতি ধর্মসম্প্রদায়ে অনেক লোকের যে উদারতা থাকে তাহা "স্বাভাবিক।" জানি না তিনি এই শব্দটিকে কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি তিনি মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের ঐ উদারতা আপনা-আপনই থাকে, উহা তাঁহাদের ধর্ম বা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম-সাধনার ফলে

হয় না, তবে তাহা প্রমাণ করা বড় শক্ত। আমার তো মনে হয় উহা ধর্মসাধনারই ফল। মানুষ যদি যথাযথভাবে ধর্মকে জীবনে পালন করিয়া চলে তবে তাহার উদারতা আসিবেই আসিবে। অজ্ঞানের কথা স্বতন্ত্র।

ধর্মসাধনায় আচার-অনুষ্ঠানের একটা স্থান—বড় স্থান, কিন্তু একমাত্র স্থান নহে। আমাদের শরীরে চোখের একটি স্থান, এবং একটি বড় স্থান, কিন্তু সমস্তটি শরীর চোখের জন্য নহে। কেহ যদি ইহা না মানিয়া চলে তো বিপদ অনিবার্য। যেমন চোখকে তাহার ন্যায্য স্থান না দিলে চলে না, তেমনি আচার-অনুষ্ঠানকেও ধর্মসাধনার মধ্যে বুঝিতে হইবে। ইহার কথা শুনিয়া ভয় পাইবার কিছু নাই, যাঁহারা ভয় পান, তাঁহারা "অভয়ে ভয়-দর্শিনঃ।" অজ্ঞানের কথা সর্বত্রই মনে রাখিতে হইবে।

রমেশবাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "ধর্মের দ্বারা মনুষ্যজাতির যে উপকার হইয়াছে, তাহা অন্য উপায়ে সাধিত হইতে পারিত কিনা। সাম্প্রদায়িক-ধর্মের পরিবর্তে যদি নীতি শিক্ষার বহুল প্রচার হইত তাহা হইলে মনুষ্যের মধ্যে পূর্বোক্ত সৎ-কার্যের প্রেরণা ও দুষ্প্রবৃত্তিগুলির দমন সম্ভবপর হইত কিনা।" ইহা ভাল প্রশ্ন। ধর্মের দ্বারা মনুষ্যজাতির যে উপকার হইয়াছে, তাহা করিতে পারে এমন কোনো উপায় জগতে এ পর্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। নীতি আমাদের ধর্মেরই অন্তর্গত। নীতি বাদ দিয়া আমাদের ধর্ম নাই। নীতি ধর্মের এক অঙ্গ। তা ছাড়া, হিংসা না করা নীতি। আমি হিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিলাম। কিন্তু ইহাতেই হইল না। আমাকে ইহার পরেও উঠিতে হইবে। সেখানে নীতির কিছু করিবার নাই। সেখানে আমার আবশ্যক ধর্ম। সৎপ্রবৃত্তিকে জাগান বা অসৎপ্রবৃত্তির দমন নীতির দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই তো মানব কৃতকৃত্য হয় না। অন্নদান, জলদান, রাস্তা, ঘাট, আরোগ্যশালা, অতিথিশালা, ইস্কুল-কলেজ-পাঠশালা, ইত্যাদি, ইত্যাদি সবই নীতির দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু সহস্র সহস্র মনের দুঃখ দূর করিবার উপায় কি? পরম আনন্দ, পরম শান্তিলাভের উপায় কি? আমি পরজন্মের কথা বলিতেছি না। পরজন্ম আছে কি নাই, কে জানে। তুমি ইহা মান, আমি না মানিতে পারি। কিন্তু এই যে বর্তমান জন্ম আছে ইহাতে তোমার, আমার, কাহারো কোন সন্দেহ নাই। তাই আমি এই জন্মেরই কথা বলিতেছি, আমি এই জন্মেই পরম আনন্দ, পরম শান্তির মধ্যে জীবনের এক-একটি ক্ষণ কাটাইতে চাই। আমি ইহা অসম্ভব মনে করি না। আমার মনে হয়, ধর্মই ইহা করিয়া দিতে পারে। শারীরিক দুঃখ আর কয়টা, কিন্তু মনের দুঃখের কি সীমা-পরিসীমা—ইয়ত্তা আছে। যা চাই, তা হয় না, যা না চাই, তাই হয়; এটা গেল, সেটা এল, এই নিন্দা, এই অপমান, এই ক্ষতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা কেবল নিজের নহে, আত্মীয়-স্বজন, দেশ-বিদেশ, বিশ্বের। কে আমাকে ইহার মধ্যে স্থির অবিচল স্বস্থ শান্ত আনন্দিত হইয়া থাকিবার সামর্থ্য দান করিতে পারে? আমার মনে হয় ধর্ম, একমাত্র ধর্ম। জগতে ইহার দানের তুলনা নাই, অন্য আর কিছুর দ্বারা ইহা সম্ভব নহে।

ধর্ম পালন করিতে না শিখিলে নীতিকেও পালন করা অসম্ভব। নীতি বলে 'মিথ্যা বলিও না।' বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ হইতে এ কথা আমরা পড়িয়া আসিয়াছি, তারপর কত ছাত্রকে পড়াইয়াছি, এ সব ছাত্রও আবার কত ছাত্রকে পড়াইয়া চলিয়াছে। এই শিষ্য-প্রশিষ্য-অনুশিষ্যের প্রকাণ্ড পরম্পরা হইয়াছে। কিন্তু, আমাদের কয়জনের সত্যনিষ্ঠা আছে? 'পরস্ব অপহরণ করিও না,' নীতি আপনাদিগকে বারবার বারবার এই শিক্ষা দিয়াছে। কে ইহা

না জানে ? দেশে বিদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রের ইহা জানা নাই ? কোন রাষ্ট্রপতি বা রাজা-সম্রাটের ইহা জানা নাই ? তবুও জগতের মধ্যে এত মারামারি কাটাকাটি হানাহানি, অস্বস্তি অশান্তি কেন ? নীতি এখানে একবারেই ব্যর্থ। তাই কি করিয়া বলিব "নীতিশিক্ষার প্রচার করিলে এই অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না ?" পাঠশালা ও মক্তব বাড়িতেছে, নীতিশিক্ষাও যে না বাড়িতেছে তাহা নহে, কিন্তু নারীধর্ষণ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না।

রমেশবাবু লিখিতেছেন "গৌতম বুদ্ধ অনেকটা এই প্রকার (অর্থাৎ নীতিশিক্ষার প্রচার) চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। অচির-কালমধ্যেই বৌদ্ধেরা তাঁহার নীতিশিক্ষার ভিত্তির উপর একটি বিরাট ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে।..." আমার মনে হয়, ধর্মকে বাদ দিয়া বুদ্ধদেব কোনো নীতি প্রচার করেন নাই। আমার মনে হয়, ইহা ঠিক নহে যে, বুদ্ধদেবের ধর্ম কেবল নীতি। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই হইল তাঁহার ধর্মের সোপান। শীলের দ্বারা সমাধি হইবে, সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞালাভ হইবে। তিনি আদিকল্যাণ মধ্যকল্যাণ ও অন্তকল্যাণ বিশুদ্ধ ধর্ম পাইয়াছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন। নিজেই তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার ধর্ম জানা বড় শক্ত. ইহাতে তর্কের দ্বারা অবগাহন করিতে পারা যায় না ("অতর্কাবচর"), কেবল পণ্ডিতেরাই ইহা বুঝিতে পারে ("পণ্ডিতবেদনীয়")। বুদ্ধদেবের পরে বৌদ্ধেরা—তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নীতিতে ধর্ম জুড়িয়া দেয় নাই। তিনি নিজেই নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সম্প্রদায়ও তাঁহার জীবদ্দশাতেই অনেকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তা যাই হউক, ধর্মের দ্বারা আমরা যাহা পাইতে চাই তিনি তাহা কেবল নীতির দ্বারা পাইবার চেষ্টা করেন নাই। আমার মনে হয়, এখনো তাহা পাওয়া সম্ভব নহে।

কেবল রমেশবাবুই নহেন, অনেকেই 'যত মত তত পথ' এই কথা বা মতটিকে লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। পরমহংসদেবের এই প্রবর্তমান জয়ন্তী-মহোৎসবসমূহের কোনো একটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। এই কথা লইয়া অনুকূল প্রতিকূল উভয়ই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই। তর্কে কে কবে হার মানে ?

দেখিতে পাইতেছি আমাদের সম্মুখে 'যত মত তত পথ' এই একটি কথা রহিয়াছে, আর ইহাই লইয়া আমরা তর্ক করিতেছি। কিন্তু মূলের একটি কথার দিকে আমরা প্রণিধান করি নাই। শব্দের দ্বারা বক্তার ভাব প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু তাহা আংশিকভাবে। বক্তা নিজের ভাবের খানিকটা প্রকাশ করেন শব্দের দ্বারা, খানিকটা আকার, ইঙ্গিত, বা অভিনয়ের দ্বারা ; খানিকটা প্রকাশ পায় প্রকরণ বা প্রসঙ্গের দ্বারা , খানিকটা তাৎকালিক অবস্থার দ্বারা , কে বলিতেছেন, কাহাকে বলিতেছেন, কিজন্য বলিতেছেন, কখন বলিতেছেন, কিরূপে বলিতেছেন, ইত্যাদিরও দ্বারা খানিকটা প্রকাশ পায়। কোনো সময়ে এক শিষ্য গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চুপ করিয়া থাকিলেন। শিষ্য আবার প্রশ্ন করিলেন। গুরু বলিলেন, 'আমি তো উত্তর দিয়াছি। তুমি বুঝিলে না।' শিষ্য গুরুর মৌনের অর্থ পরে বুঝিয়াছিলেন।

এই তত্ত্বটিকে উপেক্ষা করায় অনেক সময়ে আমরা এক একটি শব্দের কেবল ব্যাকরণাদির সাহায্যে অর্থ খুঁজিতে খুঁজিতে পুঁথি বাড়াইয়া চলি, তবুও আসল অর্থ ঢাকাই থাকিয়া যায়। প্রাচীন আচার্যেরাও অনেকে এইরূপ করিয়াই আসিয়াছেন।

অতএব আলোচ্য কথাটির আলোচনায় আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে ; আমাদিগকে

জানিতে হইবে পরমহংসদেব কবে কি প্রসঙ্গে কি অবস্থায় কাহাকে ও কি অভিপ্রায়ে ঐ কথাটি বলিয়াছিলেন। ইহাই যদি জানা না যায় তবে ঐ শব্দ কয়টি লইয়া চুল-চেরা বিচার করিলে যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইবে তাহা বিচারকর্তারই সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, পরমহংসদেবের বলিয়া নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, উহা তাঁহার হইতেও পারে, না-ও পারে।* বেদান্তসূত্রের যতগুলি ভাষ্য প্রচলিত আছে ততগুলিরই সমন্বয় করিয়া যদি কেহ একটা মত খাড়া করেন তবে তাহা বেদান্তসূত্রের রচয়িতা বাদরায়ণের মত ইহা অসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করা যায় না। ইহা সমন্বয়কারীর মত এইমাত্র আমরা বলিতে পারি।

এই ভাবিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রেমঘনানন্দজিকে এই কথাটির মূল কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃতের কয়েকটি স্থান নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে ঠিক একেবারে ঐ কথাটি না থাকিলেও ঐ ভাবের অনেক কথা আছে। ইহার দ্বারা আলোচ্য বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। বক্তার নিজের এক উক্তি নিজেরই অন্য এক উক্তির দ্বারা পরিষ্কৃত হইবে। একটু বেশী হইলেও নিম্নে ইহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। 'এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর পূর্ব্ব বারান্দায় আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরবাসী একজন গৃহস্থও বসিয়া আছেন। তিনি গৃহে বেদান্তচর্চ্চা করেন। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যের সঙ্গে তিনি শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

দক্ষিণেশ্বরবাসী। এই অনাহত শব্দ সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে হচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু শব্দ হ'লে ত হবে না। শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয় ? তোমায় না দেখলে ষোল আনা আনন্দ হয় না।

দঃ নিবাসী। ঐ শব্দই ব্রহ্ম। ঐ অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি)। ওঃ বুঝেছ। এঁর ঋষিদের মত। ঋষিরা রামচন্দ্রকে বল্লেন "হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করুন। আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই।" রাম এই কথা শুনে হেসে চ'লে গেলেন।

কেদার। ঋষিরা রামকে অবতার জানেন নাই। ঋষিরা বোকা ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরভাবে)। আপনি এমন কথা বোলো না। যার যেমন রুচি। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানারকম ক'রে খাওয়ান। কারুকে পোলাও ক'রে দেন; কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল করে দেন। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অম্বল ভালবাসে।... যার যেমন রুচি।' দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৭-১৮।

২। 'শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)। আন্তরিক হ'লে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, বেদান্ত-বাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান, খৃষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হ'লে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া ক'রে বসে। তারা বলে 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছু হবে না ;' কি 'আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না ;' আমাদের খৃষ্টান ধর্ম্মকে না নিলে কিছুই হবে না।' এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার

* শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য ও শিষ্যরূপে যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীসারদামণি দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি সকলেই "যত মত তত পথ" বাক্যটীকে তাঁহারই মুখ-নিঃসৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে কবে, কি প্রসঙ্গে, কি অবস্থায়, কাহাকে ও কি অভিপ্রায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহা বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ না থাকিলেও উপদেশ-প্রসঙ্গে যে বলিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে "উদ্বোধন গ্রন্থাবলী"তে প্রমাণের অভাব নাই। "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" ঠিক এই বাক্যটী আমরা খুঁজিয়া না পাইলেও সন, তারিখ ও প্রসঙ্গ প্রভৃতি উল্লেখে ইহার অনুরূপ অসংখ্য বাক্য (যে সকল বাক্যের অর্থ 'যত মত তত পথ" ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না) আছে। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয়ও ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। —উদ্বোধন-সম্পাদক

বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম্মই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা-পথ দিয়া পৌঁছান যায়।

আবার কেউ কেউ বলেন ঈশ্বর সাকার তিনি নিরাকার নন। এই ব'লে ঝগড়া। যে বৈষ্ণব সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, তা বলা যায় না।'

দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২১।

৩। 'মণি। আজ্ঞা। শাস্ত্রে দুরকম বলেছে। এক পুরাণের মতে কৃষ্ণকে চিদাত্মা, রাধাকে চিচ্ছক্তি বলেছে। আর এক পুরাণে কৃষ্ণই কালী—আদ্যাশক্তি বলেছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেবীপুরাণের মত। এ মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন। তা হলেই বা। তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত।

এই কথা শুনিয়া মণি অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৪১।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটাই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি 'এ কথা বোলো না, আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা, ভুল।' হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—নানাপথ দিয়া এক যায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে,' আন্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবান্ লাভ হবে।'

চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৩৮।

৫। 'শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞানীরা হরিনাম করে, খুব ভাল। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তার কৃপা হবে। ঈশ্বর লাভ হবে।

সব পথ দিয়াই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে। যেমন এক ঘাটের জল হিন্দুরা খায়, বলে জল, আর এক ঘাটে খৃষ্টানেরা খায়, বলে ওয়াটার, আর এক ঘাটে মুসলমানেরা খায়, বলে পানি।' পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৪।

৬। কি জান? দেশ কাল পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম ক'রেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত-আশ্রয় ক'ল্লে, তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ব'লে দেয় ওহে, ওদিকে যেও না—দক্ষিণদিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও না কখনও জগন্নাথ দর্শন ক'রবে।* তবে অন্যের মত ভুল হয়েছে, এ কথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ, তিনি ভাবছেন, আমাদের কর্ত্তব্য, কিসে যো সো ক'রে জগন্নাথ দর্শন হয়। তা, তোমাদের মতটি বেশ তো। তাঁকে নিরাকার ব'ল্‌ছো, এতো বেশ। মিছরীর রুটী সিঁদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে।

২য় ভাগ, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

পরমহংসদেবের যে কয়টি উক্তি উদ্ধৃত হইল তাহা খুবই স্পষ্ট, সরল, সহজ, পরিষ্কার। তিনি প্রথম উক্তিতে বলিতেছেন, রুচি ও শক্তি অনুসারে যে যে-ভাবে পারেন ভগবানের পূজা করিবেন। দ্বিতীয় উক্তিতে বলিতেছেন, ভগবানের ভজনে আন্তরিকতা থাকা চাই। আন্তরিকতা থাকিলে শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তী, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই ঈশ্বর পাইবেন। নানাপথ দিয়া ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায়। তৃতীয় উক্তিতে বলিয়াছেন, ভগবান্ অনন্ত, পথও অনন্ত। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নানাপথ দিয়া এক জায়গায় যাইতেছে। চতুর্থ উক্তিতে তিনি শাক্ত, বৈষ্ণব, যাহার যে ভাব তাহাকে তাহা রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া আমারই পথ সত্য, অন্যের পথ ভুল এই বুদ্ধি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। নানা-পথ দিয়া সকলেই এক জায়গায় যাইতেছে। নিজের ভজনায় আন্তরিকতা থাকিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। পঞ্চম উক্তিতে বলিয়াছেন, ভগবান্‌কে ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে হয়, এবং তাহা হইলে সব পথ দিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাঁহাকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নানা নামে ডাকে। ষষ্ঠ উক্তিতে বলিয়াছেন, আন্তরিকতার সহিত কোনো মত আশ্রয় করিয়া চলিলে, যদি তাহাতে কোনো ভুল থাকে তবে তিনিই তাহা সংশোধন করিয়া

* ভাগবতের নিম্নলিখিত উক্তিটি তুলনীয়—"সধ্রীচীনোহ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ। সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণ পরায়ণঃ॥"

দেন। অন্যের মতের দোষ চিন্তায় আমাদের কাজ নাই। এইরূপ উক্তি আরো অনেক আছে।*

এই সমস্ত উক্তির সহিত যদি "যত মত তত পথ" এই কথাটিকে ধরা হয় তবে ইহার অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তী, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি নামে যে সব ধর্ম প্রচলিত আছে, ইহাদের যে কোনটির দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়, যদি সাধকের সাধনায় সত্য-সত্য আন্তরিকতা থাকে। আন্তরিকতাই হইল ভগবদ্ভজনের প্রাণ। যে মতে ইহা পাওয়া যায় তাহাই ভগবানের পথ। যেমন যাহা হইতে আমরা আলো পাই, তাহাকেই বাতি বলি, তা তাহা তেলেরও বাতি হইতে পারে, কেরোসিনেরও হইতে পারে, বাষ্পেরও হইতে পারে, বিজলীরও হইতে পারে। ইহা অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি, সব বাতিতেই আলো হয়। এইরূপ যত মত আছে, যদি সত্য-সত্য উহা মত হয়, তবে তত পথ আছে ইহা বলিলে কোন দোষ হয় না। মতটা সত্য কি না, পথটা সত্য কি না ইহাই দেখিবার কথা। কিন্তু মানুষ যে অনেক সময় যেটা বস্তুত পথ নয়, তাহাকেও পথ বলিয়া মনে করে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়। অপথ, কুপথ, বিপথ এই সবকে পথের মধ্যে ধরিয়া চলিলে বিপদ্ অনিবার্য। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম সব দিকেই নগরে যাইবার পথ থাকে। সব পথ দিয়াই সেখানে যাওয়া যায়, যদি কেহ এরূপ বলে তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু বস্তুত যাহা নগরে চলিবার পথ নহে তাহাকেও যদি কেহ পথ বলিয়া মনে করে আর তাহাই অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে তবে সে কখনো নগরে পৌছিতে পারে না, এবং তাহা না পারার জন্য, যিনি বলিয়াছিলেন যে, সব পথেই যাওয়া যায়, তাঁহাকে আমরা দোষী বলিতে পারি না, এ দোষ তাঁহার যিনি না বুঝিয়া না শুনিয়া অপথকে পথ বলিয়া মনে করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব নিজেই বলিয়াছেন,—

"ভৈরব ভৈরবী, এদেরও ঐ রকম। কাশীতে যখন আমি গেলুম, তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন কোরে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান কর্‌তে বল্লে। আমি বল্লাম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগ্‌লো। আমি মনে কল্লাম এইবার বুঝি জপধ্যান কর্‌বে। তা নয়, নৃত্য কর্ত্তে আরম্ভ করলে। আমার ভয় হ'তে লাগ্‌লো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটি গঙ্গার ধারে হয়েছিল।

"স্বামী-স্ত্রী যদি ভৈরব-ভৈরবী হয়, তবে তাদের বড় মান।

(নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) "কি জান ? আমার ভাব মাতৃভাব, সন্তান ভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, এতে কোন বিপদ নাই। ভগ্নীভাব এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব,—বীরভাব বড় কঠিন। তারকের বাপ ঐ ভাবে সাধন ক'র্‌ত। বড় কঠিন। ঠিক ভাব রাখা যায় না।

"নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার। মত পথ। যেমন কালীঘাটে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা, শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। * * *"

২য় ভাগ, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ১৬৬।

পরমহংসদেব ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র রচনা করিতে বসিয়া ঐ মত প্রচার করেন নাই। সহজ-সরলভাবে কথাবার্ত্তার মধ্যে উহা বলিয়াছেন মাত্র। "যত মত" বলিতে পণ্ডিত-মূর্খ জ্ঞানী-অজ্ঞানী, শিশু বৃদ্ধ ইত্যাদি যত লোকের মত হইতে পারে তাহাই যদি ধরিতে হয়, তবে ও কথার কোনো মানেই হয় না। আমরা বলি সেরখানেক ওজনের এই পুটলিটি সবাই

---

* জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য, সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১১ পৃষ্ঠা।

আমায় সব ধর্ম্ম একবার করে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আস্‌তে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর তাঁর কাছেই সকলি আসছে, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। ঐ ৩২ পৃষ্ঠা।

মত—পথ। এক একটী ধর্ম্মের মত এক একটী পথ—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয়। ঐ ৪৬ পৃষ্ঠা।

কারু উপর বিদ্বেষ করতে নেই। শিব, কালী, হরি—সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যে এক করেছে সেই ধন্য।

ঐ ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪ পৃষ্ঠা।

দেখছো কত রকম মত। মত, পথ। অনন্ত মত, অনন্তপথ। ... আর সব মতকে এক একটী পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়।

ঐ ১৫৫ পৃষ্ঠা।

লইয়া যাইতে পারে, ইহাতে কেহ দোষ ধরে না, যদিও সন্তপ্রসূত শিশু তাহা লইয়া যাইতে পারে না। 'সবাই' বলিতে শিশুও বাদ যায় না। কবিরাজ মহাশয় রোগীকে বলেন 'তুমি এখন সব খাইতে পার।' 'সব' শব্দের মধ্যে জগতের কিছুই বা কোনো খাদ্যই বাদ পড়ে না। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের তাহা অভিপ্রেত নহে। সেই সময়ে সেই ব্যক্তির অভ্যস্ত বা অনুকূল যে কয় প্রকার খাদ্য তিনি 'সব' পদ প্রয়োগ করিয়া তাহাই বুঝাইতে চাহেন। পরমহংসদেব ঐ "যত মত তত পথ" কথার ও এইরূপ তাৎপর্য মনে হয়।

ইহাই যদি হয়, তবে "যত মত তত পথ" ইহার অর্থ দাঁড়ায় যত সত্য মত তত পথ। তাহা হইলে গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ বা সতীদাহ প্রভৃতি যে সমস্ত মত বা প্রথা মনুষ্যত্বের বিরোধী বলিয়া মনে হয় তাহা পরিত্যাগ করার বা তাহার বাধা দেওয়ার কোনো আপত্তি থাকে না। অজ্ঞানী যদি ধর্মকে না জানিয়া যা তা বুঝিয়া ফেলে বা করিয়া বসে তাহার জন্য সেই দায়ী। অন্যে যদি তাহাকে অনুসরণ করে তবে সেও অজ্ঞানী। জ্ঞানী অজ্ঞানকে সংশোধন করিবেন।

নানা উপায়ে পরমার্থ লাভ করার কথা ভারতীয় ধর্ম বা ধর্মশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ। ইহা নূতন করিয়া লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবুও একটু লিখি একই লক্ষ্যের জন্য, কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের কথা ভাবিয়া দেখুন। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সম্বন্ধে ভাগবতকার বলিতেছেন, সংসার যাঁহার ভাল লাগে না, যাঁহার তাহাতে নির্বেদ আসিয়াছে, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগ, যাঁহার সংসারে কামনা আছে তাঁহার পক্ষে কর্মযোগ, আর যাঁহার সংসারে তেমন আসক্তিও নাই নির্বেদও নাই, তাঁহার পক্ষে ভক্তি-যোগ সিদ্ধিপ্রদ। দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি সমস্ত অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবানের প্রতি ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের প্রতি চিত্ত স্থাপন করিতে, বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা না পারিলে উহাতে অভ্যাস করিতে, তাহা না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম করিতে, এবং তাহাও না পারিলে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন। ভক্তিদ্বারা সগুণোপাসনা আর অব্যক্তোপাসনা উভয়েরই কথা তিনি বলিয়াছেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন ইত্যাদি নববিধ ভক্তির কথা বলা হইয়াছে; ইহার সবগুলিও করিতে পারা যায়, আবার কোনো একটিও করা যায়। 'কেহ সাধে বহু অঙ্গ কেহ সাধে এক।' কিন্তু ইহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য একই। এইরূপ অনেক অনেক। বৌদ্ধধর্মেও এইরূপ অনেক। ইহাই তো স্বাভাবিক। মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন, আর প্রকৃতি অনুসারেই ব্যবস্থা আবশ্যক।

ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এটা সেটা লইয়া গোল বাধে, ইহা দেখাই যাইতেছে। ইহার নিবারণের উপায় কি? সকলেই নিজের নিজের রুচি অনুসারে ভোজন করে। এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক ও থাকেও। যে খাদ্য আমাকে ভাল লাগে সকলকেই তাহা ভাল লাগিবে, এই বলিয়া বিবাদ করা মূর্খতা, কেন না করিলেও তাহা সকলে শুনিবে না, বরং বিবাদ করায় কষ্ট হইবে নিজেরই। আর তাহাতে কিছু লাভেরও সম্ভাবনা নাই। ধর্মসম্বন্ধেও শাস্ত্রসম্বন্ধেও সেইরূপ। ভাগবতকার চমৎকার কথা বলিয়াছেন "শ্রদ্ধা ভাগবতে শাস্ত্রে" অর্থাৎ ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকিবে, আর "অনিন্দান্যত্র চৈব হি" অপর শাস্ত্রের নিন্দা করিবে না। বৈষ্ণবেরা অপর কথায় ইহাই বলেন 'অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব।' পরমহংসদেবও এই কথাই বলিয়াছেন অনেক স্থানে। একস্থানের উক্তি এই—"তবে অন্যের মত ভুল হয়েছে, এ কথায় আমাদের দরকার নাই।" ইহা পূর্বে একবার উদ্ধৃত হইয়াছে। ধর্মসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিবারণ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়, এবং একমাত্র উপায়। ইহা যদি কেহ না শোনে তবে তাহার বিনাশ; ইহা দেখাই যাইতেছে।*

---

* পশ্চাল্লেখ। উল্লিখিত অংশ লেখার পর উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দজী পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' যেখানে যেখানে কথিত বা বর্ণিত হইয়াছে তাহা চিহ্নিত করিয়া কয়েকখানি পুস্তক আমাকে অনুগ্রহ-পূর্বক প্রদান করেন। তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ নামক পুস্তক (ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৩৭, পৃঃ ১০১) উহা সঙ্কলিত দেখা গেলেও কবে কোথায় কি প্রমাণ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে (সাধক ভাব, ১৩৩৯, পৃঃ ৩৬১, ৩৬৭, গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ, ১৩২৫, পৃঃ ১৯৮) উহা উল্লিখিত হইলেও কোথায়, কবে, বলা হইয়াছে ইত্যাদির উল্লেখ নাই।

আত্মতত্ত্ব

সম্পাদক

আত্মা অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ। যিনি ব্যষ্টিরূপে জীবে জীবে জীবাত্মা, তিনিই সমষ্টিরূপে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরমেশ্বর। যেমন আমার প্রত্যেক অংশে চৈতন্য পৃথক পৃথক ভাবে বিদ্যমান এবং সমগ্র ব্যাপিয়া আমি এক জীবরূপে অবস্থিত, তেমন আত্মা "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ (গীতা, ১৩।১৭)—'ভূতসমূহে পৃথক ভাবে এবং এক অখণ্ডচৈতন্যরূপেও বিরাজমান।' তিনি "বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরম্" (গীতা, ১৩।১৬)—'ভূতগণের বাহিরেও আছেন এবং ভিতরেও আছেন।' তিনি স্থাবরও বটেন এবং জঙ্গমও বটেন। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) 'এই সকল বিশ্বই ব্রহ্মরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত।' অতি সূক্ষ্ম বলিয়া আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, এ জন্য তিনি অতি দূরে অথচ তিনি প্রাণের প্রাণ, মনের মন এবং চক্ষুর চক্ষু বলিয়া অতি নিকটে অবস্থিত। জগতের যখন অস্তিত্ব থাকে, তখন তিনি জগতের সর্ব্ব নামরূপের আবরণে সগুণ এবং জগৎ যখন থাকে না, তখন তিনি আপনা আপনি নির্গুণ। আত্মা যখন শরীরে অবস্থান করিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে খেলা করেন, তখন তিনি সগুণ, আবার যখন তিনি দেশকালপাত্রাতীত তুরীয় অবস্থায় অবস্থান করেন, তখন তিনি নির্গুণ। 'তাঁহার একটীও ইন্দ্রিয় নাই অথচ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াযুক্ত। তিনি কিছুরই সহিত লিপ্ত নন অথচ সর্ব্ববস্তুর ধারণকর্ত্তা। তাঁহার কোনও গুণ নাই অথচ তিনি (প্রকৃতির) গুণসমূহের অধিষ্ঠান'। সমষ্টিরূপে "সর্ব্বাত্মৈকস্বরূপেণ" (ব্রহ্মোপনিষৎ, ৫৫) তিনি সর্ব্বেশ্বর—পরমাত্মা এবং প্রতি দৃশ্যমান বস্তুতে তিনি আত্মা। ব্যষ্টিচৈতন্য অজ্ঞানপ্রযুক্ত, আপনাকে সমষ্টি-চৈতন্য হইতে ভেদ কল্পনা করিয়াই জন্মমৃত্যু ও সুখ দুঃখের অধীন বলিয়া প্রতীত হইতেছেন।

"যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাঽপি মলিনো মলৈঃ॥"
(মাঃ উঃ, গৌড়পাদীয়কারিকা, ৩।৮)

—'যে ঘটাকাশাদির ভেদবুদ্ধিদ্বারা তাহার রূপ ও কার্য্যাদির ভেদ ব্যবহার করে, সেইরূপ দেহোপাধিক জীবের ভেদ বুদ্ধিদ্বারা তাহার জন্মমরণাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন বালকেরা অজ্ঞানবশতঃ মেঘ, ধূলি ও ধূমাদিদ্বারা আকাশকে মলিন মনে করে, সেইরূপ অজ্ঞানীরা আপন অবিবেকবশতঃ দেহের জন্মমরণাদিদ্বারা আত্মাকে মলিন জ্ঞান করে। যেমন আকাশ নির্ম্মল, মেঘাদি তাহার ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ আত্মাও নির্ম্মল, জন্মমরণাদি তাহার ধর্ম্ম নহে।'

হিন্দু সাকার ও নিরাকাররূপে আত্মারই উপাসনা করিয়া থাকে। হিন্দু অনাত্মা বা জড় পদার্থের আরাধনা করে না। হিন্দুর পূজা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সাকার উপাসক তাঁহার উপাস্য প্রতীককে আত্মস্বরূপে (প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া) উপাসনা করেন। যিনি প্রতীককে আত্মা বা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন না, তিনি যথার্থই পৌত্তলিক, তাঁহার পূজা অভীষ্ট ফল প্রদানে অসমর্থ। শ্রুতি বলেন—'যিনি আত্মা ভিন্ন অন্যকে উপাসনা করেন, তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন।' (বৃহঃ উঃ ১।৪।৮)। হিন্দুশাস্ত্রে একমাত্র আত্মাকেই উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", "তরতিশোকম্ আত্মবিৎ", "আত্মানমেব লোকমিচ্ছেৎ

প্রব্রজন্তি", "আত্মলাভাৎ ন পরং বিদ্যতে"—"সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধান করিবে", "আত্মজ্ঞ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন", "মুমুক্ষুগণ আত্মরূপ 'লোক' (স্বরূপ) লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন", "আত্মলাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠলাভ কিছুই নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিশেষ জোরের সহিত আত্মার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ—'আত্মাই সমুদায় দেবতা।" বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণ আত্মারই বিগ্রহ। "নম্বুচ্চাবচভূতেষাত্মা সম এব বর্ত্ততেহথ হরিঃ।" (প্রবোধসুধাকরঃ, ২১৫)।—'উচ্চাবচ সমস্ত ভূতে সমভাবে শ্রীহরিই আত্মরূপে বিরাজমান।' আপন ইষ্টকে আত্মস্বরূপে সর্ব্বভূতে সন্দর্শন করাই হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন—

"প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ (৩।১।৪)।

—'যিনি সর্ব্বভূতস্থ সকল পদার্থে উপলক্ষিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, সেই প্রাণের প্রাণ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া অর্থাৎ ধ্যানযোগে অপরোক্ষজ্ঞানে অভিন্নরূপে নিশ্চয় করিয়া সম্যক্‌জ্ঞানী সাধক অতিবাদী (আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছু আছে ইহা বলিতে সমর্থ) হন না। ঈদৃশ জ্ঞানী আত্মানুসন্ধানরূপ ক্রীড়ায় রত, আত্মধ্যানে নিবিষ্ট, বিবেক বৈরাগ্য-ধ্যানাদি সাধননিষ্ঠ এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে প্রধান।'

মানবাত্মার ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত করিবার উপায়-নির্দ্দেশই সকল ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন লক্ষ্য। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সকল ধর্ম্মমত, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মানুষকে এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে সাহায্য করিতেছে। এই জন্য হিন্দুমাত্রই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এবং সাধন-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন। হিন্দুশাস্ত্রসমূহ অধিকার ভেদে বিভিন্ন পন্থাবলম্বনে মানবাত্মার অব্যক্ত ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মমতসমূহের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যতই ভেদবৈষম্য দৃষ্ট হউক না কেন, আত্মার ব্রহ্মভাব ব্যক্তকরণরূপ লক্ষ্যৈক সাধনার দিক দিয়া ইহারা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যে সমন্বিত।

আচার্য্য শঙ্কর তদীয় "অজ্ঞান-বোধিনী" গ্রন্থে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণমূলে আত্মার নিম্নোক্ত দ্বাদশটী গুণের উল্লেখ করিয়াছেন,—"সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্ত স্বরূপ, স্বপ্রকাশ এবং ব্রহ্মস্বরূপ।"

পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়াদি তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মার গুণ নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ মানুষ অনাত্মাকে আত্মা মনে করিয়া থাকেন। এই হেতু আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে হইলে আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যজ্ঞান স্পষ্টভাবে থাকা আবশ্যক। আত্মার সংজ্ঞাসম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন,—"স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়বিলক্ষণঃ পঞ্চ-কোশব্যতিরিক্তঃ অবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দ-স্বরূপঃ।" (আত্মানাত্মবিবেকঃ, ৬২)।—'যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর হইতে বিলক্ষণ, পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং সৎ চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ, তিনিই আত্মা।" অনাত্মার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—"অনৃতজড়-দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরত্রয়ম্। (ঐ, ৬৩)।—'কালত্রয়ে বিদ্যমানহীন, জড় ও দুঃখাত্মক যে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরত্রয়, তাহাই অনাত্মা।'

স্থূলশরীর পঞ্চীকৃত জড়ভূতের কার্য্য, কর্ম্মনিমিত্ত ইহার উৎপত্তি, এবং ইহা জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ এই ষড়বিকারসম্পন্ন, সুতরাং অনিত্য। স্থূলশরীরের কারণরূপী সূক্ষ্ম-

শরীর অপঞ্চীকৃত মহাভূতের কার্য্য, এবং ইহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট; কাজেই স্থূলশরীরেব ন্যায়ই ধ্বংসশীল। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের হেতুভূত অনাদি অনির্ব্বচনীয় চিদাভাসযুক্ত অজ্ঞান-রূপ অবিদ্যা কারণশরীর নামে অভিহিত। যাহা বিশীর্ণ হয় তাহাই শরীর। "ব্রহ্মাত্মৈক জ্ঞানেন শীর্য্যতে"—ব্রহ্মের সহিত অভিন্নাত্মকতা জ্ঞানে এই শরীরত্রয় বিশীর্ণ বা বিনষ্ট হয়। সুতরাং সৎ বা নিত্য আত্মা এই শরীরত্রয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

স্থূলবুদ্ধি মানব স্থূল শরীরকে এবং অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান বিচারশীল ব্যক্তিগণ প্রাণ মন প্রভৃতির কোন একটীকে আত্মা মনে করিয়া থাকেন। যথার্থ জ্ঞানী পঞ্চকোশের বহির্দ্দেশে আত্মাকে উপলব্ধি করেন। এজন্য ব্রহ্মবিজ্ঞান-সাধনার্থ পঞ্চকোশের জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। শরীরত্রয় যে আত্মা নহে তাহা বিশদভাবে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্র "আত্মার পঞ্চকোশ বিলক্ষণত্ব" প্রমাণ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞ বরুণ তৎপুত্র ভৃগুকে পঞ্চকোশ-বিবেক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদ প্রণীত মাণ্ডুক্যো-পনিষদের সুবিখ্যাত কারিকায় শরীরত্রয় ও অবস্থাত্রয়-বিবেক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকর ভাষায় উপদেশ দান করিয়াছেন। আমরা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানার্থীর সহায়তার জন্য 'আত্মার পঞ্চকোশ ব্যতিরিক্ততা' সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশকে পঞ্চকোশ বলে। তুষ যেমন তণ্ডুলকে এবং জরায়ু যেমন গর্ভকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পঞ্চকোশ তেমন আত্মাকে আবৃত করিয়া আছে। কোশ অর্থ আবরণ। যেমন একটী আবরণের অভ্যন্তরে আর একটী আবরণ থাকে, তেমন এই কোশসমূহের মধ্যে পূর্ব্বকোশ পরবর্ত্তী কোশের অন্তরবর্ত্তী, অর্থাৎ অন্নময় কোশের অভ্যন্তরে প্রাণময় কোশ, প্রাণময় কোশের অভ্যন্তরে মনোময় কোশ, ইত্যাদি।

পিতার ভুক্ত অন্ন বীর্য্যরূপে পরিণত হইয়া তাহা হইতে পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে অন্ন হইতে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে এবং অন্নের দ্বারাই জীবিত রহিয়াছে। এইজন্য স্থূলশরীর অন্নের বিকার বলিয়া ইহাকে অন্নময়কোশ বলে। আত্মা নিত্য—জন্ম-মৃত্যু-রহিত। স্থূলশরীর বা অন্নময়কোশ অন্নদ্বারা গঠিত এবং অনিত্য, কারণ ইহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। সুতরাং অন্নময়কোশ বা স্থূল দেহকে আত্মা বলা যায় না। মৃত শরীরে চৈতন্য থাকে না, মৃত ব্যক্তি তাহার শরীরকে 'আমি' বলিয়া মনে করে না, সুতরাং জীবিত শরীরকে 'আমি' মনে করা ভ্রমমাত্র। জীবিত স্থূলদেহ আত্মা হইলে, মৃত স্থূলদেহও আত্মা হইত, কিন্তু মৃতদেহে কেহ কখনও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মানুষের 'আমি'-জ্ঞান শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সমভাবে বর্ত্তমান থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই জ্ঞানের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যেমন কেহ 'আমার গৃহ' বলিলে তিনি সেই গৃহপদার্থযুক্ত হন না, তেমন 'আমার শরীর' বলিলে 'আমি' শরীরযুক্ত হয় না, পরন্তু 'আমার শরীর' বাক্যদ্বারা 'আমি' এক বস্তু এবং 'শরীর' অপর বস্তুই বোঝায়। কাজেই আত্মস্বরূপ-বোধক 'আমি' শরীর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সূত্রে পুষ্প গ্রথিত হইয়া মাল্য হয় কিন্তু সূত্র পুষ্প বা মাল্য নহে, তেমন শরীরকে আশ্রয় করিয়া 'আমি' জ্ঞান উদ্ভূত হইলেও 'আমি' শরীর নহে। স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহের জ্ঞান থাকে না,

অজ্ঞান অবভাসিত চৈতন্য দ্রষ্টারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া দৃশ্য দর্শন করেন, মৃত শরীরেও চৈতন্য দেখা যায় না, সুতরাং চৈতন্য স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্থূলদেহ বা অন্নময়কোশ হইতে স্বতন্ত্র।

ভূতবাদিগণ ক্ষিতি জল তেজঃ বায়ু এই ভূত-চতুষ্টয়কে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা বলেন—ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়ই জগতের কারণ। ভূত সকল জড়পদার্থ। ইহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ; কাজেই ভূত সকলকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আগমবাদীপ্রমুখ সম্প্রদায় মহেশ্বরাদি মূর্তিমান দেবতাকে পরমাত্মা বলেন। শরীরমাত্রই পঞ্চ-ভূতের বিকারপ্রযুক্ত অনিত্য, সুতরাং দেহধারী কোন দেবতা বা গন্ধর্ব্ব অথবা কিন্নরকে আত্মা বলা যায় না। জৈনগণ আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহার সাবয়বত্বে বিশ্বাস করেন। ইহা ভ্রান্তি মাত্র। কারণ কোন সাবয়ব বস্তু নিরবয়ব আত্মা হইতে পারে না।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর মিলিত অবস্থাকে প্রাণময়কোশ বলে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু স্থূল শরীরের কার্য্যনির্ব্বাহ করে বটে কিন্তু ইহাদিগকে আত্মা বলা যায় না, কারণ ইহারা আকাশাদির রজঃ অংশের কার্য্যস্বরূপ, ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট এবং জড়পদার্থ। দেহনাশে ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। পরন্তু ক্রিয়াশক্তিযুক্ত কিছু আত্মা হইতে পারে না, কারণ তাহা নশ্বর। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ক্রিয়ার সাধন-মাত্র, যেমন দর্ব্বী (হাতা) রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে, তেমন কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ জড়পদার্থ হইয়াও শারীর ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া বায়ু ইন্দ্রিয় সকলকে পরিচালিত করে এবং এজন্য বায়ুকে প্রাণময় বলা হয় বটে কিন্তু ইহা আত্মা নহে, কারণ ইহার চৈতন্য নাই। সুষুপ্তিতে এবং স্বপ্নকালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণবায়ু বর্ত্তমান থাকিলেও চৈতন্য অভাবপ্রযুক্ত ইহা অন্তর বাহিরের কিছু জানিতে পারে না। কেবল সুষুপ্তি বা স্বপ্নকালে নহে, জাগ্রত অবস্থায়ও প্রাণ কিছু জানিতে পারে না, কারণ সকল অবস্থা-তেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণের বিরামহীনতা সত্বেও ইহার চৈতন্য নাই। এজন্য ইহা শরীরে থাকিয়াও শরীরকে জানিতে পারে না। যেমন জড়পদার্থ হইয়াও প্রচণ্ড বায়ু গৃহাদিরে পাতিত করে, তেমন প্রাণ জড় হইয়াও শরীরকে চেষ্টাযুক্ত করিয়া থাকে। এইরূপে প্রাণ বক্তৃত্ব রহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায়, গমন রহিত আত্মাকে গমনকারীর ন্যায় এবং ক্ষুৎপিপাসা রহিত আত্মাকে ক্ষুধা ও পিপাসাযুক্তের ন্যায় দেখাইয়া শরীরক্রিয়া সম্পাদন করে। বস্তুতঃ প্রাণের জ্ঞান বা চৈতন্য নাই। প্রাণ ক্ষুধা তৃষ্ণাদিরও অধীন, এজন্যও ইহার আত্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। উপনিষৎ বলেন—"যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে" (কেন উঃ, ১।৮), "যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগ্ভ্যুদ্যতে" (কেন উঃ, ১।৪)—'প্রাণবায়ু যাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, যাঁহার দ্বারা প্রাণবায়ু প্রেরিত হইয়া দেহ রক্ষা করে,' 'যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, যাহা দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়' তিনিই আত্মা। সুতরাং চার্ব্বাকপন্থিগণ যে আত্মাকে প্রাণময় বলিয়া নির্দেশ করেন তাহা ভ্রান্তিমাত্র।

প্রাণবাদী বৈশেষিকগণ হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রাণকে আত্মা বলিয়া প্রচার করেন। ইহা কল্পনামাত্র, কারণ হিরণ্যগর্ভ জগতের কারণ বলিয়া প্রমাণ নাই।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত হইয়া মনোময়-কোশ নামে অভিহিত হয়। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংকল্পবিকল্পাত্মক

অন্তঃকরণবৃত্তি মন নামে আখ্যাত। বাচস্পতি মিশ্রের মতে মন অপর ইন্দ্রিয়সমূহের মতই একটী ইন্দ্রিয়। গীতায় মন ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ এবং মন কাম ক্রোধাদি অবস্থায় ভ্রান্ত হইয়া দেহ, গেহ ইত্যাদিতে অহংতা মমতা করিয়া থাকে, এ জন্য ইহারা আত্মা নহে। মন চৈতন্যবৎ প্রতীত হয়, এ নিমিত্ত ইহাকে চেতন আত্মা বলিয়া ভ্রমে পতিত হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অন্নময় ও প্রাণময়কোশ হইতেও মনোময়কোশকে আত্মা বলিয়া অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণেরও ভ্রম হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন করণস্বরূপ, ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট এবং জড় পদার্থ, কাজেই ইহা চেতন আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। মনের উৎপত্তি ও বিনাশ সুষুপ্তি ভঙ্গে মানুষ স্পষ্ট অনুভব করে। মন যদি চেতন হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি-কালেও মনের চৈতন্য থাকিত। কেহ কেহ বলেন, সুষুপ্তিকালে আত্মার অস্তিত্ব থাকে না। যদি ইহা সত্য হইত তাহা হইলে সুষুপ্তি ভঙ্গের পর ইহার সুখময় স্মৃতিও সম্ভব হইত না। সুষুপ্তিকালে আত্মা না থাকিলে সুষুপ্তি ভঙ্গের পর ইহার স্মৃতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় কে? পক্ষান্তরে সংকল্প-বিকল্পবান মন যদি অন্যত্র থাকে তাহা হইলে 'আমার মন অন্যত্র রহিয়াছে' বলিয়া মানুষ অনুভব করে। এই উভয় বৃত্তিকে যিনি জানেন তিনি 'মন' হইতে পারেন না। অনেক সময় মানুষের 'জ্ঞান' দ্রষ্টা এবং 'মন' দৃশ্য হয়, মানুষ অবস্থা বিশেষে 'মন' হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করে। "আত্মনো মনো জাতম্ ইতি তত্রৈব বিলীয়তে"— "আত্মা হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আত্মাতেই মন বিলীন হয়', এই শ্রুতিবাক্য হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মন আত্মা নহে। মনোময়কোশ জড় মনের বিকার মাত্র, কাজেই ইহা আত্মা হইতে পারে না।

লৌকিকতত্ত্ববাদিগণ মনকে আত্মা বলিয়া প্রচার করেন। মনের পার্থক্য স্বীকার না করিলে ক্লেশের অনুভব হইতে পারে না। আত্মাকে ক্লেশযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলে ঘটপটাদির ন্যায় আত্মা অনাত্মা হইয়া পড়েন। যেমন প্রদীপ প্রকাশের কারণ কিন্তু সেই প্রকাশের ফলভোগী নহে, সেইরূপ মনও সুখ দুঃখাদির কারণ কিন্তু তাহার ফলভোগ করে না। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ ভোক্তাকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাও সমীচীন নহে। ভোক্তা কখনও আত্মা হইতে পারে না, কারণ বিক্রিয়াকেই ভোগ বলা হয়, সুতরাং ভোক্তা অনিত্য। যদি ভোগই অনিত্য হইল তাহা হইলে ভোক্তা কি করিয়া নিত্য আত্মা হইবে?

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময়কোশ নামে আখ্যাত। নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি বা অন্তঃকরণের পরিণাম অথবা তদাকার ধারণকে বুদ্ধি বলে। মনের ন্যায় বুদ্ধিও মিলিত আকাশাদি পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন। বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি অভিমানী হইয়া ইহলোক ও পরলোকগামী ব্যবহারিক জীব বলিয়া কথিত হয়। ইহা বিজ্ঞানের বিকারহেতু অকর্ত্তা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া কর্ত্তার ন্যায় দেখায়। বুদ্ধি দৃশ্য পদার্থ, সুতরাং অনাত্মা। বুদ্ধি দৃশ্য না হইলে ইহার স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধি স্বপ্রকাশ হইলে জন্মমৃত্যু বর্জ্জিত হইত, কিন্তু বুদ্ধির জন্মনাশ প্রসিদ্ধ। বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে কর্ত্রী বুদ্ধির অতিরিক্ত করণরূপ একটী বুদ্ধি স্বীকার করিতে হয়। কারণ কর্ত্তা হইতে অতিরিক্ত করণের অপেক্ষা আছে। নিশ্চয়বৃত্তিসম্পন্ন একটী সাধারণ করণ ব্যতীত জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহেরও প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে বুদ্ধি করণ হইলে প্রদীপের ন্যায় উহা যে

অনাত্মা তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ কেহই নিজকে নিজে জানে না। নিজ বিষয় যে শব্দ তাহাকেও শ্রোত্র চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত জানিতে সমর্থ হয় না। মন বুদ্ধি বা বুদ্ধি মনের কাজ করিতে অসমর্থ। এই হেতু উভয় প্রকারেই তাহা জড। শব্দ প্রদীপের ন্যায় জ্ঞানের সাধন মাত্র। যেমন প্রদীপ রূপাদি জ্ঞানের সাধন অর্থাৎ প্রদীপের দ্বারা যেমন রূপাদি গৃহীত হয়, সেইরূপ শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ গৃহীত হয়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও জ্ঞান-সাধন অর্থাৎ জড়। যাহা সুষুপ্তিকালে লীন থাকে কিন্তু দেহবোধ জন্মিলে প্রকাশ পায়, সেই চিতিচ্ছায়াপন্না বিজ্ঞানময় শব্দভাক্ বুদ্ধি আত্মা হইতে পারে না। সুতরাং এক শ্রেণীর বৌদ্ধগণ যে বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা সমীচীন নহে।

প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ বৃত্তিযুক্ত অজ্ঞান-প্রধান অন্তঃকরণ আনন্দময়কোশ বলিয়া কথিত হয়। ইষ্ট পুত্রাদি দর্শনজনিত সুখের নাম প্রিয়, প্রিয় বস্তুলাভে যে আনন্দ হয় তাহার নাম মোদ এবং এই আনন্দ প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্রমোদ বলে। আনন্দময়কোশ প্রিয়, মোদ ও প্রমোদরহিত আত্মাকে প্রিয় মোদ প্রমোদযুক্তের ন্যায়, অভোক্তাকে ভোক্তার ন্যায়, দুঃখরহিত আত্মাকে দুঃখযুক্তের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া আছে। 'যাঁহার প্রীতির জন্য শরীর, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রীতিভাজন হয়, সেই আত্মাই মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয়।' (বৃহঃ উঃ ১।৪।৮)। অন্য বিষয়সমূহ বিনাশী বলিয়া শোকাস্পদ, সুতরাং তাহারা কিরূপে প্রিয় হইবে? অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা প্রিয় আত্মার সম্যক্‌রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, অন্য বস্তুর সেবা করেন না। গীতা বলেন—"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে" (৫।২২)—'ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হেতু যে সকল সুখ হয়, তাহারা দুঃখের কারণ।' এই সুখ অস্থায়ী বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাতে রত হন না।

অজ্ঞান নিত্য নহে, কারণ জ্ঞান হইলে ইহা থাকে না। দেখা যায় যে, যে মানুষ যে বিষয়ে অজ্ঞান থাকে, সেই বিষয়ক জ্ঞানে তাহার সেই অজ্ঞান নাশ হয়। সমাধিকালে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলয় হয়। সমাধি আনন্দময়-কোশের ন্যায় অবিদ্যার অন্তর্গত নহে। অজ্ঞান অনিত্য। কাজেই প্রিয়, মোদ ও প্রমোদযুক্ত অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণ বা আনন্দময়কোশকে নিত্য আত্মা বলা যায় না।

তার্কিকগণ সুষুপ্তিতে বুদ্ধ্যাদির অজ্ঞানে লয়-দর্শন এবং "আমি অজ্ঞ" অনুভব হয় বলিয়া অজ্ঞানকেই আত্মা বলেন। ভাট্টগণ সুষুপ্তিতে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ থাকে বলিয়া এবং "আমাকে আমি জানি না" ইত্যাকার অনুভব প্রযুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন। নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধগণ সুষুপ্তিতে সকলের অভাব হয় বলিয়া অভাব-পদার্থ বা শূন্যকেই আত্মারূপে নির্দেশ করেন। এই মতবাদগুলির মধ্যে একটী দ্বারা অপরটী খণ্ডিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই মতবাদসমূহ "প্রত্যগাত্মা অস্থূল, অচক্ষুঃ, অপ্রাণ, অমনা, অকর্ত্তা, চৈতন্য, চিৎমাত্র ও সৎস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধী এবং "অহং ব্রহ্ম" (বৃহঃ উঃ, ১।৪।১০) এইরূপ বিদ্বান ব্যক্তির অনুভবের বাধক বলিয়া পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সকলই অনাত্মা।

"অতঃ তত্তদ্‌ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্য-স্বভাবং প্রত্যক্‌চৈতন্যম্ এব আত্মতত্ত্বম্ ইতি বেদান্তবিদনুভবঃ। (বেদান্তসারঃ, ১৩৫)।—'উল্লিখিত কারণে অনাত্মার ভাসক যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্যস্বভাব প্রত্যক্ চৈতন্য, তাহাই আত্মতত্ত্ব, ইহা বেদান্তবিদ্‌গণের অনুভব।'

বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অদ্বয়রূপ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ

জ্ঞানের অভাবেই মানুষ অন্নময়, প্রাণময় কোশাদিকে আত্মা বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া থাকে। যিনি আত্মা হইতে পঞ্চকোশের পার্থক্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। কারণ—

"অন্নপ্রাণমনোময়বিজ্ঞানানন্দপঞ্চকোশানাম।
একৈকান্তরভাজাং ভজতি বিবেকাৎ প্রকাশতামাত্মা"॥
(স্বাত্মনিরূপণম্, ৮)।

—'দেহান্তর্ব্বর্ত্তী অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী কোশের বিভেদ-জ্ঞানে আত্মা (ক্রমশঃ) প্রকাশ্যতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ এক একটী কোশ সম্বন্ধে পার্থক্যজ্ঞান যখন স্পষ্ট হইতে থাকে, তখন তাহাদের সহিত অভিন্ন-ভাবে ভাসমান আত্মাও ক্রমে স্বরূপতঃ পৃথক হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকেন।'

আত্মাকে লাভ করিবার উপায় স্বরূপে উপনিষৎ ঘোষণা করিয়াছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।
(মুণ্ডঃ উঃ ৩।২।৩)।

—"এই আত্মা বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নদ্বারা লাভ করা যায় না, বহুশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন দ্বারাও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না, কিন্তু উপাসনাশীল সাধক যাঁহাকে (যে আত্মাকে) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তদ্দ্বারাই (আত্মস্বরূপলাভের একান্ত আগ্রহ বা ব্যাকুলতাদ্বারাই) তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন। আত্মা সেই উপাসকের শুদ্ধা বুদ্ধিতে স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করেন।' সুতরাং—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥"
(মুণ্ডঃ উঃ ২।২।৫)।

—হে মানব। একমাত্র (অদ্বিতীয়) সেই অক্ষয় আত্মাকে অবগত হও এবং অন্যান্য বাক্য-সমূহ (সকাম কর্ম্মাদি) পরিত্যাগ কর, কেননা এই আত্মা অমৃতের (মোক্ষপ্রাপ্তির অর্থাৎ একাত্মভাবে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের) সেতু বা উপায়।' "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতাঃ উঃ ৩।৮)—'সেই আত্মাকে সম্যক্‌ভাবে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, অন্য আর কোন পথ নাই।'

ধূসর

শ্রীঅপর্ণা দেবী

বর্ণ-লহরী নিমেষের ফুল,
ফুটে নিমেষের লাগি',
আমি, 'মৃত্যুর' ধীর, অচপল-থির
স্তিমিত নয়নে জাগি।

বিশ্ব-লীলায়,—তপ্ত-জ্বালায়
আমি আবরণ দানি,
সকল গ্লানির চির-আবরক,
আমার গ্লানিমাখানি।

জনম আমার, হর-কালিকার
মিলিত বর্ণ-রাগে,
আমি চিরদিন বর্ণবিহীন,
অরূপে এ 'রূপ' জাগে।

বর্ণ-বিলাসে মতি নাহি মম
নাহি মম রূপ-দৈন্য,
আমি যে 'ধূসরে' চির-ধূসরিত,—
সেই গৌরবে ধন্য।

চপলতা কভু পশেনি জীবনে,
নাহি মম লীলা-লাস্য,
রুদ্র-চরণে—তাণ্ডব তালে
বিকশিত মম হাস্য।

কর্ম্মক্লান্ত দিবা নিভে' যবে
সাঁঝের বাতাস লাগি',
আমি, সন্ধ্যারাণীর শান্ত নয়নে,
শান্ত পবনে জাগি।

যবে, নিশি শেষে 'উষা' আসেনি লইয়া
প্রভাতের আহ্বান;
বিহগ কণ্ঠে মুখরিত হয়
মম বন্দনা গান।

আমি, বিরস-ধূসর, নিরস-উষর,
সরসতা নাহি অঙ্গে,
তবু, চির-বিরাজিত চির-মধু মোর
অন্তর মাঝে রঙ্গে।

আমি, চির-বৈরাগী, তপস্বী, ত্যাগী,
চির-সন্ন্যাসী বীর,
জগতের পদে নত নহে কভু
মম উন্নত শির।

বর্ণ-লহরী আসিছে যাইছে
নিয়ত জগৎ ক্ষেত্রে,
আমি, দৃঢ়ব্রত-ধীর, অচপল-থির,
মেলিয়া ধূসর নেত্রে।

কেহ, চাহেনা আমারে,—চাহিনা কাহারে,
কেহ নাহি সাথী সঙ্গে.
আপনার মাঝে আপনি রয়েছি,
চির-ধূসরিত রঙ্গে।

ভারতীয় সাধনার অভিব্যক্তি-ধারা

বৈদিক যুগ

শ্রীগদাধব সিংহ বায়, এম্-এ, বি-এল

এক

বিধাতাব সৃষ্টি-নিপুণতাব চবম বিকাশ এই মানবে। শুধু তারই মাঝে তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে পশুত্ব ও দেবত্ব চিব-বিবোধী এই দুই ভাবেব পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। এ দ্বৈধভাবই তাব সকল ধর্ম্মসাধনার প্রেরণাব মূল। সে চায় পশু-প্রকৃতিকে জয় কবে দেব-প্রকৃতি লাভ করতে। সৃষ্টিব আদি হতে এই দেবাসুব সংগ্রাম আবস্ত হয়েছে—আব মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন চলবে। বিবাম নাই—শেষ নাই।

ভাবতীয় সংস্কৃতির ভিতব দিয়ে কেমন ভাবে ঐ সাধন-সমরেব রূপ যুগের পব যুগ বিচিত্র রঙ্গে ফুটে উঠেছে তারই একখানা মোটামুটি নক্সা এঁকে দেখাবাব চেষ্টা কববো।

ভারতীয় সভ্যতাব প্রথম যুগকে বৈদিক যুগ, মধ্য যুগকে বৌদ্ধ যুগ এবং বর্ত্তমান যুগকে পৌবাণিক যুগ বলে আমবা ধরে নিতে পাবি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু বৈদিক যুগেব কথাই অবতারণা কববো।

বৈদিক যুগ,—আনুমানিক ৪৫০০ খৃঃ পূঃ—৩০০ খৃঃ পূঃ। এ সময়ে প্রধানতঃ বেদেব অনুশাসনই ছিল আমাদেব সমাজেব সকল কর্ম্মেব মানদণ্ড। বৈদিক যুগের তিনটী স্তব—আদি, মধ্য ও অন্ত।

বৈদিক যুগের আদিকাল—(৪৫০০খৃঃ পূঃ—২৫০০ খৃঃ পূঃ)

বেদের মন্ত্রাংশ বা সংহিতাভাগ জনসমাজে আত্ম-প্রকাশ করতে লাগে প্রায় দুই হাজার বৎসব। এটাই হল বৈদিক যুগেব আদিকাল। এই বেদমন্ত্রগুলি সত্যসত্যই আমাদেব অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডাব। মানবেব জ্ঞানালোকেব প্রথম প্রভাতে সত্যানুসন্ধিৎসু মন কতখানি আন্তবিকতা—কতখানি আকুলতা নিয়ে যে ছুটেছিল তাই দেখে বিস্ময়ে আপ্লুত হতে হয়।

বৈদিক ঋষি ছিলেন গৃহী হয়েও সাধক। পশু-প্রকৃতিকে জয় কবে দেব-প্রকৃতি লাভ করবার একমাত্র উপায় চিত্তশুদ্ধি। এ চিত্তশুদ্ধি সাধন করা যায় কি প্রকাবে? বৈদিক ঋষি মানব-মন বিশ্লেষণ কবে তাব উত্তব খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি উত্তবে বলেছিলেন, সে সাধন-পথ ত্রিধা—জ্ঞান, উপাসনা ও কর্ম্ম। জ্ঞান অর্থে জগতের আদি কাবণ সেই পবব্রহ্মেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। উপাসনা অর্থে সেই আদিকাবণেব উপাসনা। কর্ম্ম অর্থে সেই আদিকারণেব পূজায় নিজেব পশুত্বকে বলি দেওয়া রূপ যজ্ঞ-কর্ম্ম। জগতেব যিনি আদিকাবণ তিনি অসীম ও অনন্ত, অতএব তাঁব কোন বিশিষ্ট রূপ বা গুণ থাকতে পাবে না। কিন্তু এ বকম এক নির্গুণ পবব্রহ্মের উপাসনা সাধারণ উপাসকের পক্ষে দুর্বোধ্য ও দুঃসাধ্য। তিনি অন্তবে বাহিরে অধে-উর্দ্ধে সর্ব্বত্র আছেন সত্য কিন্তু তাঁকে উপাসনাব সুবিধাব জন্য উপাসকের সম্মুখে উপাস্য-রূপে ধবতে হলে তাঁর এমন একটা প্রতীকের প্রয়োজন যাকে ধবা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। তাই বৈদিক ঋষি পরব্রহ্মের প্রতীকের উপাসনার ব্যবস্থা করেছিলেন

সে প্রতীক কি? আন্তর ও বাহ্য জগতের এমন কতকগুলি শক্তিশালী পদার্থ যেগুলি সান্ত ও সসীম হয়েও স্বভাবতঃই মনে অনন্তের ভাব জাগিয়ে দিয়ে সেই অনাদি অনন্ত জগৎকারণের অনুসন্ধানে মনকে প্রেষিত করে। দৃষ্টান্ত—বাহ্য জগতের ব্রহ্মপ্রতীক—যেমন অগ্নি, মরুৎ, ব্যোম (আকাশ), বরুণ (সমুদ্র) ইত্যাদি ইত্যাদি। আর অন্তর্জগতের ব্রহ্মপ্রতীক যেমন ইন্দ্র, রুদ্র, পূষা, বিষ্ণু ইত্যাদি। এই প্রতীকগণের প্রত্যেকেই এক একজন দেবতা। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের উনত্রিশ সূক্তে এরূপ প্রধানতঃ এগার জন বিশ্বদেবের নাম পাওয়া যায়।

প্রতীকগণের দেবতানামের সার্থকতা আছে। "যো দিব্যতি ক্রীড়তি স দেব", অর্থাৎ যিনি দীপ্তিমান ও ক্রিয়াশীল তিনিই দেবতা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এক একটী প্রতীক এক একটী শক্তিশালী পদার্থ। যে শক্তিমান সেই জগতে আত্ম-প্রকাশে সমর্থ, অতএব সে দীপ্তিমান; এবং যেহেতু কার্য্য-ব্যতিরেকে আত্ম-প্রকাশ অসম্ভব সেই হেতু সে ক্রিয়াশীলও। কাজে কাজেই প্রতীকগণ দেব-পদবাচ্য।

ঐ সকল বৈদিক দেবতার পূজাপদ্ধতিও ছিল সুন্দর। বেদ-বিজ্ঞানে দেবতার নাম "যজত" (যজ্ ধাতুর অর্থ পূজা করা)—অর্থাৎ পূজার পাত্র, উপাসকগণের নাম "যজমান" অর্থাৎ পূজার্থী; আর তাঁদের ধর্ম্মকর্ম্মের নাম "যজ্ঞ"। বৈদিক যজতগণের হস্তপদবিশিষ্ট কোন আকার ছিল না, অতএব তাঁদের পূজার জন্য অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য দেব-মন্দির নিষ্প্রয়োজন। তাই মন্দিরের পরিবর্ত্তে বড় বড় বেদী রচনা করা হতো। যজতগণ বাহ্যতঃ জড়জগতের অংশবিশেষ হলেও বস্তুতঃ চৈতন্যময়। চৈতন্যময়ের আসল রূপ চর্ম্ম-চক্ষুর গোচরীভূত নয়। তাই বৈদিক ঋষি ধ্যান-দৃষ্টিতে সেই রূপের দর্শন পান এবং পবিত্র বাক্যের দ্বারা তাঁর এবং স্বীয় অনুভূতির বর্ণনা করেন। যজতের পূজার জন্য হোমের ব্যবস্থা ছিল। সেই হোমে ঐ সকল ঋষিবাক্য উচ্চারণ করে অশরীরী যজতকে আহ্বান করা হতো এবং যজমান স্থিরচিত্তে পবিত্রভাবে ঐ সকল পবিত্র বাক্যের সাহায্যে যজতকে মনন বা হৃদয়ঙ্গম করতেন। সেই জন্য ঐ সকল বাক্যের নাম 'মন্ত্র'। দেখা যায়, বৈদিক যুগের আদিতে বৈদিকগণ অনেকটা অনুভববাদী ছিলেন।

এর পর বৈদিকসমাজে এমন একটা সময় আসে, যখন সাকার নিরাকার মতবাদের চিরদ্বন্দ্বের সূত্রপাত দেখা দেয়। তার আভাস অথর্ব্ববেদের সংহিতাভাগে বেশ পাওয়া যায়।

এগার জন বিশ্বদেবতা ছাড়া আরও দেবতার নাম ঋগ্বেদে দেখা যায়। এ সব ক্রমশঃ হয়েছিল। এত দেবতার সৃষ্টিতে বৈদিক সমাজে একটা সাধন-বিভ্রাট ঘটে। সাধারণ গৃহী উপাসকগণ এ সকল দেব-দেবীগণের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলে ক্রমশঃ ধরে নিয়েছিলেন। এঁরা যে এক অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মের প্রতীকমাত্র, তাহা ভুলে গিয়ে উপাসকগণের মন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র অশরীরী যজতগণের দিকে ছুটেছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ধর্ম্মরাজ্যে অরাজকতা। তাই বৈদিক ঋষি এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে একবার ঘোষণা করেছিলেন—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুৎমান্।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহু॥'

—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৬।

অর্থাৎ—"একই সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মকে জ্ঞানীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুৎমান্, যম, মাতরিশ্বাদি বহু নামে অভিহিত করেন।" ঋষি শুধু এই ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি "বিশ্বদেবাঃ" বলে সকল দেবের মিলিত হোমেরও ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থার পর

সাম্প্রদায়িকতার পথ আর প্রশস্ত থাকে না। (৮।৩০।১-২ ঋগ্বেদ দ্রষ্টব্য)।

বৈদিকসমাজে কিছুকাল সাম্প্রদায়িকতা আত্ম-প্রকাশ করতে সমর্থ হয় নাই সত্য, কিন্তু মনে হয় অথর্ব্ববেদের সময় সে ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। এর প্রতিকারের জন্য একদল ঋষি শেষে প্রচার করলেন, 'ঐ সব বহু দেব-দেবীর কল্পনা মিথ্যা, অতএব ঐ সকলের পরিবর্ত্তে হৃদয়ে অনুভবের দ্বারা সভক্তি সেই এক অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মের উপাসনা কর—চিত্তশুদ্ধি হবে।' এই মতের প্রবর্ত্তক হলেন অথর্ব্ববেদের ভার্গব ঋষি জরথুস্ত্র। কিন্তু এত বড় উদার মত সকলে গ্রহণ করতে পারলেন না। দীর্ঘকাল ধরে বৈদিকসমাজে প্রতীকোপাসনা চলে এসেছে, তা সহসা বন্ধ করা সহজ কি? তাই প্রতিপক্ষ একদল ঋষি উত্তরে বললেন,—'সেই এক নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা ত দূরের কথা, তাঁর প্রতীকরূপী নিরাকার হস্তপদবিহীন যজতগণের উপাসনাও সকল সাধকের পক্ষে সুসাধ্য নয়; উপাস্যকে যদি আমাদেরই মত চক্ষুকর্ণ হস্তপদবিশিষ্ট সাকার মূর্ত্তিতে কল্পনা না করি, তাহলে শুধু অনুভবের দ্বারা হৃদয়ে আসল ভক্তির উদ্রেক অসম্ভব এবং ভক্তিহীন পূজা ভিত্তিহীন; অতএব সাধক যদি ভক্তির উৎসে সাধনাকে সরস করতে চাও, তবে হস্তপদবিশিষ্ট সাকার দেব দেবীর উপাসনা কর।' অথর্ব্ববেদের আঙ্গিরস ঋষি ও ত্রেতাযুগাবতার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই হলেন এই মতবাদের প্রবর্ত্তক। তিনি নিজে দেবী আদ্যাশক্তির সাকার মূর্ত্তির পূজা করেছিলেন।

বিশ্বাস হয়, বৈদিক যুগের আদিকালের অর্থাৎ বেদ-সংহিতা-প্রকাশ কালের শেষ ভাগে তদানীন্তন বৈদিক সমাজে ঐ সাকার—নিরাকার মত-দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই বেদবাদী ঋষিগণ কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত যজ্ঞীয় ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, এটা কিছুকাল চাপা পড়ে যায়।

বৈদিক যুগের মধ্যকাল
(২৫০০ খৃঃ পূঃ—১৬০০ খৃঃ পূঃ)

ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন কালে তা যতখানি উদার থাকে, পরে ততখানি থাকে না। ক্রমশঃই কতকগুলি বাঁধাধরা আনুষ্ঠানিক নিয়মের বেড়ার ভিতরে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। বৈদিক যুগেও তাই ঘটেছিল। আনুমানিক ২৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পর বৈদিকগণ জ্ঞান উপাসনা কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম-সাধনের উচ্চ বেদী থেকে নেমে এসে যজ্ঞ-বেদী ও যজ্ঞীয় কর্ম্মকেই চিত্তশুদ্ধি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং যাগ-যজ্ঞ সম্বন্ধীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এইটা বৈদিক যুগের মধ্যকাল।

এই সময়ে অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব বৈদিকগণ যজ্ঞবেদীর পরিমাণ কত হাত হওয়া কর্ত্তব্য, কোন যজ্ঞে কি কি যজ্ঞীয় পদার্থের ও কতজন হোতার প্রয়োজন, এই সকল বিষয়ে গভীর গবেষণাপূর্ণ যুক্তিতর্ক আরম্ভ করেন। এই সময়েই তাঁরা যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যে বিরাট বিধি-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করেন, তাহাই প্রধানতঃ বেদের "ব্রাহ্মণাংশ"। প্রায় নয়শত বৎসর বৈদিক সমাজে এই ভাব-স্রোত চলে। তার ফলে যজ্ঞানুষ্ঠান-বিধান এত জটিল হয়ে দাঁড়াল এবং ভিন্ন ভিন্ন যাজ্ঞিকদের হাতে এর এমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ে পড়ল যে, সরল অর্থবোধের জন্য ও পরস্পর বিরোধব্যঞ্জক বিধি-নিষেধের সামঞ্জস্যের জন্য মহর্ষি জৈমিনিকে পরে এক বৃহৎ দর্শনশাস্ত্র লিখতে হয়েছিল—নাম "পূর্ব্বমীমাংসা"।

বৈদিক যাগ-যজ্ঞের সামান্য পরিচয় আচার্য্য-প্রবর স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "যজ্ঞ কথা"তে পাওয়া যায়। এখানে আমরা খুব সংক্ষেপে কিছু বলি।

প্রথমতঃ অগ্নিহোত্র। আজকালের কুলদেবতার মন্দিরের পরিবর্ত্তে সেকালে প্রতি বৈদিক গৃহস্থের বাটীতে এক একটী পৃথক অগ্নিশালা থাকতো। সেই অগ্নিশালায় প্রতি গৃহস্থ প্রাতঃকালে সূর্য্য-দেবতার উদ্দেশ্যে এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণের পর কিছু টাটকা দুধ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে হোম করতেন। সূর্য্য ও অগ্নি দুই জ্যোতিঃস্বরূপ ও শক্তিশালী দেবতা। একজন থাকেন দ্যুলোকে আর একজন ভূলোকে। এই দুই দেবতাকে তৃপ্ত রাখতে পারলে দ্যুলোকে ও ভূলোকে সকলকেই তৃপ্ত রাখা যায়। কাজেই তাঁদের নিত্য পূজার বিধি ছিল এই অগ্নিহোত্র যাগ। প্রতিদিন সকল গৃহস্থকে ইহা করতে হতো। সকলের পক্ষে অনায়াস সাধ্য করবার জন্য এটীকে খুব সহজ ও আড়ম্বরশূন্য করা হয়েছিল। এমন কি ঋত্বিকেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। গৃহস্থগণ নিজেরাই পূতচিত্তে এ যাগ সম্পন্ন করতেন।

দ্বিতীয়তঃ ইষ্টিযাগ। এ দুই রকমের—দর্শ ও পৌর্ণমাস। যজ্ঞায়তন ও বেদী নির্ম্মাণ করে অরণি কাষ্ঠের দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিতে প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যজমানকে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক দধি আহুতি দিতে হতো। এতে ঋত্বিকের প্রয়োজন ছিল। এ যাগ যাবজ্জীবন করাই বিধি কমপক্ষে ত্রিশ বৎসর। অমাবস্যায় ইষ্টিযাগের নাম দর্শ যাগ, আর পূর্ণিমায় ইষ্টিযাগের নাম পৌর্ণমাস।

তৃতীয়তঃ পশুযাগ। এ নানাবিধ। তার মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল একটী - নিরূঢ় পশুবন্ধ যাগ। ইহা প্রতি বৎসর বর্ষাকালে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় বিধেয়। এতে পশুবলি দিতে হতো।

চতুর্থতঃ সোমযাগ। এইটীই ছিল সেকালের মহোৎসব। এর অনুষ্ঠান—আয়োজন ছিল বিরাট। বহু ঋত্বিককে সাদরে নিমন্ত্রণ করে দান-দক্ষিণা দিতে হতো এবং সকল অতিথি অভ্যাগত ও ভিক্ষুকগণকে অকাতরে ভক্ষ্য-ভোজ্য দান করতে হতো। অতএব এ যাগ ধনী ছাড়া সকল গৃহস্থের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। এ যাগ ছোট বড় নানা-রকমের। ছোট ছোট গুলি অবশ্য একদিনেই হতো, কিন্তু জ্যোতিষ্টোমাদি বড় বড় সোমযাগের আয়োজনেই সারা বৎসর কেটে যেতো। এ সকল বড় বড় যজ্ঞে চার শ্রেণীর ঋত্বিকের প্রয়োজন হতো—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা। হোতা ঋগ্বেদ থেকে মন্ত্রপাঠ করতেন, উদ্গাতা সামবেদের মন্ত্র স্তব ও লয় সংযোগে গান করতেন। অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদের বিধানমত যাবতীয় কার্য্য নিজে করতেন, আর ব্রহ্মা প্রধান পুরোহিতরূপে সকল কার্য্য তত্ত্বাবধান করতেন। ক্ষত্রিয় রাজগণের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ, রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতি সোমযাগের অন্তর্গত। সোমযাগে পশুবলি দিতে হতো।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন বিবেচনা করি। বৈদিক যুগের আদিকালে হিংসা-রহিত যজ্ঞেরই ব্যবস্থা ছিল। কোনও যজ্ঞে পশুবলি দিতে হতো না। পরবর্ত্তীকালে দেখা যায়, সোম-যাগে ও পশু যাগে পশুবলি দিবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কেমন ভাবে এটী হয়েছিল। তার আভাস স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের 'যজ্ঞ কথায়' পাওয়া যায়। দেবতার পূজায় যজমানের মমত্ব-বোধ ত্যাগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিবিধানের নাম যজ্ঞ (Sacrifice)। নিজের প্রাণ নিজের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। অতএব দেবতার চরণে প্রিয় দ্রব্যের উৎসর্গের মমত্ববোধ ত্যাগের দ্বারা যদি চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে হয়, তবে যজমানের নিজের প্রাণ বলি দেওয়াই প্রশস্ত, কিন্তু তা ত আর সম্ভব নয়, সেই হেতু তার নিজের প্রতিনিধি-স্বরূপ অন্য জীবের প্রাণ বলি দেওয়া ছাড়া উপায় কি? তাই যজমানের প্রতিনিধিস্বরূপ পশুবলির প্রয়োজন হলো। এই একের প্রতিনিধিস্বরূপ অন্যকে সম্প্রদান ইহার নাম "নিষ্ক্রয়"। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই নিষ্ক্রয় শব্দটার নাকি স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং

স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যজ্ঞীয় পশু যজমানেরই প্রতিনিধি। বৈদিক ঋষি পরে এ নিষ্ক্রয়বাদের আরও একটু প্রসার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, মানুষের পরিবর্ত্তে যেমন ঘোড়া, গরু, ভেড়া ও ছাগল বলি দেওয়া যায় তেমন যে কোনও পশুর পরিবর্ত্তে নিষ্ক্রয়রূপে ব্রীহিধান ও যব দেবতাকে দেওয়া যেতে পারে। এই ব্রীহিধান ও যব, থেকে প্রস্তুত এক প্রকার রুটীর নাম ছিল "পুরোডাশ"। উক্ত ঘোষণার পর থেকে অধিকাংশ বৈদিক যজ্ঞে পশুমাংসের পরিবর্ত্তে ঐ পুরোডাশের আহুতি প্রচলিত হয়েছিল। ("যজ্ঞ-কথা" দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বেই আমরা বলেছি যে, বৈদিক সমাজ এই সময় বাহ্য যজ্ঞ-কর্ম্ম নিয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের এই ব্যস্ততার সূচনা লক্ষ্য করে মহর্ষি বিশ্বামিত্র নূতন গায়ত্রী-মন্ত্র প্রকাশ করেন। তার অর্থ—সাধক, মনকে অন্তর্মুখী কর, হৃদয়ের অভ্যন্তরে সূর্য্যস্বরূপ প্রকাশমান পরমাত্মার উপলব্ধি করে তাঁর ধ্যান কর এবং তাঁর কাছে এই প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন তোমার অন্তরে শুদ্ধবুদ্ধির প্রেরণা দান করেন। মানুষের অন্তরে শুদ্ধবুদ্ধি জাগলে চিত্তশুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এবং চিত্তশুদ্ধির দ্বারা পশু-প্রকৃতির জয়লাভ করতলগত হয়। কিন্তু গায়ত্রী-মন্ত্রের মধ্যে 'সবিতৃ' শব্দকে অনেকে জড়সূর্য্য এই অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন। তার ফলে বৈদিক যুগের মধ্যকালে দ্বাদশ সূর্য্যের উপাসনা প্রচলিত হয়। উত্তরকালে এই সূর্য্যোপাসকের দল ভারতবর্ষের অনেকখানি স্থান অধিকার করেছিলেন।

এই যজ্ঞীয় যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত সাকার মতবাদ সোজাভাবে মাথা তুলতে পারে নি। তার প্রধান কারণ উপাসনা-পদ্ধতির পার্থক্য। সাকার দেব-দেবীর পূজার জন্য প্রয়োজন দেব-মন্দিরের—যজ্ঞবেদীর নয়। এজন্য সেকালে যজ্ঞান্ধ বৈদিক এরূপ একটা নূতন উপাসনা-পদ্ধতিকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেন নি।

বৈদিকযুগের অন্তকাল
(১৬০০ খৃঃ পূঃ—৩০০ খৃঃ পূঃ)

আঘাতের প্রতিঘাত আছে—ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, তা কি জড়রাজ্যে আর কি চেতনরাজ্যে। আর এ নিয়ম আছে বলেই জড় ও চেতন উভয়েই নিত্য-নূতন গতিতে ক্রমবিকাশের পথে চলতে সক্ষম। তা না হলে অনেক পূর্ব্বে রুদ্ধশ্বাস হয়ে উভয়েই প্রাণ হারাতো।

আনুমানিক ২৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ থেকে ১৬০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত যে যজ্ঞীয় কর্ম্মকাণ্ডের একটানা স্রোত বৈদিক সমাজের বুকের উপর দিয়ে উধাও হয়ে চলেছিল, ১৬০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের পর তার একটা উজান টান দেখা দেয়। একদল অরণ্যবাসী বানপ্রস্থী বৈদিক নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণার দ্বারা এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, জগতের সেই আদিকারণ পরব্রহ্মের জ্ঞানার্জ্জনই হল চিত্তশুদ্ধি সাধনের প্রধান উপকরণ। সূর্য্যোদয়ে জড়জগতের অন্ধকারের মত জ্ঞানোদয়ে অন্তর্জগতের সকল অন্ধকার দূরে সরে যায়। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সাবিত্রী মন্ত্রে যে সত্য প্রকাশ করেছিলেন, তাই যেন নূতনরূপে এই ঋষিগণের চিত্তাকাশে দেখা দিয়েছিল। অরণ্যে থাকা হেতু তাঁদের নাম ছিল "অরণ"। তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ "আরণ্যক" বলে খ্যাত। অপর নাম "উপনিষৎ"।

প্রায় হাজার বৎসর ধরে যে যজ্ঞ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান খরতরবেগে চলে এসেছে, তার সম্পূর্ণ গতিরোধ করা সম্ভব নয়—যুক্তিযুক্তও নয়। তাই উপনিষদের ঋষি একেবারে তা বন্ধ করে দিবার প্রয়াস পান নাই। তিনি বলেছিলেন, 'সাধক, জ্ঞান-কর্ম্ম উপাসনা এই ত্রয়ী ধর্ম্ম-সাধনই বেদের মূল কথা; কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়ে তুমি শুধু যজ্ঞীয় কর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম-সাধন মনে করে অনর্থের সৃষ্টি করেছ, আবার পূর্ব্বের আসল পথে ফিরে চলে, ব্রহ্মজ্ঞানের

ও ব্রহ্মোপাসনার সহায়করূপে যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, স্বতন্ত্র ভাবে নয়, তবেই সিদ্ধিলাভ হবে।' এই প্রকারে উপনিষদের ঋষি পুত্র বিত্ত ও স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য সকাম যজ্ঞের পরিবর্ত্তে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য নিষ্কাম যজ্ঞের নির্দ্দেশ করেছিলেন। মনকে অন্তর্মুখী করে অন্তর্নিহিত পরমাত্মার উপলব্ধির উদ্দেশে এক প্রকার সাধন-কৌশলও তিনি উদ্ভাবন করেন, তার নাম অধ্যাত্ম-যোগ বা দহর বিদ্যা।

ত্রেতাযুগাবতার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সাকার মতবাদ যে এতদিন বৈদিক সমাজে মাথা তুলতে পারে নি একথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। আরণ্যকগণের নব সিদ্ধান্ত প্রচারের ফলে যেমন যজ্ঞীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের হুড়াহুড়ি কিছু মাত্রায় কমে গেল, অমনি সেই সুযোগে সাকার মতবাদ একটু সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সমাজের সকল লোক কেবল মাত্র অধ্যাত্ম-বিদ্যার বা নিষ্কাম যজ্ঞের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সাধন করতে সমর্থ নয়। চক্ষুর সম্মুখে মানুষেরই মত হস্তপদাদিবিশিষ্ট কোন উপাস্যমূর্ত্তি না রেখে অনেকেই উপাসনা করতে পারেন না। অনেকে এই সময় সূর্য্য, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণের সাকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে মূর্ত্তি-পূজা আরম্ভ করেন। যজ্ঞবেদীর পরিবর্ত্তে তাঁরা দেবমন্দির স্থাপন করলেন। এই দেখে গোঁড়া বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থাপকগণ বিপদ গণলেন ; ভাবলেন, এ আবার কি উৎপাত, সনাতন বৈদিক ক্রিয়াবিধি বুঝি রসাতলে যায়! তাই তাঁরা এ সকলের জোর নিন্দাবাদ করতে লাগলেন এবং সনাতন বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষার মানসে শাস্ত্র রচনা করতে লাগলেন —নাম স্মৃতি। এই সময়ের মধ্যে বৈদিক সমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্মৃতিকারগণ চতুর্ব্বর্ণের সকলকে সমান অধিকার দিলেন না। স্ত্রীজাতিকেও কতকগুলি অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপরের বেদাধিকার বা বৈদিক দেবতাগণের পূজারও অধিকার নাই। উপনিষদ্ বা বেদান্তের সেই মহান্ উদার মত তাঁদের হাতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। তাই প্রয়োজন হলো এমন একজন যুগাবতারের যাঁর শক্তি প্রভাবে সেই উদার মত ঐ সকল সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে।

সেই যুগাবতারই হলেন দেবকীতনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই হলেন বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার। তিনি বেদবেদান্তের মূলীভূত ত্রয়ী ধর্ম্মসাধনের নূতন রূপ দিলেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে বাণী প্রচার করলেন—'সাধক, বৈদিক যাগ-যজ্ঞে ডুবে থেক না, তাতে তোমার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বহির্মুখী হয়ে আরও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ অপেক্ষা ভাবনাত্মক যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, তাই সকল যজ্ঞের সেরা জ্ঞানযজ্ঞ, এই যজ্ঞসাধনে চিত্তস্থির হয়ে সেই জগতের আদিকারণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান লাভ কর ও তাঁর চরণে শুদ্ধা ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করে তাঁরই উদ্দেশ্যে শুদ্ধ নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী হও, তা হলেই সাধন-সমরে জয়ী হয়ে দেব প্রকৃতি লাভ করতে পারবে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বৈদিক সমাজে অবতারবাদ প্রচার করেন। জগতের যিনি ঈশ্বর তিনি শুধু সাধকের উপলব্ধির বিষয় হয়ে সাধারণের অলক্ষ্য-স্থানেই বসে থাকেন না। তিনি যুগে যুগে ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের জন্য নরদেহে এই ভূলোকে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে একজন অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। সংসারতাপদগ্ধ সাধারণ মানুষের কাছে এ একটা খুব বড় আশ্বাসের কথা—প্রাণ-জুড়ানো কথা। সাকার মূর্ত্তিবাদের পরের ধাপ এই অবতার বাদ। এর পর থেকে বৈদিক সমাজে দেব-দেবীর পরিবর্ত্তে রাম, নৃসিংহ, বাসুদেব প্রভৃতি অবতারগণের ভজনও কোথাও কোথাও চলতে

সুরু হয়। এতদিন ধর্ম্মসাধনার অনুষ্ঠানের ভিতর ভক্তির বীজ প্রচ্ছন্ন থাকলেও যজ্ঞীয় হোমের প্রচণ্ড তাপে তা শুকিয়ে যাবার মত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই নব ধর্ম্ম প্রচারের ফলে সে বীজ সরস ও অঙ্কুরিত হয়ে উঠে, পরে পল্লবিত হয় পৌরাণিক মতবাদে এবং ফলপুষ্পে শোভা পায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয়ে। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতিকারগণের সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে স্ত্রী পুরুষ জাতি নির্ব্বিশেষে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের আচণ্ডাল সকলের বেদাধিকার ঘোষণা করেছিলেন এবং ভগবানের আরাধনায় আত্মোন্নতি সাধনার দ্বার সকলের কাছে সমান ভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই নব-প্রচারিত ধর্ম্মের নাম ভাগবতধর্ম্ম।

এই যুগাবতার আবির্ভাব হন আনুমানিক ১৪০০খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে। সেটা ছিল দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর একটা মহাপ্রলয়ের মত এসে ভারতের বুক থেকে পুরাতন যুগের যা কিছু সব প্রায় ধুয়ে মুছে নিয়ে চলে যায়। তার অবসানে ভারতের রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজকে নূতন করে গড়ে তুলবার প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক মহামুনি বেদব্যাস সেই সংস্কারকগণের অগ্রদূত। তিনি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বেদমন্ত্রগুলিকে ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চার ভাগে বিভক্ত করেন এবং যুগাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও নবধর্ম্ম লোক-সমাজে প্রচারের জন্য বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত রচনা করেন। আরণ্যকগণের সিদ্ধান্তসমূহ সূত্রাকারে মালার মত গেঁথে ব্যাস-সূত্র বা উত্তর-মীমাংসা প্রণয়ন করেন। ইহাই বেদান্তদর্শন নামে খ্যাত। সরস উপাখ্যান ও গল্পের ভিতর দিয়ে যত সহজে সাধারণ লোকের পক্ষে ধর্ম্মোপদেশ-গুলি জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তাই বেদব্যাস সহজ ও সরল সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মোপদেশমূলক পৌরাণিক কাহিনীর প্রথম রেখাপাত করেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য ও পুত্র শুকদেব ভাগবতধর্ম্মের আধার স্বরূপ ভাগবত পুরাণ রচনা করেন। তবে পৌরাণিক সাহিত্যের বিস্তার লাভ করে এর অনেক শতাব্দী পরে।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের ফলে ভারতবর্ষে রাজন্য-শক্তি প্রায় লোপ পায় এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কিছু কাল সমাজে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কাজেই তার প্রচারিত নবধর্ম্ম মহাসমরের পর তদানীন্তন বৈদিক সমাজে প্রতিষ্ঠা না লাভ করবারই কথা। তার উপর বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষ দৃষ্টিই পড়েছিল। তাঁরা এই সময় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক নানা শাস্ত্র রচনা করে সমাজে ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্য বিস্তার করতে লাগলেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা গুণকর্ম্মানুযায়ী না হয়ে জন্মগত অধিকারে পরিণত হল। বৈদিক যাগ যজ্ঞ আসলরূপ হারিয়ে বিকৃতরূপে দেখা দিল। বৈদিক যুগের অন্তকালে অর্থাৎ ভারতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রায় হাজার বৎসর সমাজে ধর্ম্মের নামে এই ভাবে অধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাই অবশেষে ঐ রুদ্ধশ্বাস বেদ-পন্থী সমাজকে কঠিন শাস্ত্রপাশ ও অধর্ম্মের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল আর এক উদার যুগাবতারের—তিনি ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহ—বুদ্ধদেব! তাঁর সময় থেকে ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ—সে অধ্যায়ের নাম বৌদ্ধযুগ।

প্রেম-লিপি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, এম্-এ, বিদ্যাভূষণ

আমাকে অনাথ ভেবে ওরা করুণার চোখে চায়,—কিন্তু তুমি তো সকলের নাথ। কেমন ক'রে ভাবতে পারি, তোমার প্রেম থেকে আমি বঞ্চিত? চাইনে ওদের অশ্রদ্ধার দান, অনাদরের দয়া। দুঃখ আমার পরশমণি—তোমার হাতের উপহার। তারই আলোতে এত কমনীয় হ'য়ে তোমার কাছে দাঁড়াতে পারি—ঢেকে যায় আমার জীর্ণ-বসন, ক্ষুধাকাতর চাহনি। আমি যে অশোক-কাননে বন্দিনী সীতা—দুঃখের মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা না ক'রে প্রিয়তম তুমি নেবে কেন?

তুমি যে প্রেমময়, মঙ্গলময়—তুমি তো বেদনা দাও না। আমাকে ব্যথা দিতে যে তোমারই প্রাণে বাজে। আমি তোমার প্রিয় ব'লেই আমার সকল ভার হরণ ক'রেছ। আমাকে রিক্ত, বঞ্চিত ক'রে, আমার সব আবরণ উন্মোচিত ক'রে, আমাকে লজ্জাকুণ্ঠিত ক'রে জগতের আসরে দাঁড় করিয়েছ—সে তো তুমি আমাকে সগৌরবে গ্রহণ করবে ব'লে, আমাকে সব দিক থেকে ভ'রে দেবে ব'লে। ওরা জানে না যে তুমি বিশ্বপ্রেমিক—তোমার মধ্যে কোথাও পক্ষপাত নাই—সুখে, দুঃখে সকল ভাবে সকলকেই তুমি ভালবাস।

মা-বাপ, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি কারো সঙ্গ, কারো মাখামাখি তুমি সইতে পারো না—এত তোমার প্রেম। তুমি আমাকে একা রেখেছ—তুমি যে আমার ভালবাসাটা নিঃশেষে পেতে চাও। তোমার ব্যাকুলিত অন্তর যে তৃপ্তি পায় আমাকে ভালবেসে—নিভৃত মিলনে আলিঙ্গন করতে চায় আমারই প্রেমমুগ্ধ তনুকে।

আমাকে ঘ্রাণের শক্তি দাও নাই—তুমি যে অঙ্গসৌরভে আকুল করে দেবে আমার অনুভূতিকে। চোখ মাতাল ক'রে রাখে বাইরের রূপে। তাই তুমি আমাকে অন্ধ করেছ, আমার ভিতরের দৃষ্টি খুলে দেবার জন্যে। জানি সেদিন আসবে, যখন খুলে দেবে আমার কাছে বিশ্বরূপের সৌন্দর্য্য-উৎস—দুনিয়ার সকল দেখা, সকল চেনা এক নিমেষে শেষ হ'য়ে তোমার মধ্যে মিলে যাবে। আমাকে সব শব্দ থেকে বঞ্চিত করেছ—সে ত দেবে ব'লে আমার অন্তরের অন্তর্দেশে আর একটি এমন ইন্দ্রিয় যাতে অতীন্দ্রিয় জগতেরও কোনও ধ্বনি আমার কাছে অশ্রুত না থাকে। নাই শুনতে পাই বাসর ঘরে কুণ্ঠিতা প্রিয়ার সরমজড়িত অস্ফুট ভাষা—তোমার বাণী যে একদিন আমার বুকে বেজে উঠবে তা আমি জানি, ওগো জানি! কোনও সুখস্পর্শ আমার গলিত দেহকে পুলকিত নাই করুক—তোমার আলিঙ্গন তো বাইরে নয়। আমি বিভোর হ'য়ে আছি সেই আশায়, কবে এমন একটি শক্তি পাব যা' আমাকে ভিতরে ভিতরে রোমাঞ্চিত ক'রে তুলবে তোমার স্পর্শসুখে।—কবে মুখরা হবে আমার জড়িত রসনা তোমার নামরসের আস্বাদনে।

তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও নি—জ্ঞানের গুমোর যে মিলনের মাঝে আড়াল হ'য়ে দাঁড়ায়। তবুও আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করছি, আমাদের এই দৃশ্যলোককে ব্যেপে একটি জগৎ আছে যা' অদৃশ্য কিন্তু সত্য। যারা জ্ঞানবুদ্ধি, ধন-জনের গরব করে, তারা তো তাদের সকল শক্তি দিয়েও সেই জগতের নাগাল পায় না। এই জগতের সম্বন্ধেই বা তারা জানে কতটুকু? আর কোনও

কিছুকে নিঃশেষে জানাও কি সম্ভব,—না জগতের সব কিছুকে জানতে গেলে অনন্ত কালও পর্য্যাপ্ত? আমি তাই ব'সে আছি সেদিনের অপেক্ষায়, যেদিন একটি জানার মধ্যে সকল খোঁজা, সকল বোঝা মিটে যাবে—সেই দিব্য জ্ঞানের আলোতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও কিছুই অস্পষ্ট থাকবে না। আমি নিশ্চয় জানি সেদিন আসবে, যেদিন তুমি আমাকে মনের একটি উঁচু স্তরে তুলে দেবে', যেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলবে একমাত্র মনেরই দ্বারা। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ তুলবে না কোনও বিক্ষোভ—থাকবে না কোনও অভাব, আকাঙ্ক্ষা।

তোমার মধ্যে পেতে চাই আমার পূর্ণতা, নিখিলের সঙ্গে একাত্মার -ভ'রে দাও আমার সব শূন্যতা। তোমার রসামৃত-সেচনে আমার প্রাণ শত পল্লবে মুকুলিত হ'য়ে উঠুক—আমার অন্তর শত রন্ধ্রে রন্ধ্রিত হ'য়ে বিশ্বজগতের হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত করুক।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী

শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, বি-এ

বেশী দিনের কথা নয় একদিন আমাদের মর্ম্মী কবি ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন :—

"আর কতকাল পরে, বল ভারত রে,
দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
একি শেষ নিবেশ রসাতলে।"

তখন সত্য সত্যই আমরা অবসাদ-হিমে ডুবিতে ছিলাম। জানি না কি অজানা মোহ আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা অহিফেন-সেবীর মত নেশার ঘোরে ঢুলিতে ছিলাম—আমাদের আশা ছিল না, উদ্যম ছিল না, উৎসাহ ছিল না। আমরা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। কত বৈদ্য আসিলেন—কেহই জাতির নাড়ির স্পন্দন অনুভব করিতে পারিলেন না। সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন—"ভারতের প্রাণ-স্পন্দন নাই।" তারপর বৈদ্যরাজ বিবেকানন্দ আসিলেন। তিনি হস্ত-স্পর্শমাত্র নাড়ী অনুভব করিলেন। সকলের সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব আজ নব চেতনায় সাড়া দিয়াছে। মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় এক অপূর্ব্ব বাণী দিব্য রাজ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া হিমালয়ের প্রাণপ্রদ স্নিগ্ধ সমীরণ স্পর্শের ন্যায় মৃতদেহের শিথিল অস্থিমাংসে প্রাণ-সঞ্চার করিতেছে। ভারতের জড়তা আজ অতীতের কাহিনী হইয়াছে। বহু শতাব্দীর গভীর নিদ্রা হইতে উত্থিত ভারত আর সুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িবে না। জাগতিক কোন শক্তি আর ইহার প্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। সত্যই আজ কুম্ভকর্ণের গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।"

"ভারতে এমন এক লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাবের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত প্রতিভা এবং চৈতন্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশাল হৃদয়বত্তার অধিকারী হইবেন—যাঁহার মধ্যে উভয়ের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অমূল্য সম্পদরাজি একাধারে বিরাজমান থাকিবে, যিনি দেখিবেন—সকল সম্প্রদায় সেই একই আত্মা—সেই একই ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত। ব্রহ্ম

হইতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই একই আত্মা নিত্য বিদ্যমান। যাঁহার বিশাল হৃদয় ভারত তথা ভারতের সকল দেশের দরিদ্র ও দুর্ব্বল, ঘৃণিত ও পতিতের দুঃখে বিগলিত হইয়া উঠিবে, অথচ যাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্ব সমূহের উদ্ভাবন করিবে, যাহা ভারতীয় তথা ভারত-বহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয়সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের পূর্ণ পরিণতিসূচক এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবে। ভারতে এইরূপ এক মহান্ পুরুষের আবির্ভাবের শুভ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ভারতকৃষ্টির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সেই লোকোত্তর মহাপুরুষ।"

সেদিন এ বঙ্গদেশ তাঁহার এই বাণী শুনে নাই—কর্ণপুটে স্থান দেয় নাই। আজ কালচক্র ঘুরিয়াছে আজ আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতেছি—ভারত আর নিদ্রিত নয়, সে জাগিয়াছে—জগৎ সভায় তাহার আসন পড়িয়াছে। সে শুধু বসিয়া গেলেই হয়। বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী, বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর বিশ্ববিজয় অভিযান। শ্রীবুদ্ধের সময়ে আমাদের স্বাধীনতা ছিল, বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল। জ্ঞানবল, অর্থবল সবই ছিল। রাজশক্তি আমাদের সহায়ক ছিল—তথাপি আমরা শুধু এসিয়াই জয় করিয়াছিলাম। আজ আমরা রাজশক্তিহীন, সমাজশক্তিহীন, সংহতিশক্তিবিহীন। আমাদের বাহুতে বল নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই, দেহে শক্তি নাই, তথাপি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে তাঁহার ভাব যতটুকু প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে মনে হয়—আমরা অসম্ভব সম্ভব করিতে পারিব। আমরা জগৎ জয় করিব। পূজ্যপাদ স্বামীজি একদিন আবেগ ভরে বলিয়াছিলেন, 'আমি একজন কল্পনা-প্রিয় ভাবুক ব্যক্তি। আমি আশা করি—ভারত জগৎ জয় করিবে।' স্বামীজির সে কল্পনা আজ সার্থক হইতে চলিয়াছে। ভারত জগৎ জয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই শতবার্ষিকী উৎসব কিরূপভাবে জগৎ সভায় স্থান লাভ করিয়াছে তাহা কয়েকজন মনীষীর বাণী শুনিলেই পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন।

মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন "I regard myself as unfit to be patron I can only be an humble servant"

Senator Giovanni ইতালি হইতে লিখিয়াছিলেন—

"I feel extremely flattered at the honour bestowed on me by requesting me to accept the office of the Vice-President in the General Committee for the Centenary of Ramkrishna who so rightly deserves the name of Prophet of modern India.

Prof Sylvain Levi লিখিয়াছিলেন—"His name (Ramkrishna) belongs to all mankind as his heart and mind did. All countries in the world may unite in the commemoration, at least all countries that still believe in the dignity of man outside and above all prejudices of race"

Dr J E Eliet লিখিয়াছিলেন—

"It is he (Ramkrishna) who gives a goal to my life and I am his servant."

M Romain Rolland লিখিয়াছিলেন—

"I need not tell you with what fervent love I associate myself with the commemoration of this great soul who was above all at once the most

individual and the most universal I often receive letters from France which show me how his words and examples have awakened echoes in the hearts of the western people."

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী তথা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিশ্বের দরবারে পৌঁছিয়াছে। উহা বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতির হৃদয়-কন্দরে ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি তুলিতেছে। চিন্তাশীল বুদ্ধিমান মানব তাহা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে, বিস্মিত-নেত্রে অবলোকন করিতেছে। উহা যে প্রত্যক্ষ সূর্য্যালোক। উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্ধ যে সেও তাহার তেজ অনুভব করিতেছে, বধির যে সেও তাহা শুনিতে পাইতেছে, অজ্ঞ যে সেও বুঝিতেছে। উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত মূর্খ সকলকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বহুদিন যাবৎই বিশ্বের সিংহাসনে বসিয়া আছেন—এতদিন তাঁহার প্রকাশ ছিল না, আজ তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "পাঁচশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের তুল্য দ্বিতীয় কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই।" বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে গাহিয়াছিলেন—

"বহু সাধকের
বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার
মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে
অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ
রূপ নিল এ জগতে,
দেশ বিদেশের
প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার
প্রণতি দিলাম আনি।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ

জনৈক ভক্ত

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ—জীবনব্যাপী সেবাব্রতী গঙ্গাধর মহারাজ গত ২৫শে মাঘ শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে লীন হইয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে আজ অনেক কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়ে, প্রথম দর্শনের দিন তাঁহার ভাবগম্ভীর মুখখানি। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। কয়েক দিন পূর্ব্বেই বিহারের ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রলয়ঙ্করের প্রলয়নৃত্যে ক্ষণিকের মধ্যে হিমালয়ের পাদদেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। অযুত নরনারী গৃহহারা—স্বজনহারা হইয়া হাহাকার করিতেছে। মনে হইল, মহাপ্রাণ মহারাজের হৃদয়ে তাহাদের সকল দুঃখ যেন আসিয়া জড় হইয়াছিল। সারাদিন তিনি আনমনা হইয়া থাকিতেন, বিষম দুঃখে তাঁহার প্রেমিক হৃদয় হাহাকার করিত।

তারপর ঐ বৎসর পূজার সময় গঙ্গাধর মহারাজের পুণ্য সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেবার সারগাছিতে একে একে সকলে অসুখে পড়িতেছিলেন, কাজেই আনন্দময়ীর আগমনে আশ্রমে আনন্দের সাড়া পড়িল না। আশ্রমের নিরানন্দভাব দেখিয়া তিনি খুবই ব্যথিত হইলেন। শুধু আশ্রমের আভ্যন্তরীণ অশান্তি তাঁহাকে ব্যথিত করে নাই, দূরদূরান্তের দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্গতদের হাহাকার তাঁহার কর্ণে অহরহ ধ্বনিত হইত। ঠাকুর যেন তাঁহাকে বলিতেন, যেমন তিনি বলিয়াছিলেন—

"ওরে তুই যে কাঙ্গালের বন্ধু! দুর্ভিক্ষপীড়িত মহামারী পীড়িতদের সেবার জন্য তোকে এখানে রেখেছি। এ বছর চারদিকে দুঃখ দৈন্য হাহাকার অথচ তোর এমন সামর্থ্য নাই যে কিছু সাহায্য করিস্। তুই কোন্ মুখে সকলের দুঃখের মধ্যে নিজের আনন্দ চাস্? এ আনন্দ যে তোর সইবে না—সাজবে না।" সত্যই "কাঙ্গালের বন্ধু" ইহাই গঙ্গাধর মহারাজের প্রধান পরিচয়।

পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘটক। জন্মস্থান আহিরীটোলা, কলিকাতা। বাল্যকাল হইতে খুব নিষ্ঠার সহিত গঙ্গাস্নান, গায়ত্রী জপ ও শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন। বৈরাগ্যের প্রতি তাঁহার একটী প্রকৃতিগত অনুরাগ ছিল। পাঠ্যাবস্থায়ই কোন সাধুর সহিত কিছু-কালের জন্য তিনি তাঁহাদের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরে ফিরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভে দ্বিগুণ উৎসাহে ধর্ম্মজীবন গঠনে মনোযোগ দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার আগ্রহ, নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং আপনার হাতে তাঁহাকে গড়িতে থাকেন।

১৮৮৬ সালে ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানে গঙ্গাধর মহারাজ খুবই বিচলিত হইলেন। ঠাকুরকে হারাইয়া সে সময় তাঁহার ও স্বামীজিপ্রমুখ সকলের মনে অপূর্ব্ব বৈরাগ্য দেখা দিয়াছিল। বরাহনগরের জীর্ণ কুটীরে দিনের পর দিন ধ্যান জপ চলিতে লাগিল। সে কি কঠোর তপস্যা! কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজের তাহাতেও মন ভরিল না। ঠাকুরকে তখনই সাক্ষাৎ করিতে হইবে, প্রাণের একান্ত আকুলতায় তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। হিমালয়ের দুর্গম তীর্থগুলি, হরিদ্বার, কেদার ও পঞ্চপ্রয়াগ পার হইয়া ১৭।১৮ বৎসরের বাঙ্গালী বালক হিমালয়ের পরপারে চলিয়া গেলেন—কঠোর তপস্যার জন্য। ভগবানের জন্য কতখানি আগ্রহ জন্মিলে, বুকে কতখানি সাহস থাকিলে এ কাজ সম্ভব তাহা ভাবিবার বিষয়। মানসসরোবর দর্শন করিয়া তিব্বতের দিকে তিনি চলিয়া যান। হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণের নানা কাহিনী 'তিব্বতে তিন বৎসর' প্রবন্ধে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিব্বত হইতে তিনি ফিরিলেন। মনে অপূর্ব্ব আনন্দ। ধ্যানজপ, নির্জ্জন সাধনা, শাস্ত্রপাঠে দিন কাটিতে লাগিল। মোক্ষ লাভের প্রবল বাসনা এতদিন তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল কিন্তু এবার ধীরে ধীরে লোককল্যাণের মহান্ ভাব আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। রাজপুতানার জন সাধারণের মধ্যে অজ্ঞতা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বাসনা তাঁহার মনে জাগিল। ইতি মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনিও এ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ এবং অনুজ্ঞা জানাইলেন। কাজ আরম্ভ হইল। উদয়পুরে ভীলগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, খেতড়িরাজ্যে বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচলনের জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পরে বরাহনগর ও আলমবাজার অবস্থান কালেও জনসেবার দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। স্থানীয় বহু কলেরা রোগী তাঁহার সেবা পাইয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল। এইরূপ এক রোগীর (সর্পদষ্ট) ঔষধ আনিতে গিয়া তিনি আর ফিরিলেন

না। ঔষধ লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া তিনি গঙ্গার তীর ধরিয়া উত্তর মুখে চলিলেন। বোধ করি, নিঃসঙ্গ ভ্রমণের বাসনা তাঁহার মনে আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। কাটোয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া মুর্শিদাবাদের মহুলা অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার নিকট একদল বুভুক্ষু বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে খাদ্যের জন্য জড়াইয়া ধরিল। কাছে যাহা ছিল (তিন আনা বোধ হয়) তাহা দ্বারা তিনি মুড়িমুড়কি কিনিয়া তাহাদিগকে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার সম্মুখে কয়েকটী শব দাহ করা হইল। বুঝিতে বাকি রহিল না যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীই ইহার কারণ।

মহাপ্রাণ সাধকের আর যাওয়া হইল না। স্বামীজিকে সাহায্যের জন্য পত্র লিখিয়া নিজেই দুস্থ রোগীদের সেবা আরম্ভ করিয়া দিলেন, ক্রমে ভাল ভাবে সেবা কার্য্য আরম্ভ হইল। আজ যে বিশাল মহীরুহের ছায়ায় আসিয়া সমগ্র ভারত দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারীর রুদ্র-তাপ দূর করিতেছে, তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইল এইরূপে। ইহার পর অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই সেবাকার্য্যে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এই জনমানবের সেবাতেই তিলে তিলে তিনি জীবনপাত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের "শিব জ্ঞানে জীব সেবা" উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের মহুলা ও পাচদা প্রভৃতিতে বন্যার, ভাবদার প্লেগে, ভাগলপুরের প্লাবনে তাঁহার অক্লান্ত সেবা, সারগাছি অনাথ আশ্রমের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের কথা ভাবিলে এ কথার সত্যতা কতকটা উপলব্ধি করা যায়।

শরীরের দিকে তাঁহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। মুখে বলিতেন, "শরীর খারাপ—সাবধান হয়ে থাক্‌ব" কিন্তু কাজের সময় সারগাছির ক্ষুদ্র ঘরোয়া ব্যাপারও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ তিনি, ইচ্ছা করিলে মঠে আসিয়া থাকিতে পারিতেন এবং সেজন্য বারবার তাঁহাকে অনুরোধও করা হইয়াছিল। তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইলে সন্ন্যাসী গৃহস্থ অনেকেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন, কিন্তু পল্লীর অবজ্ঞাত, অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি তাঁহার এমন দরদ ছিল যে, তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলেন না। তিনি প্রস্তুত ছিলেন পল্লীর দুর্গতদের জন্য তাঁহার জীবন বলি দিতে। জীবনের পূর্ব্বাহ্নে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত গিয়েও জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র। যে এই মহা সন্ধিক্ষণের সময় কোমর বেঁধে খাড়া হ'য়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বহন ক'রবে সেই আমার ভাই—সেই তাঁর ছেলে। এই পরীক্ষা—যে রামকৃষ্ণের ছেলে সে আপনার ভাল চায় না। প্রাণত্যাগ হ'লেও পরের কল্যাণকাঙ্ক্ষী তারা।" বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একথা তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল।

দেশের দুঃখ দারিদ্র্য, অশিক্ষা তাঁহাকে বিষম ব্যথিত করিত। তাই তিনি তাঁহার ভক্তদের মধ্যে বিলাসিতা, আরামপ্রিয়তা দেখিতে পারিতেন না। সকলেই দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় অনুপ্রাণিত হয়, এই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা ছিল। জীবন গঠনের জন্য কঠোরতার দরকার আছে, একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং সারাজীবন কার্য্যতঃ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যাঁহাদিগকে তিনি ভালবাসিতেন, নানা কঠোরতার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে গড়িবার প্রয়াস তিনি সর্ব্বদা করিতেন। এজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে খুবই কঠোর হইতে দেখা যাইত।

কিন্তু একটা অতুলনীয় কোমলতা ও সরলতা তাঁহার হৃদয়-মনকে মধুময় করিয়া রাখিত। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"—কথাটীর সার্থকতা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি। শিষ্যের

চরিত্রগঠনে, শিক্ষাদানে তাঁহাকে যেমন কঠোর দেখা যাইত, ভক্তের আকুলতার নিকট, দীনদুঃখীর ব্যথার নিকট তিনি তেমনি কোমল হইয়া পড়িতেন। ভক্তের জীবন গঠন উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"আশীর্বাদে কি চিঁড়ে ভিজে বাপ, পরিশ্রম করতে হবে। ক্ষমা টমা আমার কাছে কিছু নাই, দোষ করলে শাস্তি।" আবার একান্ত আকুল, ভীত বালককে অভয় দিয়া বলিতেন—"আমার কাছে যখন এসেছিস্ তখন ভয় কি ?"

বালকভাব শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে দেখা গিয়াছে। অভিমান অহঙ্কারের লেশমাত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া বালকের মত জেদ, স্বাস্থ্য-প্রতিকূল আহারবিশেষের প্রতি আগ্রহ এবং পাছে সেবক জানিতে পারেন সেজন্য ভয়, এই কয়েকদিন আগেও দেখা যাইত। সকলের সঙ্গে বালকের মত প্রাণখোলা হাঁসি তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। গম্ভীর হইয়া শাসন করিতেছেন, এমন সময় হাঁসির কথা উঠিল, তিনি হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিলেন। বাস্, হাঁসিই চলিল। সারগাছি আশ্রমে তাঁহার কত ছেলেখেলা চলিত। এই ১৩৪৩ সালের নববর্ষের দিন তিনি "তিব্বতী বাবা" সাজিলেন। পরিধানে কৌপীন, হাতে লাঠি, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষমালা। আশ্রমশুদ্ধ সকলের সহিত দেখা করিতেছেন আর বলিতেছেন, "হাম বহুদূরসে আযা—তিব্বত সে", আরও কত কি।

ঠাকুর এই আপনভোলা বালককে যে কি চক্ষে দেখিতেন, ভক্তি বিশ্বাসহীন আমি তাহা কি করিয়া বলিব ? নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন ঠাকুরের দয়া তিনি অনুভব করিতেন। ঠাকুরের কথা প্রায়ই বলিতেন না কিন্তু যখন বলিতেন, তখন ভাবের ফোয়ারা ছুটিত। মন্দির হইবে শুনিয়া কত আনন্দ। শ্রদ্ধেয়া অন্নপূর্ণা, ভক্তি প্রভৃতিকে (আমেরিকার মহিলা ভক্ত) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরের আশিস্ যেন শ্রাবণের ধারার মত ওদের কথায় ঝরছে।" তাঁহার গুরুভক্তির তুলনা ছিল না। বর্ত্তমান শিষ্যদের গুরুভক্তি প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর যদি আমাদের বল্‌তেন, হাঁ-কর বাঘে করব, আমরা হাঁ ক'র্‌তাম।" গুরুর প্রতি এমন শ্রদ্ধা তাঁহার ছিল। ঠাকুরের ছবি বাজে বই বা কাগজের উপরে দেখিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। বলিতেন—"ঠাকুরের ছবি ওসবে না ছাপালে কি চলে না ? কোথায় যে গিয়ে পড়্‌বে।" ছবির মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখিতেন, তাই ইহার অসদ্ব্যবহার আশঙ্কায় ঐরূপ কথা বলিতেন।

স্বামীজি যেন তাঁহার অন্তরের ধন ছিলেন। স্বামীজির কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ্ঞা বলিয়া তিনি সারাজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজির কথা বলিতে তিনি খুবই আনন্দ পাইতেন। স্বামীজি ও তাঁহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। গঙ্গা, Ganges প্রভৃতি আদরের নাম তাঁহারই দেওয়া। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দপ্রমুখ অন্যান্য সকল গুরুভায়ের প্রতি তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধনে তাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন তাহা এ জগতে দুর্লভ।

বালক ও ছাত্রগণ ছিল তাঁহার পরম আত্মীয়। ঠাকুরের কথায় তিনি বলিতেন, "আমি বালকদের ভালবাসি কেন জান ?" আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দিতেন। সরল, অনাড়ম্বর দেখিলে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইতেন। আশ্রমের ছেলেরা তাঁহার প্রাণ ছিল। তিনি শুধু ধর্ম্ম-উপদেশ দিতেন না, সাধারণ অনেক বিষয়ও তিনি বলিতেন। আয়নাটী কেমন করিয়া রাখিতে হয়, কথার সঙ্গে 'যে আজ্ঞা' কেমন করিয়া বলিতে হয়, এ সকল কথাও তিনি শিখাইতেন। পড়াশুনার জন্য তাঁহার নিকট খুবই উৎসাহ পাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও দিতে হইত। ইতিহাস, স্বামীজির গ্রন্থাবলী, দেবদেবীর স্তোত্র আয়ত্ত করিতে তিনি প্রায়ই আদেশ করিতেন।

মেয়েরাও তাঁহার অনেক ভালবাসা ও স্নেহ পাইয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, "মেয়েরা খুব ভক্তিমতী হয়।"

অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ের ধন গঙ্গাধর মহারাজ আজ স্থূলচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। বড়ই দুঃখ ও ব্যথায় হৃদয় গুমরিয়া উঠিতেছে। সেই স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ, আশিস ও অভয়বাণী আর স্থূল কর্ণে শুনিব না। সে সৌম্য বরবপুখানি আর এ চক্ষে দেখিব না। কিন্তু সেজন্য শোক করিলে চলিবে না। আজ ভাল করিয়া মনে করিতে হইবে—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা,
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।" গীতা, ২।১৩।

দেহের বিভিন্ন অবস্থার মত মৃত্যুও আর এক অবস্থা। যে কাজের জন্য তিনি আসিয়া ছিলেন তাহা শেষ করিয়া আবার ঠাকুরের নিকট চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তবে অকস্মাৎ বিরহে অজ্ঞান মন অস্থির হয় সত্য কিন্তু শুধু অশ্রু বিসর্জ্জনে যেন ভক্তি ও আন্তরিকতা শেষ না হয়। তাঁহার প্রাণের বাসনা ছিল, আমরা মানুষ হই—দেবত্ব লাভ করি। আজ যদি আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত হয় সত্য জীবন গঠনে, তাঁহারই আদর্শকে জীবনে রূপে দিতে যদি আমরা আগ্রহান্বিত হই, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন— আমাদের মধ্যে তিনি আবার দেখা দিবেন। তাঁহার আদর্শ "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" আজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে এবং যেন বলিতেছে—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আসুন, আমরা শিববোধে জীবসেবা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকে সার্থক করিয়া তুলি।

সাধু নাগ মহাশয়

শ্রীজগৎশান্তি চৌধুরী

যুগের তমিস্র মাঝে নবীন প্রভাত
বাহিয়া আনিল যবে নবীন তপন,
অন্তরে বাহিরে তার আলোক প্রপাত
উজলিল যত মণি ছিল যা গোপন।
নিষ্কাম ধর্ম্মের মন্ত্র, জলন্ত বিশ্বাস,
স্বর্গীয় প্রেমের উৎস, ভক্তির প্লাবন
সে আলোকে ধীরে ধীরে হইল প্রকাশ
তব হৃৎপদ্ম হ'তে সাধক রতন।
ত্রিতাপ-নাশিনী-গঙ্গা কুটীরে অঙ্গনে
তোমার প্রেমের উৎসে পাইল বিকাশ,—
ধরিত্রী দেখিল পুনঃ কলির বন্ধনে
ঋষি জনকের শুদ্ধ সংসারে সন্ন্যাস।
ভগবান রামকৃষ্ণ আদর্শের খনি—
অনাসক্ত সংসারীর তুমি মধ্যমণি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক সঙ্গীত-সম্মিলনীর সভাপতি

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ

মাননীয় সুধী সজ্জনমণ্ডলি,

আপনারা আমার যথাযোগ্য সাদর ও সবিনয় সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করুন। আজ বাঙ্গলার বড়ই আনন্দের দিন, মহাগৌরবের দিন। আজ নব বসন্ত সমাগমে নব-জীবনের উদ্যম উৎসাহ আশা উদ্দীপনা নিয়ে বাঙ্গালী তার বড় আদরের প্রাণভরা ভালবাসার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে অসীম আগ্রহে সম্মিলিত,—আনন্দ হবে না? আজ বাঙ্গলার একান্ত নিজস্ব অন্তরের দেবতা রামকৃষ্ণ বাঙ্গালীর দীর্ঘ কালসঞ্চিত "অকর্ম্মণ্য ভেতো বাঙ্গালী' অভিধানের কলঙ্ক কালিমা ধৌত করে বাঙ্গালীকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ মানবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কত্তে পেরেছেন —সে কি মহা আনন্দের কথা নয়? আজ রামকৃষ্ণ-মহাপীঠ দর্শন অভিলাষে সুসভ্য জগতের নানা প্রান্ত হতে সাধুসন্তগণ বাঙ্গলায় সমবেত হচ্ছেন। সে কি বাঙ্গলার মহা গৌরবের বিষয় নয়?

শত শত বৎসর পর পদানত হতভাগ্য বাঙ্গলা জৈববলে যন্ত্রবলে বলীয়ান না হলেও আধ্যাত্মিক বলে যে সে জগদ্বরেণ্য তা আজ আর সুসভ্য জগতে অবিদিত নেই। রামকৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বসমাজকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্র জন্মনঃ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

ভগবান মনুর এই মহাবাক্য উন্মাদের অর্থহীন প্রলাপ নয়—একান্ত যথার্থ—অক্ষরে অক্ষরে অতি সত্য। সনাতন ধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি রবে আজ সমগ্র ধর্ম্মজগৎ মুখরিত—নিনাদিত। এ বিশ্ববিজয় কার মহাশক্তিবলে সম্ভবপর হয়েছে? বঙ্গের এক ক্ষুদ্র পল্লীবাসী দরিদ্র কিন্তু অসীম শক্তিশালী ব্রাহ্মণ সন্তান ঠাকুর রামকৃষ্ণের অপ্রতিহত অলোক-সামান্য তপস্যার প্রভাবেই নয় কি? বাল্যাবধি শুনে আসছি, বঙ্গজননী আমাদের চিরদুঃখিনী কাঙ্গালিনী। কেন? এমন দিক্‌পাল তুল্য কৃতী মহা-সাধক সন্তান যাঁর অমৃতময় জঠরে জন্মলাভ করেছে, কে বলে তাঁকে কাঙ্গালিনী, পরকৃপা ভিখারিণী? সে রত্নগর্ভা জননীর দৈন্য কিসের—দুঃখ কোথায়? আমরা আত্মদৃষ্টিহীন নির্ব্বোধ, তাই রত্নপ্রসবিনী জননীকে পরোপজীবিনী মনে করি। দীর্ঘকাল সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অকৃতির ফলে আমরা অধঃপতিত, আত্মবিস্মৃত পরমুখাপেক্ষী, তাই বলে আমরা যে সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব কাঙ্গাল নই, সেই কথাটি—সেই আশার বাণী আমাদের কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই এ যুগে প্রথম প্রচার করে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন—স্তিমিত প্রাণে আশার আলোকসম্পাত করেছেন। তাঁরই জ্ঞানাঞ্জন শলাকার স্পর্শে বাঙ্গালী আবার চোখ মেলে নিজেকে দেখতে পেয়েছে—জান্‌তে পেরেছে, সেও মানুষ—অমৃতের সন্তান, জগতের সভামণ্ডপে তারও একটি বিশিষ্ট আসন রয়েছে। আরও বুঝতে পেরেছে, কি বিরাট রত্নভাণ্ডার—কি বিপুল অর্থসম্ভার কিম্বা প্রচুর বিলাসোপচার কিছুতেই জগতে যথার্থ সুখ শান্তি আহরণ কত্তে পারে না—
"ন জাতুঃ কামো কামানামুপভোগেন শাম্যতি—হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে।"

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার খরস্রোতে এক দিন এদেশ যখন অজানা কোন তমসাচ্ছন্ন

মহাসমুদ্রের দিকে দ্রুতগতিতে ভেসে চলেছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ যখন এদেশের যা কিছু সবই নিন্দনীয় ও সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয় এরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন আর অন্য এক শ্রেণীর সামাজিকগণ প্রতীচ্য প্রভাবে বিপথ প্রস্থিত না হয়েও অতিমাত্র বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন—সেই উৎকট সন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এদেশে অবতীর্ণ হন। সমুদ্রগামী অর্ণবযানের পক্ষে দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য আলোকস্তম্ভ যেরূপ কল্যাণকর ও অত্যাবশ্যক, দিঙ্‌মূঢ় জাতির গতি নির্ণয়ের জন্য লোকোত্তর মহাপুরুষগণও তেমনি উপযোগী। তাই এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে বঙ্গভূমি নিদারুণ ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা পেয়ে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়েছিল। এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ তাঁর অমৃতময় উপদেশ ব্যাখ্যায়, বিশেষভাবে রসাল জীবন্ত দৃষ্টান্তে এদেশের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য, এ দেশের সাধনা, এ দেশের আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রার পদ্ধতি এমন সরলভাবে সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত করেছিলেন যে, তাতে শুধু বাঙ্গলা নয়, ভারত নয়, সুদূরবর্ত্তী বিদেশ পর্য্যন্ত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনন্যসাধারণতা উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়ে গেল। সহস্র বর্ষের পরাধীন তথাকথিত অসভ্য অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারত বিরাট বিশ্বের মহাসভায় জ্ঞান গরিষ্ঠ আখ্যা লাভে অধিকারী হ'ল। এহেন বিশ্বপূজ্য মহামানবের জন্মশতবার্ষিকীতে বাঙ্গালীর আনন্দোৎসব অতি স্বাভাবিক, অসীম কল্যাণবিধায়ক এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন ও বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

উৎসব মাত্রেই মঙ্গলাচরণ করা এদেশের স্বভাবসিদ্ধ চিরন্তন রীতি। প্রাচীন যুগে উদাত্ত সামগানে এই রীতি আচরিত হোত। আজ আমাদের মহা দুর্ভাগ্যের ফলে সামগান তো দূরের কথা, সামবেদও লুপ্তপ্রায়। আর যে মার্গী সঙ্গীত পদ্ধতি অনুসারে সামগান করা হোত, সেই পদ্ধতিও অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত। সুতরাং দেশী সঙ্গীতের সাহায্যেই মঙ্গলাচার করেই এই অলোকসামান্য মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণে আমরা প্রবৃত্ত হব। আমরা জানি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। শান্তরসসিক্ত ভগবদ্‌ভাবের অভিব্যঞ্জক স্বরলহরী স্বভাবতঃ পবিত্র জীবহৃদয়কে নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থানে পৌঁছে দেয়। জনসমাজের বিষয়-বাসনায় মলিনহৃদয়ে বাইরের আকর্ষণ প্রবলভাবে ক্রিয়া করে, তাই সেখানে সঙ্গীতের এই স্বাভাবিক শক্তি বাধা পায়। কিন্তু যাঁর চিত্ত সাধনামার্জ্জিত নির্ম্মল, তাঁর হৃদয় সঙ্গীত শ্রবণমাত্রেই ভাবরসে আপ্লুত হয়। তাই আমরা দেখতে পাই এই দেবোপম মহাপুরুষ ভাবশুদ্ধ সঙ্গীত শুনতে শুনতে সমাধিমগ্ন হয়ে পড়তেন—যেন পরমব্রহ্মেলীন হয়ে যেতেন। সুতরাং এই মহাযজ্ঞের উদ্বোধনে সঙ্গীত সাহায্যে মঙ্গলাচারের অনুমতি সভাস্থ সুধীবৃন্দের নিকট প্রার্থনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সঙ্গীতের মন্ত্রধ্বনি অলক্ষ্যে দেবলোকে পৌঁছে দেবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনে ও করুণা আকর্ষণে সমর্থ হবে। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

বাংলার সাধক

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম-এ, এম্‌-আর-এ-এস্‌, বিদ্যাবিনোদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪র্থ দৃশ্য

(মাণিক রাজার আমবাগানের ধারে মাঠে বসিয়া গদাধর)

গদাধর। গান

গগন ভরিয়া শঙ্খ তোমার ধ্বনিয়া তুলিল গীতি,
পরাণ মম আকুল করিল জাগিল পুরাণ স্মৃতি।
তোমারে চাহিয়া আছি হে ব'সে
নাহিক কুসুম গাঁথিব কিসে,
নিরাশা তিমির আবরি দিল জীবনকাননবীথি।
দিবসের পর কাটিছে যামিনী, ওগো প্রিয় সাথী।
কত যে উষার কুসুম সুবাস
কত যে রাতের জ্যোৎস্না আভাস
ছড়ায় তাদের স্বপন-ছায়া জীবন মরু প্রান্তরে,
মগন হইব সুধা সরোবরে উঠিবে পুলক প্রীতি॥

(যোগেশ, গোপাল ও নিতাইএর প্রবেশ)

নিতাই। বেশ তো, গদাই! এখানে একেলা ব'সে গান গাচ্ছিস, আর আমরা চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। গদাই, আয়, আজ একটা নূতন খেলা করি।

গদাধর। ছাখ, ভাই নিতাই, এই মাঠে এলে আমার মন কেমন উদাস হ'য়ে ওঠে।

যোগেশ। ঠিক ব'লেছিস, গদাই এ যেন রূপকথার ছবি!

নিতাই। এই স্থান উষার ধূসর রঙে স্বপন-পুরীর মতন হ'য়ে ওঠে। পূব্‌ আকাশে যখন সূয্যি উঁকি ঝুঁকি দেয় তখন তার সোণার আলো সারা মাঠখানাকে ভাসিয়ে দেয়, দুপুরে কাঠ ফাটা রোদ চোখে ঝলক লাগায়— আবার সন্ধ্যায় আকাশ ফেটে জ্যোৎস্নার আলোক বান ডেকে আসে।

গোপাল। এখানে ফাগুনে আমের বনে মলয় বাতাস গন্ধ পাগল্‌ হ'য়ে ছোটে, শীতে ধানের ক্ষেতে বনলক্ষীর আঁচলে আঁচলে দোল দেয়, আবার শরতে ফুলগুলি পুলকে শিথিল হ'য়ে ফুটে ওঠে।

গদাধর। একদিকে বনরাজির নীল আভা, নীল মেঘের সাথে মিশে গিয়েছে,—কাল মেঘ দীঘির জলে, মাঠের কোলে, কালি ঢেলে দিয়েছে, আলোর কোলে কালো ছায়া! এ কি মায়া! আবার ঐ ছাখ কালো মেঘের কোলে সাদা বকের দল—মরি, মরি, শতদলমালা কেমন দুল্‌ছে শ্যামাঙ্গে!

গান

কে এলো রে আকাশ পারে
মেঘের ভেলা বেয়ে,
চিত্ত আমার হ'ল আকুল
মৃদুল পরশ পেয়ে।
বিবশ বিশ্ব উঠ্‌ল জেগে
ছন্দে, সুরে, গানে,
দুল্‌ছে দোদুল, পুষ্প মুকুল
(তার) অভয় আঁখি চেয়ে॥

কে যেন আমায় হাত ছানিয়ে ডাকে—ঐ মাঠের দূর প্রান্তে। তার চাপা হাসি এসে বাজে আমার কাণে। সে পাখী হ'য়ে ডাকে, ফুল হ'য়ে হাসে, নদী হ'য়ে গান করে—সে আমায় ডাকে,—ডাকে,—ডাকে।

(সমাধিস্থ হইলেন)

* প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে নাটকে বর্ণিত অনেক ঘটনার সর্ব্বাংশে মিল নাই। উঃ সঃ

গোপাল। কী আশ্চর্য্য! এমন হ'ল কেন? নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! ওরে যোগেশ, ওরে নিতাই—যা বাড়ী গিয়ে জ্যাঠামশাইকে খপর দে—

নিতাই। ওরে, তোরা জানিস নি, ভয় নেই—গদাইএর অমন হয়। আমি ঐ রোগের ওষুধ জানি। তোরা সকলে ওর চারিধারে ব'স, হরিনাম কর, তাহলে গদাই এক্ষুণি জেগে উঠ্‌বে।

সকলে। (গদাইকে ঘেরিয়া)

গান

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলী ধারী॥
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার)
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিরঞ্জন,
গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ,
দামোদর কংসদর্পহারী, শ্যাম রাসরসবিহারী
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার),

গোপাল। ঐ ছাখ, গদাই জেগে উঠেছে, বোধ হয় ঘুমিয়ে প'ড়েছিল।

যোগেশ। ঘুমুলে ওর চোখের দুকোণ বেয়ে জল ঝরছে কেন?

নিতাই। তোরা বুঝবি নি সাধুদের অমন হয়। ভাবে তন্ময় হ'লে বাইরের জ্ঞান থাকে না। তখন চোখ দিয়ে আনন্দের জল গড়িয়ে পড়ে।

গোপাল। ও আমি ভাল মনে ক'রছি না ভাই। চন্দ্রা জেঠাইমাকে গিয়ে বলি চল।

নিতাই। (হাসিয়া) চল্ গদাইএর অসুখ করে নি কিন্তু—ও ভালই আছে। আয় রে গদাই, আয়—বাড়ী যাই চল্।

(সকলের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

ক্ষুদিরামের গৃহ

ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রা

ক্ষুদিরাম। কি আমি তোমায় বলেছিলুম, চন্দ্রা? এখন বিশ্বাস হ'ল? গদাইর কথা শুনেছ ত?

চন্দ্রা। হাঁ, নিতাই ব'লেছিল—গদাইএর মূর্চ্ছা হ'য়েছিল—হরিনাম কর্ত্তে কর্ত্তে মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল।

ক্ষুদিরাম। মূর্চ্ছা নয়, গো, ও মূর্চ্ছা নয়! ঐ যে গদাই আস্‌ছে। তুমি অপেক্ষা কর এখানে, আমি এখন যাই।

(গদাধর মহাদেবের বেশে নাচিতে নাচিতে আসিতেছেন)

গদাধর। (গান ও নৃত্য)

বাজন নূপুর বাজে চরণে
জয়শিব, জয়শিব ব'লে।
বাজন, নূপুর বাজে চরণে।
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমিই পাতাল,
তুমিই হ'লে হরিব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল,
অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়, দয়াসিন্ধু প্রেমময়,
দেখা দাও নিজগুণে পদাশ্রিত জনে॥
ভূষিত নানাগুণে, সন্তাপ যায় চিন্তনে,
জয় শিব জয় শিব ব'লে নূপুর বাজে চরণে॥

চন্দ্রা। কে রে গদাই?

গদাধর। হাঁ মা, চিন্‌তে পারছো না আমায়? কেমন ঠকিয়েছি, সন্ন্যাসী ঠাকুর আমায় কেমন সাজিয়ে দিয়েছেন, দেখ—

চন্দ্রা। কোথাকার সন্ন্যাসী রে?

গদাধর। কেন ঐযে লাহাবাবুদের অতিথি-শালায় একদল সন্ন্যাসী এসেছে। ওরা শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছে। আমি যাবো, মা, ওদের সঙ্গে?

চন্দ্রা। না বাবা, ছিঃ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যেতে নেই—

গদাধর। কেন মা, সন্ন্যাসীরা ত ভাল লোক, ওরা ত চোর ডাকাত নয় যে ওদের সঙ্গে যেতে আপত্তি হবে?

চন্দ্রা। না, না, সন্ন্যাসীরা ভাল লোক। এখন শোন্, তোকে অমন ক'রে সাজাল কোন্ সন্ন্যাসী?

গদাধর। ঐ ওদেরই একজন। আমি তাঁদের

রান্নার কাঠ, খাবার জল, যোগাড় ক'রে দিয়ে আসি কিনা, তাই ওরা আমার একটা স্তোত্র শিখিয়েছে। শুনবে মা?

চন্দ্রা। গান পরে শুনবো। এখন শোন, লক্ষ্মীটি আমার, ওদের সঙ্গে যেও না।

গদাধর। গান শুনবে বল, তবে যাবো না—

চন্দ্রা। আচ্ছা—

গদাধর। গান

প্রভুমীশ-মণীশ মশেষগুণং
গুণহীন-মহীশ-গরাভরণম্
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
গিরিরাজসুতান্বিত বামতনুং
তনুনিন্দিত শারদ কোটি বিধুম্।
বিধিবিষ্ণু শিরোধৃত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
শশলাঞ্ছন-রঞ্জিত সন্মুকুটং
কটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী কৃত পূতজটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

কেমন মা, গানটা ভাল নয়?

চন্দ্রা। বেশ গান শুনলুম। এখন গ্যাখ,—ওদের সঙ্গে যাবি না ত?

গদাধর। যাবো না ব'লছি। তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আমি ঠিক বলছি—যাবো না—যাবো না—

চন্দ্রা। আচ্ছা,—তুই শিবের পোষাক খুলে ফেল, বেলা হ'য়ে গেল,—চান ক'র্ত্তে যা—

গদাধর। আচ্ছা, যাচ্ছি।

(চন্দ্রার প্রস্থান)

গান

জয় কালী জয় কালী ব'লে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়॥
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়?
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব প'ড়েছেন রাঙা পায়॥

(সম্মুখের রাস্তায় একদল পল্লী-রমণী যাইতেছে)

গদাধর। হাঁ, গা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ বল ত? তোমাদের হাতে ফুলের সাজি, কাঁকালে দুধের কেঁড়ে, তোমরা যাবে কোথায়?

১ম স্ত্রী। আমরা যাবো ঐ মাঠের ওপারে বনের কিনারে আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষীর মন্দিরে। আমরা পূজা মানত করেছি কি না, তাই যাচ্ছি। আজ ওখানে অনেক লোক আসবে।

গদাধর। আমায় নিয়ে যাবে?

২য় স্ত্রী। তোমার মা কিছু ব'লবেন না তো?

গদাধর। না, গো, না—আমি এখন বড় হ'য়েছি, মা কিছু ব'লবেন না—

৩য় স্ত্রী। এমনি শিবের বেশে যাবে? চল।

(সকলে প্রস্থান করিলে চন্দ্রা প্রবেশ করিলেন)

চন্দ্রা। (দ্রুত আসিয়া) গদাই, গদাই, কৈ কেউ ত নাই এখানে? এই যে এখনি এখানে ছিল, গেল কোথায়? নাঃ, ছেলেটা বড় ভাবিয়ে তুলেছে দেখ্‌ছি।

(ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। তুমি অত অস্থির হ'চ্ছ কেন, চন্দ্রা? সে মেয়েদের সঙ্গে বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়েছে। তুমি ভেবো না গদাই এর জন্য—

চন্দ্রা। ছেলেটা একটু মাথা পাগলা কিনা? দেখ্‌লে না কোন্ সন্ন্যাসী ওকে শিব ঠাকুর সাজিয়ে দিয়েছিল, আর সেই বেশেই হাজির হ'ল বাড়ী এসে নাচ্‌তে নাচ্‌তে—

ক্ষুদিরাম। গদাই পাগল নয়—তুমি আমাদের গদাইকে চেন না—তুমি যাও, ভেবো না।

(চন্দ্রার প্রস্থান)

তুমি জান না চন্দ্রা, ভগবানের নিয়ম মানুষের বুদ্ধির অতীত! তিনি ইচ্ছা ক'রলেই কি না হয়? কোন কোন গাছে আগে ফল ধরে, পরে ফুল হয়। ধন্য চন্দ্রা! ধন্য কামারপুকুর। গদাইএর মহিমায়

তুমি একদিন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু হায়! সে শুভদিন দেখ্‌বার সৌভাগ্য বোধ হয় আমার হবে না।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

বিশালাক্ষীর মন্দির

পল্লীস্ত্রীলোকগণ ও গদাই

১ম স্ত্রী। গদাই, তুমি একটা গান ক'র্ব্বে না? তোমার গানে মধু ঝরে—

২য় স্ত্রী। দেখ, কেমন উদাস ওর দৃষ্টি। শান্ত ওর মূর্ত্তি।

৩য় স্ত্রী। একটা গান গা বাবা।

গদাধর। চুপ ক'রে শুনতে হবে কিন্তু—কথা কইলে হবে না ব'লে দিচ্ছি—

১ম স্ত্রী। হাঁ, গো, হাঁ—আমরা চুপ ক'রে শুন্‌বো—তুমি গাও।

গদাধর। গান

(আজি) নন্দিত দিশি মন্দ্রিত ছন্দ,
মঞ্জু বিহগ মুখর কুঞ্জ,
নভ-অঙ্গনে চিকুর পুঞ্জ
বঙ্কিম কিরণে গগনে ভাসে।
উছল বায়ু চঞ্চল জল,
পুঞ্জিত অলি, শোভে শতদল,
শুভ্র তুষার বাজে ফুলমাল,
চন্দন সৌরভ মন্থর বাসে॥
শ্যামল তৃণ'পরি মুকুতানিকর
দূর বনানী স্নাত শিশির
শঙ্খ নিনাদে কম্পিত অম্বর
ঝঙ্কৃত বিশ্ব মদির শ্বাসে॥
অলক্ত রঞ্জিত বঙ্কিম পদে
রক্ত কমল সুন্দর বাজে
কনকনূপুর মধুর বাজে
পুলক বিথারি তিমির নাশে॥

২য় স্ত্রী। দ্যাখ, ভাই, গদাই কেমন গান ক'রছে। কি মধুর ওর গলাটি।—দ্যাখ, দ্যাখ ওর গাল ব'য়ে চোখের জল ঝরছে।

(সকলে আশ্চর্য্যভাবে গদাইকে দেখিতেছে)

গদাধর। (চোখ বুজিয়া) দেখা দে মা, দেখা দে—আর সহ্য হয় না—কত দিন, কত রাত চ'লে গেল, তুই ত এলি নি। বেলা যে নেই! দেখা দে মা। আমি কিছুই জানি না যে। তোর কোমল হাতে তুলে নে আমার ঝরা কুসুম।

(সমাধি)

১ম স্ত্রী। ওমা, একি হ'ল। কেন গান কর্ত্তে বল্লাম ওকে।

২য় স্ত্রী। ওলো, গদাই বড় ভক্ত—ওর উপর দেবতার ভর হ'য়েছে।

৩য় স্ত্রী। তা হ'লেও হতে পারে।

(সংজ্ঞাহীন গদাইকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সকলে বলিতে লাগিল)

স্ত্রীলোকগণ। মা বিশালাক্ষী! রক্ষে কর মা। মুখ তুলে চাও মা। গদাই আমাদের নিরপরাধ, ও কিছু জানে না, অপরাধ মাপ কর—ওর প্রাণ ফিরিয়ে দাও মা।

(গদাই ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন)

স্ত্রীলোকগণ—জয় বিশালাক্ষীর জয়। জয় বিশালাক্ষীর জয়।

১ম স্ত্রী। বাঁচলুম, বাবা বাঁচলুম। চল্ সকলে ওকে নিয়ে বাড়ী পৌছে দিই। যার ধন তার কাছে দিয়ে আসি। চল হে গদাই, চল, বাড়ী যাবে চল।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আবিষ্কৃত নিয়ম স্বপ্নে অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া জানাইতেছেন—

তথাস্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সম্বিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥৪

অন্বয়—তথা স্বপ্নে। অত্র বেদ্যম্ ন স্থিরম্, জাগরে তু স্থিরম্, অতঃ তদ্ভেদঃ। তয়োঃ সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে।

অনুবাদ—স্বপ্নেও সেই প্রকার। এই স্বপ্নে, পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ স্থির থাকে না, জাগ্রদবস্থায় কিন্তু তাহারা স্থির থাকে। এই কারণে তদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ। কিন্তু তদুভয়ে সম্বিৎ একইরূপ, তাহা ভিন্ন নহে।

টীকা—"তথা স্বপ্নে"—যেমন জাগ্রদবস্থায় বিষয়সমূহের বিচিত্রতাবশতঃ পরস্পর ভেদ, এবং সম্বিৎ একইরূপে থাকে বলিয়া তাহার অভেদ দৃষ্ট হয়, "তথা" ঠিক সেই প্রকারেই, "স্বপ্নে"—পঞ্চীকরণ বার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য স্বপ্নাবস্থার যে লক্ষণ করিয়াছেন "করণেষূপসংহৃতেষু জাগরিত-সংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ" শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় (নিদ্রাভিভূত হইয়া) বাহ্যবস্তুর অভিমুখে গমনে বিরত হইলে, জাগ্রৎকালীন সংস্কারজনিত (বাসনাময়) শব্দাদি বিষয় ও তাহাদের প্রতীতিকে স্বপ্নাবস্থা বলে, সেই স্বপ্নাবস্থাতেও বিষয়সমূহ ভিন্ন, কিন্তু সম্বিৎ ভিন্ন নহে।

(শঙ্কা) ভাল, যদি উভয়স্থলেই বিষয়সমূহের ভেদহেতু এবং জ্ঞানের অভেদহেতু, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ একাকার হয় তবে, ইহা স্বপ্ন, ইহা জাগ্রৎ এইরূপ ভেদব্যবহার কি কারণে হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"অত্র"—এই স্বপ্নে, "বেদ্যম্"—পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ, "ন স্থিরম্"—স্থায়ী নহে, কেননা তৎসমূহ ব্যক্তিগত প্রতীতি দ্বারা নির্ম্মিত। "জাগরেতু স্থিরম্"—জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান বস্তু-সমূহ কিন্তু স্থায়ী, কেননা সময়ান্তরে (দুই একবৎসর পরেও অথবা অন্য জাগ্রদবস্থায়) তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। "অতঃ তদ্ভেদঃ"—এই হেতু অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ের স্থায়িতা ও অস্থায়িতা হেতু বৈলক্ষণ্যবশতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের পরস্পর ভেদ। (শঙ্কা) ভাল, স্বপ্ন ও জাগরণের যদি এইরূপ পরস্পর ভেদ রহিল, তবে তদুভয়ের সম্বিদেরও ভেদ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"তয়োঃ সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে"—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয় অবস্থায় সম্বিতের (জ্ঞানের) পরস্পর ভেদ নাই, কেননা উভয় অবস্থায় জ্ঞান একইরূপ। 'একরূপা' এই শব্দটি হেতুগর্ভ বিশেষণ, অর্থাৎ ইহা দ্বারা হেতু সূচিত হইতেছে ।৪।

এইরূপে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় জ্ঞানের একতা সিদ্ধ করিয়া সুষুপ্তিকালের জ্ঞানের ও জাগ্রৎ স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত একতা সাধন করিবার জন্য, সুষুপ্তিতে যে সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান থাকে—তাহার বিলোপ হয় না; তাহাই প্রথমে সিদ্ধ করিতেছেন :—

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধোভবেৎস্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥৫

অন্বয়—সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধঃ স্মৃতিঃ ভবেৎ। সা চ অববুদ্ধবিষয়া ; তৎ তমঃ তদা অববুদ্ধম্।

অনুবাদ—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের বোধ জন্মে, তাহা স্মৃতিরূপ। (পূর্ব্বে) অনুভূত বিষয়েরই (পশ্চাৎ) স্মৃতি হইয়া থাকে। সেই হেতু সুষুপ্তিতে, সেই অজ্ঞান অনুভূত হয়।

টীকা—"সুপ্তোত্থিতস্য"—প্রথমে সুপ্ত, পরে উত্থিত এইরূপে (স্নাতানুলিপ্তবৎ) সমাস ভাঙ্গিতে হইবে অথবা সুপ্ত অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে উত্থিত, এইরূপেও (পঞ্চমীতৎপুরুষ) সমাস ধরা যাইতে পারে; সেই সুপ্তোত্থিত পুরুষের, "সৌষুপ্ত-তমোবোধঃ"—সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের যে জ্ঞান,—অর্থাৎ তখন কিছুই জানিতেছিলাম না—এইরূপ যে জ্ঞান, "স্মৃতিঃ ভবেৎ" তাহা স্মৃতিরূপই হইতে পারে, অনুভবরূপ হইতে পারে না, যেহেতু অনুভবের কারণ যে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি সম্বন্ধ, 'ব্যাপ্তিলিঙ্গ' প্রভৃতি তাহাতে নাই—[অর্থাৎ সুপ্তোত্থিত পুরুষের যে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা সেই অজ্ঞানের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটেনা; তাহাকে অনুমান জ্ঞান বলিতে পার না, কেননা ধূমরূপ লিঙ্গের জ্ঞান দ্বারা যেমন অগ্নির ধূমে অবিনা-ভাব সম্বন্ধ হেতু—অগ্নিবিনা ধূম হয় না বলিয়া—অগ্নিরূপ 'সাধ্যে'র জ্ঞান হয় এস্থলে সেইরূপ কোনও লিঙ্গের জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞান জ্ঞান হয় না। তাহাকে উপমানজ্ঞান বলিতে পার না কেন না কোনও সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে শব্দজ্ঞান বলিতে পার না কেননা, বর্ণের অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট কোনও শব্দের জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে অর্থাপত্তিজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোনও উপপাদ্যের জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের জ্ঞানের ন্যায় সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না, এবং তাহা অভাব-জ্ঞান নহে, কেননা অভাবজ্ঞানের সামগ্রী অপ্রতীতি তাহাতে নাই। এই ছয়—প্রমাণ-জনিত জ্ঞানই অনুভবজ্ঞান। তদতিরিক্ত বলিয়া, এই সুপ্তোত্থিতের অজ্ঞানজ্ঞান স্মৃতিরূপ।]

(শঙ্কা) ভাল, তাহা দ্বারা কি সিদ্ধ হইল? সেইরূপ আশঙ্কার সমাধানহেতু বলিতেছেন—'সা চ অববুদ্ধ বিষয়া'—সেই স্মৃতি পূর্ব্বে সুষুপ্তিকালে অববুদ্ধ অর্থাৎ যাহার অনুভব হইয়া গিয়াছে,—সেইরূপ বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে. এই হেতু স্মৃতি অববুদ্ধ বিষয়া, কেননা, সংসারে স্মৃতি মাত্রই অনুভবপূর্ব্বক হইয়া থাকে—এইরূপ ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। (শঙ্কা) ভাল, তাহা ঠিক হইলেও, কি পাওয়া গেল? এই হেতু বলিতেছেন—"তৎ তমঃ তদা অববুদ্ধম্"—সেই কারণে অর্থাৎ যেহেতু অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে, সেই হেতু সেই সুষুপ্তিকালীন তমঃ (অজ্ঞান) সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। এস্থলে এই 'অনুমান' রহিয়াছে—'সুষুপ্তিকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না' এইরূপ যে অজ্ঞানের জ্ঞান, জাগ্রৎকালে হইয়া থাকে, এবং যাহাকে লইয়া এই বিবাদ বা সন্দেহ—"পক্ষ," তাহা অনুভবপূর্ব্বকই হইতে পারে,—"সাধ্য," যেহেতু তাহা স্মৃতি—"হেতু"। যাহা যাহা স্মৃতি, তাহা তাহা অনুভবপূর্ব্বকই হইয়া থাকে—"ব্যাপ্তি"। অন্যদেশে অবস্থিত পুত্রের "সেই আমার মাতা"—এইরূপ স্মৃতির ন্যায়—"উদাহরণ"।৫

সেই অনুভব, আপনার বিষয়—অজ্ঞান হইতে ভিন্ন, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্নের বোধ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ইহাই পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোক দ্বারা বুঝাইতেছেন :—

স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েপ্যেকা সম্বিত্তদ্বদ্দিনান্তরে ॥৬
মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥৭

অন্বয়—সঃ বোধঃ বিষয়াৎ ভিন্নঃ; বোধাৎ ন, স্বপ্নবোধবৎ। এবম্ স্থানত্রয়ে অপি সম্বিৎ একা

(এব)। তদ্বৎ দিনান্তরে। অনেকধা গতাগম্যেষু মাসাব্দযুগকল্পেষু সম্বিৎ একা, ন উদেতি, ন অস্তম্ এতি। ৬।৭

অনুবাদ—সেই বোধ সুষুপ্তিকালের অজ্ঞানানুভব আপন (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন স্বপ্নাবস্থার বোধ, বোধ হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই জ্ঞান একই। একদিনের তিন অবস্থার ন্যায় অন্য দিনেও জ্ঞানের ভেদ নাই। বিবিধপ্রকারে অতীত ও আগামী মাস, বর্ষ, যুগ ও কল্পেও জ্ঞান একই, তাহার উদয় নাই, অস্ত নাই।

টীকা—"সঃ বোধঃ"—সেই সুষুপ্তিকালের অনুভবজ্ঞান, "বিষয়াৎ ভিন্নঃ"—অজ্ঞানরূপ বিষয় হইতে অবশ্যই পৃথক্, যেহেতু তাহা বোধ, যেমন ঘটের বোধ (ঘট হইতে পৃথক্)। "বোধাৎ ন স্বপ্নবোধবৎ"—আর সেই বোধ জাগ্রৎস্বপ্নের বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু তাহা বোধ, স্বপ্নের বোধের ন্যায়, (স্বপ্নের বোধ যেমন জাগ্রতের বোধ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ।)

এইরূপে যে অর্থটি সিদ্ধ হইল, তাহারই উল্লেখ করিয়া সেই ন্যায়টিকে—সিদ্ধঅর্থকে অন্য দিবসাদি সম্বন্ধেও অতিদেশ করিতেছেন,—প্রযোজ্য বলিয়া দেখাইতেছেন—"এবং স্থানত্রয়ে অপি একা" (এব)—এইরূপে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েই সম্বিৎ একই। (মূলের পাঠ 'একা এব' এইরূপ না থাকিলেও, টীকাকার 'এব' শব্দ উহ্য করিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাহার সমর্থন জন্য বলিতেছেন) কেন না একটি ন্যায় আছে, যে সকল বাক্যই নিশ্চয়যুক্ত, (সুতরাং নিশ্চয়ার্থ 'এব' শব্দের গ্রহণে দোষ নাই। এইরূপ ন্যায় না মানিলে, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিবার জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যাইবে, তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে)। "তদ্বৎ দিনান্তরে"—যেমন একদিনে জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই জ্ঞান এক, সেইরূপ অন্যদিনেও জ্ঞান এক। "অনেকধা গতাগম্যেষু মাসাব্দযুগকল্পেষু"—অনেক প্রকারে অতীত ও ভবিষ্যৎ, চৈত্রাদি মাসে, 'প্রভব' প্রভৃতি সম্বৎসরে, সত্যত্রেতাদিযুগে 'ব্রাহ্ম' 'বারাহ' প্রভৃতি কল্পে, "সম্বিৎ একা" জ্ঞান অভিন্নই, ইহাই অর্থ। সম্বিতের একতা সিদ্ধ করিবার ফল বলিতেছেন—"ন উদেতি, ন অস্তম্ এতি"—যেহেতু সম্বিৎ একই এই হেতু ইহা উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না, কেননা সাক্ষিহীন উৎপত্তি ও বিনাশ দুইটিই অসিদ্ধ [অর্থাৎ উৎপত্তি বলিতে প্রাগভাবের অন্তক্ষণকে ও বিনাশ বলিতে প্রধ্বংসাভাবের প্রথম ক্ষণকে বুঝায় বলিয়া কেহই আপনার জন্ম ও নাশকে দেখিতে সমর্থ নহে। দীপ যেমন কেবল আপনার সমানকালীন বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সম্বিৎও ঠিক সেইরূপ। সম্বিতের স্থিতিকালে প্রাগভাব উপস্থিত নাই, এবং প্রধ্বংস ভাবও হয় নাই, সুতরাং তদুভয়ের যথাক্রমে অন্তিমক্ষণরূপ জন্মকে ও প্রথমক্ষণরূপ বিনাশকে, সম্বিৎ জানিতে সমর্থ হয় না।] সম্বিৎ আপনার উৎপত্তিবিনাশকে আপনার দ্বারাই ধরিতে অসমর্থ বলিয়া এবং অন্য সম্বিৎ নাই বলিয়া, সম্বিতের উৎপত্তি বিনাশ সাক্ষিহীন। সাক্ষী না থাকাতে সম্বিতের উৎপত্তি বিনাশ অসিদ্ধ; ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্কা) ভাল, যখন অন্য সম্বিৎ নাই, তখন জ্ঞাতা হইবার যোগ্য সাক্ষীর অভাব হেতু, এই সম্বিৎও প্রতীত হইবে না; তাহা হইলে, জগৎ সম্বন্ধে অন্ধতা বা অপ্রতীতি হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ জগৎ প্রকাশিতই হইতে পারে না। এই হেতু বলিতেছেন—'এষা স্বয়ং প্রভা"—এই সম্বিৎ স্বপ্রকাশরূপ অর্থাৎ আপনার প্রকাশের জন্য প্রকাশান্তরের অপেক্ষা রহিত (বা অবেদ্য হইয়াও অপরোক্ষ বা আপনার সত্তার দ্বারাই সংশয়াদি রহিত। এ স্থলে যে 'অনুমান' হইয়াছে, তাহা এইরূপ—সম্বিৎ স্বয়ংপ্রকাশ, যেহেতু জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ, যেমন ঘট। এইটি ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। এই হেতুটি বিশেষণের অসিদ্ধি-বিশিষ্ট নহে। কেননা যদি বলা যায় সম্বিৎ আপনিই আপনাকে জানিতে সমর্থ, তাহা হইলে, একই সম্বিৎকে কর্তা ও কর্ম উভয়ই হইতে হয়, তাহা বিরুদ্ধ বলিয়া হইতে পারে না, আর যদি বলা যায়, সম্বিৎ অপর সম্বিৎ দ্বারা বেদ্য, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হয় [সেই কারণে হেতুর বিশেষণ সিদ্ধ।] এই হেতু স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান সম্বিতের সমস্ত অনাত্ম বস্তুর প্রকাশক সম্ভব বলিয়া জগতের অপ্রতীতির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে না। ৭

এই প্রকারে প্রতিপাদিত হইল, যে নিত্য ও স্বয়ং-প্রকাশ সম্বিৎ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে—এক ও অভিন্ন এবং তাহা বিষয় হইতে ভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা—গত ৩১শে জানুয়ারী, রবিবার হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার পর্য্যন্ত ছয় দিবসব্যাপী ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মহা-সমারোহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিশেষ উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রথম দিন রবিবার শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। একখানি বৃহৎ রৌপ্য সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া বুড়ীগঙ্গার তীরবর্ত্তী করোনেশন পার্ক হইতে একটী শোভাযাত্রা সঙ্কীর্ত্তনসহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে উপস্থিত হয়। অতঃপর পদাবলী কীর্ত্তন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ঐ দিবস আনুমানিক ছয় সাত হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরদিন সোমবার দ্বিপ্রহর হইতে প্রায় পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত পদাবলী কীর্ত্তনান্তে একটী বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ও জননায়ক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ. বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠের স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, আনন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষা ভগিনী চারুশীলা দেবী, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, এম্-এ এবং মাননীয় সভাপতি মহাশয় "বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-ধারার প্রভাব" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যারতির পর সোণার গাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমানন্দ দত্ত মহাশয় ছায়াচিত্র-সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করেন।

তৃতীয় দিন মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮॥ ঘটিকার পর নবনির্ম্মিত স্কুল-গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভা-পতিত্বে একটী জনসভায় বিভিন্ন বক্তাগণ সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বামী মাধবানন্দ স্কুলগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। বেলা সাড়ে বারটা হইতে পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয় সুললিত ভাষায় শ্রীমদ্‌ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর ঢাকা ইউনিভারসিটীর ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত ভট্টশালী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী এবং সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় "শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। সভায় শ্রীযুক্ত আমোদিনী ঘোষের একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। রাত্রি নয়টার পর শ্রীশ্রীকালী-মাতার অর্চ্চনা হয়।

উৎসবের চতুর্থ দিন বুধবার দ্বিপ্রহর হইতে চারটার পর পর্য্যন্ত রামায়ণ গান হয়, পরে ঢাকা জুবিলী স্কুলের ছাত্রগণকর্ত্তৃক ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শিত হয়। এই দিবস ঢাকা ইউনিভার-সিটীর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, দর্শনসাগর মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী "বৈষ্ণবধর্ম্ম", শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র নাগ "ব্রাহ্মধর্ম্ম", শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন শাস্ত্রী মহাশয়

"রামানুজের মত", ডক্টর শহিদুল্লাহ্ "মুসলমানধর্ম্ম", স্বামী পবিত্রানন্দ এবং স্বামী মাধবানন্দ "সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। অতঃপর সুপণ্ডিত সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে সভাভঙ্গ হয়। সন্ধ্যারতির পর ঢাকার বিশিষ্ট ওস্তাদগণ ভজন গান করেন।

পঞ্চমদিন বৃহস্পতিবার জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর ছাত্র-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ভাইসচ্যান্সেলর ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঢাকা ইউনিভারসিটীর ছাত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিবিন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র-নারায়ণ রায়, ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশনের শ্রীযুক্ত দেব-কুমার বানার্জ্জি, "কমরুন্নেছা হাই স্কুলের" ছাত্রী শ্রীযুক্তা কমলা সেন, জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত সামসুদ্দীন আহ্ম্মদ ও শ্রীযুক্ত নদীয়ারচাঁদ পাল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, অধ্যাপক জুন্নরকর, স্বামী মাধবানন্দ এবং মাননীয় সভাপতি মহাশয় "ছাত্র-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনা-দর্শের প্রভাব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

ষষ্ঠদিন শুক্রবার গেণ্ডারিয়া আনন্দ আশ্রমে মহিলা দিবস প্রতিপালিত হয়। প্রায় তিন সহস্র মহিলা উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সকাল ৭॥ ঘটিকা হইতে ১॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আশ্রমের জনৈকা ব্রহ্মচারিণী কর্ত্তৃক বিশেষ পূজা হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং "নিমাই সন্ন্যাস" পালা গীত হয়। অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় শ্রীযুক্তা প্রিয়বালা মজুমদার মহাশয়ার সভানেতৃত্বে একটী বিরাট মহিলা সভায় ঐক্যতান বাদন, আবৃত্তি ও ভজন-সঙ্গীত প্রভৃতি মহিলাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগ, বি-এ, বি-টি, শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন, শ্রীযুক্তা অরুণা ভদ্র, শ্রীযুক্তা বিনয়বালা দাসগুপ্তা ও ভগিনী চারুশীলা দেবী "নারীজাতির আদর্শ ও শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর প্রসাদ বিতরণ ও সন্ধ্যারতির পর উৎসব শেষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক সঙ্গীত-সম্মিলনী—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক সঙ্গীত সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণের পর নসীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সমর্থনে গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি একটী সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত নটবর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হয়। এই সম্মিলনী ৪ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর ম্যারিস্ হিন্দুস্থানী কলেজ অব মিউজিকের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণরতন ঝঙ্কার, পুনা মহাগন্ধর্ব্ব বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত ভি, এন্ পট্টবর্দ্ধন, বম্বের পণ্ডিত গজানন্দ রাও যোশী, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দত্ত (দানী বাবু), গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কুমার শচীন দেব বর্ম্মন, এনায়েৎ খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক), রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন মুখার্জ্জি, রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল মুখার্জ্জি, কালীপদ পাঠক, পরেশ ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র গোপাল পুরোহিত, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী, অনাথনাথ বসু, দুর্লভ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মুরারী মোহন মিশ্র, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী

বীণাপাণি মুখার্জ্জি, শান্তিলতা বানার্জ্জি, গৌরীরাণী সেন, রতনমালা সেন, মিনতি বানার্জ্জি, বেলা সরকার, শোভা কুণ্ডু, আরতি দাস, রেবা সোম, প্রতিভা সেন, যূথিকা রায়, শ্রীযুক্তা উত্তরা দেবী প্রভৃতি বিখ্যাত গায়ক, গায়িকা ও যন্ত্রকুশলিগণ ইহাতে যোগদান করিয়া সঙ্গীতকলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শেষদিনের কার্য্যসূচী কেবল মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সম্মিলনীর অবসানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ প্রিন্সিপাল রতন ঝঙ্কার বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর প্রকারভেদ কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিয়া সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী গভীর গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন।

সম্বলপুর (উড়িষ্যা)—১২ই ফেব্রুয়ারী প্রভাতে পূজা ও হোম এবং বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-চিত্র সমভিব্যাহারে শোভাযাত্রা। ১৩ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া টাউন হল প্রাঙ্গণে সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মেলন। সভাপতি হন, স্থানীয় ডেপুটি কমিশনর রায় রাধাচরণ দাস বাহাদুর। শ্রীযুক্ত লালমোহন পাটনায়েক উড়িয়াতে খৃষ্টধর্ম্ম, দিল্লী হইতে আগত হজরত খাজা হাসান নিজামী উর্দ্দুতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম', লুধিয়ানা হইতে আগত মৌলবী গাজী মহম্মদ হিন্দীতে বর্ত্তমান ধর্ম্মসমস্যা এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ ছায়াচিত্রে বৈদিকযুগ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বাংলায় বক্তৃতা করেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রভাতে ডেপুটি কমিশনার কর্ত্তৃক ভিক্টোরিয়া টাউন হলে শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। অতঃপর এক সভায় স্বামী বাসুদেবানন্দের সভাপতিত্বে নিজামী সাহেব ইসলাম ধর্ম্মে ভক্তি ও উপাসনার স্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দ্বিপ্রহরে প্রায় ১৫০০ দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। সান্ধ্য সম্মেলনে মৌলবী গাজী মহম্মদ উর্দ্দুতে ইসলাম ধর্ম্ম, শ্রীযুক্ত এস্ রাও উড়িয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম, শ্রীমতী পি, ঘোষ বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী মেঘেশ্বরানন্দ হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী স্বামী মেঘেশ্বরানন্দ বৈকালে মাড়োয়ারী এবং কচ্ছীদের সভায় "হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় পুনরায় সম্মেলন আরম্ভ হয়। স্বামী বাসুদেবানন্দ বিশ্বের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। পরে মিঃ বালমুকুন্দ বোহিদার ইংরাজীতে "ধর্ম্মসমন্বয়", শ্রীযুক্ত বিমলেশ্বরানন্দ উড়িয়াতে "আর্য্য-সমাজ" এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া বাংলায় "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন বেজ বড়ুয়া মহাশয়ই এই দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী স্বামী বাসুদেবানন্দ সম্বলপুর হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী ধামা গ্রামের বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী সম্বন্ধে উড়িয়া বালকদের নিকট এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই দিন সন্ধ্যায় ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ের গৃহে সমস্ত হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বক্তা ও কর্ম্মীদের এক সান্ধ্য ভোজের অনুষ্ঠান হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল—গত ২৫শে হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বরিশালে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শতবার্ষিকী সপ্তাহের প্রতিদিনই স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে বিপুল জনসমাগম হইত। উৎসবের পূর্ব্ব দিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানমূর্ত্তির দুই সহস্র হাফটোন ছবি কার্য্যসূচীর সহিত গৃহে গৃহে বিতরিত হয়। প্রথম দিবস পূর্ব্বাহ্ণে উষা-কীর্ত্তন ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা এবং অপরাহ্ণে রামনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন হয়। আশ্রম-প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সুবৃহৎ মণ্ডপ ধর্ম্মাচার্য্য ও মহাপুরুষগণের বড় বড় ছবি

এবং নানাধর্ম্মের বৃহৎ প্রতীক দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবসে সঙ্গীত বাদ্যাদির আয়োজন ছিল। সহরের কয়েকটী বালক-বালিকা স্তোত্র-পাঠ, আবৃত্তি, ভজন ও সেতার বাদ্য দ্বারা সমাগত প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে কয়েক ঘণ্টা মুগ্ধ করিয়া রাখে। সহরের কয়েকজন ভদ্রলোকের ওস্তাদী গান এবং কনসার্ট বাদ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করে। তৃতীয় দিবসে বেলুড় মঠের স্বামী মাধবানন্দ বিশাল জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পুরীর স্বামী পারিজাতানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর মধ্যে বর্ত্তমান জগৎ-সমস্যার যে সমাধান নিহিত আছে, তাহা ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। স্থানীয় চৈতন্য হাই স্কুলেও ঐ দিবস শতবার্ষিকী পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে উক্ত স্বামীজিদ্বয় তথায় ছাত্রগণের উপযোগী বক্তৃতা করেন। ঐ স্কুলে ছাত্রগণের আবৃত্তি, ভজন ও ব্যায়াম-প্রদর্শন উৎসবের শ্রী বৃদ্ধি করে। চতুর্থ দিবস, মহিলা দিবসে স্বামী মাধবানন্দ এবং স্বামী পারিজাতানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে দুইটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। মাতাজি শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী অসুস্থতা সত্ত্বেও অল্পক্ষণের জন্য মহিলা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস সহরের বৃহত্তম হাই স্কুল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক শতবার্ষিকী উৎসব পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চম দিবসে এক বিরাট শোভাযাত্রা মিশন হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান রাস্তাগুলি ঘুরিয়া প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শোভাযাত্রার সংকীর্ত্তন ও গান দ্বারা সহর মুখরিত হয়। স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজ ও অন্যান্য হাই স্কুলের ছাত্রগণ শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শোভাযাত্রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একটী বৃহৎ তৈলচিত্র কাঠের সিংহাসনে সজ্জিত করিয়া ছাত্রগণ বহন করে। শতবার্ষিকীর ব্যাজ পরিহিত যুবক ও বালকের দল নানা রংয়ের নিশান উড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে সহরবাসীদের আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল। উক্ত দিবস ব্রজমোহন কলেজে স্বামী মাধবানন্দ ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় শোভাযাত্রার পর আশ্রমে স্বামীজি ইংরাজীতে সওয়া ঘণ্টাব্যাপী আর একটী বক্তৃতায় সহরের অফিসার, উকিল ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে মোহিত করেন। ৩০শে জানুয়ারী, ছাত্রসভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে আগত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ছাত্রসভার সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা করেন। স্কুল ও কলেজের কয়েকটী ছাত্রছাত্রীর গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ প্রভৃতি ছাত্রসভার প্রধান অঙ্গ ছিল। কলেজের জনৈক মুসলমান ছাত্র কর্ত্তৃক একটী ইংরাজী বক্তৃতাও হয়। ছাত্রসভা সমাপ্ত হইলে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবনের ছাত্রগণ বেলুড় মঠের স্বামী প্রেমঘনানন্দ কর্ত্তৃক এই উৎসবোপলক্ষে বিশেষভাবে লিখিত 'পথের সন্ধান' নামক একটী ছোট নাটকের অভিনয় করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধন করেন। নাটকটী বরিশালেই প্রথম অভিনীত হইল। নাটকটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের যত মত, তত পথ' ভাবটী ফুটাইয়া তুলিতে লেখক প্রয়াস পাইয়াছেন।

৩১শে জানুয়ারী প্রাতে ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণ পৃথকভাবে শতবার্ষিকী উৎসব করে। এই উপলক্ষে কলেজে ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দে মহাশয় দুইটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। ডাঃ সরকার মহাশয় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে প্রদর্শন করেন। ঐদিন জগদীশ আশ্রমে ডাঃ সরকার মহাশয় ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রামকৃষ্ণ মিশনে শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রায় চারি সহস্র

নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করে। প্রসাদ বিতরণের পর ব্রজমোহন কলেজের ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীসুবোধচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা মহাশয় তাঁহার ছাত্রদল লইয়া আশ্রমে নানাপ্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

ঝালকাঠি—গত ৩১শে জানুয়ারী এখানে শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নরোত্তমপুর রামকৃষ্ণ-নিত্যানন্দ আশ্রমের স্বামী বিশুদ্ধানন্দ প্রাতে ঊষাকীর্ত্তনের পর পূজাদি করেন। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। বরিশালের উকিল শ্রীযুক্ত শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল মহাশয় সন্ধ্যায় বৃহৎ জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করেন। সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের মুদ্রিত উপদেশ বিতরিত হয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ডোমার (রংপুর)—গত ৪ঠা ফাল্গুন ডোমারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের সংবাদে বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে ডোমারে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকা হইতে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটী ধর্ম্মমহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। তাহাতে স্বামী প্রেমঘনানন্দ এবং রংপুর কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত, তত পথের' উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ডিমলার শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত, স্থানীয় হাই স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত কাব্যতীর্থ ও হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বক্তৃতা করেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মির্জ্জামল আগরওয়ালা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ডোমার হাই স্কুলের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়।

পরদিন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় স্থানীয় হরিসভা নাট্যমন্দিরে ডোমার স্কুলের ছাত্র এবং উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়ের সম্মিলিত সভায় স্বামী প্রেমঘনানন্দ সরস গল্পের মধ্য দিয়া মানব জীবন গঠনের আদর্শ এবং রাজসাহী বিভাগের স্কুলসমূহের স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয় "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ও পেশী সঞ্চালন প্রভৃতি বিভিন্ন শারীরিক কসরৎ দেখাইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরমানন্দ দান করেন।

রাইগঞ্জ—গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাইগঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বহু নরনারী বিশেষ উৎসাহের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র মিত্র, রাজকাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সিকদার, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দে, ডাক্তার সতীশচন্দ্র নাগ, ডাঃ হরিদাস দে, উকিল শ্রীযুক্ত সুকুমার গুহ, উকিল শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, উকিল শ্রীযুক্ত কুমারেশচন্দ্র রায়, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মুক্তেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্যে রাইগঞ্জ শতবার্ষিকী কমিটি এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠের স্বামী গিরিজানন্দ ও দিনাজপুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দের উপস্থিতিতে স্থানীয় যুবকবৃন্দ ও সকল সম্প্রদায়ের গ্রামবাসিগণ বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হন। পূর্ব্বাহ্ণে একটী শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তনসহ স্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্নে শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পরে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে উপস্থিত সকলেই সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসব উপলক্ষে সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

অপরাহ্ণে উকিল শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় স্বামী গিরিজানন্দ ও স্বামী গদাধরানন্দের সুললিত ভাষায় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির জীবনী আলোচনা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীনগর, ঢাকা—শ্রীনগরের জমিদার লালা প্রদ্যোতকুমার বসু ও লালা ভূপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের উৎসাহে স্থানীয় 'বিবেকানন্দ সেবাশ্রম সঙ্ঘে' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব বিশেষ সমারোহে উদ্যাপিত হইয়াছে।

প্রথম দিবস বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর শ্রীনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী ও দেউলভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমবেত জনসাধারণকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃত 'রাই উন্মাদিনী' পালা কীর্ত্তন শুনাইয়া বিশেষ আনন্দ দান করেন। অতঃপর প্রায় এক হাজারের উপর ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমান তেজেন্ময় ঘোষ দস্তিদার 'শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা' ও 'বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, সোনার গাঁ (ঢাকা)—সোনার গাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শতবার্ষিকী উৎসব গত ২৪শে মাঘ হইতে আরম্ভ হইয়া নয় দিন বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন বেলুড় মঠের স্বামী অসীমানন্দ বিপুল জনতার মধ্যে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। রেডিও এম্পলিফায়ার যোগে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের বিশ্বশান্তি বাণী পঠিত হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি, আর, এস্, দর্শনসাগর মহোদয়ের অধিনায়কত্বে ধর্ম্ম-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী সাধনানন্দ, শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, মৌলবী মোতাহার হোসেন এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মনীষিগণ "ধর্ম্মসমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রায় সহস্রাধিক লোক উক্ত সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।

সোমবার ঢাকা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চাইসন এবং তাঁহার ইউরোপীয় সহকর্ম্মী প্রাতে ৮ ঘটিকায় এখানে আসিয়া প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

মঙ্গলবার প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পাঠ করেন।

বুধবার মধ্যাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণে এক জনসভা আহ্বান করিয়া তাঁহার জীবনী আলোচনা করা হয়। সভার সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি অর্ঘ্য প্রদান করেন।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সাধনানন্দের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমন্বয়"। তৎপর রেভ ওলার্ড যীশু-খ্রীষ্ট ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শুক্রবার মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব কোরাণ সরিপ পাঠ করেন।

নবম দিবস রবিবার অপরাহ্ণে বার্ষিক সভার অধিবেশনে শতবার্ষিকী কমিটির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হাসিময় সেন মহাশয় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দকে সম্বর্দ্ধনা করেন। বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর

স্বামীজি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর মৌলবী আহম্মদ হোসেন খন্দকার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় দরিদ্রনারায়ণ সেবা আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাধারণে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। প্রায় দেড় হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন।

বেলিয়াতোড় (বাঁকুড়া)—গত ১লা, ২রা, ৩রা ফাল্গুন বেলিয়াতোড় জনসাধারণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী ঈশানানন্দ ও স্বামী মনীষানন্দ, পুরুলিয়া হইতে স্বামী তপানন্দ এবং বাঁকুড়া হইতে স্বামী স্বানুভবানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বামী মহেশ্বরানন্দ আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু জনসমাগমের ভিতর তিন দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি ও প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম সভা ও ছাত্র-সভার অনুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণীর প্রচার বহুলোকের নয়ন আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল। কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কালী-কীর্ত্তন সমিতি (এমেচার) কর্ত্তৃক গীত শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীকালী-কীর্ত্তন বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। স্বামী ঈশানানন্দ, স্বামী তপানন্দ ও বাঁকুড়ার বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত ওঙ্কারানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গান সকলের বিশেষ মনোরঞ্জক হইয়াছিল। তৃতীয় দিবস রাত্রিতে এক সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে তৃপ্তি সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ ভোজন করান হয়। বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হইয়াছিল।

পঞ্চখণ্ড—বিয়ানীবাজার (শ্রীহট্ট) পঞ্চখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে পঞ্চখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠানের পর শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন হইয়াছিল।

গত ৪ঠা পৌষ হইতে দশদিনব্যাপী পঞ্চখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর শেষ উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। এই দশদিন পঞ্চখণ্ডে এক বিরাট ধর্ম্মমেলা বসিয়াছিল। প্রত্যহ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর সমাবেশ হইত।

উৎসবের প্রথম দুইদিন শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ পুরাণ পাঠক শ্রীযুক্ত দুর্গেশনন্দন চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মশাস্ত্রী মহাশয় "ধ্রুব-চরিত্র" ও "দক্ষযজ্ঞ" আলোচনা করেন। ইহার পর চারিদিন প্রসিদ্ধ ভগবদ্বক্তা শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, বি-এ, ভাগবতরত্ন মহাশয় ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের সুললিত দার্শনিক আলোচনা করিয়া অগণিত নরনারীকে মুগ্ধ করেন।

১০ই পৌষ, অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনার জন্য বেলুড় মঠের স্বামী তপানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়।

সভার পর স্বামী সৌম্যানন্দ ছায়াচিত্র সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-কথা আলোচনা করেন। রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা হইতে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের "শঙ্করাচার্য্য" অভিনীত হয়।

১১ই পৌষ, শনিবার ভোর হইতে গীত-বন্দনা, পূজা, হোম, কালীকীর্ত্তন, পদাবলী কীর্ত্তন, ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ চলিতে থাকে।

১২ই পৌষ সকালে ভজন-সঙ্গীত চলে। অপরাহ্ণে পঞ্চখণ্ডের নিজস্ব "কাডা"র বাদ্যের ব্যবস্থা হয়। স্বামী তপানন্দ দলের নায়ককে সুবর্ণ-মণ্ডিত লকেট দ্বারা পুরস্কৃত করেন। এইদিন রাত্রে পরশুরামের "বিরিঞ্চি বাবা" অভিনীত হয়।

পরদিন পঞ্চখণ্ড আশ্রমের বালক-কর্ম্মীদের মধ্যে ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা হয়। শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষে স্বামী তপানন্দ একটী রৌপ্যপদক প্রদান করেন।

জনসাধারণ জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে এই উৎসবে যোগদান ও অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

করিমগঞ্জ—করিমগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ-শত-বার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দিবস চতুষ্টয়ব্যাপী আনন্দোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

১৮ই ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকায় বেলুড় মঠের শতবার্ষিকী কমিটির প্রচারক স্বামী তপানন্দ শান্তিপাঠ করতঃ উৎসবের উদ্বোধন করেন। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ সেতারবাদক শ্রীযুক্ত বাঁকেবিহারী দোবেজি তদীয় সেতারবাদন দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

ঐদিন সাড়ে ছয় ঘটিকায় স্থানীয় মহকুমা হাকিম মিঃ এম, এইচ, হোসেনের সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটী জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পর সভাপতি মহোদয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ অভিভাষণ দেন। তিনি নিলামবাজার নিবাসিনী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাস কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে নব নির্ম্মিত আশ্রমের ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

১৯শে ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দ উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতীক ও পতাকাসহ আলোকমালা পরিশোভিত সুন্দর একটী বিরাট শোভাযাত্রা আশ্রম-প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। তৎপর একটী জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্বামী তপানন্দ অতি সুললিত এবং মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং শত-বার্ষিকী উৎসবের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে একটী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন।

২০শে ডিসেম্বর সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্ণে পূজা, হোম, ভজন ও শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ শর্ম্মা কর্ত্তৃক পদকীর্ত্তন গীত হয়। বায়-নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রুক্মিণীমোহন চৌধুরী মহাশয় এবং নীলামবাজার নিবাসিনী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাস কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে নব-নির্ম্মিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির-প্রতিষ্ঠা এই উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। প্রায় তিন সহস্র নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুত কুমুদচন্দ্র চন্দ মহাশয় পদ-কীর্ত্তন করেন। রাত্রি সাড়ে ছয় ঘটিকায় স্বামী সৌম্যানন্দ ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীরামকৃষ্ণ ও সঙ্ঘ" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর বিশেষজ্ঞগণের বৈঠকে সঙ্গীত জলসা হয়।

২১শে ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় মহিলা সম্মেলন হয়। উক্ত সভায় স্বামী তপানন্দ "মাতৃ-জাতির আদর্শ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রাত্রি সাড়ে ছয় ঘটিকায় শিলংয়ের ডেপুটী কন্ট্রোলার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্বামী ভূতেশানন্দ ও স্বামী তপানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় একটী তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ দিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মিলনী—গত ১লা মার্চ্চ কেন্দ্রীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা টাউনহলে বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মিলনী আরম্ভ হইয়া ৮ই মার্চ্চ শেষ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ উদ্বোধনের পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি

স্বামী অখণ্ডানন্দ

কয়েকদিন পবেই আবাব দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখি ব্রাহ্মসমাজেব সেই মেয়েটি ঠাকুবেব ঘবে বয়েছে। আমি ঠাকুবেব কাছে গিযে বসলুম। আবও দুই তিনজন ভদ্রলোক এবং বামলালদাদাও ছিলেন। ঠাকুব বলছেন, "দেখ গা, এই মেয়েটির মুখে "এস মা এস মা" গানটি শুনতে আমাব বড ভাল লাগে, তাই বিজয় এলে এ মেয়েটি যদি না আসত ত বলতুম, ওগো সেই মেয়েটিকে আনলে না? এবারে ও রয়ে গেল। সেদিন দেখি, আমাকে দেখে ঘোমটা টানছে। আমি বললুম, 'সেকি গা, তুমি আমাকে দেখে ঘোমটা টানছ কেন?' দেখি গা নেড়ে নেড়ে বলছে, 'তা কি তুমি জান না?' আর একদিন দেখি, ঘোমটার ভিতর কাঁদছে। আমি বললুম, 'সেকি গা, তুমি আমাকে দেখলে ঘোমটা টান আবার কাঁদ! কি ব্যাপার?' সে বললে, 'তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে মধুব ভাব।' আমি বললুম 'সেকি গো—আমাব যে মাতৃভাব'।" এই বলে ঠাকুর হঠাৎ উঠে পড়লেন, রাগে তাঁব শবীবটা ফুলে উঠল, কাপড় খসে পড়ল। একবার ঘবেব এমাথা আবাব ওমাথা সিংহেব মত যাওয়া আসা করতে লাগলেন আব বলতে লাগলেন, "রামলাল! রামলাল!! হাবামজাদী বলে কিনা মধুর ভাব!" আবও কত গালাগাল করতে লাগলেন। তাঁব সেই উগ্রমূর্ত্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে রইলুম। বামলাল তারপর ঐ মেয়েটিকে বলছেন, 'ওঠ, ওঠ শিগগির ওঠ'। তারপর তাকে আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে নবতের ঘাট দিয়ে একখানা পান্‌সী নৌকায় তুলে দিলেন। তখন ভাঁটার সময় ছিল। নৌকায় তাকে কলকাতার দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর সেই মেয়েটি চলে গেলে তিনি সহজ অবস্থায় সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। তাঁর কাছে যখন গেছি, যত রকমের লোক আসতেন সকলের সঙ্গে ধর্ম্ম এবং ভগবান ছাড়া অন্য কথা কইতেন না, মধ্যে মধ্যে রঙ্গরসের কথা কয়ে হাস্য-রসের ফোয়ারা ছুটায়ে দিতেন। একদিন বলছেন, 'দেখ অনেক রকম সিদ্ধ আছে। সিদ্ধ মানে কি জান? যেমন আলুপটল সিদ্ধ, সিদ্ধ হলে নরম হয়। অনেক রকম সিদ্ধ আছে—নিত্য সিদ্ধ, হঠাৎ সিদ্ধ, স্বপ্নসিদ্ধ, দৈবসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, এই বলে স্বপ্নসিদ্ধ ও হঠাৎ সিদ্ধ সম্বন্ধে বললেন, "এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী, তারা বড় গরীব, তাদের একটী মাত্র ছেলে বিদেশে চাক্‌রী করে, তাতেই তাদের চলে। ব্রাহ্মণ তার কুটীরে মাদুরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় ডাকহরকরার হাতে ব্রাহ্মণী এক চিঠি পেয়ে প্রতিবেশী একটি লোককে দিয়ে পড়িয়েছে, তাতে তাদের জীবনের আশা ভরসাস্থল একমাত্র পুত্র বিসূচিকা রোগে মারা যাওয়ার সংবাদ পায়। এদিকে ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দিব্য অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে সাত ছেলের বাপ হয়ে দেখে তার চারদিকে সেই সাত ছেলের কেউ পাকাচুল তুলছে, কেউ পা টিপে দিচ্ছে, কেউ গা হাত টিপে দিচ্ছে, কেউ বাতাস কচ্ছে, কেউ জল এনে খাওয়াচ্ছে; ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর উঠে দেখে যে সেই কুঁড়ে ঘরে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আছে আর সাত ছেলের কেউ নেই। তখন ব্রাহ্মণ তারা কোথায় গেল ভেবে গভীর চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় ব্রাহ্মণী "ওগো আমাদের কি হল গো" বলে ডাক্ ছেড়ে কুঁড়ে ঘরে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণের তখনও হুঁস নাই। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে ঐরূপ অবস্থায় দেখে কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণের হুঁস করিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, তুমি অমন করে বসে আছ কেন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে? ব্রাহ্মণ বললে, কি হয়েছে? 'ছেলে যে আর নাই।' তখন ব্রাহ্মণ বলছে—বলি, তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদছ, আমি যে এখনি দেখছিলাম, আমার সাত ছেলে, আমার চারদিকে ঘিরে আমার সেবা করছে। এখন আমি তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদব না আমার ঐ সাত ছেলের জন্য কাঁদব? এটা যদি স্বপ্ন হয়, তবে ওটাও স্বপ্ন!"

"হঠাৎ সিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ রাত্রিবেলা এক খাল দিয়ে নৌকায় লগি বেয়ে যাচ্ছেন, পাশে শ্মশান। শুনতে পেলেন এক সাধক পালাচ্ছেন। ব্যাপার হয়েছে কি, এক সাধক ঐ শ্মশানে শবাসন করে-ছিলেন। শবাসনের নিয়ম এই যে, শব উপুড় হয়ে থাকে আর তার উপর বসে জপ করতে হয়। জপ করতে করতে শবটা যখন হঠাৎ জেগে ওঠে তখন তার মুখে ছোলা ও কারণ দিতে হয়। শবটা এইরূপে মাঝে মাঝে বিভীষিকা দেখায়। ঐ সাধক শবের বিভীষিকা দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। ঐ ব্রাহ্মণ তাই না শুনে মাঝিকে বলছেন, 'নৌকা ভিড়াও'। নৌকা ভিড়ালে ব্রাহ্মণ সেই শ্মশানে গিয়ে শবের আসনে বসতে না বসতেই মা আবির্ভূতা হলেন। বল্লেন, 'বাবা, বর নাও'। ব্রাহ্মণ বললেন, "মা! তুমি ত বড় পক্ষপাতী, সাধকটি এত কল্লে, তাকে কিনা বিভীষিকা দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলে আর আমি বসতে না বসতেই তুমি এসে হাজির।" মা বল্লেন, "বাবা, তুমি যে জন্মে জন্মে অনেক করেছ। আর ও সবে এই আরম্ভ করেছে, এখনও ঢের করতে হবে।"

আর একদিন গিয়ে আমি রাত্রে ঠাকুরের কাছে থাকি। তখন হরিশ কুণ্ডু রাত্রে ঠাকুরের কাছে থাকত। ঠাকুর সবকে ধ্যান করতে বসিয়ে দিতেন। ধ্যানের সময় সব ছেলেরা ইষ্টদেবতার সঙ্গে কথা কইতে কইতে কখনও হাঁসতেন, কখনও কাঁদতেন। সে যে কি বিমল আনন্দ তা মুখে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গেলেই তিনি

জিজ্ঞাসা করতেন, "হাঁরে ধ্যান কত্তে কত্তে, প্রার্থনা কত্তে কত্তে তোর চোখে জল এসেছিল?" আমি একদিন বলেছিলাম, 'জল এসেছিল' আর শুনে কি খুসী। বলতেন, "অনুতাপ-অশ্রু চোখের কোণে (নাকের মাথার কাছে) দিয়ে আসে আর প্রেমাশ্রু চোখের প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে আসে।" 'প্রার্থনা কেমন করে করতে হয় জানিস', বলেই ছোট ছেলের মত হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগলেন, 'মা আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে, আমি যে কিছুই চাইনে মা, আমি যে তোকে ছাড়া আর থাকতে পারিনে না।' তাঁর কাপড় খুলে গিছিল, তখন তাঁর সেই মূর্তি দেখে মনে হল ঠিক যেন একটি বালক। দরবিগলিত ধারায় বুক ভাসায়ে গভীর সমাধি মগ্ন হলেন। এই দেখে আমার ধারণা হল যে, ঠাকুর আমারই জন্য এই প্রার্থনা করলেন।

স্বপ্ন সম্বন্ধে বলতেন, 'স্বপ্নে কেহ এসে পট্ পট্ করে দীপ জেলে দিয়ে গেল, আগুন লেগে গেল—কি নিজেই নিজের নাম ধরে ডাকল, এসব খুব ভাল। শেষের স্বপ্নটি চরম স্বপ্ন।'

কথাপ্রসঙ্গে একদিন দিগম্বর বাউলের (ঠাকুরের সমসাময়িক) কথা উঠল। দিগম্বর বাউলকে আমি অনেকবার দেখেছি। বাংলা, হিন্দী, ফারসীতে ছড়া বলে কাঠি বাজিয়ে শেষে 'হরি হরি বলে' বলতেন। পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়াতেন। ঠাকুর বলতেন, তিনি হরিনামে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর বিভূতি ছিল। পাথুরিয়া-ঘাটায় দুর্গাপদ ঘোষ তাঁর খুব অনুগত হন। বাগবাজারে (মাতাঠাকুরাণীর বাড়ীর কাছে) মস্ত বাড়ীতে তিনি শেষ বয়সে থাকতেন। দুর্গাপদ ঘোষ তখন তাঁর সেবায় রাশ রাশ টাকা খরচ করছেন। দোল উৎসবের সময় তাঁকে দোলে চড়ান হয়েছে, রং দেওয়া হয়েছে—মহাধুমধাম। তাই স্বামিজীর সঙ্গে একবার গেলাম, গিয়ে দেখি বিছানায় শুয়ে আছেন। তক্তাপোষের নীচে বড় মুখওয়ালা একটি পাতিভাড় রাখা হয়েছে। আমাদের দেখে—যখন আমরা বললুম যে ঠাকুরের কাছ থেকে আসছি—তখন উঠে বসলেন। কথা কচ্ছেন কচ্ছেন, হঠাৎ ভাড়টি নিয়ে আমাদের সামনেই পেচ্ছাব করলেন। তিনি উলঙ্গ। আবার খানিকপরে ঐ ভাড়টা নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেল্লেন। আমরা বল্লাম, 'করেন কি মশায়'। তিনি বল্লেন, 'এ আর কি মশাই, ওলাউঠা হয়েছিল—তা যত বেরিয়েছে সব আবার এখানে (পেটে) দেওয়া হচ্ছে। নবদ্বার দিয়ে যা বেরোয় সব আবার দিতে হয়। এই আমাদের মত।' তিনি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।

সে সময় ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন তাঁরা যখন ধ্যানে বসতেন—অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে—তখন ইষ্টদেবের সহিত তাঁহাদের হাসি কথাবার্ত্তা ইত্যাদি দেখলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। তাঁর অন্তরঙ্গদের প্রায় সকলেরই মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার কিছু না কিছু দেখা যেত। একমাত্র স্বামিজীই চাপা ছিলেন। সহজে তিনি কোনও ভাবে হঠাৎ বিচলিত হতেন না।

আর একদিনের কথা, সেদিন রাত্রে তাঁর কাছে ছিলুম, সকালে উঠে বড় ভালবেসে—দু-চার জন লোক যারা আসেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। বিষ্ণুমন্দির, কালীমন্দির সকল স্থান বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, দ্বাদশ শিবমন্দিরে "নমঃ শিবায় শান্তায়" বলে একে একে প্রণাম কচ্ছি। তারপর ঘুরে ফিরে তাঁর কাছে এসেছি। আমাকে তখন বললেন, 'আমাকে চাঁদনীর ঘাটে নাইয়ে আনবি চল'। আমাকে কমণ্ডলু নিতে বললেন। আমার তখন স্নান হয়ে গেছে। আমি তখন একবস্ত্র, অনেকবার স্নান করি। আমি কমণ্ডলুটা নিয়ে গেলাম। ঘাটে গিয়ে দেখি—চাঁদনীর ঘাটে কালী-বাড়ীর খাজাঞ্চি এক পা গঙ্গাজলে আর এক পা

ধাপে দিয়ে আছেন, তাঁর ফাটা পা, ফাটা তুলবে বলে খুব ঘসছেন। ঠাকুর গেলেন, সেদিকে দৃষ্টি-পাতও নেই। ঠাকুর আস্তে আস্তে চাঁদনীর ঘাটের উত্তর ঘেঁসে প্রায় এক কোমর জলে নেবে জল দিচ্ছেন মাথায়। একটু একটু জল দিচ্ছেন, কুলকুচ করছেন কিন্তু ডান হাতের উপর। আজ তাঁর স্নানে বেশ বুঝা গেল—অতি কষ্টেই যেন পবিত্র জলে পা দিয়েছেন। এদিকে আর একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—তাঁকে দেখেই মনে হল যে পাড়াগেঁয়ে—ঘাটে এসেই খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এখানকার খাজাঞ্চি?' খাজাঞ্চি যখন বললে 'হাঁ', তখন তিনি ধাপে বসে 'পুকুরে কত মাছ হয়, বাগানে ফলমূল যা হয়—তা বিক্রী করে কত টাকা হয়' ইত্যাদি কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তখন ঠাকুর আড়ে আড়ে সেই ব্রাহ্মণের দিকে দেখছেন, মুখে একটু বিরক্তির ভাব। স্নানের পর তাঁকে ঘরে নিয়ে এলাম। কাপড়ে গঙ্গাজল দিলাম। কাপড় পরলেন ও ঠাকুর প্রণামাদি করে প্রসাদী ফলমূল খেলেন। তারপর একটা লোক বাইরে এসে পয়সা চেয়েছে, ঠাকুর আমাকে ডেকে তাঁর ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণের দিকের তাকের উপর চারটি পয়সা দেখায়ে বললেন, 'যা এই পয়সা চারটি নিয়ে ঐ লোকটিকে দিয়ে আয়।' তারপর যখন পয়সা দিয়ে এসেছি তখন আমাকে বললেন, 'গঙ্গাজলে হাত ধো'। আমি গঙ্গাজলের জালার জল নিয়ে হাত ধুলাম। তখন ঠাকুর আমাকে কালীঘাটের মার পটের কাছে নিয়ে 'হরিবল হরিবল' বলে অনেকক্ষণ আমাকে হাত ঝাড়ালেন—নিজেও হাত ঝাড়লেন, সে অনেকক্ষণ। তখন এই ব্যাপারে পয়সা যে বিষ্ঠার চেয়েও ঘৃণ্য এটা যেন হৃদয় মধ্যে একেবারে চিরদিনের মত ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর চৌদ্দ বৎসর ভ্রমণ করেছি, কোথাও পয়সা ছুঁইনি। এখনও টাকাপয়সার উপর যে ঘৃণা রয়েছে তাও এই ব্যাপারের ফল। এখন আমার মনে হয় তিনি আমারই জন্য এত করেছিলেন। জীবের কল্যাণের জন্যই তিনি দেহ ধারণ করে এসেছিলেন, তাই আমাদের জন্য এত করেছেন।

তারপর প্রসাদী ফলমূলাদি গ্রহণ করে একটু তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় সেই গঙ্গার ঘাটের বামুনটি ঠাকুরের ঘরের কাছে এসে হাজির; বলছেন, 'এখানে হবিশ আছে—হবিশ, (হবিশ কুণ্ড)?' ঠাকুর উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা, বললেন, "হ্যাঁগা তুমি ব্রাহ্মণ, তিনকাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেছে—তাতে আবার গঙ্গার তীর, এখানে এসে কিনা তোমার ইষ্টদেব স্মরণ হচ্ছেনা—তুমি কালীবাড়ীর পুকুরে কত মাছ—বাগানে কত আম নিচু হয়—তা বেচে কত টাকা হয়—এই সব খোঁজ নিচ্ছ। ধিক্ তোমাকে!" ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হওয়া ত দূরের কথা বিরক্তি সহকারে চলে গেলেন। ঠাকুর আমাকে সেই জায়গায় গঙ্গাজল দিতে বললেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের অভিভাষণ

বন্ধুগণ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবের শতবার্ষিকী উৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান অদ্যকার এই বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন ; হয়ত ইহাই এই উৎসবের সর্ব্বশেষ অনুষ্ঠান।

মনে পড়ে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে আমি "বিবেকানন্দের মানসিক পরিণতির প্রথম যুগ" শীর্ষক একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ঐ নিবন্ধের উপসংহারে আমি বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আমার সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়াছিলাম। গুরু বজ্রনাদে কম্পিত, বিদ্যুৎ-ঝলকিত, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সন্ধ্যায় আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমার মনে তখন যে বিক্ষোভ চলিতেছিল, তাহার সহিত প্রকৃতির ঐ রুদ্ররূপের বেশ সামঞ্জস্য ছিল। ঐহিক লীলায় যাঁহাকে স্থান ও কাল নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই, তাঁহার শতবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে আজ সহস্র সহস্র নরনারী সশরীরে এবং অশরীরী আত্মায় এখানে উপস্থিত আছেন। আমার প্রশান্ত জীবন-সায়াহ্নে আমি যে তাঁহাদের সহিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

এই বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবে জগতের দূর-দূরান্ত প্রদেশ হইতে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। যে সকল মনীষী এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত, তাঁহারা বিভিন্ন দিক হইতে ধর্ম্ম, জীবন, নৈতিক মঙ্গল, ধর্ম্মতত্ত্ব ও সামাজিক উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। এই সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সম্পর্কেও কতকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে আমার স্মৃতি হইতে কয়েকটি কথা বলিব এবং মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মজগতে তাঁহার দান, দর্শন ও ইতিহাসের দিক হইতে আলোচনা করিব।

বাল্যে শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণলীলা, গাজন প্রভৃতিতে যোগ দিতেন। তিনি উহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে পুরোহিত হন। কালীমাতার দর্শনলাভের জন্য তিনি এতদূর ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মাকে বলিয়াছিলেন, মা তাঁহাকে দর্শন না দিলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। মায়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি অর্দ্ধোন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মা তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন।

তারপর তিনি কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ করেন। তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেন। এক হস্তে স্বর্ণ ও এক হস্তে কর্দ্দম লইয়া তিনি বলিতেন, 'সোণাই মাটী, আর মাটীই সোণা।' এইরূপে তিনি ষড়রিপু জয় করেন। শেষে প্রত্যেক নারীকে তিনি মাতৃজ্ঞান করিতেন।

এক সুন্দরী যুবতী ভৈরবী তাঁহাকে তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষা দেন। ইনি ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। কিন্তু তন্ত্রবিহিত প্রথায় সুরা ও মাংস ব্যবহার করিতেন। তান্ত্রিক সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ উলঙ্গ নারী-মূর্ত্তিতেও জগজ্জননীর রূপ দেখিতেন। এইরূপে কাম-কলুষ তাঁহার হৃদয়াগ্নিতে নিঃশেষে বিদগ্ধ হইয়া যায়।

তিনি ধর্ম্মমতে সাধনা করিয়া উহার সার সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মুসলমান ফকিররূপে তিনি মুসলমানী পোষাক গ্রহণ করিয়া মুসলমানী আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়াছিলেন ; আবার পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ মুক্তিপিপাসু নবদীক্ষিত খ্রীষ্টান যেরূপে সাধনা করে, খ্রীষ্টীয় সাধকরূপে তিনিও সেইরূপ সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা শুধু লোক দেখান ব্যাপার ছিল না বা একটি অর্থহীন কল্পনাও ছিল না। ঠিক এইরূপেই তিনি তাঁহার উপাসনায় বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন এবং গীতবাদ্যকেও স্থান দিয়াছিলেন।

প্রথম দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যাঁহাদের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল, আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। দয়ানন্দ বেদকেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের উৎস জ্ঞান করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁহার প্রভাব স্থায়ীও হয় নাই বা গভীরও হয় নাই। রামকৃষ্ণের আন্তরিকতা তাঁহাকে হিন্দু-সমাজের প্রথাগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি জাতি-ভেদ মানিতেন না, মেথরের সেবা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না, গোঁড়া বেদপন্থীরা ইহা সমর্থন করিবেন, তাহা সম্ভব নহে। তিনি তোতাপুরী ও অন্যান্য সাধু-মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। এই সকল বিভিন্ন ধরণের সাধনায় তিনি তাঁহার জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের যোগ্যতা লাভ করেন। তোতাপুরী তাঁহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দেন।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবও তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। হিন্দুর ধর্ম্ম আচার অনুষ্ঠানে যে সকল কুসংস্কার ও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নববিধান তাঁহার দৃষ্টি ঐগুলির প্রতি উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবের সাধক ছিলেন, সত্যের সাধনায় তিনি এক দিকে যেমন সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেন, তেমনি অপর দিকে আবার তিনি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে কালী-পূজাও করিতেন। তিনি একের মধ্যে বহুর এবং বহুর মধ্যে একের উপাসনা করিতেন। ইহাতে তিনি কোনই অসামঞ্জস্য দেখিতেন না, বরং ইহাতেই সত্যের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতেন। এইরূপে তিনি সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন, যে মূর্ত্তিই পূজা করা হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে-যায় না, সমস্ত মূর্ত্তিতেই সেই ভগবানেরই উপাসনা করা হয়। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে তিনি কোনও বিরোধ দেখিতেন না।

তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি জীবসুলভ সমস্ত দৌর্ব্বল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্দ্ধে। কিন্তু সমাধি অবস্থায় তাঁহার যে ভাবাবেশ হইত, একহার্ট প্রভৃতির যুগ হইতে ইউরোপ তাহা কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বহু হিন্দু সাধুর ন্যায় তিনিও সহজবোধ্য প্রবাদ, উপমা, রূপক ও গল্পের অবতারণা করিয়া শিশুকেও দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতে পারিতেন।

আধুনিক ভারতের পিতৃপ্রতিম রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মের মূলভিত্তি-স্বরূপ বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, প্রত্যেক প্রধান প্রধান ধর্ম্মই ঐ মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে প্রত্যেক ধর্ম্মের ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, রামমোহনের ব্যক্তিত্বে দুইটী রূপ ছিল। প্রথমতঃ, তিনি ছিলেন বিশ্বজনীন ধর্ম্মের গভীর বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন, ধর্ম্ম-সংস্কারক। ধর্ম্ম-সংস্কারকরূপে তিনি ত্রিবিধ উপায়ে ধর্ম্ম-সংস্কার করিয়াছেন; হিন্দু সংস্কার হিসাবে তিনি বেদান্তের শিক্ষা হইতে সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র একেশ্বরবাদমূলক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; মুসলমান ধর্ম্মের সমর্থক হিসাবে তিনি তোফাতুল মোয়াহিদিন ও থানাজারাতুম আবদিয়ান রচনা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টান হিসাবে তিনি সমস্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র একেশ্বরবাদ শিক্ষা দেয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের ভিত্তিতে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, আচার অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সমস্ত ধর্ম্মের সারভাগ লইয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; প্রথম দিকে কেশবচন্দ্র খ্রীষ্ট-ধর্ম্মকেই করিয়াছিলেন তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কেন্দ্র; কিন্তু উত্তর

কালে তিনি ক্রমেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস উহার পরবর্ত্তী অধ্যায় রচনা করেন। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্ম সমগ্রতঃ আচরণ করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের সারতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে অংশ গ্রহণ করিতে গেলে উহার মূলোচ্ছেদ করা হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম উপলব্ধির জন্য তিনি ছিলেন হিন্দুর নিকট হিন্দু, মুসলমানের নিকট মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের নিকট খ্রীষ্টান। কিন্তু তিনি যুগপৎ বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করেন নাই এবং বিভিন্ন ধর্ম্মমত অবলম্বন করেন নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি ঐ ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; সুতরাং মুসলমান বা খৃষ্টান ক্যাথলিক ধর্ম্মের সত্যোপলব্ধির জন্য তিনি মুসলমান বা খৃষ্টান ক্যাথলিক ধর্ম্ম সমগ্রভাবেই পালন করিয়াছিলেন। এইরূপেই তিনি সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও ধর্ম্ম-বিশেষের উপাসক ছিলেন না, তাহার ধর্ম্ম ছিল বিশ্ব-মানবতার ধর্ম্ম। তিনি যে ধর্ম্ম-জগতে বিশ্বমানবত্ব-বোধের প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, আমাদের যুগেই তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে মানবত্ববাদের নানা স্তর ও নানা রূপ দেখা যাইতেছে, কঁতের মহামানব পূজা, বাহাই ধর্ম্ম প্রভৃতি বাদ দিলেও জুলিয়ান হক্সলীর নিরীশ্বর ধর্ম্ম রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। অনেক প্রাচীন পৌরুষের ঈশ্বরবাদের পরিবর্ত্তে সত্য শিব ও সুন্দরের অপৌরুষের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে শুধু ধর্ম্ম বিশ্বাসই আমাদের মনের একমাত্র উপজীব্য নহে; বিজ্ঞান, দর্শন, বৈজ্ঞানিক দর্শন এবং কলা ও রসের প্রতি আগ্রহই বর্ত্তমান যুগের লক্ষণ; এই আগ্রহ প্রাচীন-যুগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে বহুলাংশে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে।

এখন আমরা বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলনের অনুসন্ধানে রত; অদ্যকার এই সম্মেলনে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাই অভিব্যক্ত। কিন্তু বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলন, মানব-মহাসম্মেলন এবং জগতের সমস্ত সংস্কৃতির মহাসম্মেলনের প্রথম ধাপ মাত্র।

বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাস মানবজাতিকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম-জগতে আমরা সমগ্র মানবজাতির ঐক্যসূত্রের সন্ধান চাই। কিন্তু রামমোহন যেরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মেই মূল সত্যের সন্ধানলাভ করিয়া এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেরূপ বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া সমস্ত ধর্ম্মকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ ঐক্যসূত্র আমরা চাহি না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ ঈশ্বরে মানুষকে এবং মানুষে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা-ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল ধর্ম্মমতে সাধনা করিয়াছিলেন, সেইরূপেই আমরা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় এবং সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিতে পারি।

ধর্ম্ম মানবজীবন ও মানবজীবনের কর্ম্মশক্তিকে সুসংহত করে। সমস্ত সংস্কৃতি ও ভাবধারার মূলে রহিয়াছে ধর্ম্ম। খাদ্যাখাদ্য বিচার, নর-নারীর সম্পর্ক, পরিবার ও জাতির জীবনযাত্রা প্রণালী, রণ-কৌশল—সমস্তই ধর্ম্মের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম্ম-জগতে যে ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন হইতেছে তাহার চরম অভি-ব্যক্তি। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, রসানুভূতি অথবা ভাবানুভূতি হইতেছে মানবত্ববোধের বিভিন্ন পর্য্যায় মাত্র।

আজ আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে একটী ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন আহ্বান। আমার মতে এই ধর্ম্ম মহাসম্মেলনেই মানব-মহাসম্মেলনের পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইবে এবং এই মানব-মহাসম্মেলনে মানবত্ব বোধের চরম বিকাশ হইবে।

ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন

সম্পাদক

শ্রীবুদ্ধ ছয় বৎসর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পর মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া উরুবিল্ব (বোধগয়া) বোধিবৃক্ষের মূলে ধ্যানযোগে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তৃতীয় সপ্তাহে তিনি 'অজপাল-ন্যগ্রোধের' নিম্নে বসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবেন কিনা তৎসম্বন্ধে যখন চিন্তা করিতে-ছিলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—

"পাতুর হোসি মগধেসু পুব্বে
ধম্মো অসুদ্ধো সমলেহি চিন্তিতো।
অপাপুর্ এতম্ অমতস্‌স দ্বারম্
সুন্নতু ধম্মম্ বিমলেনানুবুদ্ধম্॥"

—"এখন পঙ্কিলহৃদয় শিক্ষকগণের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম মগধে প্রচলিত আছে ; তুমি অমরত্বের দ্বার খুলিয়া দাও, লোকে নির্ম্মলহৃদয় বুদ্ধ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম্ম শ্রবণ করুক।"

কোন কোন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে, তথাগত সম্বোধি লাভ করিলে "ধর্ম্ম" প্রচারিত হইবার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীবুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচারের সংকল্প স্থির করিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামের উপকণ্ঠে অবস্থিত ঋষিপত্তন বা মৃগদাবের (সারনাথ) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন ফলপ্রদ নয় দেখিয়া তিনি যখন মধ্যপন্থাবলম্বনে সাধন করিতেছিলেন, তখন কৌণ্ডিন্য, বপ্র, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামীয় তাঁহার পঞ্চশিষ্য তাঁহাকে উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিয়া ঋষিপত্তনে এই সময় তপশ্চরণে রত ছিলেন। এই পঞ্চশিষ্য বৌদ্ধ পালীগ্রন্থে "পঞ্চভদ্রবর্গীয় ভিক্ষু" নামে অভিহিত। তথাগত প্রশান্ত মনে ধীর পদবিক্ষেপে এই ভিক্ষুগণের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে, ইঁহারা দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া (তিনি নিকটে আসিলেও) তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন না বলিয়া সমবেতভাবে সংকল্প করিলেন। শ্রীবুদ্ধ এই ভিক্ষুদের সন্নিকটে আসিলে প্রথমতঃ তাঁহারা তাঁহাকে বন্ধো বলিয়া সম্বোধন করিয়া অশিষ্টতা দেখাইয়াছিলেন কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তখন সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তথাগত এই পঞ্চশিষ্যকে প্রথম ধর্ম্মোপদেশ দান করেন, এবং এই অমূল্য উপদেশ "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন" নামে বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে।

সারনাথের যে স্থানে শ্রীবুদ্ধ এই "পঞ্চভদ্রবর্গীয় ভিক্ষুর" সহিত প্রথম মিলিত হইয়াছিলেন তথায় "চৌখণ্ডী" নামক অষ্টকোণি বুরুজবিশিষ্ট একটী স্তূপ আছে। বর্ত্তমানে ইহা বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত। যে স্থানে উপবেশন করিয়া তথাগত পঞ্চশিষ্যকে প্রথম উপদেশ দান করিয়াছিলেন সেই স্থানে রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের স্থাপিত প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ভগ্নস্তম্ভ অদ্যাবধি বিরাজমান। সারনাথের মিউ-জিয়মে "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন"-মুদ্রায় উপবিষ্ট শ্রীবুদ্ধের প্রথম ধর্ম্মপ্রচারের ভাবব্যঞ্জক কয়েকটী সুদৃশ্য মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির অনুকরণে সারনাথে "মহাবোধি সোসাইটী" কর্ত্তৃক নব-স্থাপিত "মূলগন্ধকুটী বিহারে" একটী অভিনব মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে।

তথাগতের জন্ম, সম্বোধি ও পরিনির্ব্বাণ লাভের এই পুণ্য বৈশাখ মাসে এই প্রবন্ধে তাঁহার "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন" সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া "উদ্বোধনের" পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন বিধান করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীবুদ্ধ বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আমি যে পথ অবলম্বন করিয়া 'অরহত্ব' প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট বিবৃত করিব। যদি সেই পথ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমরাও এই অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে।" অতঃপর তিনি সম্বোধি লাভের পূর্ব্বে যে "কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ" প্রত্যক্ষানুভব করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে "দ্বাদশনিদান" নামে প্রখ্যাত। নিদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

১। অবিদ্যার ("চতুরার্য্যসত্যে" * অজ্ঞতা) কারণ সংস্কার।

২। সংস্কারের কারণ বিজ্ঞান (পুনর্জ্জন্মগ্রহণ-কারী চিত্ত)।

৩। বিজ্ঞানের কারণ নামরূপ।

৪। নামরূপের কারণ ষড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন)।

৫। ষড়ায়তনের কারণ স্পর্শ (ছয় আয়তনের সহিত রূপ শব্দাদি ছয় বিষয়ের স্পর্শ)।

৬। স্পর্শের কারণ বেদনা (সুখ দুঃখাদির অনুভূতি)।

৭। বেদনার কারণ তৃষ্ণা (কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা [বিনষ্ট হইবার ইচ্ছা])।

৮। তৃষ্ণার কারণ উপাদান (তৃষ্ণার চরম পরিণতি, ইহা চারিপ্রকার যথা, ১। কাম, ২। দৃষ্টি, ৩। শীলব্রতগ্রহণ ও ৪। আত্মবাদ)।

৯। উপাদানের কারণ ভব (বীজাকার)।

১০। ভবের কারণ জন্ম।

১১। জন্মের কারণ—

১২। জরা মরণ শোক দুঃখ দুশ্চিন্তা হাহুতাশ!

যদি প্রথম কারণ থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় ফল হয়। এইরূপে একটীর সৃষ্টি হইলে অপরটী সৃষ্ট হয়। এইভাবে দুঃখরাশির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি প্রথম কারণ না থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় ফল হয় না। এইরূপে একটীর নিরোধে অপরটীর নিরোধ হয়। এইভাবে দুঃখরাশির নিরোধ হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ জন্মান্তরে বিশ্বাস করিয়াও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আত্মবাদিগণ এক অদ্বিতীয় জন্মমৃত্যুহীন শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস-পরায়ণ। বৌদ্ধগণ আত্মা আছেন বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"যেমন বাঁশ, কাঠ, খড় প্রভৃতি দ্রব্য সংযোগে আকাশের একখণ্ড স্থানকে আশ্রয় করিয়া গৃহ প্রস্তুত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে গৃহ বলিয়া কোন স্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব নাই, তেমন রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই "পঞ্চস্কন্ধ" * ধারণ করিয়া লোকে "তুমি" "আমি" ব্যবহার করে, বস্তুতঃ আত্মা বলিয়া কিছু নাই। লোকে ব্যবহারের সুবিধার জন্য 'আত্মা' শব্দটী প্রয়োগ করে মাত্র।" জীবের জন্ম যে উপায়ে সম্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বৌদ্ধগণ বলেন—"স্থায়ী কোন বস্তু জন্মে না। তবে কারণ ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না। বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হয়, আবার ঐ ফলের বীজ হইতে বৃক্ষ হয়। যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী বৃক্ষের অভাবে পরবর্ত্তী বৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্ম-বীজের অভাবে

* (১) দুঃখ, (২) দুঃখের কারণ, (৩) দুঃখের বিনাশ ও (৪) দুঃখ-নাশক মার্গ।

* রূপ=দৈহিক বা বাহ্যিক বিষয় যথা—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারিটী মিলিয়া নাম অর্থাৎ মানসিক বা আভ্যন্তরিক বিষয় গঠিত হয়।

বেদনা=অনুভব শক্তি। সংজ্ঞা=ধারণা। সংস্কার=মানসিক বৃত্তি। বিজ্ঞান=শুদ্ধ বিবেক।

পরবর্ত্তী জীবরূপী বৃক্ষের জন্ম হয় না। বীজ-বৃক্ষেব ন্যায় জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মেব সহিত পবজন্মেব সম্বন্ধ রহিয়াছে। দীপাধার, তৈল, বর্ত্তিকা ও অগ্নি এই কারণ চতুষ্টয় ভিন্ন যেমন প্রদীপ আত্মপ্রকাশ করিতে অসমর্থ, সকল বিষয়ই তদ্রূপ।" কাবণেব জ্ঞান হইলেই কার্য্যেব জ্ঞান হয় এবং ইহাব ফলে আত্মদৃষ্টিরূপ মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হইয়া যায়। এই মিথ্যাদৃষ্টি দুব কবিবাব উপায় "ধর্ম্মচক্খু—সোতাপত্তি মগ্‌গো" অবলম্বন। চিত্ত বস্ত্র সদৃশ। বাসনাদ্বাবা চিত্তরূপবস্ত্র মলিনতাপ্রাপ্ত হইযাছে। ক্ষাবদ্বাবা যেমন বস্ত্র পবিষ্কৃত হয়, তেমন বাসনানাশে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। সোতাপত্তিমার্গ ঐ ক্ষাব সদৃশ। এই মার্গাবলম্বনে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং দ্বাদশ নিদানোক্ত কার্য্য কাবণ-সম্বন্ধ জ্ঞান জন্মে। ফলে দুঃখ চিবতবে চলিযা যায এবং পবিণামে নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ হয়।

জবা, ব্যাধি, মৃত্যু, অবাঞ্ছিত অবস্থাব আবির্ভাব, বাঞ্ছিত বস্তুব অপ্রাপ্তি প্রভৃতি হইতে দুঃখের আবির্ভাব হইযা থাকে। প্রব্রজিত ব্যক্তি অত্যধিক ভোগবিলাস এবং কঠোব কৃচ্ছ্রসাধন উভয় পথ পবিত্যাগ কবিয়া "আর্য্য-অষ্টাঙ্গ মার্গ" অবলম্বনে সম্বোধি লাভ কবিলে সকল দুঃখেব হস্ত হইতে চিরতবে নিষ্কৃতি লাভ কবিতে পাবেন। "আর্য্য-অষ্টাঙ্গ মার্গ" যথা :—

(১) সম্মা দিট্‌ঠি, (২) সম্মা সংকপ্পো, (৩) সম্মা বাচা, (৪) সম্মা কম্মান্তো, (৫) সম্মা আজিবো, (৬) সম্মা ব্যায়ামো, (৭) সম্মা সতি ও (৮) সম্মা সমাধি।

ইহাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) সম্যক্ দৃষ্টি—জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে জ্ঞানের সাহায্যে সকল বিষয়েব কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া এমন দৃষ্টি অবলম্বন বা এমন বিশুদ্ধ মত গ্রহণ কবিতে হইবে যে, তাহাতে সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।

(২) সম্যক্ সংকল্প—যাহাতে সকল দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান হয়, কেবলমাত্র সেই কর্ম্ম করিবার বাসনা। যে কর্ম্ম আশু বা বাহ্যদৃষ্টিতে সুখপ্রদ কিন্তু পরিণামে দুঃখদায়ক, তাহা যত্নপূর্ব্বক পবিত্যাগেব সংকল্প।

সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প পবস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত। এই দুইটীব সম্মিলিত শক্তি হইতে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, উহা সাধকের প্রতিকার্য্যেব নিযামক হইয়া তাঁহাকে সকল দুঃখেব পাবে লইয়া যাইতে সক্ষম। জগতে মনুষ্যসমাজে প্রচলিত সর্ব্ববিধ নীতিকে এই প্রজ্ঞাব অন্তর্ভুক্ত কবা চলে।

(৩) সম্যক বাচন—সম্যক্ দৃষ্টি ও সংকল্পের উপযোগী বাক্যেব নাম সম্যক্ বাচন বা সত্য বাক্য। সর্ব্বাবস্থায এই সত্য বাক্য বলিতে হইবে। যে বাক্যে কোন প্রাণীব দুঃখ হওযা সম্ভব তাহা বর্জ্জনীয়। যাহাকে ধবিযা থাকিলে সকল দুঃখেব অবসান হয় তাহাই সত্য বা সম্যক্ বাচন।

(৪) সম্যক্ কর্ম্ম—কেবল সম্যক্ দৃষ্টি, সংকল্প ও বাচনদ্বাবা সকল দুঃখেব হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায স্বরূপ সম্বোধি লাভ হয় না। সম্বোধি লাভ কবিতে হইলে এই তিনটীব নির্দ্দেশ-মত কর্ম্মানুষ্ঠান অপরিহার্য্য। বাসনাত্যাগ, চিত্ত-বৃত্তিনিবোধ, সংযম, ধাবণা, ধ্যান, অপবিগ্রহ, অহিংসা, জীবসেবা, পবোপকাব, সমদর্শন প্রভৃতি ইহাব অন্তর্গত।

(৫) সম্যগাজীব—আজীবন অধ্যবসায় সহকারে সকল দুঃখেব অতীত হইবাব অনুকূল পথের অনুসবণ। সম্বোধি লাভেব পূর্ব্বে ও পরে আমরণ এই পথ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম—যে সকল অসৎ (দুঃখ প্রাপ্তির অনুকূল) চিন্তা মনে আসিবে বা আসিবার সম্ভাবনা আছে, বিশেষ যত্নসহকারে তাহাব প্রতিরোধ। সে সকল অসৎ চিন্তা মনে স্থানলাভ

করিয়াছে, তাহাদিগকে পুরুষকার সহায়ে দুরীভূত করা। সম্বোধি লাভের সহায়ক সৎচিন্তার দ্বারা সর্ব্বদা মন পরিপূর্ণ রাখা এবং যাহাতে এই চিন্তা-রাশি ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া স্থায়ীভাবে মনে স্থানলাভ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয় তজ্জন্য অক্লান্ত চেষ্টা।

(৭) সম্যক্ স্মৃতি—বিচারপূর্ব্বক অনিত্য বিষয় ধার্য্য করিয়া নিত্য (সকল দুঃখ পরিহারের অনুকূল) বিষয়ে সর্ব্বদা মন সংযুক্ত রাখা। নিম্নোক্ত চতুর্ব্বিধ চিন্তা ইহার সহায়ক:—(ক) শরীরের ৩২টী বিষয় যথা, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, মল, মূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধীয়। (খ) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যাবলী। (গ) মনস্তত্ত্ব, ক্রোধ, হিংসা, ভাল, মন্দ প্রভৃতি বিষয়ক। (ঘ) বন্ধনের স্বরূপ ও সম্বোধির অবস্থা। বন্ধনকে দুঃখ বলিয়া বোধ এবং তজ্জন্য মুক্তিলাভের চেষ্টা। বন্ধনজনিত দুঃখের সম্যক্ অনুভূতির জন্য এই কয়টীর অনুশীলন আবশ্যক।

(৮) সম্যক্ সমাধি—এই "সপ্তাঙ্গ নিয়ম" পালন করিলে সম্বোধিলাভ হয়। সম্যক্ভাবে এই নিয়ম পালনের জন্য "বিনয়ের" সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। সম্বুদ্ধ সাধকের মন সম্পূর্ণরূপে বিষয়-তৃষ্ণা বিরহিত হইয়া শান্ত ও সমাহিত হইয়া থাকে। এই শান্ত চিত্ত-হ্রদে জন্মজন্মান্তরের কারণ প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এই অবস্থায় সাধক অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া অতিক্রম করিয়া সত্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। অবিদ্যার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের কারণও চিরতরে অপগত হয়—সাধক নির্ব্বাণমোক্ষলাভ করেন।

"ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" নামক শ্রীবুদ্ধের এই অমূল্য উপদেশ পৃথিবীর সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। ঋষিপত্তন—মৃগদাব বা সারনাথে তথাগত প্রথম এই উপদেশ দান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা পরম পবিত্র তীর্থরূপে বৌদ্ধজগতের সর্ব্বত্র সম্মানিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণ

বন্ধুগণ, কালকৌলিন্যমণ্ডিত ধর্ম্মমতগুলি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা শিক্ষা দেয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার তেমন কোন ধারণা নাই, কাজেই ধার্ম্মিক বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায় সেই হিসাবে আমি ধার্ম্মিক পদবাচ্য কি না তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং আমি যখন এই বিদ্বজ্জন সংসদে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হই তখন স্বভাবতঃই আমি ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু যে মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মহাসম্মেলনের আয়োজন তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবশতঃ আমি সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হই। পরমহংসদেবকে আমি ভক্তি করি। ধর্ম্মনৈতিক ধ্বংসবাদের যুগে তিনি আমাদের আধ্যাত্মিকসম্পদ উপলব্ধি করিয়া উহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রশস্ত মন আপাতঃ পরস্পর বিরোধী প্রতীয়মান বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিল এবং তাঁহার আত্মার সারল্যে পণ্ডিত ও ধর্ম্মবেত্তাদের আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যাভিমান চিরধিকৃত।

আপনাদিগকে আমার নূতন কিছু শুনাইবার নাই—কোনও নিগূঢ় সত্যের সন্ধান দেওয়ার নাই। আমি শুধু কবি—মানুষ ও সৃষ্টি প্রেমিক কবি। কিন্তু, প্রেম মানুষকে কতকটা অন্তর্দৃষ্টি

দেয় সুতরাং আমি বলিতে পারি, আমি কখন কখন মানবতার নিরুদ্ধ কণ্ঠ শ্রবণ করি এবং অসীমের সন্ধান লাভের জন্য তাহার নির্জ্জিত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি। কারাগৃহে জন্ম বলিয়া কারাগৃহকে কারাগার বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য যাহাদের হয় না,—যাহারা বুঝিতে পারে না বহুমূল্যবান আসবাব পত্র ও প্রচুর সুখাদ্যরাজি যে অহমিকা দুর্গের অদৃশ্য প্রাচীর ব্যতীত আর কিছু নয় এবং উহাতে যে শুধু মুক্তি নহে বরং মুক্তি কামনা পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়, আশা করি আমি তাহাদের মধ্যে নই।

বহির্জগতেই হউক আর নিগূঢ় অন্তরের গভীরতম প্রদেশেই হউক, সেই অসীমের উপলব্ধি দ্বারাই এই মুক্তির মান নির্ণীত হয়। সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে আমাদের অবস্থান ও পেশী সঞ্চালনের জন্য আবশ্যক উপযুক্ত স্থান থাকিতে পারে, আহার্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইতে পারে, প্রচুর চর্ব্ব-চোষ্যলেহ্যপেয়ও থাকিতে পারে, তথাপি, অধিকতর প্রাপ্তির সহজাত আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ অবসান না হইলেও অপূর্ণ থাকিয়া যাইতে পারে। কারণ সেই অবস্থায় আমরা অসীমে বঞ্চিত—যে অসীম বহির্জগতে এবং আমাদের হৃদয় কন্দরের চির-বৈচিত্র্যময় জগতে আমাদের স্বাধীনতার মানদণ্ড স্বরূপ।

কিন্তু, পরিপূর্ণতার কোনও আদর্শের চরম মূল্য উপলব্ধি করিয়া আমরা আমাদের চেতনাশক্তির যে স্তরে উপনীত হই এবং জীবনের কোনও তথ্য সমগ্রতঃ উপলব্ধি করিয়া যখন উহার সহিত ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত অব্যক্ত সত্যের সন্ধান পাই, তখনই অসীমের আরও নিবিড় অনুভূতি জন্মে। মানব হৃদয় ভূমার ক্ষুধার আর্ত্তজীবন স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, তদতিরিক্ত অনেক কিছু মানুষের কাম্য। জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে মানুষ অন্তরের যে রূপ দেখিয়াছে, তদনুসারেই সে যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া এই সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছে,—জীবনের রীতিপদ্ধতি ক্রমাগত পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সেই সত্যোপলব্ধির চেষ্টায় অনেক সময় সে ব্যর্থকাম হইয়াছে কিন্তু কখনও চরম পরাজয় স্বীকার করে নাই।

আমরা দেখিতে পাই মনুষ্যেতর প্রাণীর বিবর্ত্তন তাহার জাতিসুলভ পন্থায় ঘটিয়া থাকে,—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি। কিন্তু অসীমের আহ্বান তাহারাও শুনিয়াছে, তাহারা নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনের পরও নিজ জাতির চিরস্থায়ী অস্তিত্বের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং সেইজন্য দুঃখ বরণ ও ত্যাগ স্বীকার করে। জনক-জননী যে সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, তাহা অসীমেরই ইঙ্গিতে, ত্যাগ স্বীকারের এই ইচ্ছাই জাতীয় জীবনের মূল এবং উহাই তাহাদিগকে সন্তান-সন্ততিগণের জন্য সহজলভ্য আহার্য্য ও আবাসের সংস্থান করিবার যোগ্যতা দেয়।

কিন্তু মনুষ্যজাতির মধ্যে অসীমের এমন এক অনুভূতি আছে, যাহা কায়িক জীবন সংগ্রামের বহু ঊর্দ্ধে। কায়িক জীবনের অস্তিত্ব শুধু স্থান ও কালের অপ্রমেয়তায়, কিন্তু মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, পরিপূর্ণ জীবন শুধু স্থান ও কালের অপ্রমেয়তার জীবন নহে। যে জীবনে মহান ও সুন্দরের অনাত্ম সম্ভোগ, তাহাই পরিপূর্ণ জীবন।

যখন আমাদের এই সুন্দরের, এই শিবের—ইহাকেই কখন কখন আমরা বলি সত্য—অনুভূতি জন্মে তখন আমরা এমন স্তরে আসিয়া পড়ি, যাহা মনুষ্যেতর জীব ও উদ্ভিদের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আমরা মাত্র সেইদিন এই স্তরে পৌছিয়াছি।

যাহাকে আমরা বলি অহং—আহার্য্য ও আবাসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, বংশ রক্ষায় সচেষ্ট সেই অহংএর কর্ত্তৃত্ব চলিয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া কিন্তু এমন একটি রহস্যময় জগৎ আছে, যাহার পূর্ণোপলব্ধি এখনও হয় নাই এবং যে জগৎ কায়িক

দাবী পুরাপুরি স্বীকার করে না। এই জগতের রহস্য আমাদিগকে নিয়ত বিমূঢ় করিয়া রাখিয়াছে, এখানে আজও আমরা স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ইহাকে আমরা বলি আধ্যাত্মিক জগৎ। আজও আমরা এই শব্দটির পূর্ণার্থ উপলব্ধি করিতে পারি নাই, কাজেই এই শব্দটি আজও আমাদের নিকট অস্পষ্ট।

আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি, এই জগতের কেন্দ্রস্থলে কি রহস্য লুক্কায়িত তাহা আজও আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু কায়িক অস্তিত্বের প্রাচীরের মধ্য দিয়া আমরা যে স্তিমিত আলো দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে কায়িক জীবন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনেই আমাদের বিশ্বাস গভীরতর বলিয়া মনে হয়। কারণ যে অব্যক্ত সত্যকে আমরা প্রকাশ করিতে অক্ষম, যাঁহাকে আমরা আত্মা বলিয়া থাকি, যাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের আচরণেও প্রকাশ পায় যেন তাঁহারাও ইহাতে আস্থাবান, অন্ততঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগৎকে অধিকতর সত্য বলিয়া মনে করেন সুতরাং তাঁহারাও সত্য, শিব ও সুন্দরের জন্য মৃত্যুকে—এই কায়িক জীবনের অবসানকে—বরণ করিতে প্রস্তুত। ইহাতে মানুষের আন্তরিক মুক্তি কামনা, যে অসীম জগতে মানুষ সত্যের সহিত নিজের নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক উপলব্ধি করে, সেই অসীম জগতে প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত।

বুদ্ধ যখন মৈত্রী—মানুষের সহিত মানুষের মৈত্রী নহে—নিখিল বিশ্বের সহিত মৈত্রী প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি এই সত্য উপলব্ধি করেন নাই, যে, যে দৃষ্টি দিয়া আমরা জগৎকে বিচার করি, তাহা ভ্রান্ত—আমরা যে এই জগৎকে আমাদের ব্যক্তিগত অভাব মোচনের উপকরণ বলিয়া মনে করি, তাহা ভ্রান্ত? তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রেমের দ্বারাই ভগবানের সৃষ্টি-লীলার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব,—কারণ অহংবোধের বন্ধনমুক্ত আত্মার নিকট প্রেমের শাশ্বত অভিব্যক্তিই সৃষ্টি-লীলার রহস্য জিজ্ঞাসু? এই মুক্তি নেতিবাচক হইতে পারে না, কারণ প্রেম কদাপি নিরর্থক নয়। বন্ধনচ্ছেদই যে পরিপূর্ণ মুক্তি, তাহা নহে,—সমন্বয়ের পরিপূর্ণতার মধ্যেই পরিপূর্ণ মুক্তি। মুক্তি যেখানে আত্মসর্বস্ব, সেখানে মুক্তি তৃপ্তিহীন, সুতরাং অর্থহীন। যাহা সৎ, তাহারই অন্তর্নিহিত সত্যের সহিত আত্মার একান্ত মাধুর্যের মধ্যেই উহার মুক্তি,—ইহার সংজ্ঞানির্দ্দেশ অসম্ভব, কারণ ইহা সমস্ত সংজ্ঞার অতীত।

জড়বাদের বিশিষ্ট রূপ—উহার অভিব্যক্তির প্রমেয়তা—অর্থাৎ উহার গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা। মানবেতিহাসে যে সকল বিরোধ দেখিতে পাই, উহাদের অধিকাংশেরই মূল এই গণ্ডী। নিজের গণ্ডী বৃদ্ধি করিতে গেলে, অপরের গণ্ডীতে অনধিকার প্রবেশ অনিবার্য্য। শক্তির গর্ব্ব হইতেছে মাত্রা ও সংখ্যার গর্ব্ব—অনুচর ও কবলিত জনগণের সংখ্যার গর্ব্ব—সুতরাং শক্তির প্রতি তীব্রতম দূরবীন ধরিলেও বস্তু সাগরের অপর পার্শ্বে শান্তিকূলের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ক্ষমতাপ্রিয়তা যখন মানুষের ধর্ম্মজীবনের উপর আধিপত্য করে তখন ইতিহাস এমনই করুণ হইয়া উঠে। কারণ, আত্মিক মুক্তির যে একটি মাত্র উপায় আছে; তখন উহাই হইয়া পড়ে মুক্তির বিজাতীয় শত্রু। যে শৃঙ্খল ধর্ম্মের মিথ্যা মাহাত্ম্য মণ্ডিত, সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলের মধ্যে সেই শৃঙ্খল ভঙ্গ করাই সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর এবং অহঙ্কারপ্রসূত আত্ম-প্রতারণায় মানুষের আত্মা যে কারাগারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, সর্ব্বপ্রকার কারাগারের মধ্যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ। কারণ, আত্মপোষণের উলঙ্গ কামনা অনাবৃততার মধ্যেই আশ্রয় খোঁজে।

ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকতায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িলে মানুষ যে নির্লজ্জ আত্মগবিমায় অন্ধ হইয়া পড়ে, এবং মানবের অন্তর্নিহিত গুণগুলি নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা জগতেব এক বিকৃতরূপ—ধর্ম্মের ছদ্ম আববণে আবৃত। নিছক জডবাদে মনুষ্য হৃদয় যতদুব সঙ্কীর্ণ না হয় এই বিকৃতধর্ম্মে মনুষ্য হৃদয় ততোধিক সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

সান্ধ্য গগনে আমবা স্নিগ্ধকব তাবকাবাজি দেখিতে পাই কিন্তু আমবা জানি ঐ তারকা বস্তুতঃ পক্ষে অগ্নিময় গোলক, উহা হইতে উদ্ধৃত শত শত অগ্নিশিখা তুমুল তাণ্ডবে পবস্পবেব সহিত সঙ্ঘর্ষে বত। কিন্তু ঐগুলি এক অব্যক্ত বহস্যময় সঙ্গতিব অধীন—সেই সঙ্গতি সংগ্রাম-শীল জডপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ কবিয়া সৃজনশীল কবিযা তুলিতেছে—অনুপম শান্তি ও সৌন্দর্য্য রূপায়িত কবিতেছে।

এই মহতী সঙ্গতিই সত্য, যে সত্য স্থান ও কালেব অন্ধকাবময় ব্যবধানে সেতুবন্ধ কবিযাছে, বিবোধের মধ্যে সামঞ্জস্য কবিয়াছে। মহাপুরুষ-গণ এই মহাসত্যকে তাঁহাদেব জীবনে উপলব্ধি করিয়া শান্তি ও মৈত্রী লাভেব উপায় স্বরূপ, এবং আচবণে সৌন্দর্য্য, চরিত্রে বীবত্ব, আকা-ঙ্ক্ষায় মহত্বেব উপায়স্বরূপ নিজ নিজ অনুচবদিগকে দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই সকল ধর্ম্ম যখন উহাদেব পবিত্র উৎস হইতে বহুদূববর্ত্তী হইয়া পড়ে, তখন উহাবা প্রাথমিক তেজস্বিতা হারাইয়া ধর্ম্মান্ধতায় পর্য্যবসিত হয় এবং যুক্তিহীন আচাব ও গতানু-গতিক প্রথায় পরিপূর্ণ এক বিরাট শূন্যতায় পবি-ণত হয়—তখনই উহাদের আধ্যাত্মিক আলোক সাম্প্রদায়িকতার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আমাদের প্রগতিব পথ যুক্তিহীনতাব জঞ্জালে আবদ্ধ করিয়া মানবজাতির ঐক্যবোধকে বিরো-ধেব মূঢ়তায় নিস্তব্ধ কবিয়া ফেলে; কাজেই সভ্য মানব পরিণামে শিক্ষাপদ্ধতিকে শ্বাসরোধকর ধর্ম্মনাগপাশ হইতে মুক্ত কবিতে বাধ্য হয়। উগ্র ও আন্তরিক নাস্তিক্যবাদ ঈশ্বরেব নামে যে কলঙ্ক আবোপ কবিতে পারে না, আধ্যাত্মিক-তাব ছদ্মবেশী এই মাবাত্মক ব্যভিচাব ঈশ্বরেব নামে ততোধিক কলঙ্ক আবোপ কবিয়াছে।

তাহাব কাবণ এই যে, সাম্প্রদায়িকতা যে ধর্ম্মেব আশ্রয় গ্রহণ কবে, পরগাছাব ন্যায় উহাবই জীবনবস শোষণ কবিযা উহাকে নির্জ্জীব করিযা ফেলে—জানিতেও পাবে না, কখন উহা নিষ্প্রাণ কঙ্কালে পবিণত হইল।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীবা যে তাহাদেব গণ্ডীব বহির্ভূত অন্য সকলেব প্রতি অন্যায় আচবণ কবিয়া মানবতাব অপমান ও উহাকে আঘাত কবে তজ্জন্য তাহাদিগকে তিবস্কাব কবিলে তাহাবা নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ কবিতে চায় যে, তাহাদেব ধর্ম্ম প্রেম, ন্যায় এবং মানুষে ঐশ্বরিকতা শিক্ষা দেয কিন্তু তাহাবা বুঝিতে পাবে না যে, তাহাদেব ধর্ম্মেব ঐ শিক্ষা দ্বাবাই তাহাদেব মনোবৃত্তি অপবিসীম বিকৃত। তাহাবা যখন নিজ নিজ ধর্ম্মেব বক্ষা-কর্ত্তা বলিয়া আত্মপ্রচাব কবে তখন তাহাবা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানগুলিব প্রতি শাশ্বত মূল্য আবোপ কবিয়া স্থূল জডবাদকে তাহাদেব ধর্ম্ম আক্রমণেব সুযোগ দেয়। আবাব নৈতিক সমর্থন আছে কি না, তাহা বিচাব না কবিয়াই জন্ম অথবা আনুগত্যেব অধিকাবে বচিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীব মধ্যে সীমাবদ্ধ উপাসনা পদ্ধতিই ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া প্রচাব কবিয়া নৈতিক জডবাদকেও তাহাদেব ধর্ম্ম আক্রমণের সুযোগ দেয়। এইরূপ ব্যভিচার কোনও ধর্ম্ম বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে, অল্লাধিক সমস্ত ধর্ম্মেই এইরূপ বিকৃতি দেখা যায়—ইহাব কলঙ্ক কাহিনী ভ্রাতৃবক্তে লিখিত, ইহাব উপর রহিয়াছে পুঞ্জীভূত ধিক্কাবের স্তূপ।

মানবজাতির ইতিহাসে এই নির্ম্মম সত্য দেখা যায় যে, যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য আত্মার মুক্তি, সেই ধর্ম্মই মনের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে—এমন কি নৈতিক অধিকার পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছে কিন্তু পাশবিকতার অন্ধকার গহ্বর হইতে মানুষকে উদ্ধারের জন্য যে সত্য প্রচারিত হইয়াছিল, অযোগ্যের হাতে পড়িয়া যখনই সেই সত্য কলঙ্কমলিন হইয়াছে, তখনই তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—এই জন্যই দেখিতে পাই শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটিবশতঃ যুক্তি যতটা অন্ধ না হয়, নীতিবোধ যতটা বধির না হয়, ধর্ম্মের বিকৃতি যুক্তিকে ততোধিক অন্ধ ও নীতিবোধকে ততোধিক বধির করে, ঠিক যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য অসৎ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে আমরা ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়ি। অন্তহীন দুঃখের সহিত মানুষ দেখিয়াছে যে, সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ঐরূপে বিনষ্ট হইয়াছে—ধর্ম্ম রক্ষকগণ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও দাসত্ব বন্ধন দৃঢ় করিবার অভিযানে বজ্রমুষ্টি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন এবং বিজ্ঞানও সেই জিঘাংসু নৃশংস অভিযানে যোগ দিয়াছে।

যখন আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে যে, যেহেতু আমরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সেই হেতু আমরা ঈশ্বরলাভ করিয়াছি, তখনই আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি যে, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাদের ধারণা আমাদের কল্পনা অপেক্ষা পৃথক, অধিকতর নির্ম্মমতায় তাহাদের মাথাভাঙ্গা ব্যতীত অন্য সময় ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনও অবাস্তব জগতে এইরূপে আমাদের ঈশ্বরকে স্থাপন করিয়া আমরা বিনা দ্বিধায় এই বাস্তব জগৎকে একান্তভাবে আমাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লই,—অসীমের সেই রহস্যকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি এবং উহাকে আসবাবপত্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর করিয়া ফেলি। যখন আমরা নিজকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধ হই, অথচ নিজ জীবনে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করি তখনই এইরূপ চূড়ান্ত বর্ব্বরতা সম্ভব হয়।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ধার্ম্মিক ব্যক্তির মন অহংভাবে পূর্ণ, কারণ তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, সে ঈশ্বরলাভ করিয়াছে কিন্তু ভক্তিপ্রবণ ব্যক্তি শান্ত, কারণ সে জানে তাহার জীবন ও আত্মার উপর ঈশ্বরের প্রেমের দাবী রহিয়াছে। যাহা আমাদের স্বত্বাধীন তাহা আমাদের তুলনায় নিশ্চিতই ক্ষুদ্র, অন্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদ। মুখে স্বীকার না করিলেও সে অন্তরে এই নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে ঈশ্বরকে তাহার নিজের ও তাহার সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের নিমিত্ত স্বহস্ত নির্ম্মিত পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। এইরূপই আদিম যুগের মানুষ মনে করে যে, তাহাদের আচার অনুষ্ঠানগুলি তাহাদের দেবতাদের উপর ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিতে পারে।

মুক্তিপথ হিসাবেই সমস্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি বটে কিন্তু শেষ অবস্থায় এইরূপেই ধর্ম্ম হইয়া পড়ে বিরাট কারাগার। প্রতিষ্ঠাতার আত্মত্যাগের উপর রচিত ধর্ম্ম পুরোহিতগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ হইয়া পড়ে, এবং বিশ্বজনীনত্বের পরিচিত সত্ত্বেও দ্বন্দ্বভেদের কেন্দ্র হইয়া পড়ে। ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় মানুষের মন পচমান শৈবালজালে অবরুদ্ধ ও বহু সঙ্কীর্ণ ধারায় বিভক্ত হইয়া পড়ে—সংক্রামক বিষবাষ্প বিস্তার ব্যতীত ঐগুলির আর কোনও সার্থকতা থাকে না। এই গতানুগতিক মনোবৃত্তি ঘোরতর জড়বাদী অন্ধ আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী, কিন্তু ধার্ম্মিক নহে, যুক্তিহীনতার যে অপদেবতা দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের মনকে আশ্রয় করিয়া উহাকে ধর্ম্মের কুৎসিত অনুকরণের মোহে অভিভূত করিয়া ফেলে, ঐ গতানুগতিক মনোবৃত্তি সেই

অপদেবতার প্রভাবে একান্তভাবেই আচ্ছন্ন। মধ্যস্তরের যে সকল লোক শৃঙ্খলকেই সপ্রেমে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দায়িত্ব-বোধহীনতাকে প্রশংসনীয় জ্ঞান করে, কিংবা চাকচিক্যময় অসার বস্তু কামনা করে, শুধু তাহাদেরই যে এই অবস্থা তাহা নহে; যে নির্ব্বীর্য্য জাতি আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছে, অতীতের অন্ধকার যাহাদের বর্ত্তমানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদেরও পুরুষানুক্রমে এই অবস্থা প্রচারিত হয়। তাহারা উহাকে বিকৃত করিয়া ফেলে, তাহারা তাহাদের গুরুর যে বর্ণনা দেয়, উহা যদি কিয়দংশে তাহাদের নিজ ব্যক্তিত্বের অনুরূপ প্রতিভাত হয়, তবে তাহারা তৃপ্তিপ্রদ সন্তোষ বোধ করে। জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, জ্ঞানগর্ভ বাণীগুলিকে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ বিকৃত জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নূতন রূপ দেয়, যে সকল গতানুগতিক উক্তিতে নিজেদের তৃপ্তি, যে গতানুগতিকতার অভ্যস্ত নিজেদের মনোবৃত্তির সন্তুষ্টি, মহাপুরুষের বাণীগুলিও তাহারা সেই গতানুগতিকতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া লয়। অনাবিল পবিত্রতামণ্ডিত সত্যকে উপলব্ধি করিতে যে সূক্ষ্ম অনুভূতির আবশ্যক, সেই অনুভূতির অভাব বশতঃ তাহারা তাহাদের মাত্রাহীন আদর্শ অনুসারে অতিরিক্ত গৌরব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সত্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলে—কিন্তু ঐ মাত্রাহীন আদর্শ সেই সত্যের পূর্ণোপলব্ধির পক্ষে যেমন অনাবশ্যক, মূল বাণীদাতার মর্য্যাদার পক্ষেও তদ্রূপ অপকারক। মহাপুরুষগণের ইতিহাস মহীয়ান বলিয়াই উহা স্মৃতির এমন অস্বাভাবিক স্থানে নিক্ষিপ্ত হয় যেখানে উহা চিরাগত স্থূলতার সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, সুতরাং সাধারণ লোকের জড় মনও সহজেই তাহা বিশ্বাস করে।

আমি আপনাদিগকে বলি, আপনারা যদি প্রকৃতই সত্যপ্রেমিক হইয়া থাকেন, তবে সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধির সাহস সঞ্চয় করুন,—উহার মহিমময়ী অসীম সুষমা উপলব্ধি করুন,—গতানুগতিকের প্রস্তর প্রাচীরের নিভৃত অভ্যন্তরে উহার নিষ্ফল প্রতীককে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না। প্রত্যেক মহাপুরুষই ধর্ম্মজগতের যে উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, যেস্থান হইতে তাঁহারা মানুষকে তাহার নিজস্ব অহংবোধ হইতে তাঁহার জাতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের অহংভাব হইতে মুক্তিদানের চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেই উচ্চস্তরের অনাড়ম্বর মহিমায় ভক্তি করি; কারণ ঐতিহ্য ও প্রবচনের নিম্নভূমিতে যেখানে প্রত্যেক ধর্ম্ম পরম্পরের সহিত সংগ্রামে এবং পরম্পরের দাবী ও শিক্ষার সত্যতা খণ্ডনে রত, মহাপুরুষগণকে সেখানে টানিয়া আনিতে জ্ঞানী লোকেরা স্বতঃই সন্দিগ্ধ ও সঙ্কুচিত হইবেন।

সমগ্র মানবজাতির একটিমাত্র ধর্ম্ম থাকিবে, একই বিশ্বজনীন পদ্ধতিতে সকলে উপাসনা করিবে এবং একই আদর্শে সকলের ধর্ম্ম-পিপাসা তৃপ্তিলাভ করিবে, আমি এমন কথা বলি না। যেরূপ সাম্প্রদায়িক মন বিনা কারণে, নামমাত্র কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে অত্যাচার করে, তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, কবিতার ন্যায় ধর্ম্মও কোনও আদর্শবাদ নহে—উহা অভিব্যক্তিমাত্র। সৃষ্টির বিচিত্রতার মধ্যেই ঈশ্বরের বহুমুখীন আত্মপ্রকাশ, অনন্ত সম্পর্কে আমাদের আদর্শও তদ্রূপ ব্যক্তিত্বের নিরবচ্ছিন্ন এবং অকমনীয় বিচিত্রতার মধ্যেই প্রকাশ করিতে হইবে। কোনও ধর্ম্ম যখন সমগ্র মানবজাতির উপর তাহার শিক্ষা চাপাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তখন উহা আর ধর্ম্ম থাকে না, তখন উহা হইয়া পড়ে স্বৈরাচার—ইহাও এক প্রকার সাম্রাজ্যবাদ। অধিকাংশ স্থানে এইজন্যই দেখিতে পাই, পৃথিবীর ধর্ম্ম-জগতেও চলিতেছে ফ্যাসিজমের তাণ্ডব—অনুভূতিবিহীন পদভারে উহা মানবাত্মাকে দলিত মথিত করিতেছে।

সাম্প্রদায়িকতার আচ্ছন্ন লোকেরাই তাহাদের নিজ ধর্ম্মকে সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বস্থানের ধর্ম্মে পরিণত করিতে চাহে। সুতরাং তাহাদিগকে যদি বলা যায়, ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবে তাঁহার প্রেম বিতরণ করেন এবং যে বদ্ধ গলি ইতিহাসের কোনও এক সঙ্কীর্ণ কোণে অকস্মাৎ শেষ হইয়াছে, উহাই ঈশ্বর ও মানুষে যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র পথ নয়, তবে সেই উক্তি তাহাদের অসহ্য। মানবজাতি যদি কখনও মূঢ় সঙ্কীর্ণতার ব্যাপক প্লাবনে ভাসিয়া যায়, তবে মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের আর একটি "নোয়ার নৌকা" (Noah's Ark) প্রস্তুত করিতে হইবে।

বৌদ্ধ বিনয়

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে, এম-এ

ভগবান শ্রীবুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণকল্পে অন্তিম শয়নে শায়িত থাকিয়া শিষ্যবর্গের উদ্দেশ্যে আনন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, আমাকে বল যদি কাহারও ধর্ম্ম কিম্বা বিনয়ের অর্থ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, আমি এখনও তাহা দূর করিব।' শিষ্যমণ্ডলী নির্ব্বাক্ রহিলেন এবং আনন্দ ভিক্ষুগণকে নীরব দেখিয়া উত্তর করিলেন, 'অদ্ভুত। হে তথাগত, কোন ভিক্ষুরই ধর্ম্ম বা বিনয়ে অল্পমাত্রও সন্দেহ নাই।'[1] শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্ম অর্থে তাঁহার ধর্ম্মের মূল বিষয়ের তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা এবং বিনয় অর্থে তাঁহার সেই ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে পালন করিবার বিধি-নিষেধ। শ্রীবুদ্ধের বচন বলিলে এই ধর্ম্ম এবং বিনয় বুঝায়, কারণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তিনি এই ধর্ম্ম ও বিনয় ব্যতীত আর কিছু বলেন নাই। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক নির্ব্বাণলাভ, তবে নিকায়গ্রন্থে[2] এবং বিনয়পিটকে ধর্ম্মের অপেক্ষা বিনয়েরই উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। ঐ গ্রন্থকারগণ বলেন, ধর্ম্ম যদি কখনও বিলুপ্ত হয় এবং বিনয় অক্ষুণ্ণ থাকে—তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভবপর, অন্যথা, যদি বিনয় লুপ্ত হয় ধর্ম্মের উত্থান অসম্ভব।[3] আমরাও দেখিতে পাই, শ্রীবুদ্ধের দেহান্তে যতগুলি

(১) মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তন্ত।

(২) সব্বপাপস্স অকরণং কুশলস্স উপসম্পদা।
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং ॥১৮৪
অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো।
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্তঞ্চ সয়নাসনং।
অধিচত্তে চ আয়োগো এতং বুদ্ধান সাসনং ॥১৮৫
খুদ্দকনিকায়, ধম্মপদ।

(৩) মহাবগ্গ, পৃ ৯৮।৯৯।

দল এবং মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের বেশীরভাগই বিনয়কে উপলক্ষ্য করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছিল।[1]

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই বিনয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বৌদ্ধপূর্ব্বযুগে বিনয় শব্দটী এখনকার মত শুদ্ধ বৌদ্ধযতিগণের নিয়ম কানুন বুঝাইত না, নীতিশাস্ত্র মাত্রকেই বুঝাইত। প্রাচীন জাতকের পদ্যাবগুলিতে এইরূপ বাক্যের উল্লেখ দেখিতে পাই :—

'যত্থ পোসং ন জানন্তি আচার বিনয়েন বা।'[2]

'যথায় কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আচার বা বিনয়ের দ্বারা জানা না যায়' ইত্যাদি। কিন্তু এই বিনয় শব্দ বৌদ্ধযুগে এবং পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধ-কথিত বিনয় অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং যেহেতু বুদ্ধদেব মাত্র ভিক্ষুদিগেরই উদ্দেশ্যে এই আচারপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার বিনয় বলিতে মাত্র ভিক্ষুদিগেরই আচারপদ্ধতিকে বুঝাইত। এমন কি, বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘের প্রতি আস্থাসম্পন্ন গৃহস্থদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আচারপদ্ধতিকেও বুঝাইত না। অবশ্য তখন গৃহস্থ বৌদ্ধ বলিয়া কেহ ছিলেন না। বুদ্ধের শিষ্যদিগের নাম ছিল শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীবুদ্ধের শরণ লইয়া গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। বুদ্ধের ভক্ত গৃহীরা উপাসক শব্দে অভিহিত হইতেন এবং শিষ্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহারা ছিলেন না।

বুদ্ধদেবের বিনয়ের দুইটী দিক্। একটী আচার-

(১) চুল্লবগ্গ, দ্বিতীয় ধর্ম্মসংগীতির বিবরণ, ১২শ অধ্যায়।

(২) জাতক ৩০৪।৩য় ভাগ, পৃ ১৭।

পদ্ধতি এবং অপবটী শীলানুষ্ঠান।[১] বারাণসীতে প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারের অব্যবহিত পরে যখন তিনি উরুবিল্ববাসী কাশ্যপপ্রমুখ জটিলগণকে ধর্ম্মে দীক্ষাদান করিয়া প্রায় সহস্রাধিক ভিক্ষুকে লইয়া প্রথম সংঘ গঠন করেন[২], তখন তাঁহাদের অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষার বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিলেন। এই বিধি-নিষেধের শিক্ষাপদগুলি বুদ্ধদেবের নিজস্ব বিষয় ছিল না। তখনকার দিনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য বহু মুনি ঋষির আশ্রম ছিল[৩] এবং এই সমস্ত আশ্রমের নিয়ম যতগুলি শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্মের অনুকূলে ছিল, সেইগুলি এবং কিছু কিছু নূতন সন্নিবিষ্ট করিয়া তিনি এই বিধি-নিষেধ-গ্রথিত প্রথম বিনয় সৃষ্টি করিলেন, নাম হইল প্রাতিমোক্ষ। তাঁহার প্রচারের প্রথম অবস্থায় শিষ্যমণ্ডলী সকলেই প্রায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চাবস্থায় উন্নীত ছিলেন। তাঁহারা হয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় হইয়া পার্থিব ভোগ বিলাসে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, নয় বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী সংসার বিরাগী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া মোক্ষের আশায় উগ্র তপস্যানিরত থাকিতেন। কুল-পুত্র যশ এবং তাঁহার বন্ধুগণ প্রথম শ্রেণীর[৪] এবং জটাধারী অগ্নিউপাসক সহস্রাধিক উরুবিল্ববাসী তপস্বী জটিল দ্বিতীয় শ্রেণীর[৫] অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই শিষ্যবর্গকে লইয়া যখন প্রথম সংঘ গঠিত হইল, তখন আত্মশুদ্ধিমূলক প্রাতিমোক্ষ উক্ত বিধি-নিষেধগুলির প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না এবং সংঘের উদ্দেশ্য হইল 'বহুজনহিতায বহুজনসুখায়' ভিক্ষুদিগের বিচরণ ও জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা।[৬] দীক্ষিত শিষ্যগণ দূরদূরান্তরে প্রচার করিতে গিয়া অন্য শিষ্যবর্গ সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সকল স্থলে বিহার বা মঠ স্থাপন করিয়া সেগুলি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিতে লাগিলেন। এদিকে বুদ্ধদেবের অনুগমন-কারী সহস্রাধিক জটিল পরিবারের বাসোপযোগী বেণুবন নামক রাজগৃহের উপকণ্ঠে অবস্থিত এক উদ্যান বিহারে পরিণত করিবার জন্য রাজা বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধকে অর্পণ করিলেন।[১] এই বেণুবন বিহারেই বিনয়ের প্রাতিমোক্ষ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাতিমোক্ষ অর্থে যাহা মোক্ষের প্রতিকূল এবং এই মোক্ষ পরম মোক্ষ নহে ইহার অর্থ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার। বহু পুরাতন জাতকের মধ্যে এই পদের ব্যবহার দেখা যায়, যথা, 'তং সংগরং পটিমোক্খং ন মুক্তং'[২]—'সেই প্রতিজ্ঞাটী এখনও আমার মোক্ষের প্রতিকূল—আমায় অব্যাহতি দেয় নাই'। বিনয়ের প্রাতিমোক্ষ অর্থে বুঝিতে হইবে যে, বিধি-নিষেধগুলি ভিক্ষু-দিগের বন্ধন স্বরূপ এবং অবশ্য প্রতিপাল্য। যদিও প্রাতিমোক্ষ শব্দটী অন্য বহুরূপে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মনীষিবৃন্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে[৩], তথাপি উপরোক্ত অর্থটাই সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আমরা পালিভাষায় থেরবাদভুক্ত যে প্রাতি-মোক্ষ প্রাপ্ত হই তাহা নয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত :—

(১) নিদান বা প্রাতিমোক্ষ নির্দ্দেশের কারণ।

(২) পারাজিক বা যে অপরাধগুলির জন্য ভিক্ষুগণ সংঘে বাস করিবার অযোগ্য হন। ইহাদের সংখ্যা চারিটী।

(৩) সংঘাদিশেষ বা যে অপরাধ স্বীকৃত করিবার জন্য আদিতে এবং যাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শেষে সংঘকে প্রয়োজন হয়। এইগুলি

(১) মহাবগ্গ ৪র্থ অধ্যায় ১৬ বিভাগ ১১ পংক্তি।
(২) মহাবগ্গ ১।২০।১৭—২৩।
(৩) 'বৌধায়ন' 'গৌতম' 'আপস্তম্ব' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।
(৪) মহাবগ্গ ১।৭—১০।
(৫) মহাবগ্গ ১।১৫—২১।
(৬) মহাবগ্গ ১।১১।

(১) মহাবগ্গ ১।২২।
(২) জাতক ৫১৩, ৫ম ভাগ পৃ ২৫।
(৩) পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য কৃত 'প্রাতিমোক্ষের' প্রবেশক পৃ ৭১—৭৪ দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীলোক এবং সংঘের প্রতি প্রত্যেক ভিক্ষুর কিপ্রকার ব্যবহার করিলে অপরাধ হয় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছে। এই অপরাধে ভিক্ষুগণ কিছুদিনের জন্য স্ব স্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত হন এবং শেষে উহা স্বীকারপূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করিলে আবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাদের সংখ্যা ত্রয়োদশ।

(৪) অনিয়ত অর্থাৎ যে অপরাধগুলির নির্দ্দেশকরণ প্রমাণ সাপেক্ষ। এইগুলি মাত্র দুইটী।

(৫) নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তিক যে অপরাধগুলির জন্য ভিক্ষুদিগকে দ্রব্যবিশেষ পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইগুলি সংখ্যায় ত্রিশটী।

(৬) প্রায়শ্চিত্তিক অর্থাৎ যে অপরাধ করিলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়। ইহারা মোট বিরানব্বইটী।

(৭) প্রতিদেশনীয় বা যে অপরাধগুলি কোন অপরাধশূন্য সৎভিক্ষুর নিকট কীর্ত্তন বা স্বীকার করিতে হয়। ইহারা চারিটী।

(৮) শৈক্ষ্য বা শিক্ষণীয়, এগুলি সদাচার সম্পর্কীয় বিধি—ভিক্ষু মাত্রেরই অবশ্য পালনীয়। ইহারা মোট পঁচাত্তরটী।

(৯) অধিকরণসমথ বা বিবাদ মীমাংসা করিবার নিয়ম। ইহারা মোট সাতটী।

এই নয়টী অধ্যায়ে পালি প্রাতিমোক্ষে মোট ২৩১টী বিধি-নিষেধের উল্লেখ আছে। আবার স্ত্রী প্রব্রজিতদিগের জন্য ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষেরও সৃষ্টি হইয়াছিল উহা প্রায় ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষেরই অনুরূপ।

এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, উল্লিখিত ২৩১টী বিধি-নিষেধ এক সময়ে বা একেবারে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে, ঐ আকারে পরিণত হইয়াছিল। মহাবগ্গের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ বিভাগে আমরা অবগত হই যে, সংঘের প্রথমাবস্থায় প্রাতিমোক্ষে মাত্র চারিটী অধ্যায় ছিল, যথা—সূচনা, পারাজিক, সংঘাদিশেষ এবং অনিয়ত এবং তাহাদের ভাষা কিছু দুর্বোধ্য থাকায় উহাদের সহিত একটী সরলার্থও দেওয়া হইত।[১] বুদ্ধদেবের দেহান্তের প্রায় অব্যবহিত পরে যে প্রথম ধর্ম্ম-মহাসভা বা সংগীতি আহূত হয়, তাহাতে চুল্লবর্গের (বিনয়ের একখানি গ্রন্থ) নির্দ্দেশানুসারে শেষের দুইটী অধ্যায়, যথা—শৈক্ষ এবং অধিকরণসমথ উল্লিখিত হয় নাই।[২] খুব সম্ভব ঐ দুইটী তখনও প্রাতিমোক্ষের অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, প্রথম সংগীতির অল্পকাল পরেই উহা যুক্ত হইয়া থাকিবে, কারণ পরবর্ত্তী কালে মূল স্থবিরবাদের যে সমস্ত শাখা—যথা, সর্ব্বাস্তিবাদ, মহীংশাসক প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়াছিল, উহাদের সকলেরই বিনয়ের মধ্যে ঐগুলির উল্লেখ আছে।[৩]

এখন কথা হইতেছে যে প্রাতিমোক্ষের মূল নিয়ম বা নিষেধগুলি যে পালি বিনয়-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহার নাম সূত্রবিভঙ্গ এবং উহা পারাজিক এবং পাচিত্তিয় এই দুই বিভাগে বিভক্ত। ইহাদেরই মধ্যে মূল নিয়মগুলি উহাদের টীকা অর্থাৎ শব্দার্থ এবং ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থটী কোন সময়ের? মহামতি ওল্‌ডেন্‌বার্গ ও কার্ণ প্রমুখ বুধমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন যে প্রাতিমোক্ষই সর্ব্বপ্রথমে রচিত হইয়াছিল এবং পরে ঘটনাগুলির সমাবেশ করা হইয়াছে। অতএব গ্রন্থটী পরে গ্রথিত হইয়াছে।[৪]

উপস্থিত বিনয় বলিতে সাধারণে এই প্রাতিমোক্ষই বুঝিয়া থাকে কিন্তু এই প্রাতিমোক্ষ বস্তুতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধদেব কথিত বিনয়ের একটী বিশেষ দিক

(১) মহাবগ্গ ২।১৫।১। (২) চুল্লবগ্গ ১১।৯। (৩) কিন্তু মহাসংঘিক বিনয় অর্থাৎ মহাযান বিনয় সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। হীনযান বিনয়ের বিষয়গুলি এই মতবাদে ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইত এবং বোধিসত্ত্বের সদ্‌গুণ সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি ইহাদের বিনয় বলিয়া প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে থেরবাদ ভুক্ত পালির বিনয়টী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। (৪) ওল্‌ডেন্‌বার্গ কৃত মহাবগ্গের সূচনা পৃ ৩৭ এবং Kern's Manual of Indian Buddhism p. 1.

মাত্র। এই প্রাতিমোক্ষ মোটামুটি নিষেধাজ্ঞা-মূলক এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা ভিক্ষুদিগের ব্যক্তিগত পবিত্রতা এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু অপরদিকে সংঘকে সংহত এবং সমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত রাখিবার জন্য সময়ের প্রয়োজন অনুসারে বহুসংখ্যক বিধি বা ব্যবস্থামূলক নিয়মের প্রবর্তন করা হইয়াছিল। উহারা বিনয়ের 'আচার' নামে মহাবগ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।[১] এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংঘকে প্রথমাবস্থায় শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিবার জন্য যে সমস্ত নিয়ম সৃষ্টি করা হইল, তাহা প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা শীর্ষে উক্ত হইয়াছে। ইহাদের অনুশীলন করিলে বুঝা যাইবে, কি প্রকারে বিভিন্নাবস্থায় শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদানকল্পে প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা দিবার প্রণালী ক্রমশঃ দীর্ঘ ও জটিল হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা বৌদ্ধ বিহারগুলি শিক্ষা ও সংযম প্রদানের বিরাট আবাস ভূমি হয়।[২] আগন্তুক আসিয়া প্রথমে শ্রীবুদ্ধ বা উপাধ্যায় স্থানীয় তাঁহার কোন শিষ্যের নিকট ত্রিশরণ[৩]—বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সংঘ শরণ—গ্রহণ করিয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং বিংশতি বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে উক্ত উপাধ্যায়ের অনুমতি অনুসারে এবং তাঁহার নিজের বিশেষ প্রার্থনায় সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষু হইলেন। অতঃপর তাঁহাকে দীর্ঘ পাঁচবৎসরকাল ধরিয়া উক্ত উপাধ্যায় এবং অন্য একজন আচার্যের নিকট বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত।[৪] যদি তিনি পাঁচবৎসর পরে উপাধ্যায় বা আচার্যের সদ্‌গুণে ভূষিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে উপাধ্যায় বা আচার্য্য পদবীলাভ করিয়া অন্য আগন্তুককে আশ্রয় এবং শিক্ষাদান করিতে পারিতেন। যদি তাহা না হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বরাবরই ছাত্র স্থানীয় হইয়া থাকিতে হইত।[১] সংঘে ভিক্ষুগণ একক জীবনযাপন করিবার কোন সুবিধা পাইতেন না। কোন না কোন দায়িত্ব বা কাহারও সহিত কোন ভাবে যুক্ত না হইয়া সংঘমধ্যে বসবাস অসম্ভব ছিল।[২] আবার সংঘে প্রবেশ করিবার জন্য যে সমস্ত বিধি-নিষেধ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সকল অবস্থার ব্যক্তিকে সংঘে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। মাত্র বলিষ্ঠ অঋণী এবং কৃতী পুরুষদিগেই গ্রহণ করা হইত। যাঁহারা দুর্বল, বিকলাঙ্গ, রাজ্য বা সমাজের নিকট দায়যুক্ত, দুষ্ট বা রুগ্ন, তাঁহাদের গ্রহণ নিয়মবিরুদ্ধ ছিল।[৩]

সংঘবদ্ধ হইয়া ধর্মাচার্য্যগণের অবস্থান তখনকার সময়ে নূতন ছিল না। কেবল বুদ্ধ নহেন, অন্য যে সকল আচার্য্য নিজ নিজ সম্প্রদায় গঠন করিয়া ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, সকলেরই এক একটী দল বা সংঘ ছিল। নিগ্রন্থনাথ পুত্র জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি সকলেই সংঘী এবং গণী এই বিশেষণে অভিহিত হইতেন। তবে তাঁহাদের সংঘ বা গণ তাঁহাদের নিজেদেরই আয়ত্তে থাকিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীবুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন যখন তাঁহাদের পূর্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া সংঘ মধ্যে আসেন, তখন তাঁহাদের পূর্বাচার্য্যদের সঞ্জয় তাঁহার সংঘ বা গণ মধ্যে রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে উহার নেতৃত্ব দিবার প্রস্তাব করেন।[৪] ইহাতে বেশ বুঝা যায়, নেতার উপরই কর্তৃত্ব নির্ভর করিত। কিন্তু বৌদ্ধ সংঘের কর্তৃত্বের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা

(১) মহাবগ্গ ৪।১৬।১২। (২) মহাবগ্গ ১।৭৬, (৩) মহাবগ্গ ১।১২।১-৪, (৪) মহাবগ্গ ১।৫৩।৪, (লেখকের 'সংঘের শিক্ষা' নামক উদ্বোধনের ফাল্গুন ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

(১) মহাবগ্গ ১।৩৭।১-১৪;
(২) মহাবগ্গ ১।৬৯।১;
(৩) মহাবগ্গ ১।৩৯।৭৮।
(৪) মহাবগ্গ ১।২৪।২;

হইল। ভগবান বুদ্ধ নিজে গণতন্ত্র মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন, কারণ শাক্যগণ গণতন্ত্রবাদী ছিলেন। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, সংঘের প্রচারকার্য্যের সাহায্যের জন্য শ্রীবুদ্ধ ব্যক্তিগত সম্মান উপেক্ষা করিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, যে কেহ বুদ্ধ ধর্ম্ম এবং সংঘের শরণ লইয়া সংঘ মধ্যে প্রবেশ করিবেন তিনিই তাঁহার ভিক্ষু বা শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হইবেন।[১] সংঘের অন্য দীক্ষাগুরুগণ মাত্র আচার্য্য পদবী লাভ করিবেন। ইহাতে সকল ভিক্ষুরই সমান অধিকার জন্মিল এবং প্রভেদ থাকিল, তাঁহাদের আচার্য্য এবং ছাত্র পদবী লইয়া।

উল্লিখিত ত্রিশরণ প্রব্রজ্যার সহায়ে শীঘ্রই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নূতন নূতন সংঘকেন্দ্র সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উপোসথ নামক মহাবগ্গের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়ম সকলের প্রবর্ত্তন হইল। শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, ভিক্ষুগণ প্রতিপক্ষে একবার করিয়া প্রাতি-মোক্ষের বিধি-নিষেধগুলি (অবশ্য প্রথম অবস্থার) সংঘবদ্ধ হইয়া শ্রবণ করিবেন এবং একজন বিশিষ্ট ভিক্ষু তাহা সংঘমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিবেন।[২] কারণ উহা তাঁহাদের মনে যাহা পাপ এবং বর্জ্জনীয় তাহা জাগ্রত রাখিবে এবং রক্ষা করিবে। এই কার্য্য উপলক্ষে যে পর্ব্বদিন সৃষ্ট হইল, তাহার নাম হইল উপোসথ দিবস। কত সংখ্যক ভিক্ষু একত্র হইয়া উপোসথ করিবেন তাহা নির্ণয় করণার্থ উপোসথসীমা বা চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশের প্রান্তদেশ নির্দ্দিষ্ট হইল।[৩] এই সীমার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় ভিক্ষুকে ঐ দিন পূর্ব্ব হইতে স্বীকৃত কোন বিহারে আসিয়া একত্র উপোসথ পালন করিতে হইত এবং এই উপোসথ পালন প্রত্যেক ভিক্ষুরই অবশ্য করণীয় হইল।[৪] সংঘের এই পাক্ষিক অধিবেশনে

(১) মহাবগ্গ ১।১২।৪।
(২) মহাবগ্গ ২।৩।১-৮;
(৩) মহাবগ্গ ২।৫।১-২। (৪) মহাবগ্গ ২।৫।৫।

সচরাচর যে সমস্ত কার্য্য হইত, তাহাদের তালিকা যথাক্রমে—১। প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি, ২। ধর্ম্ম ও বিনয়চর্চ্চা, ৩। উপসম্পদা-প্রদান, ৪। উপাসক-গণের বিশেষ আবেদন বিচার, ৫। নীতিভ্রষ্ট ভিক্ষুগণের অপরাধ নির্ণয় ও শাস্তি বিধান। এইরূপে সংঘের অধিবেশনে একই প্রকার কার্য্যাবলীর দ্বারা সংঘ কেন্দ্রগুলিকে একসুরে বাঁধিয়া দাঁড়করাইবার একটী বৃহৎ প্রচেষ্টা হইল এবং উপোসথ পালনের বিধি ও ভিক্ষুগণের কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে বাস করিবার নিয়মগুলি এরূপভাবে গঠিত হইল যে, ক্ষুদ্র সংঘগুলি সহজেই এক বিরাট সংঘের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল।[১]

সংঘ মধ্যে যে নিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পরবর্ত্তীকালের ভিক্ষুগণের স্বকপোল কল্পিত নহে।[২] তৎকালীন গণতন্ত্রপরায়ণ প্রদেশ-গুলিতে যে ভাবে সমাজের এবং রাজ্যের কার্য্যাবলী প্রজাবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইত, উহা তাহারই প্রতিচ্ছবি মাত্র। প্রমাণ স্বরূপ দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থগুলি বাদ দিয়া মূল পালি বিনয়েই দৃষ্ট হইবে যে, অবস্থাভেদে উপোসথের নিয়মগুলি কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংঘের প্রথমাবস্থায় উপোসথ অধিবেশনে যাবতীয় কার্য্য সীমার অন্তর্গত সমস্ত ভিক্ষুগণ একত্রিত হইয়া সম্পাদন করিতেন।[৩] যদি প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে একজন ভিক্ষুও অনুপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে সংঘের ক্রিয়া পণ্ড হইত। একারণ সীমার মধ্যস্থ সমস্ত ভিক্ষুর সংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্য একজন বিশিষ্ট ভিক্ষু নিযুক্ত হইতেন এবং তিনি উপযুক্ত সময়ে ঐ সংখ্যাটী প্রত্যেক

(১) মহাবগ্গ ২।১৩।১—১৩।
(২) 'It (the Buddhist Sangha) rested on the basis of a common Dhamma and had at first no special Vinaya of its own'—p. 86—'Early Buddhist Monachism' by Dutt.
(৩) মহাবগ্গ ২।১৪।৩।

ভিক্ষুবই গোচব করিতেন।[১] যদি কেহ কার্য্যবশতঃ উপোসথে উপস্থিত থাকিতে না পাবিতেন, তাঁহাকে 'পাবিশুদ্ধি' বা প্রাতিমোক্ষেব নিয়ম সম্পর্কে ব্যক্তিগত নিষ্পাপত্ব এবং 'ছন্দ' বা সংঘ-কার্য্যসম্বন্ধে মতামত জ্ঞাত কবাইতে হইত।[২] সংঘেব প্রত্যেক ক্রিয়াটী জ্ঞপ্তি বা জ্ঞাপ্তি (proclamation) দ্বাবা জানান হইত এবং সমস্ত ভিক্ষুব অভিন্ন মতের উপব তাহার ব্যবস্থা নির্ভব করিত।[৩] প্রাচীন ভাবতে গ্রাম্য ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত গ্রামবাসিগণ একযোগে সভাতে মিলিয়াই সম্পন্ন কবিতেন। নদী, পথ এবং পানাগাবেব মত 'সভা' গুলিও সাধাবণেব ছিল; "যথা নদী চ পন্থো চ পানাগাবং সভা পপা" ইত্যাদি[৪] বাক্যটী প্রাচীন জাতক গাথায় দেখিতে পাই। তৎকালীন বজ্জী বা লিচ্ছবীদিগের গণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, 'যতদিন এই বজ্জিগণ সকলে একত্রে মিলিত হইয়া অধিবেশনাদি কবিবেন, ততদিন তাঁহাদেব উচ্ছেদ সম্ভবপব নহে ববং উন্নতিই দৃষ্ট হইবে[৫]। বজ্জীদিগেব এই অধিবেশনেব সহিত সংঘেব প্রথমাবস্থাব অধিবেশনেব যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

আবার বিনয়েব উপোসথ অধ্যায়েব শেষ-ভাগে দেখিতে পাই যে, সংঘমধ্যে একত্র বা একমতে সংঘকার্য্য পবিচালনা ব্যাপাবে নূতন অবস্থাব সৃষ্টি হইয়াছে। সংঘমধ্যে বিভিন্ন মতের প্রাদুর্ভাব হইলে যে দলেব সংখ্যা অধিক, সেই দলেবই জয় হইবে অর্থাৎ সংখ্যাধিক্যেব শাসন সংঘে প্রবর্ত্তিত হইবে, এই নিয়ম বলবৎ হইল। তখন সংখ্যালঘিষ্ঠেব ঐ মতে সায় দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না।[৬] পুনবায়, দ্বিতীয় মহাসংগীতির সময়—বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের প্রায় একশত বৎসর পরে—দেখিতে পাই যে, সংঘ দলবদ্ধ থাকিয়া কার্য্যাবলী পরিচালনে অক্ষম হইয়াছেন এবং বিভিন্ন দল হইতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠনপূর্ব্বক ক্রিয়াদি সম্পন্ন কবিতেছেন[১]। অতএব ইহা অনুমান কবা খুব সহজ হইবে যে, বৌদ্ধ সংঘেব নিয়মগুলি তৎকালীন বাজনৈতিক এবং সামাজিক নিয়মগুলিব উপব লক্ষ্য বাখিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং আদৌ মন-কল্পিত নহে। বাজ্যেব এবং সমাজেব অবস্থাব পরিবর্ত্তন অনুসাবে যেমন নিয়মগুলি পবিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহাদেব প্রভাবও সংঘেব বীতিনীতিব উপব আসিয়া পড়িয়াছিল। ভিক্ষুদিগের স্বরচিত হইলে একই গ্রন্থে একই কার্য্যেব জন্য বিভিন্ন বকম নিয়মেব উল্লেখ থাকিত না।

দ্বিতীয়তঃ এই উপোসথেব নিয়মগুলি পালিগ্রন্থে যে ভাবে লিখিত আছে, সেই ভাবে পববর্ত্তী কালেব অন্য গ্রন্থে নাই। হয় তাহাবা একেবাবে লুপ্ত হইয়াছে, নয় নূতন আকাবে দেখা দিয়াছে। পালি বিনয় এবং থেববাদেব অন্য কোন শাখা ব্যবহৃত বিনয়েব তুলনা কবিলেই ইহাব সত্য প্রমাণিত হইবে।[২] মহাসর্ব্বাস্তিবাদ নামক যে থেববাদের শাখা তিব্বতে প্রচলিত, তাহাব বিনয়েব মধ্যে 'চোগা' বলিয়া উপোসথেব যে নিয়মকানুন আছে, তাহা পালি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ তাহাতে 'প্রাতিমোক্ষে'ব সমস্ত নিয়মগুলি অবিকল বর্ত্তমান আছে ববং কিছু কিছু বাড়িয়াছে।[৩] সুতবাং আমবা বলিব, এই উপোসথের থেরবাদ উক্ত নিয়মগুলি 'প্রাতিমোক্ষে'ব মত বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিজস্ব হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত বিনয় গ্রন্থে সঠিক বিরাজ কবিত। শ্রীবুদ্ধের সময়েই গণতান্ত্রিক নিয়মাবলীসহ বিনয়

(১) মহাবগ্গ ২।১৮ ৪। (২) মহাবগ্গ ২।২২-২৩-২৪। (৩) মহাবগ্গ ১।২৮ ৩-৬। (৪) জাতক ১ম ভাগ পৃ ৩০২। (৫) মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র। (৬) মহাবগ্গ ২।২৮-৩৩।

(১) চুল্লবগ্গ ১২।২।৭।

(২) ওলডেনবার্গ কৃত মহাবগ্গের উপক্রমণিকা পৃ ৪৩-৪৫; (৩) অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কৃত 'সো সো থার পা'র উপক্রমণিকা।

লইয়া সংঘের পূর্ণতেজে বিদ্যমান থাকার আরও বহু প্রমাণ আছে।

এই উপোসথ নিয়মগুলি সৃষ্ট হইবার অল্পকাল পরে আসিল 'বর্ষাবাসে'র নিয়ম।[১] বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" বিচরণের সহিত বর্ষাকালের চারিমাস একস্থানে অবস্থান কিছু বিসদৃশ হইল। কিন্তু ইহার একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় সংঘ 'বর্ষাবাস' করিতে বাধ্য হইলেন। উপোসথ পালন করিবার সময় গৃহস্থ উপাসকগণের উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয় ছিল, এমন কি নিয়ম ছিল একটীমাত্র গৃহস্থও উপস্থিত থাকিলে তথায় উপোসথ পালিত হইবে না।[২] কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংঘের অবস্থিতি কিরূপে সম্ভবপর? ভিক্ষুসংঘে বর্ষাবাস পালনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল গৃহস্থদিগের সহিত ভিক্ষুগণের কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা। বৈদিক ঋষিগণ বর্ষাকালে চাতুর্মাস্য পালন করিতেন। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সংঘ নিয়ম করিলেন সাধারণতঃ ভিক্ষুগণ শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিনমাস কাল বর্ষাবাস পালন করিবেন[৩] এবং এই তিনমাস দেশ বিদেশে গমনাগমন বন্ধ রাখিয়া একস্থানে অতিবাহিত করিবেন, বিশেষতঃ ঐ সময়টী তাঁহারা বিহারে না থাকিয়া আত্মীয় বা বন্ধু বা গৃহী উপাসকগণের মধ্যে থাকিবেন।[৪] ঐ সময়ের জন্য এমন নিয়মও প্রবর্ত্তন হইল,—অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—যে গৃহস্থের মন তুষ্টির জন্য সংঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার পদ্ধতি তাঁহারা লঙ্ঘন করিতেও পারেন।[৫] গৃহস্থেরা এই বর্ষাকালের তিনমাস ভিক্ষুগণকে নিজ নিজ আয়ত্তে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন এবং ইহার ফল হইল, 'প্রবারণা' অর্থে 'পারণ' উৎসব বা পর্ব্ব।

(১) মহাবগ্গ ৩য় অধ্যায়। (২) মহাবগ্গ ২।১৬।৮, (৩) মহাবগ্গ ৩।৩।২; (৪) মহাবগ্গ ৩,১০।১, 'সমন্তা বেসালিং যথা মিত্তং যথা সন্দিট্ঠং যথা সম্ভত্তং বস্সং উপেথ'। —মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তন্ত।

(৫) ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে শিক্ষা ও উপোসথ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই 'পারণের' অনুষ্ঠান হইত কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার রাত্রিতে যেদিন বর্ষাবাস শেষ হইত।[১] ভিক্ষুগণের চরিত্র আচার ব্যবহার রীতিনীতি সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় সহানুভূতিসম্পন্ন গৃহস্থ উপাসকগণ বহুবিধ প্রকারের উপহার লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঐ দিন রাত্রিতে সংঘকে প্রদান করিতেন। গৃহস্থগণের ঐরূপ ভক্তির অর্ঘ্য প্রদানে প্রায় সমস্ত রাত্রিই কাটিয়া যাইত।[২]

একদিন বৌদ্ধ সংঘ বিশাল ভারতের বক্ষে যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা প্রধানতঃ এই চারিটী অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথম,—সংঘকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করণ; দ্বিতীয়,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রগুলিকে উপোসথ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া এক বৃহৎ সংঘের অঙ্গীভূত করণ; তৃতীয়—বর্ষাবাস পালন দ্বারা সংঘকে গৃহস্থদের চক্ষে বরণীয় করণ; এবং চতুর্থ—গৃহস্থগণের ভক্তি এবং সহানুভূতিব্যঞ্জক "প্রবারণা"র অবতারণা।

বিনয়পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'খন্দকে'র অন্তর্গত মহাবগ্গ নামক অত্যাবশ্যকীয় রীতিনীতিপূর্ণ পুস্তকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে এই অনুষ্ঠানগুলি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে আরও বিস্তারলাভ করিল, তখন আরও খুঁটিনাটিপূর্ণ বিনয়ের নিয়মাবলী সৃষ্ট হইল, উহা মহাবগ্গের অন্যান্য অধ্যায়ে এবং চুল্লবগ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহাদের সবিশেষ আলোচনা সম্ভব নহে। বিনয়ের আর একখানি গ্রন্থের নাম 'পরিবারপাঠ'। উহা সূচীপত্র মাত্র।

উপস্থিত এই বলিয়া উপসংহার করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'আচার' বিনয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল একতা করণ। একতার উপর শ্রীবুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ

(১) মহাবগ্গ ৪র্থ অধ্যায়, (২) মহাবগ্গ ৪।১৫।২.

বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন—এতদূর যে বুদ্ধের মাতা মহাপ্রজাবতী গোতমী তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন—'সমগ্গে সাবকে পস্স এসা বুদ্ধান বন্দনা'[১] বুদ্ধের শিষ্যবর্গকে একত্র মিলিত থাকিতে সহায়তা কর, ইহাই তাঁহার বন্দনা।

একতার দোহাই দিয়া দোষী নির্দ্দোষ হইতেন। যদি কোন ভিক্ষু সত্য সত্যই কোন দোষে দোষী হইতেন কিন্তু সংঘ যদি মিলিত হইয়া তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত না করিতে পারিতেন বা নির্দ্দোষ বলিতেন, তাঁহার নির্দ্দোষিতাই প্রতিপন্ন হইত।[২] অন্যদিকে প্রাতিমোক্ষ বা শীল বিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল সংঘের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত পবিত্রতা রক্ষা করা। এখানেও আমরা সংঘাদিশেষ নিয়মগুলির মধ্যে দেখিতে পাই যে, সংঘভেদ বা দলাদলির সৃষ্টি করা একটী গুরুতর ব্যক্তিগত অপরাধ ছিল।[১]

গণতন্ত্রবাদের উপর ভিত্তি রাখিয়া শ্রীবুদ্ধের সংঘসৃষ্টি বাস্তবিকই ভারতে নূতন যুগের অভ্যুত্থান আনয়ন করিয়াছিল। তখন গৃহস্থাশ্রম দূরে রাখিয়া বনাশ্রয়ে গৃহীকে মোক্ষের জন্য ধাবমান হইতে হইত। মহাকরুণায় ভারতের ভগবান এই সংঘের দ্বারা সেই ঋষির আশ্রমের মোক্ষমার্গকে গৃহস্থের কল্যাণ ও দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থাপিত করিলেন।

(১) থেরী গাথা। (২) মহাবগ্গ ১।১২।৩। (১) প্রাতিমোক্ষ ২য় অধ্যায় ১০ম নিয়ম।

কাল-বৈশাখী

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

বসন্তের পানে ঘৃণা ভরে চাহি,
সৃষ্টি,—সে নহে আমার কাজ,
আমি ধ্বংসের রুদ্র-দেবতা,
চির-গৈরিক আমার সাজ।
বর্ণ-গন্ধে, অবজ্ঞা করি,
চাহিনা কখনো সেবা তার;
হোমাগ্নি জ্বালি, বিপুল-ভস্মে
অর্ঘ্য সাজাই দেবতার।
হস্তে অমোঘ-বজ্র-দণ্ড,
আননে ক্ষিপ্ত-অট্টহাসি;
চক্ষে দীপ্ত-বিজলী-আলোক,
বক্ষে বিপুল ভস্মরাশি,
ক্ষুব্ধ-পবনে উড়ে জটাজাল,
কণ্ঠে সগর্ব-ফণিহার,
বজ্র-আবাবে গরজে 'কম্বু',
দিগন্তে ছুটে ধ্বনি তা'র।
উন্মাদ-আবেগে, উদ্দাম-বেগে
রুদ্র প্রলয়-ঝটিকা-বুকে,—
মেঘ-ডমরুর ডিণ্ডিম-তালে—
নাচিয়া বেড়াই অসীমে সুখে।
আমি মর্ত্ত্যের মৃত্যু বিনাশি,
সসীম করিয়া চূর্ণ,
বিরাট-রুদ্র,—নহি যে ক্ষুদ্র,
চাহি সে অসীম, পূর্ণ।
চরণ-চিহ্নে পথ-রেখা আঁকি',
আলোকিত করি' রাত্রি,—
লয়ে যাই সাথে কত শত শত
অমৃতের পথ-যাত্রী।
মম অভিযান বিশ্ব-বিজয়ে,—
'জয়-গৌরব' বক্ষে ধরি'.
আমি, চির-বিদ্রোহী, বিশ্ব-বিজয়ী—
'বিজয়-পতাকা' বহন করি।
আমি, চির-বাধাহীন, মুক্ত, স্বাধীন,
দূর করি বাধা-বন্ধ;
'রুদ্রের' তালে বাজাই হরষে
বিশ্ব-বীণার ছন্দ।
মায়ার বিশ্ব চূর্ণ করিয়া,
বুঝাইতে চাই তথ্য তার,—
পদাঘাতে ভাঙ্গি রুদ্ধ-দুয়ার
বাহিরেতে আনি 'সত্য' তার।
আমি, বিদ্রোহী-বীর, উন্নত শির,
ধ্বংস আমার ধর্ম্ম;
জীবন মানিনা, মরণ জানিনা,
জানি আমি শুধু কর্ম্ম।

যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধি

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

মিথ্যা ও অসৎ মধ্যে ভেদ নাই বলিয়া আপত্তি

যদি বলা হয় অদ্বৈতমতেও ত বলা হয়—যে অসৎ দৃশ্য হয় তাহাই মিথ্যা, আর যে অসৎ দৃশ্য হয় না তাহাই "অসৎ"। বন্ধ্যাপুত্র যে অসৎ, সে অসৎ দৃশ্য হয় না। সুতরাং তাহা শুদ্ধ অসৎ, আর রজ্জুসর্প অসৎ হইলেও দৃশ্য হয়, সুতরাং তাহা কল্পিত অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা, কিন্তু উভয়ই যখন অসৎ তখন বন্ধ্যাপুত্রীয় অসৎও দৃশ্য হয় বলিব। উহাদের মধ্যে আবার ভেদ কল্পনা করা কেন? ন্যায়মতে রজ্জু সৎ, সর্প সৎ স্বীকার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধকে অসৎ বলা হয়, আর সেই অসৎ সম্বন্ধকে দৃশ্যও বলা হয়। বেদান্তমতেও তাহা স্বীকার করা হয়। সুতরাং সকল অসৎই দৃশ্য হয়। আর তজ্জন্য দৃশ্য হইলেই সদসদ্‌ভিন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং মিথ্যাত্বের লক্ষণে আবার দোষ ঘটিল। অর্থাৎ মিথ্যা ও অসৎ অভিন্নই হইল।

উক্ত আপত্তির নিরাস

তাহা হইলে বলিব—একথা অসঙ্গত। কারণ, অনুভব অনুসারে কল্পনা করা আবশ্যক। বন্ধ্যাপুত্র যে অসৎ তাহা কেহ দেখে না, কিন্তু রজ্জুসর্প যে অসৎ তাহা সকলেই দেখে। রজ্জুতে সর্পকে যখন "এই সর্প" বলা হয়, তখন তাহার প্রত্যক্ষ আর অস্বীকার করা যায় না। আর বন্ধ্যাপুত্রকে কেহ "এই বন্ধ্যাপুত্র" বলে না; একারণ, তাহার প্রত্যক্ষ স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। এইজন্য অসৎ দুইরূপ স্বীকার করিতেই হয়। বন্ধ্যাপুত্রীয় অসৎ ও রজ্জুসর্পীয় অসৎ—ইহারা পৃথক্। এই পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য রজ্জুসর্পীয় অসৎকে মিথ্যা বলা হয়। আর তাহা সৎ বা অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না বলিয়া তাহাকে অনির্ব্বচনীয়ই বলা হয়। এই অনির্ব্বচনীয়ত্বই মিথ্যাত্ব। অতএব মিথ্যা ও অসৎ মধ্যে ভেদ নাই—এই আপত্তি নিরর্থক।

এইরূপ নানাকারণে ভ্রম বা ভ্রমের যে বিষয় তাহা সদসদাত্মক নহে, কিন্তু তাহা সদসদ্‌ভিন্ন। অর্থাৎ যাহা সদসদ্‌ভিন্ন তাহা সৎ নহে, অসৎও নহে, এবং সদসৎও নহে। অতএব মিথ্যাত্বের লক্ষণে কোন দোষ নাই।

ভ্রমসম্বন্ধে মতভেদ

এই রজ্জুসর্প-ভ্রমকে এবং তাহার বিষয়কে রামানুজ ও প্রভাকরমতে সৎ বলা হয়, মাধ্বমতে ও শূন্যবাদে অসৎ বলা হয়। সাংখ্য ও নিম্বার্কমতে ও প্রায়শঃ পাশ্চাত্ত্যমতে সদসৎ বলা হয়; এবং অদ্বৈতমতে সদসদ্‌ভিন্ন বলা হয়। এজন্য এই অদ্বৈত বেদান্তমতে সদসদ্‌ভিন্ন শব্দের অর্থ—সৎ নহে, অসৎ নহে এবং সদসৎও নহে। কিন্তু অদ্বৈতমত ভিন্ন উক্ত সকল মতই যুক্তিসহ নহে। এই যুক্তি অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না, এজন্য এস্থলে আর উল্লেখ করা গেল না। তথাপি এক কথায় যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, যাহাকে অদ্বৈতমতে সৎ বলা হয়, তাহা ত্রিকালাবাধিত সৎ বলা যায়। রজ্জুসর্প তাদৃশ সৎ হইলে তাহা রজ্জুজ্ঞানে বাধিত হয় কেন? আর বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ হইলে তাহা দৃশ্য হয় কেন? আর সদসৎ একই কালে একই বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না। অতএব রজ্জুসর্প দৃশ্য হয় বলিয়া এবং বাধিত হয় বলিয়া সদসদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয়।

সদসদ্‌ভিন্নেও সদ্‌বুদ্ধির শঙ্কা

যদি বলা যায়—সদসদ্‌ভিন্ন রজ্জুসর্পাদিতেও ত সদ্‌বুদ্ধি হয়? অর্থাৎ যখন রজ্জুসর্প দেখি তখন ত তাহাকে "আছে" বলিয়াই দেখি, অতএব তাহাকে সদসদ্‌ভিন্ন কেন বলিব? সদসদ্‌ভিন্ন বলিলে ত সদ্‌ভিন্নও বলা হয়, কিন্তু তাহাতে "আছে" অর্থাৎ সদ্‌বুদ্ধি হয় বলিয়া তাহাকে সৎই বলিব। সুতরাং সদসদ্‌ভিন্নস্বরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণ সিদ্ধ হইল না।

উক্ত শঙ্কার নিরাস

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা সঙ্গত নহে। রজ্জুসর্পে যে সদ্‌বোধ হয়, তাহা ত্রিকালাবাধিত সতের বোধ নহে। কিন্তু তাহা তৎসদৃশ সতের বোধ মাত্র। অথবা তাহা অধ্যস্ত সতের বোধ মাত্র। অর্থাৎ তাহা সতের ছায়ার বোধ মাত্র। তাহা যথার্থ ত্রিকালাবাধিত সতের বোধ নহে। সেই ত্রিকালাবাধিত সৎ কখনও দৃশ্য হয় না। কিন্তু রজ্জুসর্পের সৎ দেখা যায়। এইজন্য ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। কারণ, সাধারণতঃ আমরা যাহাকে "আছে" বলি তাহাকেই পরক্ষণে "নাই" বলি। কিন্তু ত্রিকালাবাধিত সৎকে কখনই "নাই" বলি না। অতএব রজ্জুসর্পকে সৎ বলা যায় না। অতএব উক্ত আপত্তি নিরর্থক অর্থাৎ মিথ্যাত্বের লক্ষণে কোন দোষ হয় না।

সৎ জ্ঞেয় না হইলে অসিদ্ধ হইবার আপত্তি

যদি বলা যায়—যাহা ত্রিকালাবাধিত সৎ, তাহা যদি দৃশ্য না হয়, তবে তাদৃশ সৎ বলিয়া একটা বস্তু স্বীকার করিব কেন? বস্তু থাকিলেই তাহার জ্ঞান হয়, আর জ্ঞান হইলেই ত তাহার সত্তা স্বীকার করা হয়। সদ্‌বস্তু যদি দৃশ্য বা জ্ঞেয় না হয়, তবে তাহার স্বীকার কি ব্যর্থ নহে? অতএব সৎও দৃশ্য হয়, জ্ঞেয় হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে এই দৃশ্যজগৎ আর মিথ্যা হইবে না। কারণ, সদ্‌বস্তু দৃশ্য হয় বলিতে হইবে। অর্থাৎ মিথ্যাত্বলক্ষণ আবার অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

সৎ জ্ঞেয় না হইলেও সিদ্ধ—এই বলিয়া খণ্ডন

তাহা হইলে বলিব—সেই ত্রিকালাবাধিত সদ্‌বস্তুর সত্তায় সকল দৃশ্য সত্তাবান্ হয় বলিয়া অর্থাৎ দৃশ্য মিথ্যাবস্তুও সদ্‌ বলিয়া বোধ হয় বলিয়া উহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেমন ঘট আছে, পট আছে, মঠ আছে, আমি আছি, সে আছে—ইত্যাদি সকল বস্তুর সঙ্গে এই সদ্‌বস্তুরই জ্ঞান হইতেছে। সেই সদ্‌বস্তুর সত্তাতেই ইহারা সকলে সত্তাবান্। এই সতের অভাব বোধ কখনই হয় না। একটি ঘট পট মঠ ভাঙ্গিয়া গেলেও সেই সদ্‌বুদ্ধির বিষয়ের অভাব হয় না। কারণ, অন্য ঘট পট মঠে সেই সদ্‌বুদ্ধি ভাসিয়া থাকে। সদ্‌বুদ্ধির বিষয়ের একেবারে অভাব হয় না। এমন কি সমস্ত নষ্ট হইলেও "আমি" নষ্ট হই না। সুষুপ্তি মৃত্যু মূর্চ্ছা অবস্থাতেও সেই আমির সত্তানাশ স্বীকার করা যায় না। আমি না থাকিয়াও যেন আমি থাকি এইরূপ একটা বোধ সুষুপ্তি প্রভৃতির অন্তে থাকিয়া যায়। এই আমিকে "সাক্ষী আমি" বলা হয়। সব নষ্ট হইলেও এই "সাক্ষী আমি"টী থাকিয়া যায়। এই "সাক্ষী আমির" জ্ঞান ও সত্তা শেষকালে মিশিয়া এক হইয়া যায়। ইহার বিনাশ আর হয় না এজন্য ইহাকে স্বপ্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলা হয়। আর এই সদ্রূপ "সাক্ষী আমির" জ্ঞানটী নিত্য প্রত্যক্ষ। ইহার স্বীকারে যে ইহার দৃশ্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব হয়, সেই দৃশ্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্বের যে অস্বীকার করা হয়, সেই দৃশ্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব ঘট পটাদির ন্যায় দৃশ্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব নহে বলিয়া স্বীকার করা হয়; কারণ, ঘট পটাদির যে দৃশ্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব তাহা দ্রষ্টৃসম্বন্ধ দৃশ্যত্ব বা জ্ঞাতৃসম্বন্ধ জ্ঞেয়ত্ব। এই দ্রষ্টৃসম্বন্ধ দৃশ্যত্ব বা জ্ঞাতৃসম্বন্ধ জ্ঞেয়ত্বই সেই ত্রিকালাবাধিত সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে অস্বীকার করা হয়। আর তজ্জন্য এই "সাক্ষী আমির" যে দৃশ্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব তাহা দ্রষ্টৃসম্বন্ধ দৃশ্যত্ব নহে বা জ্ঞাতৃসম্বন্ধ জ্ঞেয়ত্ব নহে। ইহারই কথা শ্রুতিমধ্যে কথিত হইয়াছে যথা—

> "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ (বৃঃ উঃ ২।৪।১৪)
> যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম (বৃঃ উঃ ৩।৪।১)
> ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যে ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়া
> এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরম্ (বৃঃ উঃ ৩।৪।২)
> অদৃশ্যে অনিরুক্তে··· সূক্ষ্মোঽগ্রাহ্যঃ অদৃশ্যঃ।"
> ইত্যাদি।

অতএব যাহা ত্রিকালাবাধিত সদ্ তাহা দৃশ্য না হইলেও স্বীকার্য্য। তাহা কোনরূপেই অস্বীকার্য্য হইতে পারে না, অথচ ত্রিকালাবাধিত সদ্‌বস্তু কখনও দৃশ্য হয় না। অতএব মিথ্যাত্বলক্ষণে কোন দোষ হয় না।

সতের ধর্ম্ম সত্তাকে দৃশ্যের ধর্ম্ম বলিয়া আপত্তি

যদি বলা যায়—একটী সদ্‌বস্তুর সত্তায় যাবদ দৃশ্যবস্তু সত্তাবান্ হয়, এরূপ কেন বলিব? কিন্তু

যাবদ্ দৃশ্যবস্তুর ধর্ম্মবিশেষই সত্তা, একটী সদ্-বস্তুর ধর্ম্ম সত্তা নহে—এইরূপই বলিব। ইহা জাতি-পদার্থের ন্যায় যাবদ্ দৃশ্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহা নিজে স্বাধীনসত্তা-বস্তু অর্থাৎ ধর্ম্মিবিশেষ বলিব না। যেহেতু "ঘট আছে" "পট আছে" বলিলে ঘটের ধর্ম্মই "আছে", পটের ধর্ম্মই "আছে" এইরূপই অনুভব হয়। ঘট পট ধর্ম্মী হয়, আর "আছে" পদার্থটী তাহাদের ধর্ম্ম হয়। সুতরাং একটী সদ্বস্তুর জন্য যাবদ্ দৃশ্যবস্তু তাহার সত্তায় সত্তাবান্ হয়, তজ্জন্য সদ্বস্তুই ধর্ম্মী এবং ঘট-পটাদি যাবদ্ দৃশ্যবস্তু তাহাতে আরোপিত ধর্ম্ম বা অধ্যস্ত ধর্ম্মবিশেষ—এরূপ অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না, আর তাহা হইলে যাবদ্ দৃশ্যবস্তুই সৎ হইল, একটী সদ্বস্তু আর সিদ্ধ হইল না। দৃশ্যবস্তুও মিথ্যা হইল না। সুতরাং অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত সুদূরপরাহত হইল। অর্থাৎ মিথ্যাত্ব-লক্ষণটী আবার অসিদ্ধ হইল।

সদ্বস্তুটী ধর্ম্মী বলিয়া উক্ত আপত্তির নিরাস

তাহা হইলে বলিব—না, একথা সঙ্গত নহে। কারণ, ঘটপটাদি যাবদ্ দৃশ্যবস্তুর ধর্ম্ম "আছে" হইলে সেই ঘটপটাদির নাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই "আছে" ধর্ম্মটীরও নাশ হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই "আছে" ধর্ম্মটী তখন অন্য বিদ্যমান ঘটপটাদিতে প্রতিভাত হয়। বিনষ্ট ঘটের "আছে" এবং বিদ্যমান ঘটের "আছে"র মধ্যে কোন ভেদই নাই। এই "আছে" ভাবই ত সত্তা। ঘটপটের সত্তাকে পৃথক্ বোধকরা অনুভব মধ্যে আসে না। অতএব ঘট-পটাদি যাবদ্ দৃশ্যবস্তুর ধর্ম্মই "সত্তা" একথা বলা সঙ্গত হয় না। আর তাহা যদি না হয়, তবে সেই সত্তা-ধর্ম্মটী একটী সদ্বস্তুরই ধর্ম্ম বলিতে হইবে। এই সদ্বস্তুকে লইয়া যাবদ্ দৃশ্যবস্তুকে সদ্ বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য এই সৎকে ধর্ম্মী বা অধিষ্ঠান বলা হয়, এবং ঘটপটাদি যাবদ্ দৃশ্য-বস্তু তাহাতে ধর্ম্মরূপে আরোপিত বা অধ্যস্ত বা কল্পিত বলা হয়। যেমন যে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সেই রজ্জুটী যে প্রকারে অবস্থিত ও যত বড় দেখায়, কল্পিত সর্পটীও সেই প্রকারে অবস্থিত ও তত বড় দেখায়, অর্থাৎ রজ্জুর ধর্ম্ম সর্পে যেমন সংক্রামিত বা অধ্যস্ত হয়, তদ্রূপ সদ্বস্তুর সত্ত ধর্ম্মটী দৃশ্যপদার্থে সংক্রামিত বা আরোপিত বা অধ্যস্ত হয়। অর্থাৎ সদ্বস্তুটী যেমন "আছে" বুদ্ধির বিষয় হয়, তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থও "আছে" বুদ্ধির বিষয় হয়। এই হেতু "ঘট আছে" "পট আছে" ইত্যাদি স্থলে যে "আছে" অর্থাৎ সত্তা আছে, সেই "আছে" পদে সেই সদ্বস্তুকেই বুঝায়, এবং ঘটপটাদি তাহাতে কল্পিত বলা হয়। অতএব সকল বস্তুতে যে সদ্বোধ, তাহার সেই সত্তাটী সেই সকল বস্তুর ধর্ম্ম নহে; কিন্তু তাহা একটী ধর্ম্মিরূপ বস্তুবিশেষ, তাহার সত্তাতেই সকলে সত্তাবান হয়। অতএব এক অদ্বৈত সদ্বস্তুর সিদ্ধিতে কোন বাধা নাই, আর তজ্জন্য দৃশ্যমিথ্যাত্বেও কোন বাধা নাই অর্থাৎ মিথ্যাত্ব লক্ষণ কোন দোষ হয় না।

সদ্বস্তু স্বীকারে তাহার দৃশ্যত্বাপত্তি

যদি বলা যায়—স্বীকার করিলেই ত দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হইয়া যায়। আর সৎ ও অসৎ উভয়ই স্বীকার্য্য বলিয়া দৃশ্যই হইবে। দ্রষ্টৃশূন্য দৃশ্যত্ব আর দ্রষ্টৃ-বিশিষ্ট দৃশ্যত্ব—উভয়ইত দৃশ্যত্ব, এই দৃশ্যত্ব উভয়েই আছে, সুতরাং সৎ ও অসৎকে দৃশ্যই বলিতে হইবে। তাহারা দৃশ্য হয় না—একথা বলা সঙ্গত হইবে না। এইরূপে তাহারা দৃশ্য হওয়ায় তাহারা মিথ্যাই হইবে। দৃশ্য জগতের সহিত তাহাদের আর কোন ভেদই থাকিল না। সুতরাং দৃশ্যবস্তু সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া আর তাহা-দিগকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারা গেল না। সুতরাং তাহার অধিষ্ঠানরূপে অদ্বৈতও সিদ্ধ হইল না। অর্থাৎ মিথ্যাত্ব লক্ষণটী অসিদ্ধই হইল।

কল্পিত সৎ ও অসৎই দৃশ্য হয় বলিয়া খণ্ডন

তাহা হইলে বলিব—ইহাও অসঙ্গত কথা। কারণ, কল্পিত সৎ ও অসৎই দৃশ্য হয়, অকল্পিত সৎ ও অসৎ কখনই দৃশ্য হয় না। ইহাই অদ্বৈতবাদী বলেন। দৃশ্য হইতে গেলে পরিচ্ছিন্ন হইতে হয়, নচেৎ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ সম্ভব হয় না, কিন্তু সদ্বস্তু অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বানুগতবস্তু। সুতরাং হয় বল—তাহা সদাই দৃশ্য, অথবা বল—তাহা দৃশ্য হয় না। আর অসতের সহিত ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়

না। এজন্য অসৎও দৃশ্য হয় না। এজন্য এই সৎ ও অসৎ যখন ঘটপটাদির সহিত মিলিত অর্থাৎ অধ্যস্ত হইয়া কল্পিত সৎ ও অসৎ-স্বরূপ হয়, তখনই ঘটপটাদির সহিত ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া তাহারা দৃশ্য হয়। শুদ্ধ সৎ ও শুদ্ধ অসৎ কখনও দৃশ্য হয় না। সুতরাং দৃশ্য অর্থাৎ কল্পিত ঘটপটাদি এবং তাহাদের সহিত প্রতীয়মান কল্পিত সৎ ও অসতের অধিষ্ঠানরূপে অদৃশ্য একটী সদ্‌বস্তু সিদ্ধ হইতে বাধা ঘটে না। অর্থাৎ মিথ্যাত্ব-লক্ষণে কোনও প্রকার দোষ উপস্থাপিত করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ সদসদ্‌ভিন্নই মিথ্যাত্ব।

অসৎ সম্বন্ধের দৃশ্যত্বদ্বারা আপত্তি

যদি বলা যায়—অসৎ যে সম্বন্ধ, তাহা ত দৃশ্য হয়, ভ্রমস্থলে রজ্জুও সৎ, সর্পও সৎ, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ সৎ নহে। কারণ, রজ্জু সম্মুখে দৃশ্য হয় তজ্জন্য সৎ, আর অরণ্যে সর্প থাকে তজ্জন্য তাহাও সৎ। কিন্তু তাহাদের যে সম্বন্ধ তাহা বাস্তবিক পক্ষে ঘটেই না। যেহেতু—"ইহা সর্প" বলিলে উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বুঝায়। এজন্য এস্থলে এই সম্বন্ধটীকে অসৎ বলা হয়। অথচ তাহাকে দৃশ্য বলিয়া স্বীকারও করিতে হয়, সুতরাং অসৎ দৃশ্য হয় না—কেন বলিব? আর অসৎ দৃশ্য হইলে সেই মিথ্যাত্ব লক্ষণে আবার দোষ উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ মিথ্যা ও অসৎ অভিন্ন হইল।

সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়া উক্ত আপত্তির নিরাস

তাহা হইলে বলিব—একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, এই সম্বন্ধটীও কল্পিত অসৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এস্থলে রজ্জু একস্থানে এবং সর্প অন্য স্থানে থাকে, তাহাদের মধ্যে ত সম্বন্ধ নাই, অথচ সেই সম্বন্ধটীকে দৃশ্য বলা হইয়া থাকে। সুতরাং কল্পিত অসৎই দৃশ্য হইল। অকল্পিত সৎ বা অসৎ ত দৃশ্য হইল না। অতএব মিথ্যাত্বের লক্ষণে কোন দোষ ঘটিল না।

কল্পিত সৎ ও অসৎই দৃশ্য হয় বলিয়া মিথ্যা

এজন্য এস্থলে "ঘট আছে" বলিলে যে সৎ দৃশ্য হয়, তাহাও কল্পিত সৎ হইল। কারণ, সেই সৎ ঘটযুক্তরূপেই দৃশ্য হয়। কিন্তু যাহা সদ্‌-বস্তু, তাহা ত কাহারো সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে না। এজন্য উক্ত "ঘট আছে" স্থলে যে সৎ, তাহাও কল্পিত সৎ। এইজন্যই বলা হয়—কল্পিত সৎই দৃশ্য হয়, অকল্পিত সৎ দৃশ্য হয় না। তবে যে অকল্পিত সৎ স্বীকার করা হয়, তাহা কল্পিতের অধিষ্ঠানরূপেই স্বীকার করা হয়। তদ্রূপ "ঘট নাই" স্থলে যে অসৎ স্বীকার করা হয়, তাহাও কল্পনা বলেই স্বীকার করা হয়। যেহেতু অসৎ কখনও দৃশ্য হয় না। এই কল্পিত সৎ ও অসৎই মিথ্যা। অকল্পিত সৎ ব্রহ্ম, আর অকল্পিত অসৎ বন্ধ্যাপুত্র। ইহারা দৃশ্য হয় না বলিয়া মিথ্যাও নহে। যাবদ্‌ দৃশ্যবস্তুই এই কল্পিত সদসদাত্মক। এইজন্যই ইহারা সদসদ্‌ ভিন্ন, এইজন্যই ইহারা মিথ্যা। অতএব মিথ্যাত্বলক্ষণে কোন দোষ হয় না।

স্বীকার করিলেই দৃশ্য হয় না

তাহার পর স্বীকার করিলেই দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, যাহাকে অদৃশ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা ত কখনও দৃশ্য হয় না। অথচ তাহা ত স্বীকার করা হইল। বিশেষসহিত সামান্য সত্তার স্বীকারেই দৃশ্যত্ব হয়। নির্ব্বিশেষ সামান্য সত্তার স্বীকারে দৃশ্যত্ব হয় না। অতএব সৎ ও অসৎ সামান্যভাবে স্বীকার করিলে তাহাদের দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। সত্তাসামান্যই যে ব্রহ্ম, তাহা একাধিক উপনিষদেই কথিত হইয়াছে। যথা অন্নপূর্ণোপনিষদে—

সত্তাসামান্যরূপত্বাৎ তৎ কৈবল্যপদং বিদুঃ"

(অন্নপূর্ণোপনিষৎ ৫।১৫)

এস্থলে সত্তাসামান্যকে কৈবল্যপদ বলায় ব্রহ্মই বলা হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিলেই স্বীকৃত বিষয়ের দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। আর তজ্জন্য মিথ্যাত্ব লক্ষণে কোন দোষ ঘটে না।

মিথ্যার মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে দ্বৈতাপত্তি

যদি বলা হয়—প্রপঞ্চ না হয়—মিথ্যাই হইল, কিন্তু সেই মিথ্যার যে মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী, তাহা মিথ্যা কি সত্য? ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ভিন্ন কোন বস্তুরই জ্ঞান আমাদের হয় না। মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী সত্য হইলে আর অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। কারণ, অদ্বৈত ও মিথ্যাত্ব

ধর্ম্ম—এই দুইটী বস্তু থাকিল। আর যদি মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটী মিথ্যা হয়, তাহা হইলে যাহার ধর্ম্ম মিথ্যাত্ব তাহা সত্য হইয়া যাইবে। অর্থাৎ মিথ্যারূপ জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হওয়ায় জগৎ সত্য হইয়া যাইবে। সুতরাং অদ্বৈত সিদ্ধ হইল না। অর্থাৎ মিথ্যাত্ব ধর্ম্মটীকে সত্য বলিলেও অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না, আর মিথ্যা বলিলেও অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। অতএব মিথ্যাত্বলক্ষণে আবার দোষ ঘটিল।

উক্ত আপত্তির নিরাস

তাহা হইলে বলিব—এই আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, যে বস্তুটী মিথ্যা হয়, তাহার যে মিথ্যাত্ব ধর্ম, তাহাও সুতরাং মিথ্যাই হইবে। মিথ্যার মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে মিথ্যা কখনই সত্য হইতে পারে না, কারণ, যাহা নাই অথচ দেখা যায়, তাহাই ত মিথ্যা। সেই মিথ্যার ধর্ম্মও সুতরাং নাই অথচ দেখা যায়—এইরূপই হইবে। মিথ্যা যে মিথ্যা হয়, তাহা তাহার ধর্ম্মকে লইয়াই মিথ্যা হয়। ধর্ম্মী কখন ধর্ম্মের বিপরীত হইতে পারে না। অতএব এই আপত্তিও ব্যর্থ। আর তজ্জন্য মিথ্যাত্বের লক্ষণ অসিদ্ধ হয় না।

কল্পিত সৎ ও অসতের দৃশ্যত্বে আপত্তি

যদি বলা যায়—আমরা যখন "ঘট আছে" বলি, তখন ত ঘটের সহিত সতেরও জ্ঞান হইল, এবং যখন "ঘট নাই" বলি তখনও ত ঘটের সহিত অসতেরও জ্ঞান হইয়া গেল? অতএব আসল সৎ ও অসৎ দৃশ্য হয় না, কল্পিত সৎ ও অসৎই দৃশ্য হয়—একথা বলি কি করিয়া? সতের সত্তায় যখন যাবদ্ দৃশ্য সত্তাবান্ হয়, আর তজ্জন্য সদ্বস্তু স্বীকার করা হয়, তখন সৎ দৃশ্য হয় না বলি কি করিয়া? তদ্রূপ "ঘট নাই" বলিলে যে অসতের জ্ঞান হয়, তাহাকে কল্পিত অসৎই বা বলি কি করিয়া? জ্ঞান হওয়া আর দৃশ্য হওয়া ত একই কথা? বস্তুতঃ এই জগৎ এই সদ্ ও অসদ্রূপেই দৃশ্য হয়, আর তজ্জন্য তাহা সদসদাত্মকই বলিব। সদ্সদ্ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহাকে মিথ্যা বলিব কেন? অতএব মিথ্যাত্বলক্ষণ সিদ্ধ হয় না।

উক্ত আপত্তির নিরাস

তাহা হইলে বলিব—না, এ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, ত্রিকালাবাধিত সৎ ও বন্ধ্যাপুত্রীয় অসৎ-পদার্থের সহিত ঘটপটাদির সম্বন্ধ হয় না, অথচ সম্বন্ধ দৃশ্য হয় বলিয়া তাহার সম্বন্ধী সৎ ও অসৎকে অধ্যস্ত বা কল্পিত সদসৎ বলিতে হয়। যাহার যথার্থ সম্বন্ধ হয় না, অথচ সেই সম্বন্ধজন্য যদি তাহারা দৃশ্য হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধজন্য যে তাহার দৃশ্যত্ব, তাহাও কল্পিতই বলিতে হইবে। অতএব "ঘট আছে" বা "ঘট নাই" স্থলে যে সৎ ও অসতের দৃশ্যত্ব, তাহা কল্পিত দৃশ্যত্বই বলিতে হইবে। অর্থাৎ এই সৎ ও অসৎ কল্পিতই বলিতে হইবে, অতএব মিথ্যাত্বলক্ষণে কোন দোষ হয় না।

অকল্পিত সতের অদৃশ্যত্বে অনির্ম্মোক্ষত্ব শঙ্কা

যদি বলা যায়—অকল্পিত সৎ যদি দৃশ্য না হয়, তবে মিথ্যা জ্ঞান ও তাহার বিষয়—এই জগৎ প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, অধিষ্ঠান সাক্ষাৎকারেই আরোপ্য অর্থাৎ মিথ্যার নিবৃত্তি হয়—ইহাই ত নিয়ম। যেমন রজ্জুসর্পভ্রমকালে রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকারেই সর্পভ্রমের নিবৃত্তি হয়। এই অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার না হইলে ত সর্পভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব ঘটপটাদির সহিত যে "আছে" পদবাচ্য সতের প্রতীতি হয়; সেই "আছে" পদবাচ্য সদধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকারেই এই জগদ্-ভ্রমের নিবৃত্তি হইবে, অন্যথা জগদ্-ভ্রমের নিবৃত্তি হইবে না, অর্থাৎ মোক্ষও সিদ্ধ হইবে না। আর কল্পিত সতের সাক্ষাৎকারে তাহা হইতে পারে না। অতএব সেই সৎকে অকল্পিত সদধিষ্ঠান বলিতে হইবে। অতএব অকল্পিত সতের সাক্ষাৎকার বা দৃশ্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। আর তাহা হইলে দৃশ্যের সদসদ্ভিন্নতাই মিথ্যাত্ব—এই মিথ্যাত্বলক্ষণের আবার অসিদ্ধি হইবে।

উক্ত শঙ্কার নিরাস

তাহা হইলে বলিব—না তাহা নহে। কারণ, "ঘট আছে" স্থলে যে সতের প্রতীতি হয়, তাহা কল্পিত সৎই বটে, কিন্তু সেই কল্পিত সতের প্রতীতি হইলে অকল্পিত সতের একটা সামান্য জ্ঞান হয়। অকল্পিত সতের কোন বিশেষই নাই, এজন্য তাহার এইরূপে যে জ্ঞান হয়, তাহা সামান্য জ্ঞানই হয়। এই কল্পিত সতের অধিষ্ঠানরূপে সেই অকল্পিত সতের সাক্ষাৎকারে ঘট ও তাহার সঙ্গে যে "আছে"-রূপ কল্পিত সৎ থাকে, তাহারা উভয়ই নিবৃত্ত হইয়া

যায়। এই যে অকল্পিত সতের সাক্ষাৎকার, ইহা তাহার দৃশ্যত্ব নহে। কারণ, এই অকল্পিত সতের আর দ্রষ্টা আমি হই না। এই দ্রষ্টা আমির যে সাক্ষী, সেই সাক্ষীর সহিত সেই অকল্পিত সৎটী অভিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং অকল্পিত সতের আর দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। এই সাক্ষীর ভাবই সাক্ষাৎকার-স্বরূপ বলা হয়। ইহাই স্বপ্রকাশ বস্তু বলিয়া ইহার অন্য প্রকাশক কল্পনা ব্যর্থই হয়। এজন্য অকল্পিত সৎ সাক্ষাৎকার হইয়া দৃশ্য প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধ হয়, অথচ সেই সাক্ষাৎকারজন্য সেই অকল্পিত সতের দৃশ্যত্ব সিদ্ধ হয় না, সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণের উক্ত অসিদ্ধিশঙ্কা অসঙ্গত।

কল্পিত সৎ ও অসতের হেতু অধ্যাসের পরিচয়

যদি বলা হয়—এই কল্পিতত্বের প্রতি হেতু কি? তাহা হইলে বলিব—ইহার হেতু অধ্যাস। অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ একে অন্যের আরোপ। অর্থাৎ এই ত্রিকালাবাধিত সদ্বস্তুর সহিত যখন ঘট-পটাদির পরস্পর অধ্যাস হয়, তখন 'ঘট পট আছে' বলি, অর্থাৎ সেই ত্রিকালাবাধিত সতের ধর্ম্ম যে সত্ত্ব, তাহা ঘটপটাদিতে ভ্রমবশতঃ আরোপিত হয়, আর ঘটপটাভাবের সহিত বন্ধ্যাপুত্রীয় অসতের যখন পরস্পরাধ্যাস হয়, তখন "ঘটপটাদি নাই" বলি। অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্রীয় অসতের ধর্ম্ম যে অসত্তা, তাহা সেই ঘটপটাভাবে ভ্রমবশতঃ আরোপিত হয়। তদ্রূপ ঘটের যে দৃশ্যত্ব, তাহা সেই ত্রিকালাবাধিত সদ্বস্তুতে আরোপিত হইয়া "ঘট আছে" স্থলে সেই সদ্বস্তুর দৃশ্যত্ব বলিয়া স্বীকার করি এবং বন্ধ্যাপুত্রীয় অসতে ঘটের দৃশ্যত্ব, আরোপ করিয়া ঘটাভাবের অসৎকে দৃশ্য বলি। এইরূপে দৃশ্য ঘট ও দৃশ্য ঘটাভাবের ধর্ম্ম যে দৃশ্যত্ব তাহা যথাক্রমে সেই ত্রিকালাবাধিত সতে এবং বন্ধ্যাপুত্রীয় অসতে আরোপিত হয়, এবং ত্রিকালা-বাধিত সতের এবং বন্ধ্যাপুত্রীয় অসতের ধর্ম্ম যথাক্রমে যে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, তাহা ঘট ও ঘটাভাবে আরোপিত হয়। এইজন্য ঘটে যে সত্তা দৃশ্য হয়, তাহা কল্পিত সতের সত্তা এবং ঘটাভাবে যে অসত্তা দৃশ্য হয়, তাহা কল্পিত অসতের অসত্তা। এইজন্যই বলা হয়—অকল্পিত সদ্ ও অসৎ দৃশ্য হয় না, কিন্তু কল্পিত সৎ ও অসৎই দৃশ্য হয়। এইরূপে ঘট-পটাদির সদসত্তা কল্পিত সদসত্তা বলিয়া ঘটপটাদির স্থানীয় যে জগৎ, তাহা আর সদসদাত্মক হইল না। কিন্তু সদসদ্‌ভিন্নই হইল। অর্থাৎ মিথ্যাই হইল।

জগৎ কল্পিত সদসদাত্মক বলিয়া আপত্তি

যদি বলা হয়—তাহা হইলে জগৎকে এই কল্পিত সদসদাত্মকই বলিব? সদসদ্‌ভিন্ন কেন বলিব? সদসদ্‌ভিন্ন বলিতে গেলেও কল্পিত সদ্‌সত্তা এবং অকল্পিত সদ্‌সত্তা উভয়বিধ সদ্‌সত্তাভিন্ন বলাই হয়।

উক্ত আপত্তির নিরাস

তাহা হইলে বলিব—না, জগৎকে কল্পিত সদ্-সদাত্মকও বলা যায় না। উহাকে কল্পিত সদসদ্ ভিন্নই বলিতে হইবে। কারণ, জগৎ একই কালে সদসদাত্মকরূপে আমাদের নিকট ভাসমান হয় না। সৎকালে সৎ, এবং অসৎকালে অসৎরূপেই প্রতিভাত হয়। বিচারকালে দৃশ্যবস্তুকে "একটা কিছু" বলিয়া বুঝিয়া তাহাকে সৎকালে সৎ এবং অসৎকালে অসৎ বলিয়া থাকি। এজন্য বিচার-কালেও ঘটপটাদিকে সৎকালে অসৎ এবং অসৎকালে সৎ—এরূপ কখনও বুঝি না। এজন্য কোনকালেই জগৎ সদসদাত্মকরূপে প্রতিভাত হয় না। পিতাপুত্র একসঙ্গে দৃষ্ট হইলেও তাহারা কখনই সমবয়স্ক হয় না। অতএব জগৎ কল্পিত সদসদাত্মকও নহে। অর্থাৎ জগৎ সদসদ্‌ভিন্নই হইয়া থাকে। আর তজ্জন্য তাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা। আর সেই মিথ্যার অধিষ্ঠানরূপে এক সদ্ অদ্বৈতই সিদ্ধ হয়। এই সদ্ অদ্বৈতবস্তু স্বয়ংপ্রকাশ, সুতরাং ইহার সিদ্ধির জন্য কোন প্রমাণেরই আবশ্যকতা হয় না। যাহার প্রকাশে সকলের প্রকাশ, তাহার প্রকাশের জন্য অন্য কোন্ বস্তুর প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে?

রজ্জুসর্প মিথ্যা হইলেও জগৎ মিথ্যা হইবে না,—আপত্তি

যদি বলা যায়—সদসদ্‌ভিন্নত্বরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ মিথ্যা বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে—ইহা সিদ্ধ হইলে জগৎপ্রপঞ্চ যে মিথ্যা তাহা সিদ্ধ হইবে কেন? রজ্জুসর্প না হয় সদসদ্‌ভিন্ন মিথ্যা

হইল, জগৎপ্রপঞ্চ রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা হইবে কেন? রজ্জুসর্প কিয়ৎকাল পরেই ভ্রমের বিষয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চ ত সেরূপ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা সঙ্গত হয় না।

দৃশ্যত্বরূপ সমানধর্ম্মবশতঃ জগৎও মিথ্যাই হইবে

কিন্তু একথাও অসঙ্গত। কারণ, রজ্জুসর্প যেমন দৃশ্য, এই জগৎপ্রপঞ্চও তদ্রূপ দৃশ্য হয়, অতএব দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা হয় বলিয়া জগৎ প্রপঞ্চও মিথ্যা হইবে না কেন? সকলেই জানেন অগ্নিমাত্রই যখন দগ্ধ করে, তখন বিদ্যুতাগ্নিও দগ্ধ করিবে না কেন? জলমাত্রই যখন চূর্ণকে পিণ্ড করে, তখন সমুদ্রজলও চূর্ণকে পিণ্ড করিবে না কেন? অতএব রজ্জুসর্প দৃশ্যত্ববশতঃ যেমন মিথ্যা, জগৎও তদ্রূপ দৃশ্যত্ববশতঃ মিথ্যা।

প্রতিবন্ধক স্বীকারদ্বারা ব্যভিচার-শঙ্কার বারণ

যদি বলা হয়—মন্ত্রমুগ্ধ অগ্নি ত দগ্ধ করে না, করকাকৃতি জলও চূর্ণকে পিণ্ড করে না, সুতরাং জগৎ দৃশ্য হইলেও মিথ্যা হইবে কেন? ইহাতে উক্ত নিয়মেরও ব্যভিচার হইল, তাহা হইলে বলিব—যাহা বহুস্থলে একরূপ হয় বা কার্য্য করে, তাহা যদি কোন একটী বিশেষ স্থলের অন্যথা হয় বা অন্যথা করে, তখন প্রতিবন্ধকের কল্পনা করিয়া তাহার সাধারণ ধর্ম্মের সত্তাই স্বীকার করিব। অর্থাৎ সকল অগ্নি দগ্ধই করে, তবে মন্ত্র প্রতিবন্ধক থাকিলে অগ্নি দগ্ধ করে না বলিব। তদ্রূপ করকাকৃতিটী জলের পিণ্ডীকরণ ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয় বলিব। প্রতিবন্ধক কখন ধর্ম্মের ব্যত্যয় করিতে পারে না, উহাতে তাহার কার্য্যেই বাধা দেয় মাত্র। অতএব দৃশ্যত্ব ধর্ম্মটী সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইবে না কেন? অর্থাৎ উক্ত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে কোন দোষ নাই—ইহাই বলিব।

প্রত্যক্ষ বস্তুর মিথ্যাত্বে আপত্তি

যদি বলা যায়—যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—"রহিয়াছে," তাহাকে মিথ্যা অর্থাৎ "নাই" বলি কি করিয়া? অগ্নিতে হস্ত দগ্ধ হয়, সে অগ্নিকে "নাই" বলিয়া কি কেহ তাহাতে হাত দেয়? এরূপ বলিলে সর্ব্ব ব্যবহার বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় তৃতীয় লক্ষণও সঙ্গত হয় না দেখিতেছি।

প্রত্যক্ষ হইলেই সত্য হয় না

কিন্তু এ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, যাহা দেখা যায়, তাহাই যে "থাকে" তাহা নহে, এমন অনেক বস্তু দেখা যায়—যাহা নাই অথচ দেখা যায়, দ্বিচন্দ্র, দিগ্‌ভ্রম, গন্ধর্ব্বনগর, মরীচিকা—ইহা না থাকিয়াও দৃশ্য হয়। অতএব জগৎপ্রপঞ্চ দেখা যায় বলিয়াই যে থাকিবে—সত্তাবান্ হইবে, এমন কোন কথাই নাই। আর তজ্জন্য মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় ও চতুর্থ লক্ষণে কোন দোষ হয় না।

সকলের দৃশ্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নহে—আপত্তি

যদি বলা হয়, যাহা দেখা যায় তাহা "আছে" এই নিয়ম সর্ব্বক্ষেত্রে সত্য না হইলেও বহুস্থলে ত সত্য হয়? তদ্রূপ বিশ্ব-প্রপঞ্চস্থলে ইহা সত্যই হইবে। দিগ্‌ভ্রমাদি বহুক্ষণ থাকে না এবং এক সময়ে সকলেরও হয় না, তাহা না হয়—মিথ্যাই হইল, কিন্তু জগৎ ত জীবনমরণকালস্থায়ী, এক সময়ে সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়, এক সময় সকলেই "আছে" বলিয়া থাকে। অতএব "আছে" জ্ঞানে ব্যভিচার থাকিলেও জগতের স্থলে ব্যভিচার নাই—ইহাই বলিব। আর তজ্জন্য জগৎকে যে আছে বলিয়া জ্ঞান হইতেছে তাহা সত্য জ্ঞান, আর তাহার বিষয়ও সত্য। অর্থাৎ জগৎ রজ্জুসর্প বা তাহার জ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা নহে। অর্থাৎ মিথ্যাত্বের তৃতীয় লক্ষণটী সঙ্গত হয় না। জগৎও ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে—ইত্যাদি।

সকলের দৃশ্য হইলেও জগৎ মিথ্যা

তাহা হইলে বলিব—না, একথাও সঙ্গত নহে। বিশ্বপ্রপঞ্চ "আছে" বলিয়া জ্ঞান হইলেও—সকলে এক সময় তাহাকে "আছে" বলিয়া দেখিলেও ইহা রজ্জুসর্প হইতে বিলক্ষণ নহে।

বিরহ কো অঙ্গ্

(বিরহের বিষয়)

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

কবিব পববৎ পববৎ ম্যায় ফিবা, নয়ন্ গঁওয়ায়ে রোয়ে।
সো বুটি পাওয়ে নহিঁ, যাতে সব্ জীবন হোয়ে॥

কবিব কহেন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুবিয়া বেড়ানু কত,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাবানু নয়ন হু'টি,
মূল শিকড়েব সন্ধানে তবু হয়ে আছি আশাহত
যা' পেলে নিমেষে মবণেব ভয় টুটি॥

বিরহ তেজ্তন্ মোব বহায়, অঙ্গ্ সভে অকুলায়।
ঘটশূনো জীউও পিউওমো, মউং ঢুঁবি ফিব্ যায়॥

শবীবে আমাব বিবহেব তেজ আজো যে জাগিয়া আছে
আকুল অঙ্গ মনেব মিলন হাবা—
শূন্য এ ঘট-দেহী জীব মোব নাবায়ণে মিশে গেছে
মৃত্যু আসিয়া হেবিল শূন্যকারা।

কবিব বেবা পাযা সবপ্কা, ভওসাগবকে মাহি।
যও ছোড়ে তও বুড়ি মবো, গঁহো তো ডছে বাঁহি॥

কবিব কহেন এ ভব সাগবে পেয়েছি সর্প-ভেলা—
ছাড়ি যদি তা'রে অতলে ডুবিয়া যাই,
ডুবিয়া আবাব জনম লভি গো কবিতে ধবাব খেলা
ধবিয়া বাখিলে দংশনে ত্রাণ নাই॥

কবিব নযন্ হমাবে বিছোহীয়া, রহোবে শঙ্খ ম ঝুব।
দেওয়ল্ দেওয়ল্ মায় ফিরো, দেওছ উগা নহি সুর॥

কবিব কহেন নযন আমাব সহিছে বিবহ ব্যথা,
পেয়েও হাবানু তাই জাগে বড় ভয়;
দেবতা, দেবতা, কোথায় দেবতা, দেখা দাও হে দেবতা
এলনা দিবস এলনা সূর্য্যোদয়!

ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্য-বোধি

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

বিচিত্রিতা লইয়াই এই নিখিল-বিশ্ব-সত্তার বিস্তমানতা। যাহাদের মধ্যে অত্যন্ত একতা আছে বলিয়া মনে করি, তাহাদের মধ্যেও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বিশেষ দৃষ্টি লইয়া দেখিলে কত কি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিভিন্নতার আদি অন্ত অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিলে কেবল ব্যর্থই হইতে হয়। এই সিদ্ধান্ত যেকোনও বিষয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্য-বোধ সম্বন্ধেও ঐ এক কথা।

সুন্দরের প্রতি বিশ্বমানবের সমভাবে আকর্ষণ আছে। সভ্য শিক্ষিত মানুষ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া যেভাবে আনন্দ অনুভব করে, নিতান্ত একজন বর্ব্বর মনুষ্যের সৌন্দর্য্যানুভূতিও তদ্রূপ। শোভনীয়তার প্রতি লালসাও সমান, তাহার অনুভূতি জন্য আনন্দও অনুরূপ। কোনও ইতর বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। থাকিলেও তাহা যৎসামান্য।

বিচিত্রিতা রহিয়াছে সৌন্দর্য্য-বোধে। ব্যক্তিগত স্বভাব-সংস্কারের মত সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। সৌন্দর্য্য-বোধের দৃষ্টি-ভঙ্গিমা সকলের সমান নহে। উহাতে কতকটা সার্ব্বভৌমিকতা থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক। প্রাকৃতিক পর্য্যায়ে বিশ্বমানবের মধ্যে সৌন্দর্য্যের ঐক্যবোধ অহরহই দেখিতে পাওয়া যায়। কৌমুদী বিহসিত শুভ্র-রজনীর রূপ একজন সভ্য মানবের পক্ষেও যেমন নয়নানন্দদায়ক, একজন বন্য হটেনটটের কাছেও উহা তেমনি মনোমুগ্ধকর। শীতার্ত্ত প্রকৃতির অন্তে বসন্তের আবির্ভাবকে বরণ করিতে আগ্রহ নাই, এমন মনুষ্য সভ্য বা বর্ব্বরজাতির মধ্যে নাই বলিলেই হয়।

এখন পার্থক্য যেখানে যেখানে আছে ও যাহাতে আছে, তাহাও আলোচ্যরূপে উপস্থাপিত করা যাউক। প্রথমতঃ—সঙ্গীত। সঙ্গীতে অনুরাগ নাই এমন মানুষ বিশ্বসংসারে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু সাঁওতাল মহুয়া গাছের তলায় মাদল বাজাইয়া যে গান গায়, সেই সঙ্গীত ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীতে অভ্যস্ত ভারতীয় জাতির কর্ণে ভাল লাগিবে না। লাগিলেও উহা তেমন চিত্তপ্তিকর হইবে না। আবার য়ুরোপের মনীষা-প্রসূত সুর-বিজ্ঞান—তাহা বীথোভেনেরই হউক, আর যাহারই হউক—আমাদের অন্তঃকরণে আনন্দের তরঙ্গ তুলিতে সমর্থ হইবে না। রাগ-বোধের এমনি সহস্রবিধ পার্থক্য রহিয়াছে।

সিদ্ধান্তটি আর একটু বিবৃত করিলে বক্তব্য বিষয়ের পোষকতা হইতে পারে। ভোজন শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নহে। উহার মধ্যে রসানুভূতিও রহিয়াছে। সেইজন্য ভক্ষ্য-ভোজ্যকে রসাল করিবার চেষ্টা করা হয়। সুস্বাদু আহার্য্য সকলেই ভালবাসে। কিন্তু ঐ স্বাদুতা অস্বাদুতার অনুভূতি বিভিন্ন মানবের বিচিত্র প্রকারের। আমাদের বঙ্গদেশের সুক্তানি, শাকের ঘণ্ট, পায়েস স্কটল্যাণ্ডের একজন হাইল্যাণ্ডারের মুখে রুচিবে না, আবার ঐ হাইল্যাণ্ডারের রসনা পরিতৃপ্তিকর খাদ্য-পেয় অষ্ট্রেলিয়ার আমমাংসখাদক বন্য মানব কিছুতেই রুচির সহিত

খাইতে পারিবে না। এমনি বিভিন্নতার হিসাব করিতে হইলে বহু বক্তব্যের অবতারণা করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উহার স্থানাভাব।

আবার পূর্ব্ব কথার অবতারণা করা যাউক। বক্তব্য হইতেছে, ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্য-বোধি। রসানুভূতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ধারণা কি প্রকার? মানুষ রূপ ও রসের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া কতবিধ প্রকারে সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোনও কোনও জাতি প্রসাধন কার্য্যকেই পরম রসপ্রিয়তা বলিয়া তাহারই উপাসনা-তৎপর। স্বাভাবিক বর্ণকে—মুখশ্রীকে কত প্রকারে রঞ্জিত করিতেছে। কেশ-কলাপের কতনা কারুতা! ভ্রূযুগল কৃষ্ণবর্ণ, ওষ্ঠে রক্তিম রাগ!

বিভিন্ন জাতির রস-প্রিয়তার বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কহিবার প্রয়োজন থাকিলেও তেমন বিস্তারিতরূপে বলিবার স্থানাভাব। তবে, প্রত্যেক জাতির সৌন্দর্য্যানুভূতি আদৌ এক প্রকারের নহে। ঐ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলিতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, প্রধানতঃ বিভিন্ন সৌন্দর্য্য বাহ্যিক সৌষ্ঠবের প্রতিই আকর্ষণযুক্ত, উহার রূপের প্রতি প্রয়াসী। কিন্তু ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যানুভূতি রূপ হইতে স্বরূপের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত।

সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ না করিয়া এই স্বরূপানুরক্তির সম্বন্ধে কয়েকটা ব্যবহারিক কথা এখানে উত্থাপন করা প্রয়োজন। স্বরূপ কথাটা নিতান্ত সহজ কথা নহে। সেইজন্য অধিক দূর ঐ সম্বন্ধে অগ্রসর না হইয়া একটু সহজভাবে এইরূপ উপাসনা সম্বন্ধে প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাউক। এক একটা রূপ ধরিয়া এই আলোচনা কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি।

ভারতবর্ষ রূপের বাহ্য ভঙ্গিমাটির প্রতি তেমন-ভাবে সচকিত নহে! কোনও উৎসব অথবা পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে তোরণদ্বারে মঙ্গল কলস ও কদলী-বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে। আলোকমালা প্রজ্জ্বালন, কিম্বা অন্যবিধ সমারোহকর ব্যাপারের পূর্ব্বে এই পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষই অগ্রবর্ত্তী। কদলীবৃক্ষ অপেক্ষা মনোরম পত্রপল্লব বহুবিধ রহিয়াছে, পুষ্পাদিরও অভাব নাই, কিন্তু সেই সকলের প্রয়োজনাভাব!

এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের রূপ পূজার কতকটা আভাস পাইব। পূর্ণকুম্ভ পরিপূর্ণতার নিদর্শন। অভাব এবং তজ্জনিত হাহাকার কুৎসিত কদর্য্যতার সৃষ্টি করে। পূর্ণতা না হইলে যথার্থ মাধুর্য্যের প্রকাশ পায় না। "নাল্পে সুখমস্তি" অল্পে সুখ নাই। আর্য্যচিত্ত সেইজন্য পূর্ণত্বকামী! ঘটস্থাপনায় সেই পূর্ণত্বলাভের ইঙ্গিত। উপরের সৌষ্ঠব দিয়া নহে, মর্ম্মেরভাব ও ভাবনা দিয়া ভারত-ভুবনের রূপ উপাসনা। কদলীকাণ্ডেরও এমনি একটি সুচারু তাৎপর্য্য আছে। উহাতে রহিয়াছে মঙ্গলের মহিমা! উৎসর্গের অবদান! কদলীবৃক্ষের শ্যামপত্রে, তাহার বিকাশ আবির্ভাবে এমন শোভনীয়তা নাই, যাহা আপাত মনো-মুগ্ধকর কিন্তু উৎসর্গ পরায়ণ। মঙ্গল দিয়া আমাদের ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যের পরিমাপ ও পরিচয়!

এইরূপ পূজার মধ্যে একটু জড় ও জীবনের কথা আছে। ভারতবর্ষ প্রাণের পূজারী! জড় যাহা, তাহা ত শুধুই কঙ্কাল। উহার শোভনীয়তা কঙ্কালেরই মনোহারিত্ব! এমন হয় কিনা, সে প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অবকাশ রহিলেও ঐ কথা না কহিয়া এখানে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, ভারত-বোধি প্রধানতঃ প্রাণের মাঝেই সৌন্দর্য্যের সন্ধান করিয়াছে! সেই কবে কোন দিন, কোন অযুত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল,—আকাশে প্রাণ না থাকিলে কেই বা প্রাণধারণ করিতে চাহিত! এই প্রাণ সম্পূজন অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। হয়ত ইহাই ভারতের পক্ষে স্বাভাবিক।

জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রসাধন কার্য্যটি একটি প্রধানতম রূপ-বিলাস। বিশেষতঃ নারী-জাতির এই প্রসাধন ক্রিয়ার দিকে অত্যধিক আসক্তি। আধুনিক সভারমণী-সমাজে এই প্রসাধন ব্যাপার এমন প্রসারলাভ করিয়াছে, এবং প্রসাধন উপাদান এরূপভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে যে, তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কথা বলিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হয়। অবশ্য, প্রসাধন ব্যাপারে ভারতীয় রসবুদ্ধি যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল এমন কথা বলিতে পারা যায় না। শাস্ত্রে ঐ প্রসাধন কলার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা ভারতীয়-বোধির বিশাল বুদ্ধির অতি বিচিত্র সুন্দর অনুভূতিরও পরিচায়ক।

বিলাস-ব্যসন কিন্তু এ জাতির প্রকৃতিসঙ্গত নহে। ভারতীয় জাতির জীবন আপনার মূলমন্ত্র ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা। কাজেই, রস-পিপাসাকে কোথাও ভোগ-প্রবৃত্তির দ্বারা উদ্বিজিত করা হয় নাই। সর্ব্বত্রই উহার মধ্যে ছিল শুচিতার ভাব ও কল্যাণমুখীনতা।

আর্য্যনারীর এক বিশেষণ শুচিস্মিতা। শুচিতার দ্বারা সুস্মিতা যিনি, তিনিই শুচিস্মিতা। প্রসাধনে নহে, বেশে ভূষায় নহে, রূপমাধুর্য্যের তিলোত্তমা-বিকাশে নহে, বধূ বরণের সময় দেখিয়া লইতে হয় তাহার চলন বলন এবং উহার মধ্যে কল্যাণের অভিব্যক্তি। পরিণয়ের সময় যখন কন্যা সম্প্রদান করা হয়, তখন অলঙ্কারের যতকিছু বাহুল্য ও মহার্ঘতাই থাকুক, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শঙ্খ ও সিন্দুর—আয়তির লক্ষণ। কেবল আয়তি নহে, উহা সাধ্বীত্বের বিশেষণা। সতীত্বেই রমণী রূপের সর্ব্বোত্তম বিকাশ।

উর্ব্বশী ও তিলোত্তমা রূপরাজ্যের সাম্রাজ্ঞী। সমাজ সংহতির মাঝে এ রূপের কিন্তু আদর নাই, আবাহন নাই, পূজা নাই। সম্পূজিতা সাবিত্রী। সাবিত্রী সতীত্বের মহিমায় বরণীয়া ও মহনীয়া। ভারতবর্ষ কখনই রূপকে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে নাই, দেখিয়াছে রূপের প্রাণকে অর্থাৎ গুণ-ধর্ম্মকে। নহিলে এ দেশে লক্ষ্মীবরণ অপেক্ষা দেখিতে পাওয়া যাইত উর্ব্বশী আবাহন।

ভারতীয় রস-সাহিত্য ভারতের তত্ত্ব-বিজ্ঞান-সম্মত রসোপলব্ধিকে অবহেলা করিয়া শারীরক্ষেত্রে সুন্দরের সম্ভোগ বাসনা করে নাই। সেই যে প্রজ্ঞান-বোধির সর্ব্বোচ্চ অনুভূতি "রসো বৈ সঃ"—উহা রস-সাহিত্যকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। আবার কেবল সাহিত্য নহে, সৌন্দর্য্যের সর্ব্ব বিভাগই উহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমন কোনও মাধুর্য্যের অনুভূতি নাই, যাহাতে মহিমার প্রতিষ্ঠা নাই। এমন কোনও শ্রী সম্পদ নাই, যাহা সাহায্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে।

রূপের অন্তঃ প্রেরণা সর্ব্বত্রই একটা ইঙ্গিত। অনুপ্রবিষ্ট হইবার ইঙ্গিত। বাহির হইতে ভিতরের দিকে অভিনিবিষ্ট হইবার নির্দ্দেশ। তাই সাধ্বী অন্তঃপুরিকার প্রকোষ্ঠে সুবর্ণকায় থাকুক বা না থাকুক, গণ্ডে কপোলে প্রসাধনের রাগরেখা বিলেপিত হউক বা না হউক, মহার্ঘ বস্ত্র বসনে দেহযষ্টি সমাবৃত নাই বা থাকুক, নৃত্য গীত বা অন্যবিধ কলা-বিদ্যায় অনভিজ্ঞতা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, কিন্তু ললাটদেশে অনুলেপিত সিন্দুর বিন্দু, উহাই রমণী রূপের সর্ব্বোত্তম অভিজ্ঞান। তিলোত্তমা কান্তিময়ী যে নারী, তাহার ললাটে যদি সিন্দুরলেখা না থাকে, তবে সে সৌন্দর্য্য অবজ্ঞার দ্বারা অবহেলিত হইবে। এমনি সর্ব্বদিক দিয়া।

অভ্রশীর্ষ মর্ম্মর প্রাসাদ। তাহাতে কারুতার সীমা পরিসীমা নাই। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে চিত্র ও শিল্প-সম্ভার! কতবিধ সুচারু ও সুদৃশ্য উপকরণ। কিন্তু ঐ অট্টালিকার পুরোভাগে দেবমন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহ একান্ত অন্ধকার। সেখানে বিজলী-দ্যুতি নাই, একটি প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিয়া সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থিত

অন্ধকারকে আরও অন্ধকারময় কবিয়া তুলিয়াছে। মন্দিরদ্বার এমনই সঙ্কীর্ণ যে নিতান্ত ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া সেখানে প্রবেশ কবিতে হয়। কিন্তু প্রাসাদের সমারোহযুক্ত সৌষ্ঠব ছাড়িয়া ঐ দেব-বিগ্রহের শ্রীচবণ-তটে আর্য্য নবনাবী নতি নিবেদন করিতেছে। বিগ্রহমূর্ত্তি সর্ব্বত্রই যে সুন্দব সুঠাম, গঠন-পারিপাট্য অনুপম এমন নহে, উহা কোথাও শিলামূর্ত্তি, কোথায় বা আদি সুষমাব কোনই প্রকাশ নাই। ববং সে মূর্ত্তি লৌহিক অঙ্গভঙ্গিমার একান্ত বিরূপ। যেমন পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব। অথচ তিনিই আনন্দেব লীলা-নিকেতন রসঘন মূর্ত্তি বসবাজ।

সহস্র দিক দিয়া ভাবতবর্ষেব সৌন্দর্য্য বুদ্ধিব বিশিষ্টতাব পবিচয় প্রকট হইয়া বহিয়াছে। সর্ব্বত্রই সেই অন্তর মাধুর্য্য। বাহ্যকে অস্বীকাব করিয়া অভ্যন্তব প্রদেশে প্রবেশ পরায়ণতা। তাই শুচিতাই রুচি-বোচকতা। যাহা পবিত্র, শান্তিময় যাহা, যাহার মধ্যে বহিয়াছে—তুষ্টি পুষ্টি, হ্রী, ধী, তাহাই শ্রী। সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সবস্বতী। তিনি শুধু রূপ নহেন, তিনি জ্ঞান-স্বরূপা। শ্রী বিদ্যা। অশুচিতা, প্রগলভতা, অসন্তোষ যাহাব সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহা ভারতীয় অনুভবে কথনই মধুময় হইতে পারে না। এই শ্রী আবার ব্রহ্মবিদ্যা!

ভারতবর্ষেয় গৃহস্থেব প্রাঙ্গণে অঙ্গনে আলিপনা কাটিবার রীতি বহিয়াছে। আলিপনা রেখা শিল্প নহে। তাহাতে পুষ্পিতা বল্লবীর লিখন চাতুর্য্য নাই। উহাতে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমারোহেরও অসম্ভাব। যাঁহাবা কলা-লক্ষ্মীর বেশবাস দেখিয়া মুগ্ধ হইতে প্রয়াসী, তাঁহারা আলিপনা দেখিয়া কথনই আনন্দ পাইবেন না। উহাতে রেখাঙ্কনেরও কুশলতা নাই, শিল্প-কলার কারিগরি নাই। তবু, সমগ্র ভারতের গৃহে গৃহে ঐ আলিপনাই একমাত্র অঙ্কনের বস্তু। কারণ, উহা লক্ষ্মীর চরণ লিখন। মাতার শ্রীচরণ স্পর্শে যে ফুল্লারবিন্দগুলি ফুটিয়া উঠে, আলিপনা তাহাই। মায়ের আগমন সম্পদেব বারতা বহিয়া আনে বলিয়া আলিম্পনই আর্য্য-মানসে পরম আদরণীয় চিত্র।

এই সৌন্দর্য্য-বোধির সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে সাতকাণ্ড বামায়ণেব মত অনেক কথা বলিতে হয়। খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তত কথা বলিবাব অবকাশ ও স্থানাভাব। কেবল ভাবত-বর্ষের সৌন্দর্য্যানুভূতিব ভঙ্গিমাটা এখানে বলিয়া যাইব, তাহা হইলেই সমগ্র মধুবিস্তাব পবিচয়টি আমাদেব মানসক্ষেত্রে প্রকট হইয়া উঠিবে। সামান্যতঃ বলিতে হইলে চোখে দেখিয়া যাহা ভাল লাগে, কাণে শুনিয়া যাহা মিষ্ট বোধ হয়, অন্তঃকবণের লালসাব অনুবঞ্জনে যাহা বঞ্জিত হইয়া উঠে, তাহাই মধু ও মাধুর্য্যযুক্ত নহে। বস তিনিই "রসো বৈ সঃ"। তাঁহাব স্বরূপ শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ ও পাপস্পর্শ বহিত।

তিনি একেবাবে পবম তত্ত্ব। সহসা অনধিগম্য। সেই বসসত্তা বা বসস্বরূপকে লাভ কবিবার একটা সিদ্ধ পন্থা বহিয়াছে। ঐ পথেব নাম বৈধপথ। আচারে নিয়মে ঐ পথে অগ্রবর্ত্তী হইতে হয়। তিনি বসস্বরূপ সুন্দব এবং শুদ্ধ। কাজেই যাহা শুদ্ধ শুচি, তাহাই শোভন সুন্দব। এই অনুভবেব অনুসরণে ভাবতবর্ষীয় সৌন্দর্য্য বুদ্ধি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে বহিয়াছে শুচিতা ও শান্তি, তুষ্টি এবং লজ্জা, সেইখানেই ভারতীয় চিত্তের বসানুভূতি উদ্রিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সাজসজ্জা সৌন্দর্য্য-বোধের এক সাধারণ প্রকাশ। মূল্যবান বসন ভূষণ দ্বাবা অঙ্গকে সজ্জিত করার পিছনে সৌন্দর্য্যেব এক অভিলিপ্সা আছে। ইহাকে কোনও মনুষ্য সমাজই প্রায় অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। সুদৃশ্য বসন ও স্বর্ণরত্ন বিজড়িত অলঙ্কার সুন্দয়ের এক শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

অলঙ্কার এই শব্দটির মধ্য দিয়াই যেন শোভনীয়তার ভাব অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। মনুষ্যজাতির রসস্পৃহা বস্ত্র ও অলঙ্কারকে সুন্দরতর করিতে যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, তাহার পরিমাণ সামান্য ত নহেই, বরং অপরিমেয়।

ভারতীয় রসলিপ্সা বসন ও ভূষণকে যে একান্তভাবে অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে, এমন কথা বলিবার উপায় নাই। বরং অলঙ্কার ও বস্ত্রের ইতিহাসে ভারতীয় চিত্তের কারুত্ব অননুকরণীয়। বারাণসীর বহুমূল্য সাড়ী ও নানাবিধ বত্ন বিজড়িত অলঙ্কার ভারতীয় শিল্পী যাহা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার আর তুলনা মিলে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় চিত্ত তাহার শারীর সত্তাকে শুচি-শোভন করিতে চাহে, অলঙ্কার ও বস্ত্র জড়াইয়া নহে, স্নানের দ্বারা অবগাহনে পূত হইয়া।

ভারতবর্ষের স্নান মাত্র ক্লেদ নিঃসারণ করা নহে। উহা অন্তঙ্গ তাপজনিত ক্লান্তির অপসারণেও নহে! স্নানের উদ্দেশ্য পবিত্রতা, অশুচিতার মোক্ষণ। অস্নাত যে, তাহার অঙ্গে যতই বসন ভূষণ থাকুক, সে অশুচি। দেব ও পৈত্র্য এবং অন্যবিধ বৈধ কার্য্যে তাহার অধিকার নাই। সুন্দরের মন্দিরতলে তাহার প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। ভারতবর্ষ চাহে সজ্জীকরণ নহে, শুচিতা—বাহ্য অভ্যন্তর শুচি। সেইজন্য ভারতবর্ষীয় নবনারীর নিকট বসন ভূষণ পরিবর্ত্তন করা অপেক্ষা অবগাহন স্নান করাই শোভনীয়তার পরিচায়ক। য়ুরোপীয় জাতিসমূহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রজনীতে সজ্জা পরিবর্ত্তন করে। ভারতবর্ষে সে স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নানের ব্যবস্থা। নিত্য স্নান ভারতবর্ষে মানবধর্ম্মের অন্যতম ধর্ম্ম। শুচিতাই সৌন্দর্য্য, এই বোধ না থাকিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নানের ব্যবস্থা হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইত না।

কাব্য ও সাহিত্য সৌন্দর্য্যানুভূতির অন্যতম নিদর্শন। হয়তবা সভ্য মানবতার কাছে ইহার অপেক্ষা বরণীয় বিষয় আর কিছুই নাই। ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষায় যে কাব্য সাহিত্য আছে, তাহা বিশ্বজগত অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কত সহস্র কবি যে ভারতবর্ষের সাহিত্য সংসারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কবি উশনা হইতে ভারবি, কালিদাস, ভবভূতি সকলের নাম করিলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া যায়। এক শকুন্তলা-চরিত্র পাঠ করিয়া প্রতীচ্য সুধী আবেগ-উৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—শকুন্তলা। সৌন্দর্য্য ও তুমি একার্থবাচক। বাস্তবিক কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য-মাধুর্য্য সাহিত্য-সম্পদের মধ্যে কৌস্তভমণি!

ভারতীয় চিত্ত কিন্তু এই কাব্যরসে একান্তভাবে অনুরক্ত নহে। শিক্ষিতগণের মধ্যে সাহিত্য হিসাবে এই সকল কাব্যের পঠন পাঠন ও আলোচনা থাকিলেও উহা ভারতবর্ষীয় চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে নাই। শকুন্তলার রূপ আকর্ষণীয় হইলেও তদতিরিক্ত কিছুর প্রত্যাশী এই ভারতীয় চিন্তা। সীতা অলোকসামান্যা সুন্দরী, সাবিত্রী হয়ত উর্ব্বশীর অপেক্ষাও অনুপমা, কিন্তু সে রূপের প্রতি যতটা আকর্ষণ, তদপেক্ষা সমধিক শ্রদ্ধা সীতা ও সাবিত্রীর পাতিব্রত্যে! ভারতবর্ষের চিত্ত যে সীতা ও সাবিত্রীর প্রতি গদ্‌গদ, তাহার কারণ তাঁহারা "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" বলিয়া নহে, তাঁহারা পাতিব্রত্যধর্ম্মে নিরুপমা বলিয়া।

কাব্য আলোচনা ভারতবর্ষে না হইয়া থাকে এমন নহে। কিন্তু অধিকাংশ মনের প্রবণতা কাব্য অপেক্ষা পুরাণের প্রতি। পুরাণকাহিনী যে জনগণেরই রুচিকর এমন নহে, উহা আপামর সাধারণের একান্ত হৃদ্য বস্তু। কাব্য-রসিক বিবুধব্যক্তিগণও কাব্যগ্রন্থকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া পুরাণ পাঠ করেন। এই প্রবণতাটুকুর বিশ্লেষণ

করিলে যে তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তব্যগুলিরই পোষকতা হইবে। অর্থাৎ শুচিতাই রুচি! পুণ্যই সৌন্দর্য্য। শক্তিই শোভনীয়তা।

কতকগুলি ছোট খাট দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত করিয়া বক্তব্যকে আরও সুপরিস্ফুট করা যাইতে পারে। বিবিধ দিক দিয়া এই রসানুভূতির পরিচয় পাইতে চাহিলে তবে ভারতীয় সৌন্দর্য্য-বোধির পরিচয়টুকু সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। সকলগুলি উপস্থাপিত করা সম্ভব না হইলেও একান্ত আবশ্যক বোধে এখানে দুই একটির পরিচয় প্রদান করিতেছি।

পত্রপল্লবের বর্ণ বৈচিত্র্য, পুষ্প-বীথিকার মনোহারিত্ব, মানব সাধারণের একান্ত আদরের বস্তু। ভারতেতর জাতীয় অঙ্গনে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রোটন অলিন্দে সজ্জিত থাকে অর্কিড। ভারতবর্ষের কিন্তু এমন নহে। ভারতবর্ষে শ্রদ্ধায় সম্পূজিত হয় অশ্বত্থ ও তুলসী। ইহাকে একান্ত ধার্ম্মিকতার লক্ষণ বলিলে অর্দ্ধাঙ্গভাবে বিচার করা হয়। কারণ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সুন্দর হইতে ব্যবচ্ছিন্ন নহে। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। যাহা সত্য, তাহাই একাধারে শিবম্ ও সুন্দরম্। ধর্ম্মের যিনি চরম লক্ষ্য তিনি আনন্দ স্বরূপ। শ্রুতি বাক্য —"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। সুন্দরই পুণ্য কিম্বা পুণ্যই সুন্দর। যাহা সুন্দর নহে, তাহা পুণ্য নহে, কিম্বা যাহা পুণ্য নহে, তাহা সুন্দর নহে। পরম সুন্দর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি শুদ্ধম্। কাজেই অশুদ্ধ বস্তুতে বা ভাবে সৌন্দর্য্যের স্পর্শ থাকিতে পারে না। সেইজন্য প্রসাধনে ভারতের সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিতৃপ্তি সংশাধিত হয় না, বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচিতাই সৌন্দর্য্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। সৌন্দর্য্য সুশোভনীয়তা অলঙ্কারে, বস্ত্রে, বিলাসব্যসনের সমারোহে নহে, আয়তির চিহ্ন ফুইগাছি লৌহবলয়ে ও সীমন্তের সিন্দুর রেখায়।

মঙ্গল এবং শান্তি এই দ্বিবিধ ভাবের প্রতি অভিনিবিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষীয় সৌন্দর্য্য-বোধি উন্মেষিত হইয়া উঠিয়াছে। মঙ্গল যাহা তাহাতেই শান্তি কিম্বা শান্তির প্রতিষ্ঠা যাহাতে ও যেখানে, সেইখানেই মঙ্গল। ভারতীয় চিত্র-শিল্পে তাই উর্ব্বশীর পরিকল্পনা নাই, আছে শ্রীর প্রতিলিখন। পুষ্পগুলি চয়ন করিয়া বাসকসজ্জা করিবার রীতি নাই, উহা দেবোদ্দেশ্যে নির্ম্মাল্য বিশেষ। সৌন্দর্য্য বিলাসের ব্যবহারিকতা নহে, উহা পরম সুন্দরের অভিমুখীনতা। প্রধানতঃ এই দিক দিয়াই ভারতের সৌন্দর্য্য সম্পূজন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ভাল মানিলাম সম্বিৎ এই প্রকারে নিত্য ও স্বপ্রকাশ। তদ্দ্বারা কি সিদ্ধ হইল? এই হেতু বলিতেছেন :—

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভুবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে॥৮

অন্বয়—ইয়ম্ আত্মা পরানন্দঃ, যতঃ পর-প্রেমাস্পদম্। হি যতঃ আত্মনি 'মা ভুবং ন, ভূয়াসম্' ইতি প্রেম ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ—এই সম্বিৎই আত্মা এবং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার, যেহেতু দেখা যায়, 'আমি যেন না থাকি' (এইরূপ ইচ্ছা কাহারও হয় না, বরং) 'আমি যেন (চিরদিনই) থাকি' এইরূপ ইচ্ছা সকলেরই হয়। 'আত্মা' সম্বন্ধে এইরূপ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—এস্থলে অনুমানটি এইরূপ হইয়াছে—এই সম্বিৎই আত্মা হইতে পারে। যেহেতু ইহা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিনাশহীনতা হেতু জন্মহীন হইয়া স্বপ্রকাশ। যাহা এইরূপ (আত্মা) নহে তাহা এইরূপ নিত্য হইয়া স্বপ্রকাশও নহে। যেমন ঘট আত্মা নহে (ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত, এই হেতু নিত্য স্বপ্রকাশরূপও নহে। সেই হেতু তাহা সম্বিৎ নহে)। আত্মার নিত্য সম্বিদ্রূপতা সিদ্ধ হওয়াতে, সত্যতাও সিদ্ধ হইল, কেননা নিত্যতা হইতে ভিন্ন সত্যতা নাই। যেহেতু বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"নিত্যতারূপ যে সত্যতা, তাহাই যে বস্তুর আছে, সেই বস্তুই নিত্য ও সত্য।" (এই-রূপে নিত্যতার সিদ্ধিদ্বারা সত্যতা সিদ্ধ হইল)। ইহাই অভিপ্রায়। আত্মার আনন্দরূপতা প্রতি-পাদন করিতেছেন—"পরানন্দঃ" ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত 'আত্মা' শব্দটি বসাইয়া অর্থ করিতে হইবে। সেই সম্বিদ্‌রূপ আত্মা 'পরঃ আনন্দঃ', নিরতিশয় সুখরূপ (সেই অর্থাৎ সর্ব্বান্তর প্রকাশক সাক্ষী)। তাহার হেতু এই—"যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্" —যে হেতু আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ, (পুত্রধন দেহেন্দ্রিয়াদি) উপাধি বর্জ্জিত হইলে, আত্মাই সর্ব্বাধিক প্রীতির বিষয়রূপে অনুভূত হন, এই হেতু "পরানন্দঃ" (১১।১২৭ হইতে ১২।৩১ পর্যান্ত দ্রষ্টব্য)। এস্থলে এইরূপ 'অনুমান'—আত্মা হইতেছেন পরানন্দরূপ, যেহেতু পরম প্রেমের বিষয়। যাহা পরানন্দরূপ নহে, তাহা পরম প্রেমের বিষয়ও নহে, যেমন ঘট। সেইরূপ এই আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ নহে এরূপ নহে, সেই হেতু পরানন্দরূপ নহে—এরূপ নয়, কিন্তু পরানন্দরূপই। (শঙ্কা) ভাল, লোকে বলে "আমাকে ধিক্," এইরূপে আপনার সম্বন্ধে অর্থাৎ 'আত্মা'-সম্বন্ধে দ্বেষ প্রতীত হয়: সেইহেতু আত্মাকে যে প্রেমাস্পদ বলা হইতেছে, তাহা অসিদ্ধ। তাহা হইলে আত্মা কি প্রকারে পরম প্রেমের বিষয় হইতে পারেন?

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, এই বলিয়া ইহার পরিহার করিতেছেন যে আত্মায় সেই দ্বেষ দুঃখের সহিত সম্বন্ধরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ আত্মা স্বভাবতঃ দুঃখ-সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত হইলেও, দুঃখ-সম্বন্ধযুক্ত দেহাদি উপাধির যোগে আত্মার দুঃখ-

সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই দুঃখহেতু দেহাদি উপাধিই দ্বেষের বিষয় হয় এবং দেহাদির অধ্যাস বশতঃ আত্মাও দ্বেষের বিষয় বলিয়া প্রতীত হন, আত্মা স্বরূপতঃ দ্বেষের বিষয় হন না। মণিমন্ত্রৌষধাদি দ্বারা লুপ্তদাহিকাশক্তি অগ্নির ন্যায় দুঃখ সম্বন্ধজনিত দ্বেষরূপ নিমিত্তবশতঃ আত্মাও স্বভাবসিদ্ধ প্রেমাস্পদতাবিরহিত বলিয়া প্রতীত হন এবং তখন প্রেমাস্পদতায় ধনপুত্রাদিও আত্মাকে অতিক্রম করে। এইরূপে সেই আত্মদ্বেষ দুঃখ-সম্বন্ধরূপ নিমিত্তজনিত বলিয়া) অন্য প্রকারে সিদ্ধ হয়, আর প্রেম আত্মায় অনুভবসিদ্ধ। এইহেতু আত্মার প্রেমাস্পদতা অসিদ্ধ নহে। এই প্রকারে উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন "হি আত্মনি মা ভুবং ন, ভূয়াসম্ ইতি প্রেম ঈক্ষ্যতে"—"হি"—যেহেতু, জনসাধারণে "আত্মনি" আত্মবিষয়ে, "মা (অ) ভুবং ন"—আমি যেন (কোনও কালে) না থাকি—এইরূপ আকারের নহে, অর্থাৎ কোনও কালে আমার অনস্তিত্ব যেন না ঘটে, কিন্তু "ভূয়াসম এব"—যেন চিরদিনই আমার অস্তিত্ব থাকে, এইরূপ আকারের "প্রেম আত্মনি ঈক্ষ্যতে"—প্রেম, আত্মায় সকলেই অনুভব করে। এই হেতু আত্মা যে প্রেমের বিষয়, ইহা অসিদ্ধ নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ৮।

ভাল, আত্ম-বিষয়ে প্রেমের স্বরূপ অসিদ্ধ নহে ইহা যেন সিদ্ধ হইল, কিন্তু আত্ম বিষয়ে প্রেম যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। সেই হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সাধিতে গিয়া পরপ্রেমের আস্পদতারূপ যে হেতু দেখান হইয়াছে, সেই হেতুতে "পর"—পরম বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এই বিশেষণটি অসিদ্ধ—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন।—

তৎ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমস্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥' ৯

অন্বয়—অন্যত্র যৎ প্রেম, তৎ আত্মার্থম্, এবম্ আত্মনি অন্যার্থম্ ন। অতঃ তৎ পরমম্। তেন আত্মনঃ পরমানন্দতা।

অনুবাদ—অন্যত্র যে প্রেম, তাহা আত্মার জন্য; আত্মায় যে প্রেম তাহা অন্যের জন্য নহে। এই কারণেই সেই (আত্ম বিষয়ে) প্রেম পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কারণেই আত্মার পরমানন্দতা সিদ্ধ হয়।

টীকা—"অন্যত্র প্রেম"—আপনা হইতে ভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রাদিতে, যে প্রেম, "তৎ আত্মার্থম্"—তাহা আত্মার জন্যই অর্থাৎ সেই পুত্রাদি আত্মার উপকারক বলিয়া, তাহা স্বভাবতঃ অর্থাৎ তাহাদের জন্য নহে। "এবম্ আত্মনি প্রেম অন্যার্থম্ ন"—এইরূপে, আত্মাতে বিদ্যমান যে প্রেম, তাহা অন্যের অর্থাৎ পুত্রাদির জন্য নহে—আত্মার পুত্রাদির উপকারকতা হেতু নহে কিন্তু আপনারই নিমিত্ত। "অতঃ তৎ পরমম্"—এইরূপে সেই আত্ম-বিষয়ক প্রেম অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না বলিয়া, পরম—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাই বলিতেছেন—"তেন আত্মনঃ পরমানন্দতা"—সেই, নিরতিশয় প্রেমের আস্পদতা হেতু, আত্মার নিরতিশয় সুখরূপতা সিদ্ধ হইল।৯॥

(তৃতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত) এই সাতটি শ্লোকে যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইল, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

ইত্থং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যাতথাবিধম্।
পরংব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং, শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥১০

অন্বয়—ইত্থং যুক্ত্যা আত্মা সচ্চিৎপরানন্দঃ। তথা বিধম্ পরম্ ব্রহ্ম, তয়োঃ ঐক্যং চ শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে।

অনুবাদ—এই প্রকারে যুক্তিদ্বারা আত্মা (জীবাত্মা) যে সৎ (নিত্য), চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ও পরমানন্দস্বরূপ (তাহা সিদ্ধ হইল)। বেদান্তে

অর্থাৎ উপনিষৎসমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরব্রহ্মও সেইরূপ অর্থাৎ সৎ—চিৎ—পরমানন্দস্বরূপ, আর জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম একই।

টীকা—"ইত্থম্"—তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত শ্লোকপঞ্চকে জ্ঞানের নিত্যতা সপ্রমাণ করিয়া, 'সেই জ্ঞানই এই আত্মা,' এইরূপে অষ্টম শ্লোকে সেই জ্ঞানের আত্মরূপতা প্রতিপাদন করিলেন এবং "পরমানন্দঃ" ইত্যাদি শব্দদ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ করিলেন। ইহার দ্বারা আত্মা যে মহাবাক্যের অন্তর্গত "ত্বম্" পদের অর্থ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল।

এস্থলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে,—ভাল, যুক্তিদ্বারাই যদি উক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে উপনিষৎসমূহ ত প্রতিপাদ্য বিষয়াভাবে অপ্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে (অথবা আত্মা উপনিষৎসমূহের বিষয় না হওয়াতে, আত্মসম্বন্ধে উপনিষৎ অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে)। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"তথাবিধম্ পরমব্রহ্ম"—সেই প্রকারের সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাবাক্যের (অর্থাৎ উপনিষদের অন্তর্গত "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের) অন্তর্গত 'তৎ' পদের অর্থ। "তয়োঃ ঐক্যম্,"—সেই 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই দুই পদের অর্থ ব্রহ্মাত্মার অখণ্ড-একরসতারূপ একতা, "শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে"—উপনিষৎ সমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু উপনিষৎসমূহ নির্ব্বিষয় নহে। ইহাই অর্থ। ১০

এস্থলে প্রতিবাদী আত্মার পরমানন্দস্বরূপতায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন—

অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা।
অতোভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥১১

অন্বয়—(শঙ্কা) অভানে পরম্ প্রেম ন, ভানে বিষয়স্পৃহা ন। (পরিহারঃ) অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা।

অনুবাদ—(শঙ্কা) আত্মার পরমানন্দরূপতা জানিতে না পারিলে আত্মাতে পরম প্রেম হয় না; (আবার) তাহা জানিতে পারিলে বিষয় সমূহের কামনা থাকে না। (অর্থাৎ আত্মায় পরম প্রেমও আছে, আবার বিষয়েচ্ছাও আছে, এরূপ হওয়া উচিত নহে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায়) (অতএব আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ তাহা সিদ্ধ হইল না)। (পরিহার)—ইহার উত্তরে বলি, এই হেতু সেই পরমানন্দতা জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত,—প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত। (তাহা কিরূপ, পর শ্লোকে বলিতেছেন)।

টীকা—(প্রতিবাদী বলিতেছেন—জিজ্ঞাসা করি) (সেই পরমানন্দরূপতা 'প্রতীত হয় না'—বলিবেন, অথবা 'প্রতীত হয়' বলিবেন? "অভানে পরম্ প্রেম ন"—(যদি বলেন) তাহা প্রতীত হয় না, (তবে বলি, তাহা হইলে) আত্মায় যে নিরতিশয় স্নেহরূপ পরম প্রেম আছে, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা বিষয়ের সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হইতেই স্নেহের উৎপত্তি। (আর যদি বলেন সেই পরমানন্দরূপতা প্রতীত হয়, তবে বলি) "ভানে ন বিষয়স্পৃহা"—আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইলে, সুখের অর্থাৎ বিষয়ানন্দের সাধন যে মালা, চন্দন, বনিতা প্রভৃতি তৎসমূহে অথবা সেই সেই বিষয়জনিত সুখে যে লোকের ইচ্ছা হয়, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা পরমসুখরূপ ফলের প্রাপ্তি হইলে, বিষয়রূপ সাধনের ইচ্ছা সম্ভবে না, আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের লাভ হইলে, ক্ষণিকতা ও সাধনের অধীনতাদি দোষদুষ্ট, বিষয়জনিত সুখে ইচ্ছা হইতে পারে না; সেই হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না। (ইহাই গেল শঙ্কা)। (সমাধান) এস্থলে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই প্রকারান্তরে সম্ভব হইতে পারে বলিয়া, 'আত্মার আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না,' বলিতে পার না—এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন:—"অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা"—যেহেতু প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয় পক্ষেই দোষ রহিয়াছে এই হেতু, আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইয়াও প্রতীত হয় না (ইহাই সিদ্ধান্ত)।১১

সমালোচনা

ন্যায়ভাষ্যের সমালোচনার প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর—

গত মাঘমাসের "উদ্বোধনে" কার্ত্তিকমাসে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। প্রতিবাদী তর্কতীর্থ মহাশয় উপহাস করিয়া অসংকোচে লিখিয়া দিয়াছেন যে "মীমাংসকদিগের মতে চক্ষুরাদির প্রামাণ্য চক্ষুরাদির দ্বারাই গ্রাহ্য হয়" ইহাই নাকি আমি "বহু প্রাচীন গ্রন্থ পড়িয়া ও দেখিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়াছি"। আমি কিন্তু ঐরূপ কিছুই বুঝি নাই বা কখনও শুনি নাই। এবং পূর্ব্ব প্রবন্ধে কুত্রাপি ঐরূপ অসম্ভব কথাও যে আমি লিখি নাই, তাহা আমার প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝা যাইবে। প্রতিবাদী সাহিত্যিকদিগকেও নিরর্থক অবজ্ঞার সহিত উপহাস করিয়াছেন। আমি কিন্তু সাহিত্যিকও নহি। তথাপি প্রতিবাদীর সাহিত্যজ্ঞান বুঝিতে পারিয়াছি। প্রতিবাদী তর্কতীর্থ মহাশয় "পঠদ্দশায় উক্ত ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট একাধিকবার" যাহা শুনিয়াছেন তাহাও আবার প্রকাশ করিয়া গুরুগৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানিতাম যে দম্ভেরও একটা সীমা আছে।

(১) আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, প্রতিবাদী নিজমতে তাহার কোন ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া, "অন্য তাৎপর্য্যও তাহাদের থাকিতে পারে", "উহার ব্যাখ্যা দেখাইতে চাহি না" "নিরস্ত রহিলাম" এইরূপ যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহাও কি আমার কথার প্রতিবাদ বলিয়া ধরিতে হইবে?

(২) প্রতিবাদী লিখিয়াছেন "প্রমাণতঃ" এই স্থলে "একবচনের উত্তর তসি প্রত্যয় হইতে আপত্তি কি?" আপত্তি কিছুই নাই। কিন্তু দ্বিবচন ও বহুবচনের স্থানেও তসি প্রত্যয়ে, এবং "প্রমাণতঃ" এই পদের দ্বারা "প্রমাণাভ্যাং প্রমাণৈঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা যাহা উদ্দ্যোতকর করিয়াছেন ও যাহা বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতেই বা আপত্তি যে কি, তাহাও প্রতিবাদী বলিয়া দেন নাই। ঐরূপ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে ন্যায়াচার্য্য মহাশয় প্রথমে এ বিষয়ে কিছুই যে প্রতিবাদ করিতেন না, ইহা কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রে "প্রমাণঞ্চ প্রমেয়ঞ্চ" এইরূপ একবচন প্রয়োগ করিয়াই নব্যমতে দ্বন্দ্বসমাসের ব্যাসবাক্য হইবে, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেখানে একবচনের অর্থ কি? প্রতিবাদী ইহার যে উত্তর দিবেন, তদ্দ্বারাই অন্যত্র তাঁহার ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়া লইবেন।

(৩) ভাষ্যকার প্রভৃতি "প্রমাণং প্রমাণং" এইরূপ প্রয়োগ করেন নাই। আমরাও ঐরূপ বলি নাই। কিন্তু কোন অংশে অর্থভেদ হইলে ঐরূপ শব্দ পুনরুক্তি যে সকল মতেই অপরিহার্য্য দোষ নহে, ইহাই বক্তব্য। অলংকারশাস্ত্রে "লাটানুপ্রাসে"র কথা ও "কদলী কদলী করভঃ করভঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিলেই ইহা জানা যায়। বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মকীর্ত্তিও "বাদন্যায়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ন হি অর্থভেদে শব্দসাম্যেঽপি কশ্চিদ্দোষঃ" (পৃঃ ১১১)।

(৪) প্রতিবাদী লিখিয়াছেন "যথার্থজ্ঞানকরণত্ব ও যথার্থজ্ঞানত্ব কখনও একস্থানে থাকে না।" কিন্তু যথার্থ অনুমিতি প্রভৃতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান

প্রভৃতিতে যে প্রমাত্ব ও প্রমাকরণত্ব এই উভয়ই থাকে, ইহাও কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে?

(৫) ভাষ্যে হানাদিবুদ্ধিকে প্রমিতি না বলিয়া প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের "ফল" বলা হইয়াছে বলিয়া, হানাদিবুদ্ধিকে প্রমিতি বলা "ভাষ্যকারেরও অভিপ্রেত বলিয়া" তর্কতীর্থ মহাশয়ের "মনে হয় না"। কিন্তু প্রমাণের ফল যে "প্রমিতি"ই হইবে; সুতরাং হানাদিবুদ্ধিও যে প্রমিতি, ইহা ত সহজেই বুঝা যায়। হানাদিবুদ্ধি প্রমা না হইলে অপ্রমা হইবে। কিন্তু যাহা "প্রমাণে"র ফল বলিয়া স্বীকৃত, তাহা কি অপ্রমা বা ভ্রম হইতে পারে?

(৬) প্রতিবাদীর মতে "কোন দার্শনিকই" প্রমাকরণের প্রামাণ্যকে স্বতোগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী তাঁহার সম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণের যে স্বতঃপ্রামাণ্যই স্বীকার করিতেন, তাহা অনুমিতি গ্রন্থের শেষে গঙ্গেশ চার্ব্বাকমতের খণ্ডন করিতে লিখিয়া গিয়াছেন,—"স্বতশ্চ প্রামাণ্যগ্রহে তৎসংশয়ানুপপত্তেঃ"।

(৭) প্রতিবাদী ন্যায়াচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার সমর্থক তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রধান কথা এই যে মীমাংসকমতে জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য হইলেও প্রমাকরণত্ব স্বতোগ্রাহ্য নহে। কারণ, "প্রামাণ্যবাদ" গ্রন্থে গঙ্গেশ "প্রামাণ্যং" না বলিয়া "জ্ঞানপ্রামাণ্যং" বলিয়াছেন। শিরোমণিও সেখানে লিখিয়াছেন যে কেবল "প্রামাণ্যং" বলিলে ঐ প্রামাণ্য শব্দের দ্বারা প্রমাজ্ঞানের করণত্বও বুঝা যাইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাকরণত্বরূপ যে প্রামাণ্য তাহা জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থেও থাকায় উহাকে কোন মতেই "জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীমাত্রগ্রাহ্য" বলা যায় না। সুতরাং সেখানে মীমাংসকমতে গৃহীত সাধ্য উহাতে না থাকায় আংশিক বাধ হয়। তাই গঙ্গেশ "জ্ঞানপ্রামাণ্যং" বলিয়া জ্ঞানগত প্রমাত্বরূপ প্রামাণ্যকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ "জ্ঞান" শব্দটী ঐ "প্রামাণ্য" শব্দের উক্ত অর্থে তাৎপর্য্যবোধক। কিন্তু ইহার দ্বারা জ্ঞায়মান বেদে যে প্রমাকরণত্ব আছে, তাহাও সকল মীমাংসকের মতে অনুমানগম্য, ইহা বুঝা যায় না। শিরোমণি তাহা বলেন নাই। কুসুমাঞ্জলির ২।১ কারিকার ব্যাখ্যায় হরিদাস যে মত সংক্ষেপে লিখিয়াছেন তাহা একদেশী মত ("কুসুমাঞ্জলি বোধনী"—৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু ঐ কারিকার গদ্যবৃত্তিতে স্বয়ং উদয়নাচার্য্য স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের কথা বলিতে লিখিয়াছেন—"স্বত এব প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ কিন্তু শংকামাত্রমনেনাপনীয়তে"। টীকাকার বরদরাজ সেখানে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ন তাবদ্ বেদানাং প্রামাণ্যং অপেতবক্তৃদোষত্বেনানুমীয়তে" ইত্যাদি (৬২ পৃঃ)।

মীমাংসকমতে বেদের প্রামাণ্য যে অনুমানাদির দ্বারা সিদ্ধ নহে, ইহা ভট্ট কুমারিলের গ্রন্থ দেখিলেই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। চোদনাসূত্রের বার্ত্তিকে ভট্ট লিখিতেছেন—"ন চানুমানতঃ সাধ্যা শব্দাদীনাং প্রমাণতা" (৮১ কারিকা)। সুতরাং "মহাজন পরিগৃহীতত্ব"কে বেদের প্রামাণ্যের হেতু বলিয়া তিনি যে স্বীকার করিতে পারেন না তাহা প্রতিবাদী সহজেই বুঝিতে পারিবেন। (এই প্রসঙ্গে ঐ সূত্রবার্ত্তিকের ৯৭-৯৮ কারিকাও দ্রষ্টব্য)। তবে অন্য কাহারও কোন কারণে সংশয় জন্মাইলে সেই সংশয় দূর করিবার জন্যই মীমাংসকগণ সেই শংকার নিবর্ত্তক "হেতু"ই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহা তাঁহাদের মতে বেদের প্রামাণ্যের অনুমাপক হেতু নহে। তাই উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন—"স্বত এব প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ কিন্তু শংকামাত্রমনেনাপনীয়তে।" পরন্তু, অনুমানের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে হইলে, সেই অনুমানের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে আবার অন্য অনুমান আবশ্যক হওয়ায় অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে, ইহাই পরতঃপ্রামাণ্যবাদের বিরুদ্ধে মীমাংসকদিগের প্রধান কথা। কিন্তু তাঁহারাও বেদের প্রামাণ্যকে অনুমানগ্রাহ্য বলিলে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ সমর্থনে তাঁহাদের এত প্রয়াস কেন?

শেষকথা, প্রতিবাদী মীমাংসকদিগের মত বলিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক মীমাংসা গ্রন্থ হইতে দেখাইয়া দিবেন এবং আমার উদ্ধৃত উদয়নাচার্য্য, শ্রীধরভট্ট ও বরদরাজের সন্দর্ভের সপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়া নিজমত সমর্থন করিবেন। নচেৎ তাঁহার কোন কথাই পণ্ডিত সমাজ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য

বৈদিক গবেষণা—প্রথম খণ্ড। শ্রীউমাকান্ত হাজারী সম্পাদিত। দুইশত আটাশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমৃন্ময়কুমার রায়, ১১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ আনা।

ইহাতে কতকগুলি বেদবিষয়ক প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে হয়। লেখক ইহার নাম গবেষণা কেন দিলেন, বোঝা যায় না। লেখকের মতে 'পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না' কিন্তু Dr. Winternitz বেদকে 'Divine revelation' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও কোথাও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার করেন নাই। লেখকের এ সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা থাকিলে তাহা ভ্রান্তই বলিতে হইবে।

ত্রয়ী বলিতে—গীতি, পদ্য ও গদ্য বুঝায় না—ঋক্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ বুঝায়। প্রাচীন বিভাগ-মতে অথর্ববেদ এই তিনের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্র ও বিধি বেদের দুই প্রধান ভাগ নয়। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দুই প্রধান ভাগ। ব্রাহ্মণ অংশে—বিধি ভিন্ন উপাসনা, ইতিহাস, পুরাণ, আখ্যায়িকা ইত্যাদিও দৃষ্ট হয়। বেদের তিন ভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্র, ইহা সমগ্র পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত নয়—প্রধানতঃ Welur সাহেবের মত কিন্তু Dr Winternitz এর মতে সূত্রভাগকে কখনও বেদের অংশ বলা যায় না। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক—বেদের তিনটী ভাগ। বেদের পাঁচটী শাখার নাম—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক নয়। যথার্থ নাম হইবে—আশ্বলায়নী, সাংখ্যায়নী, শাকলা, বাস্কলা ও মাণ্ডুকেয়া। লেখক এই সকল বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া মত প্রকাশ করিলে ভাল হইত। আলোচ্য গ্রন্থের ঋগ্বেদ নামক অধ্যায়টী অধিকস্থলে Welur সাহেবের History of Indian Literature এর Rigveda Samhita নামক অধ্যায়কে অনুসরণ করিয়া লিখিত বলিয়া আমাদের ধারণা। কিন্তু উহাতে যেস্থানে আছে 'The Sakalas appear in tradition as intimately connected with the Sunakas and to Saunaka in particular'—সেই স্থান দেখিয়াই 'শাকল ঋষিকে শৌনকের প্রিয় শিষ্য' বলা যায় না, আর ঋষির যথার্থ নাম হইবে শাকল্য। ঐরূপ যেস্থলে Welur সাহেবের গ্রন্থে আছে 'The scholiast on Panini at least probably following the Mahabhasya', সেস্থলের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গলা 'পাণিনি ও মহাভাষ্যের মতে' বলিয়া যে লিখিত হইতে পারে তাহা আমাদের কল্পনাতেই আসে না।

আলোচ্য-গ্রন্থের বিষয়টীর গুরুত্ব লেখক যথাযথ ধারণা করিতে সক্ষম হইলে এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ আছে, সে সমস্ত আলোচনা করিয়া গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করিলে আমরা আনন্দিত হইতাম।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

গীতা প্রাঞ্জলকরী—(১ম খণ্ড)। সম্পাদক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ। ২৩ ও ৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মিত্র ব্রাদার্স সুশীলা প্রেস হইতে মুদ্রিত। ৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

ভূমিকায় প্রকাশ, গ্রন্থকারদ্বয় তিনখণ্ডে গীতার একটী প্রাঞ্জল সংস্করণ বাহির করিতে ব্রতী হইয়াছেন। আলোচ্য-গ্রন্থখানি উহার প্রথমখণ্ড। ইহাতে সমগ্র গীতার একটী "অনুশোচনা" (অনুবন্ধ ?) এবং প্রতি অধ্যায়ের এক একটী সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণবের ভগবান—শ্রীসাহাজী লিখিত এবং কুমারখালী (নদীয়া) হইতে শ্রীকালীপদ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪০ পৃষ্ঠা, দাম ছয় আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অতি সরল হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যান হইয়াছে। ভাষা বেশ সরল ও সজীব। মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির ভাবার্থ দিলে বোধ হয় ভাল হইত। বইখানি বেশ সমন্বয়ের সুরে লেখা—গোঁড়ামি নাই। ভক্তিপিপাসুগণকে একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীরাধা—২০ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আনা। শ্রীসাহাজী কৃত এই বইখানিও আমাদের বেশ লাগিল। শ্রীরাধা সম্বন্ধে এমন মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা যাঁহারা বৈষ্ণব নন তাঁহাদিগেরও ভাল লাগিবে। মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির পদ্যানুবাদ অতি সুললিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন

গত ১লা মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা টাউন হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক সমিতির উদ্যোগে বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের সমবায়ে অষ্টাহকালব্যাপী এই ধরণের বিরাট সম্মেলন ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। এতদুপলক্ষে টাউন হলটী অতি সুন্দরভাবে পত্রপুষ্প এবং বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক বাণীসমূহ এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতীক, মন্দির, মঠ, তীর্থস্থান, উপাসনালয় প্রভৃতির চিত্র হলটীর প্রাচীর গাত্রে বিলম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল।

সভা আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে দলে দলে নরনারী টাউনহলে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জন সংসদে যোগদান করিবার জন্য সমবেত হইতে থাকেন। ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই টাউনহলে আর তিলধারণের স্থান ছিল না। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং অনেকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান।

সুমধুর বেদগানসহ সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। যাঁহারা সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করিয়া পত্র বা তার পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহাদের বার্ত্তা পাঠ করেন।

ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর সভাপতির নিকট নিম্নলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন :—

"আপনার সভাপতিত্বে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে সম্মেলন হইতেছে, আমি উহার সাফল্য কামনা করিতেছি। বাংলা দেশে অবস্থানকালে রামকৃষ্ণ-মিশনের কর্ম্মকর্ত্তা এবং সন্ন্যাসীদের সহিত মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। সে স্মৃতি এখনও আমার চিত্তে সুস্পষ্টভাবে জাগরুক রহিয়াছে। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই যে, মিশনের উদ্যোগে আহূত এই সম্মেলন সর্ব্বতোভাবে সাফল্যলাভ করিবে। * * "

বঙ্গদেশের গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন শুভেচ্ছা কামনা করিয়া নিম্নোক্ত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

"রামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ কলিকাতায় ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন আহূত হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমার মনে অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি যে, রামকৃষ্ণদেবের যাহা অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা প্রতিপালনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের আলোচনা সহায়তা করিবে। ধর্ম্মসমন্বয়, পরমত সহিষ্ণুতা এবং আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী ছিল রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ।"

মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

"সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। আশা-করি, এই সম্মেলন দ্বারা কিছু গঠনমূলক কার্য্য সাধিত হইবে।"

এতদ্ভিন্ন এ সম্বন্ধে ভারতের বাহির হইতে যে সকল পত্র ও বাণী আসিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত স্থানসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য :—

অষ্ট্রেলিয়া, আফগানিস্থান, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, মিশর, ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন, জার্ম্মাণী, হলাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইরাণ, ইরাক, ইতালী, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, পোলাণ্ড, ফিলিপাইনস্, রুমানিয়া, রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্টস, উত্তর আমেরিকা এবং ভারতের আসাম বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান, ব্রহ্মদেশ, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, মাদ্রাজ, মহীশূর, নিজামরাজ্য, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি।

স্যার বি, এল্, মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার মন্মথনাথ

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণের পর সভাপতি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হয়। ইহার অনুবাদ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত তিনি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া সভা ত্যাগ করেন।

সভাপতির অভিভাষণের পর শিখ ধর্ম্মের পক্ষ হইতে সর্দ্দার জমায়েৎ সিং, পাঞ্জাব দেব-সমাজের পক্ষ হইতে সোহন সিং, মহাবোধী সোসাইটীর পক্ষ হইতে দেবপ্রিয় বলীসিংহ, জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী সভার পক্ষ হইতে ছগমল ছপরাও, পার্শী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিঃ ডি, এন্, ওয়াদিয়া, থিয়োসফিক্যাল্ সোসাইটীর পক্ষ হইতে অধ্যাপক তুলসীদাস কর, বাংলার মুসলমানদের পক্ষ হইতে ডাঃ আর, আমেদ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পক্ষ হইতে স্বামী নির্ব্বেদানন্দ, ইহুদী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিঃ জে, এ, জোসেফ, ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিঃ ইউ মং আই মং, তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষ হইতে তাসিলামার প্রধান মন্ত্রী নাকচীন বিনপোচ, চীনের তাওধর্ম্মের পক্ষ হইতে অধ্যাপক তান ইয়েন সান, ইরাকের পক্ষ হইতে মুসলমানধর্ম্মের মিঃ ইউসুফ্ আমেদ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ডাঃ পিটার বইকি, হল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে ডাঃ এইচ, গোরেটজ, বোষ্টনের বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে স্বামী পরমানন্দ, দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ হইতে মিস্ হেলেন মেরী প্রভৃতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করেন।

অতঃপর ইংলণ্ডের প্রতিনিধি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইলে সমবেত জনমণ্ডলী তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি দুইটী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং সম্মেলনে উপস্থিত হইতে সমর্থ হওয়ায় আনন্দপ্রকাশ করেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় প্যারিস ও জেনেভার "ফেডারেশন অব দি সোসাইটি এণ্ড ইনষ্টিটিউট অব সোসিওলজি"র প্রতিনিধিরূপে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। রাত্রি ৮৷১৫ মিনিটের সময় একটী সঙ্গীতের পর অধিবেশন শেষ হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন:—কর্ণেল এবং মিসেস লিণ্ডবার্গ, মিঃ ম্যাকডোনাল, অধ্যাপক সাণ্টাক্রোরা (স্পেন), শেখ মহম্মদ (ইজিপ্ট), ডাঃ লেডেন (মেস), ম্যাডাম সোফিয়া ওয়াদিয়া, মিঃ চেন (চীন), কাণ্টি দোঁ্যা দে ডিলস (বার্লিন), কাঃ রুবিন (তুরস্ক), মিস জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, ফ্রেঞ্চ কনসাল জেনারেল মিঃ পল দুর্বা, চীন কনসাল জেনারেল, চেকোস্লোভেকিয়ার কনসাল ডাঃ তুসিফ, মিস হেলেন মেরী বলনোয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা), জিন হার্ব্বার্ট (জেনেভা), ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মিঃ এবং মিসেস বি, সি, চ্যাটার্জ্জি, ডাঃ সরোজ দাস, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, ডাঃ এ, সি, উকীল, ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর, শ্রীযুত শ্রীশ চ্যাটার্জ্জি, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী, মিসেস এম, আর, দাস, শ্রীযুক্তা অমৃতকুমারী, মিসেস মিথিবেন, ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, কুমার এইচ, কে, মিত্র, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, অধ্যাপক মাদাম ডি, উইলম্যান গ্রাবাস্কো (পোল্যাণ্ড) প্রভৃতি।

২রা মার্চ্চ প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় টাউন হলে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে নানকিংএর মিঃ সি, এল, চেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

একটী সুমধুর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি মিঃ চেন একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রধান দুইটী জাতি—চীনবাসী ও ভারতবাসীর প্রতিনিধিবৃন্দ আজ এখানে উপস্থিত; অন্যান্য অনেক দেশের প্রতিনিধিও এখানে উপস্থিত। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মনীষিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। গত হাজার অথবা তাহারও অধিক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নরনারীর মনে যে

সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মভাবধারা উদিত হইয়াছে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা তাঁহাদের মনে জাগরিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে আজ এই সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রতিভাবান্ ব্যক্তিবর্গ আলোচনা করিবেন। মিঃ চেন বলেন, এইরূপ একটী অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ লাভে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

অতঃপর ভারতের বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পঠিত হয়।

হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করেন :—

"যে মহাপুরুষ উদার ও উচ্চ মতসমূহ এবং সর্ব্বধর্ম্মসহিষ্ণুতা আত্মজীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন এবং যাহা আপনাদের এই ধর্ম্ম-সম্মেলন প্রচার করিতে প্রচেষ্টা করিতেছে, সেই মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে আমি শ্রদ্ধাবনত শিরে সহানুভূতি জানাইয়া এই উৎসাহের বাণী প্রেরণ করিতেছি। * *"

প্রফেসার ব্যারণ সি, ভন ব্রক ড্রুফ (জার্ম্মাণী) তাঁহার বাণীতে বলেন, "আপনারা মানবজাতির জন্য মহৎকার্য্য করিতেছেন। * * *" কিউ মাম তে বৌদ্ধসঙ্ঘ জাপানীবৌদ্ধ এবং স্বামী অসঙ্গানন্দ সিংহলের ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাইকাউণ্ট সাণ্টা ক্লার (স্পেন) তাঁহার বার্ত্তায় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বলেন যে, মানুষকে প্রথমে ঋষিতুল্য হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলে "যত মত তত পথ" এই বাক্যের ভিতর যে গভীর প্রেমানুভূতি আছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

অতঃপর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মিশরের আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট এল, মারাঘি কর্ত্তৃক লিখিত "ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কর মহাশয় আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি, এ, এলউড লিখিত "ধর্ম্মগত ঐক্যের আবশ্যকতা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীহট্ট মুরারি চাঁদ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় "ধর্ম্ম ও সুসমঞ্জস জীবন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাঁশবেড়িয়ার রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় "বর্ত্তমান জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক সেন কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের মিসেস রুথ ফ্রাই লিখিত 'সামাজিক বিধি ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। স্বামী ভূতেশানন্দ কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস, চিয়ার লিখিত "হিউম্যানিজম এণ্ড রিলিজিওলজি" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া "চীন ও ভারতের সংস্কৃতি" সম্পর্কে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মালদহের মৌলবী ইদ্রিস আহম্মদ (এম-এল-এ) "পবিত্র কোরাণের বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় "বিভিন্ন ধর্ম্মমতে সৃজনক্ষম ব্যক্তিত্বের বিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর স্বামী শ্রীবাসানন্দ সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন। একটী সঙ্গীতের পর সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যা ৬।১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা টাউন হলে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে পূর্ব্বাহ্ন অপেক্ষা অধিক সংখ্যক নর-নারী অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। একটী উদ্বোধন সঙ্গীতের পর রোমঁ্যা রোলঁ্যা এবং হল্যাণ্ডের অধ্যাপক জে, জে, ভন সামিডের শুভেচ্ছালিপি পড়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক কমিটির নিকট মনীষী রোমঁ্যা রোলঁ্যা নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন :—

"চিন্তায় আমি আপনাদের সহিত যুক্ত রহিয়াছি, এ সম্বন্ধে যেন আপনারা সন্দেহ পোষণ না করেন। অনুগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের প্রতি আমার আন্তরিক শুভকামনা, সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও সহানুভূতি জানাইবেন। বিশ্বমানবের জীবনে পারস্পরিক সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের শক্তির সামঞ্জস্য বিধান আজীবন কামনা করিয়াছি। প্রেমের অবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামে বিশ্ব-মৈত্রীর প্রতীক ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে, ইহাতে আনন্দ অনুভব করিতেছি। বিশ্বমানবের কল্যাণ চেষ্টায় ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের প্রতিনিধিগণ যেন তাঁহাদের শক্তি ও চেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করেন, ইহাই আমার

অনুরোধ। বর্ত্তমান যুগে দুর্ব্বিসহ উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত শোষিতদের অভ্যুদয় ও আত্মরক্ষার চেষ্টা চলিয়াছে, আমরা যেন সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায় হই। দরিদ্র ও নিঃসম্বল যাহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াই জগৎ হইতে বিদায় লয়, তাহাদের পাশেই যেন আমরা নিজেদের আসন গ্রহণ করি।"

হল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, জে, ভন সামিড লিখিয়াছেন :—

"শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ-লিপি নূতন করিয়া আমার নিকট ভারতীয় চিন্তাধারার অত্যুচ্চ আদর্শের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। * * *"

লাহোর আর্য্য-সমাজের পণ্ডিত সুখদেওজি বিদ্যাবাচস্পতি "সর্ব্ব ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বোম্বাইএর মিসেস শিরিন ফজদার "বাহাইজম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক হরিমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং স্বামী মাধবানন্দ "বর্ত্তমান জগতে অভাব কি?"—সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। এই যুগে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যেও মানুষ তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না. তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা ভুলিতে বসিয়াছি যে, আমাদের আরও একটী গৌরবময় জীবন, শান্তির জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন আছে। আমাদের দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা শান্তির বাণী, মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছেন। সেই সমস্ত মহাপুরুষদের শিক্ষা ও আদর্শ হইতে আমাদের দেখা দরকার যে, আমরা কোনখানে ভুল করিতেছি, —আমরা কোন পথে চলিব।"

শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াদিয়া (বোম্বাই) বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বলেন।

অতঃপর সভাপতি মহারাজের সুচিন্তিত বক্তৃতার পর এই দিনের সভার কার্য্য শেষ হয়।

৩রা মার্চ্চ বুধবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় টাউন হলে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ওয়ার্দ্ধার "ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য-পরিষদের" কাকা কালেলকর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

মহাত্মা গান্ধী কাকা কালেলকরের নিকট এই মহাসম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করেন :—

"প্রিয় কাকা, আপনি বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য যাইতেছেন। মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামের সহিত এই মহাসম্মেলন জড়িত। আমি আশা করি যে, এই সভা এমন কিছু করিতে সমর্থ হইবে, যাহা সকল প্রকার ধর্ম্মাবলম্বীর পথপ্রদর্শক হইবে। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পর্কে এই সভার সিদ্ধান্ত কি হইবে? আমাদের মতে সকল ধর্ম্মই সমান, এই মহাসভা কি তাহাই স্বীকার করিবে? অথবা বলিবে যে, কোন একটা বিশেষ ধর্ম্মই সত্য, অন্যান্য ধর্ম্ম সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ? শেষোক্ত কথাটাও অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় এই মহাসভার মতামত এই সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিতে পারে।"

প্যারিসের "একোলদেস হ্যাটেস এতুদেস"এর ডিরেক্টার অধ্যাপক লুই রেনো তাঁহার বাণীতে বলেন, "মানব সভ্যতা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সমস্তই বর্ত্তমানে জড়বাদ ও বর্ব্বরতার চাপে ডুবিয়া যাইতে বসিয়াছে। এই সময়ে আপনাদের এই ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন অপেক্ষা অন্য কিছু অধিকতর প্রশংসনীয় হইতে পারে না।"

আমষ্টার্ডমের (হল্যাণ্ড) এ, ভ্যান ষ্টক তাঁহার বাণীতে লিখিয়াছেন,—"আমার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন যুগের অবতারগণের একজন; আমি তাঁহার সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পড়িয়াছি এবং তাঁহাকে আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। পাশ্চাত্যে সুফি আন্দোলনের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের সহিত সংযোগ স্থাপন, সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা ও বিভিন্ন জাতির সংযোগ ও বন্ধুত্ব সাধন—এই উদ্দেশ্যগুলিও বর্ত্তমান। তাই ঐ সমস্ত আদর্শের প্রচারকল্পে আপনারা যে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।"

অতঃপর রুমানিয়ার কার নৌটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন, সি, নালি লিখিত "মানবের ভবিষ্যৎ", অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি, গ্রেটার লিখিত "খৃষ্টান জগতে যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের প্রয়োজন", এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলরতন ধর মহাশয়ের লিখিত "বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম", কলোন (জার্ম্মাণী) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

লিওপোল্ড ভন উইস লিখিত “ধর্ম্মের স্বরূপ”, ঢাকার অধ্যাপক বি, বি, দাসগুপ্ত মহাশয় লিখিত “বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন ধারা”, নানকিনের সিনো-ইণ্ডিয়া কালচারাল ফেডারেশনের অধ্যাপক তান ইয়ান সান লিখিত “চৈনিক ধর্ম্ম কি”, পাটনা নালন্দা কলেজের অধ্যাপক ক্ষেত্রলাল সাহা মহাশয় লিখিত “ভারতের ধর্ম্ম”, ঝাঁসির পণ্ডিত বিশ্বনাথ আত্মারাম বরবাক্কর লিখিত “হিন্দুধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব”, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এন, কে, দত্ত মহাশয়ের লিখিত “ব্রহ্মচর্য্য” শীর্ষক প্রবন্ধ সভায় পঠিত হয় বা পঠিত হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হয়।

স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, “* * আমরা নিজ নিজ ধর্ম্মে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী এবং ভক্তিপরায়ণ থাকিব, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমার ধর্ম্মছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মও ভাল। আমরা অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতিও যেন শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতে শিখি। আমরা যেন ইহাই মনে করি—সকল ধর্ম্মের মধ্যে একটী অখণ্ড ও নিগূঢ় যোগসূত্র বিদ্যমান। আমি আশা করি, এই বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে যোগদান করিয়া নরনারীবৃন্দ এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।”

সভাপতি কাকা কালেলকর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নামে সকলে এই ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে মিলিত হইয়াছেন —ইহা আনন্দের বিষয়। সকল ধর্ম্মেই যে সত্য নিহিত আছে এবং সকল ধর্ম্মই যে সমান—ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন। * *

সর্দ্দার জমায়েৎসিং সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। একটী সঙ্গীতের পর প্রাতঃকালীন অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

বুধবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ারস্থ ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ইনষ্টিটিউটে অত্যন্ত অধিক জনসমাগম হইয়াছিল। ইনষ্টিটিউটের বাহিরে রাস্তার উপর একটী লাউড স্পীকার বসান হইয়াছিল এবং অনেকে হলে প্রবেশ করিতে না পারায় সেখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ্জিও দেল বেচ্চিও এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিন প্রাইলুস্কির শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র পঠিত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণের অনুবাদ এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য। অতঃপর স্বামী পরমানন্দ, স্বামী নির্ব্বেদানন্দ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

৪ঠা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলাবৃন্দের উপস্থিতির মধ্যে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের চতুর্থদিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের বোষ্টন বেদান্ত সমিতির স্বামী পরমানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি ভল্যাডিস্কো রেকোয়াসার প্রেরিত একটী বাণী সম্মেলনে পঠিত হয়। বাণীতে তিনি বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের সভ্যবৃন্দকে তাঁহার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার ভাব অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শান্তির যেমন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এমন আর কোন সময়ে হয় নাই। এই সময়ে আপনাদের এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ মঙ্গলেরই শুভ সূচনা। * *

লেডী এজরা প্রেরিত অপর একটী বাণী পাঠের পর কলিকাতা রিপণ কলেজের অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য,কলিকাতার ডাঃ এ, সি, উকিল, জার্ম্মাণীর কাউণ্ট এইচ, কাইজেরলিং, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর, সি, থার্ণওয়াল্ড, চীনের এময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট লিম বুন কেঙ্গ, ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, কে, কোচানস্কী, বেলজিয়ামের অধ্যাপক জে, লেভেডার প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ সভায় পঠিত হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক প্রভুদত্ত শাস্ত্রী মহাশয় “শান্তি বলিতে বেদান্তে কি বুঝায়” সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। শিখ মিশনের শ্রীযুত গুরুমুখ সিং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

সভাপতি স্বামী পরমানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “* * যে মহাপুরুষের নামে আজ এই মহাসম্মেলন

অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূত-জীবন, প্রগাঢ় ভক্তি ও সাধু উদ্দেশ্যের দ্বারা তিনি এই আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। বড় বড় কথার আর আমাদের প্রয়োজন নাই। বহু বড় কথা, বহু মত আমরা শুনিয়াছি। যাহা বর্তমানে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন তাহা হইতেছে—আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা। * *"

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা টাউন হলে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের সভাপতিত্বে ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি, এল, ডুপ্রা এবং টুরিন (ইটালী) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিনেটর একিলি লোরিয়ার প্রেরিত শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র পাঠ করা হয়।

সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, "বহু বৎসর ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি এবং সেইজন্য ইংলণ্ড হইতে আমি এখানে আসিয়াছি। তিনি অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় শুধু যে অন্যের ধর্ম্মকে সহ্য করিতেন তাহা নহে—পরধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অটুট শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সেই ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন—ঠিক এই কারণেই তাঁহার প্রতি আমি প্রথম আকৃষ্ট হই। খৃষ্টান হইয়া আমি আজ এই কথা বলিতেছি যে, এই মহাপুরুষ যে দিক দিয়া যেভাবে আমাদের ধর্ম্মকে দেখিয়াছিলেন তাহাতে আমরা আমাদের ধর্ম্মকে আরও ভাল ভাবে বুঝিতে পারিয়াছি।

খৃষ্টান ধর্ম্মকে রামকৃষ্ণ কিভাবে দেখিতেন তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া স্যার ফ্রান্সিস বলেন, "একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে ম্যাডোনা এবং শিশুপুত্রের ছবি দেখান হয়। ছবিখানি দেখিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া তৎক্ষণাৎ সমাধিমগ্ন হন। তিনি সেই সময় কেবল যে জগৎপিতাকে উপলব্ধি করিলেন তাহা নহে, জগন্মাতারও বিকাশ দেখিতে পাইলেন। তারপর একবার তিনি কয়েকমাস এরূপ একান্ত চিত্তে খৃষ্টকে সাধনা করিয়াছিলেন যে নিজেকে খৃষ্টময় দেখিয়াছিলেন, খৃষ্টানেরা তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ হিন্দু এবং শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান। তিনি যে শুধু খৃষ্টানদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাহা নহে, মুসলমানেরা এবং বৌদ্ধেরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন—মূলতঃ সর্ব্বধর্ম্মই অভিন্ন; সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে মিলন মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানব ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে—যখন চতুর্দ্দিকে বিভেদ বিচ্ছেদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে—এই সময় সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মমতের নরনারী মিলিত হইয়া, রামকৃষ্ণ যে আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন, সেই আদর্শকে কিভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহার বিষয় চিন্তা করা এবং তদনুসারে কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজন।

অতঃপর স্যার ফ্রান্সিস বলেন, "এই ধরণের ধর্ম্ম সম্মেলনে যোগ দিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুফল এই যে, যাঁহারা ইহাতে যোগ দেন প্রত্যেকেই মনে করেন, তাঁহার নিজের ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং পরস্পরের এই মিলনের জন্য যে আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়—তাহাতে প্রত্যেকেই মনে করেন যে, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান। ইহাই হইতেছে পরস্পরের মিলনের ভিত্তি। নিজের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ এই আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং প্রচার করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা তাহার নিকট ঋণী।

স্যার ফ্রান্সিস অতঃপর বলেন, "বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিচিত্রতা আছে। মানবও বৈচিত্র্যহীন নহে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাহার নিজের কতকগুলি ধর্ম্ম, সমাজ, চরিত্রগত বৈচিত্র্য আছে, যাহা হয়ত কাহারও সহিত মিলে না। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনই ছিল রামকৃষ্ণের আদর্শ। সমস্ত বিচ্ছেদ, বিভেদ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে একটী মিলনের সুর।

পরিশেষে স্যার ফ্রান্সিস বলেন, "মধ্যে মধ্যে দেশে এই রকম মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তাঁহাদের উপদেশাবলী ও জীবনী জানিবার সুযোগ দেশবাসীর হয়। কিন্তু শুধু জানিলেই চলিবে না, তাঁহাদের ভাবধারা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। সর্ব্বদা অতীতের দিকে তাকাইলে চলিবে না, মনে রাখিতে হইবে যে, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি তাহাদেরই হাতে এবং যাহাতে ভবিষ্যৎ জগৎ বর্ত্তমানের চেয়ে আরও উন্নত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমি আশা করি, যখন এই হলে শতবর্ষ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত

হইবে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অনেক মহাপুরুষ উপস্থিত থাকিবেন।"

অতঃপর মণ্ডলেশ্বর স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি, মৌলবী জিলুর রহমন, স্বামী শর্ব্বানন্দ, স্যার জাহাঙ্গীর কয়াজী, শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, সর্দ্দার জমায়েৎ সিং, স্বামী বিজয়ানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, মিঃ বি, কে, বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

৫ই মার্চ্চ শুক্রবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় টাউন হলে বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনের পঞ্চমদিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ আলী সিরাজী (ইরাণ) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর দুইটী বাণী পঠিত হয়। একটী রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি, গিনীর নিকট হইতে। অধ্যাপক গিনী তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম বলিতে যদি আমরা এমন সমস্ত কারণসমূহকে বুঝি—যাহা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নাগালের বাহিরে থাকিয়া তাহার কার্য্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, মানবজাতিকে বিপু-চরিতার্থতার উপরে তুলিতে পারে, ধর্ম্ম ছাড়া এমন আর কিছুই নাই। * * সমন্বয়ের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য্যাবলী সমুদ্ভাসিত হইয়াছে।" অপরটী ইংলণ্ডের মিঃ সি, এম, রীচের বাণী। মিঃ রীচ বলিয়াছেন—"* * আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ও বিশেষ ভাবে ধ্যান ধারণা সম্পর্কে আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতে অনেক কিছু শিখিবার আছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। বিশ্বের অশান্তির মাত্রা হ্রাস করিয়া পৃথিবীর শান্তিরক্ষাকল্পে ও মানবজাতিকে ধর্ম্মজীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করিতে আপনাদের শক্তি আমাদের শক্তির সহিত যোগ করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।"

কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারী দেবপ্রিয় বলীসিংহ, বরিশালের শ্রীযুক্ত শ্রীধর মজুমদার, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ নারায়ণ মেনন, প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্গীয় অধ্যাপক এম, উইণ্টারনিজ, জার্ম্মাণ কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যারণ সি, ভন ব্রকডফ, মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর কে, এস, রামস্বামী শাস্ত্রী, মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আচারিয়ার, বৃন্দাবনের স্বামী ধনঞ্জয় দাস, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করা হয় বা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

সভাপতি অধ্যাপক মহম্মদ আলী সিরাজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "* * ধর্ম্মগ্রহণে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকা উচিত নয়। ইহাতে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকা উচিত।"

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। একটী সঙ্গীতের পর সভা শেষ হয়।

বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের অপরাহ্ণের অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া তিনি কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। ঐ দিনের অধিবেশনে ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত ৩রা মার্চ্চ পণ্ডিত মালব্য কাশী হইতে নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছিলেন :—

"* * পরমহংসদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। আপনাদের সহিত আমার অন্তরের যোগ রহিল।"

ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "* * তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সমগ্র জীবন ছিল এক মূর্ত্ত সাধনা। তিনি শাক্তদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাক্ত, বৈষ্ণবদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান। তিনি ছিলেন সমস্ত ধর্ম্মের পূজারী। তিনি রামানুজ, কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি আধুনিক ধর্ম্মপরিচালকদের মতবাদ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সাধনার দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মের উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যে কোন নামেই ডাকুক না কেন—ঈশ্বর এক। "যত মত তত পথ" এবং সমস্ত পথই সেই একেতেই বিলীন হইয়াছে। ইহাই হইতেছে তাঁহার সাধনার মর্ম্ম কথা।"

আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি, সোরোকিন এবং স্যারের মিঃ সি, এম, রীচের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র সভায় পঠিত হয়। অতঃপর স্বামী বিশ্বানন্দ, শ্রীযুক্তা সৌদামিনী মেটা, ডাঃ এইচ, গোয়েটজ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

৬ই মার্চ্চ শনিবার বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলনের ষষ্ঠ

অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্যার টি, বিজয় রাঘবাচারিয়া অসুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃকালীন অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিতে না পাবায় মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতিত্ব কবেন। প্রথমেই ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডাঃ ই, টি, উইলিয়মসেব বাণী পাঠ করা হয়।

ডাঃ উইলিয়ম্‌স লিখিয়াছেন, "আমি শ্রীবাম-কৃষ্ণের 'যত মত তত পথের' সমর্থক। আপনারা যে সর্ব্ব জাতি ও বর্ণের নবনারীকে এক সম্মেলনে সমবেত কবিতেছেন তাহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতা ও আন্ত-র্জ্জাতিক সদ্ভাব বস্তুতান্ত্রিক ভাবে অভিব্যক্ত হইবে।"

লণ্ডন হইতে আর্ল অব স্যাণ্ডুইচ লিখিয়াছেন, "আপনাদেব সকলেব সহিত অন্তরে অন্তরে আমি সম্মিলিত হইতেছি।"

সিডনি (অষ্ট্রেলিয়া) হইতে অধ্যাপক এস, আর্গান লিখিয়াছেন, "শ্রীবামকৃষ্ণেব মত ধর্ম্মগুরুব নিকট ভাবত তথা পৃথিবী নানাভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহাব স্মৃতিবক্ষার্থ শতবার্ষিক উৎসব সাফল্যলাভ করুক, ইহাই আমি কামনা কবি। * *"

মাদাম অধ্যাপক হেলেন দা উইলম্যান গ্রাবাউস্কা (পোল্যাণ্ড ক্রাকো বিশ্ববিদ্যালয়) আচার্য্য শঙ্কবা-চার্য্যের সহিত টমাস একুইনাসেব মতেব মিল প্রদর্শন করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ কবেন।

অধ্যাপক জিন হার্ব্বাট (প্যাবিস) "ঐক্যে অনৈক্য" প্রবন্ধে বলেন, "বহুশতাব্দী ধবিয়া ধর্ম্ম-গুরুগণ বিশ্ব-বৈচিত্র্যেব মধ্যে ঐক্য সন্ধান কবিতে-ছেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ প্রভাবে ধর্ম্ম, জাতীয়তা, বাজনীতি প্রভৃতি বহুবিধ আদর্শে নবনারী অনুপ্রাণিত হইয়াছে। * *"

বোম বিশ্ববিদ্যালযে অধ্যাপক মিসেস গিসেলা মুসিয়া লিখিত 'সুফি আন্দোলন', পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ লিখিত 'ব্রহ্মানুভূতি' এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক বি, এ, কিথ লিখিত 'নীতিধর্ম্ম ও বাজনৈতিক শক্তি,' এবং জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি, এল, ডুপ্রায়েব একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়।

ইহার পর সভাপতি পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ইংরেজী ভাষায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়। প্রাচীনকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানেব ধর্ম্ম-নেতৃগণ পরস্পবের মত বিনিময় করিতে সমর্থ হন নাই। আজ অবস্থা পরিবর্ত্তিত। আজ সকল জাতির মধ্যে মত বিনিময় করা সম্ভবপর হইয়াছে। * *"

আচার্য্য কাকা কালেলকাব হিন্দী ভাষায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "গত ৫ দিন যাবৎ সম্মিলনে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতে আমা-দের এই ধাবণা হয় যে, পৃথিবীব যত প্রচলিত ধর্ম্ম প্রত্যেকটী সত্য এবং প্রত্যেকটী প্রয়োজনীয়। * *"

আবও দুই একটী প্রবন্ধ পাঠের পব প্রাতঃ-কালীন অধিবেশন শেষ হয়।

সন্ধ্যা প্রায় ৬৷টাব সময় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুব সভানেত্রীত্বে বিশ্বধর্ম্ম-সম্মিলনেব আপবাহ্ণিক অধিবেশন হয়।

অধ্যাপক বিনয়কুমাব সরকাব মহাশয় সম্মি-লনেব প্রয়োজনীয়তা ও সাফল্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা কবিবাব পব শ্রীমতী সবলা দেবী চৌধুবাণী মহাশয়া একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ কবেন। দক্ষিণ আমেবিকাষ বামকৃষ্ণ মিশনেব ভাবপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী স্বামী বিজয়ানন্দ বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা কবেন।

অতঃপর ফবাসী অধ্যাপক হার্ব্বাট 'য়ুরোপে বামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ কবেন। বায় বাহাদুব খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সম্মিলনের সাফল্য কামনা কবিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা কবেন এবং সাবনাথ মহাবোধি সোসাইটীব ভিক্ষু আনন্দ কৌশল্যায়ন হিন্দী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীযুত বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'যত মত তত পথ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ কবেন।

সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা কবিতে উঠিলে চাবিদিক হইতে হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়।

শ্রীমতী নাইডু বলেন—"* * মানবতা চাহে ভগবান। ভগবান আবির্ভূত হন মানবের নিকট। মানুষ তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য ভগবানকে আহ্বান করিতেছে। আমাদের সকল কর্ত্তব্য—সকল সত্য উৎসারিত হইতেছে ভগবান হইতে। * *"

৭ই মার্চ্চ রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় টাউন হলে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের সপ্তম দিবসের অধি-

বেশন আরম্ভ হয়। ম্যাডাম গুবালদেস সভানেত্রীব আসন গ্রহণ কবেন। পোল্যাণ্ডেব ক্রাকপ্প বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টার ডবলিউ, জাফের ও ইউসকনসিন্নেব (আমেরিকা) অধ্যাপক ই, এ, রস কর্তৃক প্রেরিত দুইটী শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী পাঠ করা হয়। অতঃপর ফ্রান্সেব অধ্যাপক পি, ম্যাসন উসেল, কুমিল্লা ভিক্টোবিয়া কলেজেব অধ্যাপক গিরীন্দ্রনাবায়ণ মল্লিক, লাহোবেব শ্রীযুক্ত বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী প্রভৃতি লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ কবা হয়।

অতঃপব সভানেত্রী বক্তৃতা করেন। একটী সঙ্গীতেব পব প্রাতঃকালীন অধিবেশন শেষ হয়।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকাব সময় মণ্ডলেশ্বর স্বামী ভাগবতানন্দ গিবি মহারাজেব সভানেতৃত্বে সান্ধ্য-অধিবেশন আবম্ভ হয়। বার্লিনেব অধ্যাপক আব, সি, থার্ণল্ড ও ইবাণেব মহম্মদ হাসা কাসানী কর্তৃক প্রেবিত দুইটী বাণী সভায় পঠিত হয়।

অতঃপব সিষ্টাব সবস্বতী, স্বামী শর্ব্বানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, মিঃ জে, এ, জোসেফ (বোম্বাই), মিসেস সোফিয়া ওয়াদিয়া প্রভৃতি কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। তৎপব সভাপতি বক্তৃতা কবেন। একটী সঙ্গীতেব পব সভা ভঙ্গ হয়। সভাব পব কলিকাতাব শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি মহাশয় ছায়াচিত্রে বক্তৃতা দেন।

৮ই মার্চ্চ সোমবাব প্রাতে ৮ ঘটিকাব সময় টাউন হলে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনেব শেষ দিবসেব অধিবেশন আবম্ভ হয। প্রেগেব ডাঃ এফ, ভি, টাউজেক সভাপতিব আসন গ্রহণ কবেন।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পব জার্ম্মাণ একাডেমীব ডাঃ এফ, থিব ফেল্ডাব ও বার্ম্মিংহামেব হার্ব্বার্ট জি, উড প্রেবিত দুইটী শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী পঠিত হয়। অতঃপব ডাঃ জি, এইচ, মীজ (হল্যাণ্ড), ঢাকাব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমাব বায়, কলিকাতার এডভোকেট শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র শঙ্কব দাসগুপ্ত, প্রেসিডেন্ট এফ, জান (জার্ম্মাণী), মহীশূবের মিঃ ভি, সুব্রহ্মণ্য আযাব, কলিকাতাব প্রবীণ ও বহুদর্শী চিকিৎসক মেজব প্রভাতকুমাব বর্দ্ধন, কলিকাতাব জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী সভাব ছগমল ছপবাও, নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক মিঃ ই, হবউইজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুশীল কুমার মৈত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য, ডাঃ ভগবান দাস প্রভৃতি লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ পঠিত হয়।

অতঃপর সভাপতি ডাঃ এ, ভি, টাউজেক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "* * বিভিন্ন জাতির ব্যক্তি-বর্গেব মধ্যে যদি এইরূপ ভাব বিনিময় ঘটে তবে জগতেব শান্তিলাভের পথ অনেকটা সুগম হইবে। এই ধর্ম্ম-সম্মেলন হইতে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, একজন মানুষ অন্য মানুষ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে ; প্রতি মানুষেরই স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত কবিবাব বা গ্রহণ কবিবার অধিকার আছে। এই স্বাধীনতাই মানুষের পক্ষে চবম সত্য। প্রতি মানুষেবই স্বাধীনতা থাকা উচিত। সকলকে নিজ নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাসী থাকিয়া অপর ধর্ম্মকে সহ্য ক বতে হইবে। * *"

অতঃপব স্বামী পরমানন্দ ও স্যাব ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দকে তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

সোমবাব সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় টাউন হলে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনেব শেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়। বাবাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যক্ষ এ, বি, ধ্রুব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ভিয়েনাব অধ্যাপক অথমাব স্প্যানস, পারস্যের সেথ আব নাসব গিলা ও নান্‌কিনের সিনো, ইণ্ডিয়ান কালচাবাল সোসাইটীর অধ্যাপক তান ইয়ান সান প্রেবিত তিনটী শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী সভায় পঠিত হয়।

সভাপতি অধ্যক্ষ ধ্রুব, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, অধ্যাপক বিনয়কুমাব সবকাব, রোস্তমজী, মাদ্রাজের রাও-বাহাদুব রামানুজাচাবি, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বর্দ্ধমানের মহাবাজাধিরাজ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, আজ ইউবোপে যে অবস্থা তাহাতে এইরূপ ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন বিশেষ কাজে লাগিবে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মনে রাখিতে অনুরোধ করিয়া উপস্থিত সকলকে তাঁহাব আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এই সম্মেলন দেখিয়া মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে এবং তাঁহার উপদেশাবলী সকলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে স্বামী

বিবেকানন্দের উপদেশাবলী জগতের সকল নর-নারীর মনে কার্য্য করিতে থাকিবে।

অতঃপর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :—

"* * শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাজা রামমোহনের ন্যায় পাণ্ডিত্যের সাহায্যে বিভিন্ন ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চাহেন নাই, পরন্তু ভক্তের হৃদয় লইয়া বিভিন্ন ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ধর্ম্মমত অনুযায়ী সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কঠোর তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক ধর্ম্মমতানুযায়ী সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সমস্ত ধর্ম্মমতানুযায়ী সাধনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, 'প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্য'। * *"

স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড সমস্ত বৈদেশিক প্রতিনিধিবৃন্দের পক্ষ হইতে উপস্থিত সকলকে এবং ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসবের উদ্যোক্তাগণকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলন যাঁহার নামে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব আমার মত ভিন্নধর্ম্মী একজন বৃদ্ধকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। এই স্থানে আমি যে আদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, সেই স্মৃতি চিরকাল সযত্নে ধারণ করিয়া রাখিব। অতঃপর তিনি মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে বৈদেশিক প্রতিনিধিগণের এই সম্মেলন সম্পর্কে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনাপূর্ণ একখানি পুস্তক উপহার দেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বসু, মিঃ সি, এল, চেন (চীন) শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র, স্বামী শর্ব্বানন্দ প্রভৃতি প্রতিনিধিগণকে ও উপস্থিত সকলকে বিদায় অভিনন্দন জানান। একটী সঙ্গীতের পর অধিবেশন শেষ হয়।

বেলুড় মঠে প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, গত ৮ই মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদিগকে প্রীতি-সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। মঠবাড়ীর সম্মুখে গঙ্গাতীরে একটী বিরাট চন্দ্রাতপতলে সভার স্থান করা হইয়াছিল। চাঁদপাল ঘাট হইতে দুইখানি ষ্টীমার প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া বেলা ২টার পর যাত্রা করে এবং দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ঘুরিয়া অপরাহ্ণ ৪॥টার সময় বেলুড় মঠে পৌছে। কলিকাতা হইতে অনেকে মোটরযোগেও মঠে আগমন করেন।

চা-পানের পর স্বামী পরমানন্দ সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে রামকৃষ্ণ-মিশনের পক্ষ হইতে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অভিনন্দনের উত্তরে প্রতিনিধিবর্গের পক্ষ হইতে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসিগণকে ধন্যবাদ দেন এবং এই পুণ্যস্থান দর্শনের যে সুযোগ তাঁহারা দিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় (হাওড়া) —বেলুড় মঠে অষ্টাহকালব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক পরিসমাপ্তি উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, গুজরাট, পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। গত বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি হইতে তাঁহার শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। এই এক বৎসর ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার অনেক স্থানে—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ইহা বিশেষ ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে গত ১৪ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজা, হোম, কালীকীর্ত্তন ও ভজন সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এবং এই দিন সাত হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে স্বামী পরমানন্দের সভাপতিত্বে মঠ-প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে স্বামী শর্ব্বানন্দ, স্বামী বিজয়ানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৫ই মার্চ্চ বৈকালে স্বামী ভূতেশানন্দ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠ করেন এবং "হাওড়া সমাজ" কর্ত্তৃক "নদের নিমাই" অভিনীত হয়। ১৬ মার্চ্চ অপরাহ্নে স্বামী মাধবানন্দ "উপনিষদের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং সন্ধ্যায় "ভাণ্ডারী অপেরা পার্টি" কর্ত্তৃক "শাপ-মোচন" যাত্রাভিনয় হয়। ১৭ই মার্চ্চ বৈকালে "শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন" এবং রাত্রে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের ছাত্রগণ নানাবিধ শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ১৮ই মার্চ্চ অপরাহ্নে স্বামী শর্ব্বানন্দ "বর্ত্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ" নামক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং রাত্রে সিকদার পাড়ার "বান্ধব সমাজ" কর্ত্তৃক "মীরাবাঈ" অভিনীত হয়। ১৯শে মার্চ্চ বৈকালে স্বামী তপানন্দ "শ্রীমদ্ভাগবৎ" পাঠ করেন এবং রাত্রে "ভবানীপুর মিতালী-সঙ্ঘ" কর্ত্তৃক "বুদ্ধদেব" গীতাভিনয় হয়। ২০শে মার্চ্চ অপরাহ্নে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২১শে মার্চ্চ রবিবার শতবার্ষিকী সমাপ্তি উৎসব অতি বিরাটভাবে সম্পাদিত হয়। এই দিন প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভোর হইতেই যাত্রী সমাগম আরম্ভ হয়। বেলা ৯।১০ ঘটিকার সময় হইতেই সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্ত নরনারীবৃন্দের উপস্থিতিতে বেলুড় মঠটী জমজম হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির পত্রপুষ্পে সুশোভিত করিয়া সজ্জিত করা হয়। বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে একটী সুবৃহৎ প্যাণ্ডেল নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে একপার্শ্বে কৃত্রিম পাহাড় ও ঝরণা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সম্মুখে ধূপ-দীপাদি রাখা হইয়াছিল। প্যাণ্ডেলটী পত্রপুষ্পে বিশেষরূপে সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সারাদিন ধরিয়া ঠাকুরের পূজা, হোম ও আরাত্রিক হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বহু যাত্রীর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ বিতরিত হয়। প্রায় ৩০ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সমস্ত দিন ধরিয়া আন্দুলের কালীকীর্ত্তন, সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্ত্তন, আহিরীটোলা কনসার্টপার্টি প্রভৃতি প্রায় ২০টী দল বিভিন্ন স্থানে কীর্ত্তন ও ভজন সঙ্গীত করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে একটী বিরাট মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। মেলায় বহু রকমের দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রদর্শনীটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। উহাতে স্বদেশী কাপড়, চাদর, কার্পেট ইত্যাদি নানাপ্রকার সূতীর কাজ, কাঠের কাজ, বিভিন্ন প্রকারের খেলনা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যাদি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সেই

সমস্ত পুস্তকাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় বিভিন্ন মন্দিরের এবং অন্যান্য স্থানে নানা বর্ণের আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। রেডিওর ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। মনো রেডিও এণ্ড কোং এই ব্যবস্থা করেন।

মিঃ কে, বি, দত্ত ও অন্য একটী দল যাত্রীদের মধ্যে সরবৎ ও চা বিতরণ করেন। যাত্রীরা জুতা ছাতা, সাইকেল প্রভৃতি রাখিয়া যাহাতে নিশ্চিন্তে উৎসবে যোগদান করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। মঠের সাধু ও স্বেচ্ছা-সেবকগণ, যাত্রিদের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহার জন্য বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া সুব্যবস্থা করিতে যত্নবান ছিলেন। সেণ্টজন এম্বুলেন্সের কর্ম্মিবৃন্দও উৎসবস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ভিড়ের চাপে ও গরমে প্রায় ৫০।৬০ জন বালকবালিকা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। স্বেচ্ছা-সেবকগণ ও সেণ্টজন এম্বুলেন্সের কর্ম্মীদের শুশ্রূষায় তাঁহারা শীঘ্রই সুস্থ হন। ভিড়ের মধ্যে যাহারা হারাইয়া যায়, তাহাদিগকে একস্থানে জড় করিয়া তাহাদিগের অভিভাবকগণের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়। রয়াল ফায়ার ওয়ার্কস, ইণ্ডিয়ান ফায়ার ওয়ার্কস ও ওরিয়েণ্ট্যাল ফায়ার ওয়ার্কস মঠে বিচিত্রবর্ণের ও বিভিন্নপ্রকারের আতস বাজী দেখান। দুইটী বাজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর মূর্ত্তি আকাশপথে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড, হল্যাণ্ডের ডাঃ মেস, কতিপয় জাপানী প্রচারক এবং ভারতের ও ভারতের বাহিরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এই উৎসব চলে।

বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব—গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ভোলা (বাখরগঞ্জ); ১০ই ফেব্রুয়ারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সঙ্ঘ ছাত্রনিবাস, খড়দহ; ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম, রাজকোট (গুজরাট); ১৭ই ফেব্রুয়ারী, পূর্ণিয়া, শ্রীগদাধর আশ্রম ও বহরকুলি (বর্দ্ধমান); ২১শে ফেব্রুয়ারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম, বাগেরহাট এবং জমসেদপুর; ২৪শে ফেব্রুয়ারী, নবদ্বীপ; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, কানপুর; ২৬শে ফেব্রুয়ারী, খুলনা; ২রা মার্চ্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর); ৫ই মার্চ্চ, ছুলালী (শ্রীহট্ট); ৬ই মার্চ্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম, বালিচক (মেদিনীপুর); ৭ই মার্চ্চ, দৌলতপুর, ১২ই মার্চ্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ-নিত্যানন্দ আশ্রম, নরোত্তমপুর (বরিশাল); ১৪ই মার্চ্চ, গোরক্ষপুর; ২১শে মার্চ্চ, সরিষাবাড়ী (ময়মনসিংহ); ২৩শে মার্চ্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম, হাসাড়া (বিক্রমপুর); ২৭শে মার্চ্চ, বেঁউচা (মেদিনীপুর); ২৮শে মার্চ্চ, বিবেকানন্দ সমিতি, সাচালীয়া (পাবনা), ঝিখিরা (হাওড়া) ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পল্লীমঙ্গল সমিতি, তিরোল (হুগলী) নামক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক উৎসব বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা এবং সভা উৎসবানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ
অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি

স্বামী অখণ্ডানন্দ

ঠাকুব বরানগরের বেণীপালেব ভাড়াটে দ্বিতীয় শ্রেণীব গাড়ী ছাড়া কখনও কোথাও যেতেন না। তার ঘোড়া ভাল ছিল—দৃঢ় ও বলিষ্ঠ—এই কারণ। ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলেই ঠাকুর অস্থিব হয়ে উঠতেন। বলতেন, 'আমাকে মাবছে'। তাই যখন বেণীপাল শুনতেন যে, পরমহংসদেবকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন এমন ভাল ঘোড়া দিতেন, যাকে মারতে হত না—একটু পা নাড়লেই ছুটে চলত। সেদিন বেণীপালের গাড়ী দক্ষিণেশ্বরে এল, ঠাকুর উঠলেন, আমি ও লাটু তাঁব সঙ্গে উঠলাম। বাগবাজার ষ্ট্রীটে গিয়ে গাড়ী দাঁড় করিয়ে আমাকে বললেন, 'হাঁারে নারাণকে একবার ডেকে আনতে পারিস?' নারাণ বলে একটী ছেলে সে সময় ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করত। বাগবাজাব ষ্ট্রীটে নেবে নারাণকে ডেকে আনলাম। ঠাকুর তার সঙ্গে গাড়ীতে কথাবার্ত্তা কইলেন। দক্ষিণেশ্বরে অনেকদিন যায় না কেন—জিজ্ঞাসা করলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে যেতে বললেন। তারপর শ্যামপুকুরে নেপালেব রাজদূত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়—যাঁকে ঠাকুর কাপ্তেন বলতেন—তাঁর বাড়ীতে গেলেন। দুয়ারে গাড়ী থামলে, তিনজন উপরে উঠে গেলাম। তাঁর বাড়ীর সকলে এসে প্রণাম কবলেন। সেখানে একটু বরফ-জল খেলেন। ঠাকুর বরফ জল খেতে বড় ভালবাসতেন। তারপর বলবাম বাবুর বাড়ীতে এলেন। সেখান হতে দক্ষিণেশ্বরে ফিবলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বব ছাড়া রাত্রে কোথাও থাকতেন না। কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়ীতে দু'এক রাত্তির হয়ত ছিলেন। স্বামীজিকে বলতে শুনেছি, ঠাকুব বলরাম বাবুর বাড়ী ছাড়া কোথাও অন্নগ্রহণ করতেন না; বলতেন, 'ওর অন্ন শুদ্ধ'। স্বামীজি তাই বলতেন, দেখেছিস্, বড় বড় মহাপুরুষ কলিকাতায় কখনও রাত্রিবাস করতে পারেন না।'.

সেই সময় প্রায় সকল সম্প্রদায়ভুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যে অনেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়ে থাকতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গলাভ ও উপদেশ শ্রবণে ধন্য হতেন। একবার ঐরূপ একজন মহাপুরুষ (জটাধারী) আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত নাগা দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। আমি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পর ঠাকুর আমাকে বললেন, 'ঐ কুঠি বাড়ীতে একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি কাশ্মীর থেকে এসেছেন।' আমি তাঁর কাছে গেলাম, প্রণাম করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। দীর্ঘজটা শ্মশ্রুবিশিষ্ট মহাপুরুষ অতিশয় গম্ভীর, কথাবার্ত্তা তেমন কিছু বলতেন না। আমার জিজ্ঞাসায় দু'একটি কথার উত্তর মাত্র দিলেন। ঐরূপ কোন সাধুমহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরে এলেই ঠাকুর আমাদিগকে দর্শন করে আসতে বলতেন।

আর একদিন শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণেই ঠাকুরের কাছে গিয়েছি, বেলা প্রায় দুটার সময় ঠাকুর আমাকে বললেন, 'আমার জন্য বরফ নিয়ে আয়'। আমি কয়েকটা পয়সা নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরের বরফ আনবার জন্য আলমবাজারের দিকে যাচ্ছি। তখন বরফ দু এক পয়সা সের। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবছি, 'বরফ না নিয়ে আর ফিরব না'। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, দক্ষিণেশ্বর থেকে বেরিয়ে প্রায় পাঁচ মিনিটের রাস্তা যেতে না যেতেই দেখি, একটা 'পানিপিনেকা বরফওয়ালা' দক্ষিণেশ্বরের দিকেই আসছে। তাই দেখে আমার আর আহ্লাদের সীমা নাই! তারপর আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেমন তাঁর ঘরে গেছি, অমনি তিনি বললেন, 'হাঁরে পেলি?' আমি বরফ দেখাতেই কি খুসী! আমি বললাম, 'এই দেখুন, ভেবেছিলাম, যেখান থেকে পারি আনব, তা যেতে না যেতেই বরফ পেলাম—যেন আপনার জন্যই এসেছিল'। তখন বরফ দিয়ে জল খেলেন। রাত্রিতে সেখানে থাকলাম। সকালে একটু বেলা হলে দেখি, কুঠিবাড়ীর দিকটা সবগরম। তারপর শুনলাম, মথুরবাবুর ছেলে ত্রৈলোক্যবাবু লোকজন নিয়ে এসেছেন। ত্রৈলোক্যবাবুকে দেখলাম, পিঠে লোম রয়েছে, কালপেড়ে ধুতিপরা—জমিদার যেমন হয়, রংটি যেন দুধে আলতা। কিন্তু যে রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু ঠাকুরের এত ভক্ত ছিলেন —তাঁদের বংশের হয়ে কি না ঠাকুরকে একবার প্রণামও করে না—এই ভেবে মনে মনে বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভ হল। ত্রৈলোক্যবাবু তাঁর ইয়ার-মোসায়েবদের নিয়ে শনিবার শনিবার কুঠি-বাড়ীতে আসতেন—জমিদারবাবুরা যেমন বেড়াতে আসেন।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকতে কর্ণেল অলকট কলকাতায় 'থিওসফিক্যাল্ সোসাইটি' (তত্ত্ববিদ্যা-সমিতি) স্থাপন করে প্রত্যেক সদস্যের নিকট হতে দশ টাকা লয়ে বহুতর শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের তাঁর সমিতির সদস্যভুক্ত করেন। একদিন ঠাকুরের ঘরে কয়েকজন ভদ্রলোক বসেছিলেন—সম্ভবতঃ ঐ দলভুক্ত কয়েকজন তাঁদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা ঠাকুরকে বললেন যে, কর্ণেল অলকট নামক একজন গণ্যমান্য আমেরিকাবাসী যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করে হিন্দু হয়েছেন। ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে আছি, ভাবছি, হয়ত খুসী হবেন। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তার নিজের ধর্ম্ম সে ছাড়লে কেন?' আমি অবাক্। সেই সময়ে বাগবাজার রাজবল্লভ পাড়ার বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—দুই সহোদর—তাঁদের গাড়ীতে নবীন ময়রার এক মালসা রসগোল্লা নিয়ে রোজ বৈকালে ঠাকুরের কাছে যেতেন। ময়দা, সুরকী ও তেলের কল—দুই ভায়েরই ছিল। মহেন্দ্র বাবু গোঁড়া 'থিয়োস-ফিষ্ট'। স্বামীজি একবার অসুখের সময় বলরাম বাবুদের বাড়ীতে ছিলেন। তখন মহেন্দ্রবাবু রোজ তাঁর কাছে এসে প্রায় ৪ ঘণ্টা কাটিয়ে যেতেন। তাঁর সঙ্গগুণে মহেন্দ্রবাবুর এত পরিবর্ত্তন হয় যে, তিনি

একজন ভক্ত হয়ে ওঠেন ও মঠের যত আটা (ও কাপড় ?) লাগত, সব তিনি যোগাতেন।

তাঁরা (দুভাই) 'থিয়োসফিষ্ট' ছিলেন। কর্ণেল অলকট কলিকাতায় এলে পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগান-বাড়ীর তেতলায় থাকতেন। আমাকেও একদিন মহেন্দ্রবাবুরা সেইখানেই নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক যুবা প্রৌঢ় ভদ্রলোকে তেতালাটা পরিপূর্ণ। কর্ণেল অলকটের চেহারাটি ভারি সুন্দর—বড় বড় শুভ্র শ্মশ্রু -ঠিক ঋষির মত। গলায় একবোঝা—অনেক মাদুলি—নানানরকম আকারের। মহাত্মা মানতেন কি না তাই, এ মহাত্মার চুল—ও মহাত্মার চুল সব মাদুলি করে গলায় রেখেছেন। তাঁর একটি পাচক—সে মাদ্রাজী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি বলে। ঐখানে বসে থাকতে থাকতে দেখি, 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক মশায় (বাবু শিশিরকুমার ঘোষ) এলেন, সাদা জামা—তার উপর তুলসীর মালা, খুব লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি আসবামাত্র কর্ণেল অলকট তাঁকে নিয়ে তাঁর কামরায় গেলেন। খানিকক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর বেরিয়ে এলেন। সকলে যেখানে বসে, শিশিরবাবু সেখানে বসলেন না। তারপরে আমরা কথায় কথায় জানলাম যে, অলকট্ সাহেব খাঁটি নিরামিষাশী, কিন্তু ঘরে দেখি—ডিম সাজান রয়েছে। পাচককে জিজ্ঞাসা করায় বললে, 'ওয়াল সাহেব বলেন যে, ওটা নিরামিষের মধ্যে গণ্য'।

সেই সময় কিছুদিন পরে মহেন্দ্রবাবুরা ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (তিনিও একজন থিয়োসফিষ্ট ছিলেন) ঠাকুরের কাছে আসতেন। এই দেবেন্দ্র বাবুদেরই বাড়ী বলরামবাবুরা ক্রয় করেন। তখনকার দিনে যে 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'আদর্শ সতী' প্রভৃতি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হতো, তার লেখক ছিলেন এই দেবেন বাবু। থিয়োসফিষ্টদের ওপর তিনি বিরক্ত হন, কারণ, অলকট সাহেব বলতেন যে, চুল রাখা, নখ রাখা, নিরামিষ খাওয়া ইত্যাদি পালন করলে—মহাত্মাদের সূক্ষ্ম শরীর দর্শন হয়। কিন্তু অনেক দিন ঐসব করেও যখন দেবেনবাবুর কোন দর্শনাদি হল না, তখন সাহেবকে বলতেই তিনি বলতেন, 'আরও কিছুদিন পরে হবে।' ভাবলেন, তিনি আমেরিকান—কি এমন পুণ্যবান ; শেষে এসবের উপর তাঁর আস্থা রইল না। তখন হতে তিনি ঠাকুরের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেন।

জমিদার দুর্গাশঙ্কর বাবুর কনিষ্ঠ ভাই গদাশঙ্কর বাবুর সঙ্গে দেবেনবাবুর কন্যা তারার বে হয়। সেই সময় নৌকায় মহেন্দ্র বাবু, প্রিয় বাবু, দুর্গাশঙ্কর বাবু গদাশঙ্কর বাবু ও আমি যাচ্ছি দক্ষিণেশ্বরে। খুব হাওয়া ও ঢেউ উঠেছে। আমাদের পানসী মাঝ-দরিয়ায়। মাঝি কসে হাল ধরেছে। মহেন্দ্র বাবু বেশ নাদুস নুদুস, তবে একটু বেঁটে, কিন্তু অতি সুপুরুষ ছিলেন। নৌকার এই বিপদে মহেন্দ্র বাবুর ফুর্ত্তি লেগে গেল। তিনি ভিতরে বসে নৌকা দোলাতে লাগলেন—আর হাসি। আমি তখন ছেলে মানুষ। একটু ভয়ও হল। এইরূপে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নৌকা ভিড়ল। তখন খাওয়া দাওয়া সব হয়ে গেছে। ঠাকুর উঠেছেন—উঠে তাঁর নীচের তক্তাপোষখানায় বসেছেন। এমন সময় আমরা সব তাঁর ঘরে গেলাম। মহেন্দ্র বাবু ও প্রিয়বাবু গিয়ে ঠাকুরকে বলছেন, 'মশাই কাশীর ভক্ত সব এনেছি।' ঠাকুর বলছেন, 'তাইত, ওহে এসব যে শিবোঽহং এর দল এনেছ।' খুব আহ্লাদ করে তাদের বসালেন। প্রথমেই গয়ার জমিদার দুর্গাশঙ্কর বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাই, যিনি পূর্ণব্রহ্ম—ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কোথাও অভাব নাই, তিনি সকল স্থানে সর্ব্বদা রয়েছেন, তাঁর আবার অবতার হয় কি করে ?' ঠাকুর বলছেন, 'দেখ, পূর্ণব্রহ্ম যিনি তিনি সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজমান

আছেন, তাঁর শক্তির অবতার। কোথাও দশকলা কোথাও বারকলা এবং কোথাও ষোলকলা। ষোলকলা শক্তির অবতার যাঁতে হয় তাঁকেই পূর্ণব্রহ্ম বলে লোকে পূজা করে—যেমন শ্রীকৃষ্ণ'। রামকে বললেন, বারকলা। দেবেন বাবু (বলরাম বাবুর বাড়ী যাঁদের ছিল) বললেন, 'আচ্ছা মশাই—এ শরীরটাই ত যত অনিষ্টের মূল, তখন এটাকে নষ্ট করলেই ত সব চুকে যায়?' ঠাকুর বললেন, 'দেখ কাঁচা হাঁড়ি ভাঙলে আবার গড়ন হয়, কিন্তু পাকা হাঁড়ি ভাঙলে আর গড়ন হয় না তেমনি জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে শরীর নষ্ট করলে আবার শরীর হবে, আবার সেই কষ্ট নিয়ে আসতে হবে।' দেবেন বাবু বলছেন, 'তবে শরীরটার এত যত্ন কেন?' ঠাকুর বলেছেন, 'দেখ, যারা ঢালাইয়ের কাজ করে, তারা যতদিন না মূর্ত্তিটি হয়, ততদিন ছাঁচটি যত্ন করে রাখে। তারপর মূর্ত্তিটি তৈয়ার হয়ে গেলে ছাঁচ থাক আর যাক, তেমনি এই শরীর দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে, আত্মসাক্ষাৎকার করতে হবে। তারপর শরীর থাক, আর যাক। যতদিন তা না হয়, ততদিন এই শরীরটার একটু যত্ন করতে হয়।' দেবেন বাবু চুপ করে রইলেন। তারপর ঠাকুর তাঁর প্রিয় (শ্যামাবিষয়ক) কয়েকটি গান করে শুনালেন। কমলাকান্তের গান। গয়ার জমিদার দুর্গাশঙ্কর বাবু কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হলেন, বললেন, 'এদের ঘিয়ের কড়াতে জাল পড়েছে—তাই এই কথাবার্ত্তা—এরপর চুপ হয়ে যাবে।'

তার অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর উঠে পড়লেন। ঠাকুরঘর ইত্যাদি সকলে দেখলেন। সকলে এদিক ওদিক গেলেন। গদাশঙ্কর বাবু একটু ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন লোক—কেশব বাবুর ভক্ত। ঠাকুর তাঁকে তাঁর পূর্ব্বদিকের বারান্দায় দু তিন দরজার পরে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তুমি সন্ধ্যা আহ্নিক কর?' তিনি হাত নেড়ে বললেন, 'আমার ওসব অস্ত্রায় ফট্‌ ফুট্‌—ওসব ভাল লাগে না।' ঠাকুর বললেন, 'দেখ জোর করে কিছুই ছাড়তে নাই। যেমন কুমড়া লাউ ইত্যাদির ফুল ছিঁড়ে দিলে ফল পচে যায়, কিন্তু ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে পড়ে।' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সাকার ভালবাস না নিরাকার'? তিনি বললেন 'নিরাকার।' ঠাকুর বললেন, 'সন্ধ্যা করতে করতে সন্ধ্যা গিয়ে গায়ত্রীতে লয় পায়, তেমনি গায়ত্রী জপ করতে করতে গায়ত্রী ওঁকারে লয় পায়। ওঁকার জপ করতে করতে প্রণব তুরীয় অবস্থায় লয় পায়, তখন সন্ধ্যা আপনি ছেড়ে যায়। তুমি একেবারে নিরাকার ধরবে কি করে? তীরন্দাজ যখন শেখে, তখন প্রথম কলাগাছ বেঁধে, তারপর সরুগাছ, তারপর ফল, তারপর পাতা—তারপরে উড়ো কাক পাখী। প্রথমে সাকার, তারপর নিরাকার।'

তারপর ঠাকুর বলেছেন, 'দেখ অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ শুনতে শুনতে আমার মন একেবারে অযোধ্যায় সরযূর চড়ায় গিয়ে উপস্থিত। সেখানে দেখি, জাঙ্গিয়া পরা নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম—হাতে ধনু ও পিঠে তূণীর —সেইরূপ সীতা ও লক্ষ্মণ—তাই দেখে দেখে কি যে আনন্দ হল—আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছিলুম—সেই রূপ উপভোগ করেছিলুম।'

এই রকম পবিত্র কথাবার্ত্তায় সেদিন যে কি সুখে গেল, তা যতই ভাবি, ততই মিষ্টি লাগে। তারপর আমরা এক নৌকাতেই সকলে ফিরে এলাম। দুর্গাশঙ্কর বাবুর সঙ্গে আমার এই প্রথম আলাপ। (ক্রমশঃ)

বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন

সম্পাদক

"জগতের কোন দেশে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের কথা উত্থাপন ও আন্দোলন হইবার অনেক পূর্ব্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন একজন ছিলেন, যাঁহার সমস্ত জীবনটী ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের স্বরূপ ছিল।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

গত ১লা মার্চ্চ হইতে ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা টাউনহলে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত সিকাগো নগরে অনুষ্ঠিত সর্ব্বধর্ম্ম-মহাসভার মতই দেশ-বিদেশের প্রখ্যাতনামা মনীষিবৃন্দের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন জগতের ধর্ম্মেতিহাসে একটী স্মরণীয় অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। সকল দেশের ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্, শিক্ষাবিদ্ এবং নীতিবিদ্-গণের সমবায়ে এরূপ বৃহদাকারের ধর্ম্ম-সভা ভারতবর্ষে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এসিয়ার বিভিন্ন দেশের বিবিধ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দুই শতেরও অধিক প্রতিনিধি এই ধর্ম্ম-সম্মেলনের অধিবেশনসমূহে যোগদান করিয়া বক্তৃতা দান বা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অষ্টাহকালস্থায়ী এই বিদ্বজ্জন সংসদ পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের মধ্যে সদ্ভাববৃদ্ধি ও আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য স্থাপনের দিক দিয়া অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসভা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের বিখ্যাত প্রতিনিধিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত সমন্বয়ের দৃষ্টি অবলম্বনে যে বিশ্বমৈত্রীর বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, উহার প্রভাব জগন্ময় মানুষের সম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-বিরোধের বিষাক্ত বাতাসকে যে অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সকল ধর্ম্মের সমান মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে এই সভা সার্ব্বজনীন আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সর্ব্বধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যনামে আহূত এই সম্মেলন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি স্যর ফ্র্যান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড বলিয়াছেন, "এই ধরণের ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুফল এই যে, যাঁহারা ইহাতে যোগদান করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করেন—তাঁহার নিজের ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এবং পরস্পরের এই মিলনের জন্য যে আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তাহাতে প্রত্যেকেই মনে করেন যে, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান ও শ্রেষ্ঠ মুসলমান। ইহাই হইতেছে পরস্পরের মিলনের ভিত্তি। নিজের জীবনে রামকৃষ্ণ এই আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং প্রচার করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী।" উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সম্মিলনীর অধিবেশনের অভ্যন্তর দিয়া সকল ধর্ম্মের বিশ্বজনীন আদর্শ যেন জীবন্ত ভাব পরিগ্রহ করিয়াছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার বহুরূপ যেমন স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া প্রকটিত হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সকল ধর্ম্ম তেমন আপনাদিগকে সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় রূপ বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিদের বক্তৃতার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার অশরীরী বাণী যেন এই সভায়

আপন মহিমায় আপনি প্রকটিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহার সত্যতা মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন।

নব্য ভারতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় সকল ধর্ম্মের মূল ভিত্তিস্বরূপে এক বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন। উপনিষদুক্ত সগুণ ব্রহ্মমূলক একেশ্বরবাদ তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সকল ধর্ম্মমতের সারভাগ সংগ্রহ করিয়া প্রখর বিদ্যাবুদ্ধি বলে এক সার্ব্বজনীন সমন্বয়ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করেন নাই। জগতের বহুলপ্রচারিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়া উহাদের সত্যতা নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। জগন্মাতা ভবতারিণীর উপাসক হইয়াও তিনি বেদান্ত-ধর্ম্ম সাধনকালে তাঁহাকে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম যাজনকালে তিনি মন্দিরে যাইতেন না এবং মুসলমানী আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়াছিলেন। অধিকারভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদিগকে তিনি বিভিন্ন প্রকারে ঈশ্বর লাভ করিবার উপায় শিক্ষা দিতেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় সহধর্ম্মিণী সারদামণি দেবী এবং ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রের জন্য তিনি সম্পূর্ণ পৃথক সাধনপ্রণালীর ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তৎকালীন প্রাচীনপন্থী হিন্দু-সমাজ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার অন্তরঙ্গগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-সাধন শাস্ত্র বা দার্শনিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, ইহা ছিল প্রত্যক্ষ—বস্তুতন্ত্রমূলক—বাস্তব। সকল ধর্ম্মের অন্তঃসত্যকে সাধন-সহায়ে প্রত্যক্ষানুভব করিয়া তিনি উহাদের মধ্যে সমন্বয়-সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং সত্যসাধন-উদ্দেশ্যে সকল ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক স্বাতন্ত্র্যও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবনের এই অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলনের সভাপতিরূপে জগৎবরেণ্য দার্শনিক আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলিয়াছেন, "তিনি প্রত্যেক ধর্ম্ম সমগ্রতঃ আচরণ করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের সারতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে অংশ গ্রহণ করিতে গেলে উহার মূলোচ্ছেদ করা হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মের সারমর্ম্ম উপলব্ধির জন্য তিনি ছিলেন, হিন্দুর নিকট হিন্দু, মুসলমানের নিকট মুসলমান এবং খৃষ্টানের নিকট খৃষ্টান। কিন্তু তিনি যুগপৎ বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করেন নাই এবং বিভিন্ন ধর্ম্মমত অবলম্বন করেন নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানগুলি ঐ ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; সুতরাং মুসলমান বা খৃষ্টান-ক্যাথলিক ধর্ম্মের সত্যোপলব্ধির জন্য তিনি মুসলমান বা খৃষ্টান ক্যাথলিক ধর্ম্ম সমগ্রভাবেই পালন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সকল ধর্ম্মের সাধন করিয়াছিলেন। * * রামমোহন যেরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মেই মূল সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেরূপ বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে সার সংগ্রহ করিয়া সকল ধর্ম্মকে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ ঐক্যসূত্র আমরা চাহি না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেরূপ ঈশ্বরে মানুষকে এবং মানুষে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানাধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল ধর্ম্মের সাধনা করিয়াছিলেন, সেইরূপেই আমরা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এবং সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিতে পারি।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে বিশ্বধর্ম্ম-সম্মিলনী জগতের নরনারীকে এই ঐক্যসূত্রেরই সন্ধান দিয়াছে।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া ঈশ্বর লাভ বা আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত করাই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ মানুষ এই উদ্দেশ্য ভুলিয়া কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকে এবং যাহারা এই অনুষ্ঠান-বিশেষের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে, তাহাদিগকে নরকের যাত্রী বলিয়া বিদ্রূপ করে। এইভাবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতিবিশেষের প্রতি শাশ্বত মূল্য আরোপ করিয়া মানুষ ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিয়াছে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন লিখিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে নিদর্শন, প্রতীক, ক্রুশেবিদ্ধ খৃষ্টের মূর্ত্তি, অনুষ্ঠান এবং মতবিশেষ হইতে ধর্ম্ম স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। এই সকল বিষয় ধর্ম্মদ্বারা নিয়োজিত হয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস কেন্দ্রীভূত করিতে, কিন্তু যখন ইহারা ধর্ম্ম-বিশ্বাস অপেক্ষাও অধিক আবশ্যকীয় হইয়া পড়ে, তখনই আমরা পৌত্তলিকতা দেখিতে পাই। ধর্ম্মের প্রতীক অসীম (infinite)কে সসীমে (finite) সীমাবদ্ধ করে না, পরন্তু সসীমকে স্বচ্ছ করে। প্রতীক তাহার ভিতর দিয়া অসীমকে দর্শন করিতে সাহায্য করে। আমরা যখন প্রতীকের সহিত তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব (reality)কে এক করিয়া ফেলি, আপেক্ষিক (relative)কে অপরিসীমে (Absolute) উন্নীত করি, তখনই বিপত্তির উদ্ভব হয় এবং অযৌক্তিক পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হয়।"* শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবনে এ কথার সত্যতা আমরা দেখিতে পাই। প্রত্যেক ধর্ম্ম-সাধন কালে উহার আনুষঙ্গিক আচার নিয়মগুলি যথাযথ মানিতেন বলিয়া তিনি ধর্ম্মকে উদ্দেশ্যহীন আচার-নিয়মের কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। ঈশ্বরলাভ-রূপ উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়া কেবল আচার অনুষ্ঠান ও গতানুগতিক প্রথার গণ্ডীতে বিচরণ করিলে মনুষ্য-হৃদয় যে যুক্তিহীনতার জঞ্জালে আবদ্ধ হয়, এ কথা তিনি উপদেশ-প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মের সাধন-পদ্ধতি যেমন বিভিন্ন, তদানুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানও তদ্রূপ পৃথক। অবস্থাধীনে একজনের পক্ষে যাহা অমৃত, অপরের পক্ষে তাহাই বিষতুল্য এবং একজনের পক্ষে যাহা বিষ, অপরের পক্ষে তাহাই অমৃত সদৃশ। তিনি বলিয়াছেন, "যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করতে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গোমাংসতুল্য হয়। আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু ভগবান লাভ করবার চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্নতুল্য হয়।" ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, যাহা মানুষের পক্ষে ভগবান লাভ বা দেবত্ব পরিব্যক্ত করিবার সহায়ক, তাহাই শ্রেষ্ঠ আচার এবং উহার বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহার নিকট অনাচার বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই নীতির অনুসরণে আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধীপ্রতীয়মান অনুষ্ঠানসমূহও তাঁহার সাধন-দৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আপন ধর্ম্মের জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহার সাধন-জীবন প্রমাণ করিয়াছে যে, বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং তৎসংক্রান্ত নিষ্ঠা-নিয়ম প্রতিপালন সমন্বয় বা উদারতার প্রতিবন্ধক নহে। ধর্ম্মের গভীরতা ও প্রবলতার মধ্যেও যে অভূতপূর্ব্ব উদারতা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে দেখা গিয়াছে, মানবের ধর্ম্মেতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবনের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঔদার্য্যে মুগ্ধ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "* * সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর এবং আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবণতা একাধারে সন্নিবিষ্ট

* The Cultural Heritage of India, Vol. 1, Introduction, P. XXV.

হইতে পারে এবং ঐপ্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।" বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের বাণীর ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রদর্শিত এই ঔদার্য্য উদ্‌গীত হইয়া ধর্ম্মরাজ্যের সকল ভেদ-বৈষম্য দূর করিবার উপায় দেখাইয়াছে। মানুষের অন্তঃসত্তা এই উদারতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে জগতে মানুষের মধ্যে বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আচরিত ও প্রচারিত সর্ব্বধর্ম্ম-সাধন সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, মনুষ্য সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাস স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও সমগ্র মানবজাতিকে এক ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিতে পারে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়রূপে বিশ্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্ম্মমতসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া বিশ্বমানবতা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই এই ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন আহূত হইয়াছিল। ধর্ম্ম-জগতের সমন্বয়ের পরিপূর্ণতাই যে এক অখণ্ড মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম, এ কথার সত্যতা জগতের ঘটনা পরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয়-ভিত্তির উপরই বিশ্বমানবের জীবনে পারস্পরিক সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সর্ব্বাঙ্গীণসম্পূর্ণ সমন্বয়ের ঘনিভূত মূর্ত্তি। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অপর একস্থলে বলিয়াছেন, "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে একের উপাসনা করিতেন। ইহাতে তিনি কোন অসামঞ্জস্য দেখিতেন না, বরং ইহাতেই সত্যের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতেন। এইরূপে তিনি সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, যে মূর্ত্তিই পূজা করা হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, সকল মূর্ত্তিতেই সেই এক ভগবানেরই উপাসনা করা হয়। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ দেখিতেন না।" তিনি আপাত-বিরোধী বিভিন্ন ধর্ম্ম-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বের সকল ধর্ম্ম তাঁহার সাধনালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই ধর্ম্মনৈতিক ধ্বংসবাদের যুগে তাঁহার সমন্বয়-সাধন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতিকে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মে শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম-সাধন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাহাদের আপন আপন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্য ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ দিয়াছে। ধর্ম্ম-সম্মিলনীর অধিবেশনে স্যর ফ্র্যান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "খৃষ্টান হইয়া আমি আজ এই কথা বলিতেছি যে, এই মহাপুরুষ যেদিক দিয়া যেভাবে আমাদের ধর্ম্মকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা আমাদের ধর্ম্মকে আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিয়াছি।" এইরূপে পৃথিবীর প্রথিতনামা পণ্ডিতগণ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্ম-সাধনের মধ্যে বিশ্বমানবতার সন্ধান পাইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত অশ্রুতপূর্ব্ব সমন্বয় জগতে বিশ্বমানবত্ব-বোধের যে প্রেরণা জাগাইয়াছে, বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন উহারই বহিঃপ্রকাশ।

জগতের সকল ধর্ম্মের ভস্মরাশির উপর কোন ধর্ম্ম-বিশেষের বিরাট সৌধ নির্ম্মাণের অস্বাভাবিক চেষ্টা ধর্ম্মরাজ্যে সমন্বয় বা ঐক্য-প্রতিষ্ঠার পথে পর্ব্বত প্রমাণ বিঘ্ন। মধ্যযুগে ইউরোপের অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নরপতিগণের সহায়তায় কতিপয় স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি জগতের সকল মানবকে একটী "বিশ্ব-গির্জ্জা" (World-Church)র মধ্যে সমবেত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে খৃষ্টধর্ম্ম রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিয়া "বিশ্ব-খৃষ্টান" (Pan-Christian) মতবাদকে ব্যর্থ করিয়াছে। এইরূপে মুসলমান জগতের একচ্ছত্র অধিপতি তুরস্কের খলিফার নেতৃত্বাধীনে জগতের

সকল মানবকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকার নিম্নে সমবেত করিবার চেষ্টা—যাহা "বিশ্ব-ইস্‌লাম" (Pan-Islam) মতবাদ নামে প্রসিদ্ধ, তাহাও গাজী মুস্তাফা কামালপাশার কৃপায়—খলিফাপদ বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি প্রত্যেক ধর্ম্মকে বিশ্ব-ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টার বিরাম নাই। সকল ধর্ম্মের উৎসন্নের বিনিময়ে কোন একটী ধর্ম্মমতকে সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বস্থানের ধর্ম্মে পরিণত করিবার "কালা-পাহাড়ী" মনোবৃত্তি স্মরণাতীত কাল হইতে মানব-সমাজকে হিংসা বিদ্বেষ ও বিরোধের লীলাস্থলীতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ ধর্ম্মজীবন যাপন অপেক্ষা ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায়বিশেষের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন করিতে যাইয়া ধর্ম্মরাজ্যে স্বেচ্ছা-তন্ত্রকে প্রশ্রয় দিয়াছে। বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনের অন্যতম সভাপতিরূপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়া-ছেন, "কোনও ধর্ম্ম যখন মানব জাতির উপর তাহার শিক্ষা চাপাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তখন আর উহা ধর্ম্ম থাকে না, তখন উহা হইয়া পড়ে স্বৈরাচার—ইহাও একপ্রকার সাম্রাজ্য-বাদ। এইজন্যই দেখিতে পাই, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ধর্ম্ম জগতেও চলিয়াছে 'ফ্যাসিজমের' তাণ্ডব নৃত্য—অনুভূতিহীন পদভারে উহা মানবাত্মাকে দলিত মথিত করিতেছে।" ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ যেমন তাহাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার অনলে জগতের অনুন্নত দুর্ব্বল জাতিসমূহকে আহুতিদান করিয়াছে, তেমন ভাবে সকল ধর্ম্মকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া ধর্ম্মমতবিশেষকে বিশ্বধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া "ধর্ম্মের হিটলার ও মুসলিনীগণ" ধর্ম্ম-জগতে সাম্রাজ্যবাদ উপস্থিত করিয়াছেন! ধর্ম্মাবরণে আবৃত এই স্বৈরাচার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান ধর্ম্মকে কলঙ্ক-মলিন করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে এই স্বেচ্ছাচার হইতে নিতান্ত জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা এবং পরমত-অসহিষ্ণুতা জন্মলাভ করিয়া স্থূল জড়বাদকে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম আক্রমণের সুযোগ দিয়াছে।

ইউরোপে মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্ম অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া এক এক সম্প্রদায় এক এক ভাবের বাইবেল-ব্যাখ্যাকে ভগবান খৃষ্টের একমাত্র উপদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, এবং ধর্ম্মমত লইয়া এক সম্প্রদায়ের উপর অপর সম্প্রদায়ের আক্রমণ শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই সময় অ-ক্যাথলিক সম্প্রদায়সমূহের উপর ক্যাথলিক ধর্ম্ম-গুরু পোপের অবর্ণনীয় অত্যাচার, প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাসের জন্য নরহত্যা, ডাইনী সন্দেহে অসংখ্য মহিলাকে জীবন্ত দগ্ধ করা, ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) প্রভৃতি খৃষ্টান ধর্ম্মমতবিশেষকে বিশ্বধর্ম্মে পরিণত করিবার বৃথা চেষ্টার বিষময় ফল। মধ্যযুগের অবসানে খৃষ্টধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রভাবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাড়নায় আপনাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রশমিত করিয়া এখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে, ধর্ম্মকে কর্ম্মজীবন হইতে নির্ব্বাসন করিয়া নিছক জড়বাদের আশ্রয় লইয়াছে।

ভারতের ধর্ম্মেতিহাসেও দেখা যায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত সকল মতবাদকে খণ্ডন করিয়া এক এক যুগে এক এক জন ধর্ম্মাচার্য্যের এক একটী মত হিন্দুধর্ম্মের উপর সার্ব্বভৌম প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিদেশাগত ইস্‌লাম ধর্ম্ম হিন্দুস্থানে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় রত। ইহার উপর খৃষ্টান ধর্ম্মের একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ভারতের ধর্ম্মবিরোধকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে ভারতে ধর্ম্ম লইয়া যে বিরোধ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা আজও নির্ব্বাপিত হয় নাই। ধর্ম্ম মতে মতে সংগ্রাম, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ এবং পরস্পরের

দাবী খণ্ডন, আজও ভারতের আকাশকে সাম্প্রদায়িকতার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপে ধর্ম্মের নামে ভারতবাসী শত ভেদ এবং সহস্র বৈষম্যে বিভক্ত হইয়া অনৈক্য-বিরোধে আজও উত্থানশক্তিহীন পঙ্গু! হিন্দুজাতি ধর্ম্মের নামে স্থূলভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বীর স্বাধীকার শৃঙ্খলিত করিয়া—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে অপরের নৈতিক অধিকার পর্য্যন্ত হরণ করিয়া আজ নিজেই শৃঙ্খলাবদ্ধ—হৃতসর্ব্বস্ব! ধর্ম্মের নামে হিন্দু আপনার স্বজাতিকে সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, অধিকার-বঞ্চিত এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া যে মহা-অনর্থকর সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিয়াছে, উহার বিষময় ফলে সে আজ বিমমগ্ন—মৃতকল্প!

ধর্ম্মের বিকৃতি মানুষের যুক্তিকে কিরূপ অন্ধ এবং নীতিবোধকে কিরূপ খঞ্জ করে, বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বনাশকর সাম্প্রদায়িকতা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মের এই শোচনীয় পরিণতি পর্য্যালোচনা করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "উগ্র ও আন্তরিক নাস্তিক্যবাদ ঈশ্বরের নামে যে কলঙ্ক আরোপ করিতে পারে না, আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশী এই মারাত্মক ব্যভিচার ঈশ্বরের নামে ততোধিক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে।" ধর্ম্মবিশেষের নামে একচেটিয়া অধিকার বিস্তারের এবম্বিধ কুফল, বর্ত্তমানে সকল দেশের চিন্তাশীল মনীষিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মেলন-সমুত্থিত সমন্বয় বাণী ধর্ম্মমত বিশেষের একচ্ছত্রপ্রাধান্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছে।

বর্ত্তমানে জগতের সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে ব্যক্তি বা দলবিশেষের সার্ব্বভৌম ভোগাধিকারের উলঙ্গ কামনার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য আপনাদের মধ্যে যত অধিক প্রতিযোগিতা চালাইতেছে, জগতের আপামর সাধারণ ততই উহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছে। যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে জগতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াছে, এই বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন তাহারই অভিব্যক্তি। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্ববিধ বিভবে সকল মানুষের সমান অধিকার উদাত্তকণ্ঠে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে। বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মিলনী সকল ধর্ম্মে মানুষ মাত্রেরই সমানাধিকার সমর্থন করিয়াছে। ধর্ম্মসম্মেলনে চেকোশ্লোভাকিয়ার ডাঃ এফ্, ভি, ট্রাউজেক্ বলিয়াছেন, "এই সম্মেলন হইতে ইহাই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, একজন মানুষ অন্য মানুষ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে; প্রতি মানুষেরই স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করিবার বা গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। এই স্বাধীনতাই মানুষের পক্ষে চরম সত্য। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনতা থাকা উচিত। সকলকে নিজ নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাসী থাকিয়া অপর ধর্ম্মকে সহ্য করিতে হইবে।" যেমন রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে, তেমন ধর্ম্মবিশেষেরও কায়েমী অধিকার বিস্তারের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন বিশ্বময় "live and let live" (বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও) নীতি ক্রমেই মানব-সমাজের একমাত্র নীতি হইয়া দাঁড়াইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের "যত মত তত পথ" রূপ মহাবাক্য ধর্ম্মরাজ্যে এই সাম্যবাদেরই জয় ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার প্রচারিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ধর্ম্মজগতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে প্রেরণা জাগাইয়াছে, এই বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে তাহারই মাঙ্গলিক মন্ত্র গীত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" আশ্রয়ে এই সম্মিলনী বিশ্বমানব-মহাসম্মেলনের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে, ইহাই যে বিশ্বময় ধর্ম্মের দ্বন্দ্বভেদ বিদূরিত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র মানব-জাতিকে যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রেমে আবদ্ধ করিবার একমাত্র পথ, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীসায়ণাচার্য্য

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, পি-এইচ্-বি, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে আচার্য্য সায়ণ অতি গৌরবোজ্জ্বল আসন অধিকার করিয়া আছেন। তিনি বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গহন বৈদিক সাহিত্যে প্রবেশার্থীর পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্বেও বহু বেদ ভাষ্যকারের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের গ্রন্থই বর্ত্তমানে উপলব্ধ হয় না। আধুনিক কালে যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিতে অভিলাষী হন, আচার্য্য সায়ণের ভাষ্যই তাঁহাদের প্রধানতম উপজীব্য। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে তত্রত্য হিন্দু নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বেদবিদ্যার যে মহা অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, আচার্য্য সায়ণ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর মাধবাচার্য্যই তাহার মূলীভূত কারণ। সায়ণাচার্য্যের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বিস্তর উপকরণ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সে সব একত্র সংগৃহীত হইলে তাঁহার জীবনের সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচিত হইতে পারে।

আচার্য্য সায়ণ স্বরচিত গ্রন্থসমূহের প্রারম্ভে নিজের বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিজয়নগরের নৃপতিগণের বহু শিলালেখ এবং শাসন-পত্রাদিতেও তাঁহার সম্পর্কে অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

সায়ণ দক্ষিণ দেশীয় এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম "সায়ণ" এবং মাতার নাম "শ্রীমতী"। তিনি ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রিয়, কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা এবং বৌধায়ন সূত্রের ব্রাহ্মণ। তাঁহার দুই ভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ মাধবাচার্য্য ও কনিষ্ঠ ভোগনাথ। সায়ণ ছিলেন মধ্যম সহোদর।[১]

আচার্য্য সায়ণের অগ্রজ মাধবাচার্য্য ভারত ইতিহাসের একজন প্রথ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁহার চরিত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন অশেষ শাস্ত্রদর্শী মহাপ্রতিভাশালী পণ্ডিত; আবার অপর দিকে তিনি ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের সংস্থাপক এবং রাজাধিরাজ হরিহর ও বুক্কের প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন ভোগ-বিরাগী সন্ন্যাসী। মাধবাচার্য্য উত্তরকালে শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশ হন। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বর্ণনা প্রসঙ্গে Kane মহোদয় বলেন, "as an erudite scholar, as a far sighted Statesman, as the bulwark of the Vijaynagar Kingdom in the first day of its foundations, as a Sannyasin given to peaceful contemplation and renunciation in old age, he led such a varied

---

(১) শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা।
সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ।
বৌধায়নং যস্য সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী।
ভারদ্বাজং যস্য গোত্রং সর্ব্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ।

— পারাশর মাধবীয়।

অলঙ্কার সুধানিধি, সুভাষিত সুধানিধি, প্রায়শ্চিত্ত সুধানিধি এবং যজ্ঞতন্ত্র সুধানিধি গ্রন্থেও আচার্য্য সায়ণ পূর্ব্বোক্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

and useful life that even to this day his is a name to conjure with" (Kane : History of Dharma Sastras, p 374)

মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য ছিলেন মহা পণ্ডিত, দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ এবং বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকালে ইঁহার প্রধান আশ্রয়। বৃদ্ধবয়সে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে তিনি ধ্যান-ধারণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনটি ছিল এমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জনসাধারণের হিতকারী যে, আজিও তাঁহার নাম যাদুমন্ত্রের মতই কার্য্য করে।

ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা ও বেদান্তাদি গ্রন্থের রচয়িতা-রূপে মাধবাচার্য্য সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার নামে বহু গ্রন্থ চলিয়া আসিলেও সবগুলিই তাঁহার নিজস্ব রচনা নহে। অনেক পরবর্ত্তী গ্রন্থকারও স্ব স্ব গ্রন্থ তাঁহার নামে চালাইয়া গিয়াছেন। তবে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি যে মাধবাচার্য্য স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় না :—(১) পরাশর-মাধব (পরাশর স্মৃতির উপর মাধবাচার্য্যের ভাষ্য), (২) ব্যবহার মাধব, (৩) কাল মাধব বা কাল নির্ণয়, (৪) জৈমিনি ন্যায়মালা বিস্তর, (৫) জীবন্মুক্তি বিবেক, (৬) পঞ্চদশী, (৭) বৈয়াসিক-ন্যায়মালা, (৮) সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ এবং (৯) শঙ্কর দিগ্বিজয়।

কেহ কেহ মাধবাচার্য্য ও বিদ্যারণ্যকে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা দুইজন যে অভিন্ন, তাহা সমসাময়িক লেখকদের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। (Vide Indian Antiquary, 1916, pp 17—18, Indian Historical Quarterly Vol. VII. pp. 611—14). মহারাজ প্রথম বুক্কের মাধব নামক অপর এক মন্ত্রী ছিলেন; ইনি সাধারণত মাধব মন্ত্রী বা অমাত্য মাধব নামে পরিচিত। মাধবাচার্য্য ও মাধব মন্ত্রী যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি শিলালেখ হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। (Indian Antiquary, 1916, pp. 4—6) অমাত্য মাধবের পিতার নাম অবুন্ত ভট্ট; গুরুর নাম কাশীবিলাস ক্রিয়াশক্তি।

আচার্য্য সায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগনাথ অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় প্রখ্যাতনামা না হইলেও তিনিও যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাসনপত্রের সাক্ষ্য হইতে জানা যাইতেছে, তিনি মহারাজ কম্পনের পুত্র দ্বিতীয় সঙ্গমের নর্ম্মসচিব ছিলেন।[১] মাধবও সায়ণ ছিলেন বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে একান্তদর্শী, আর ভোগনাথ ছিলেন কবি। আচার্য্য সায়ণ তাঁহার "অলঙ্কার সুধানিধি" গ্রন্থে ভোগনাথ বিরচিত ৬খানা কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে ঐ সকল গ্রন্থ হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ৬খানা কাব্যের নাম,—(১) রামোল্লাস, (২) ত্রিপুরবিজয়, (৩) উদাহরণমালা, ইহাতে সংস্কৃত অলঙ্কারসমূহের উদাহরণ রহিয়াছে। এই সব উদাহরণে আচার্য্য সায়ণের প্রশংসাসূচক কবিতা আছে। (৪) মহাগণপতি স্তব, (৫) শৃঙ্গার মঞ্জরী, ও (৬) গৌরীনাথাষ্টকম্।

সায়ণ তাঁহার ভ্রাতার কাব্য-প্রতিভার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন। তিনি স্বরচিত অলঙ্কার গ্রন্থের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, 'এই সকল নিয়মের উদাহরণ ভোগনাথের কাব্যে পাওয়া যাইবে।' (তেষামুদাহরণানি ভোগনাথকাব্যেষু দ্রষ্টব্যানি।)

সায়ণাচার্য্য এবং তাঁহার ভ্রাতাদের রচিত গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তাঁহাদের গুরু ছিলেন তিন জন,—বিদ্যাতীর্থ, ভারতীতীর্থ এবং শ্রীকণ্ঠ। বিদ্যাতীর্থ রুদ্রপ্রশ্ন-ভাষ্যের প্রণেতা যতিরাজ পরমাত্মতীর্থের শিষ্য। অশেষ বিদ্যার আকর

---

১ ইতি ভোগনাথ সুধিয়া সঙ্গম ভূপাল নর্ম্ম সচিবেন। শ্রীকণ্ঠপুর সমৃদ্ধো শাসনপত্রেষু বিলিখিতাঃ শ্লোকাঃ। Epi. Ind. Vol. III p. 23.

বলিয়া বিদ্যাতীর্থকে 'মহেশ্বর' নামেও অভিহিত করা হইত। 'অনুভূতি প্রকাশের' শ্লোক হইতে জানা যায়, বিদ্যাতীর্থই ছিলেন সায়ণ, মাধবের মুখ্য গুরু। মাধবাচার্য্য শৃঙ্গেরী পীঠে 'বিদ্যাশঙ্কর' নাম দিয়া বিদ্যাতীর্থের মূর্ত্তি স্থাপিত করেন।

ভারতীতীর্থ শৃঙ্গেরী পীঠের গুরু ছিলেন। পরাশর স্মৃতি, জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর এবং অন্যান্য গ্রন্থে মাধবাচার্য্য সাদরে বহুবার "ভারতী-তীর্থের" নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

কাঞ্চীর শাসনপত্রে সায়ণ শ্রীকণ্ঠাচার্য্যকে তাঁহার গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভোগনাথও তাঁহার গণপতিস্তবে শ্রীকণ্ঠকে গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও শিলালেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আচার্য্য সায়ণ বিজয়নগর রাজ্যের চারিজন নৃপতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কম্পণ, দ্বিতীয় সঙ্গম, প্রথম বুক্ক এবং দ্বিতীয় হরিহর। ইঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্বকালেই তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সায়ণের প্রথম পৃষ্ঠপোষক কম্পণ ছিলেন প্রথম সঙ্গমের দ্বিতীয় পুত্র অর্থাৎ বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহরের কনিষ্ঠভ্রাতা। কম্পণ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশ—সম্ভবতঃ বর্ত্তমান নেল্লোর ও কুড্ডাপ্পা জেলা শাসন করিতেন। কম্পণের পুত্র দ্বিতীয় সঙ্গমকে সায়ণ বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাবালক অবস্থায় আচার্য্য সায়ণই তাঁহার পক্ষে শাসনকার্য্য চালাইতেন। এরূপ অনুমান হয়, দ্বিতীয় সঙ্গম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আচার্য্য সায়ণ তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজে তাঁহার পিতৃব্য প্রথম বুক্কের (১৩৫০-১৩৭৯) রাজসভায় গমন করেন এবং তাঁহার মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন। এই বুক্ক রাজের (প্রথম) প্রোৎসাহেই আচার্য্য সায়ণ বেদভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম বুক্ক রাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হরিহর সিংহাসন আরোহণ করেন। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালেও (১৩৭৯-১৩৯৯) আচার্য্য সায়ণ প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। হরিহরের নির্দ্দেশ পাইয়াই আচার্য্য সায়ণ অথর্ব্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণাদির ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে সায়নাচার্য্য দেহত্যাগ করেন (১৩৮৭ খৃঃ)।

চতুর্ব্বেদভাষ্যকার আচার্য্য সায়ণ যে অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার চরিত্রে অপূর্ব্ব মনীষার সহিত আবার অসাধারণ বীরত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যেমন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রেও তেমনি সফলতার সহিত কর্ম্মপরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। একটা বিশাল সাম্রাজ্যের তিনি ছিলেন কর্ণধার, আবার সংগ্রাম ক্ষেত্রেও তাঁহার বীরত্বপ্রভাবে শত্রুপক্ষের ত্রাস উপস্থিত হইত। চোলরাজ্যের 'চম্প' নামক রাজাকে তিনি যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং গরুড নগরের শাসন-কর্ত্তাকে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'অলঙ্কার সুধানিধি' গ্রন্থে তদীয় শৌর্য্যবীর্য্য পরাক্রমের কথা এইভাবে উল্লিখিত থাকিতে দেখা যায় ;—

"জগদ্বীরস্য জাগর্ত্তি কৃপাণঃ সায়ণ প্রভোঃ।
কিমিত্যেতে বৃথাটোপা গর্জ্জন্তি পরিপন্থিনঃ॥

*　　*　　*

সমরে সপত্নসৈন্যং সায়ণ তব বিম্বিতং বহন্ খড়্গঃ।
ক্রীড়তি কৈটভরিপুরিব বিভ্রৎক্রোড়ে
জগত্রয়ং জলধৌ॥"

রাজা কম্পনের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র সঙ্গম অল্পবয়স্ক শিশু মাত্র। তখন সায়ণই শিশুরাজার পক্ষে বিজয়নগরের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশের সুখসমৃদ্ধি কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা অলঙ্কার সুধানিধিতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ;—

সত্যং মহীং ভবতি শাসতি সায়ণার্য্যে।
সম্প্রাপ্ত ভোগ সুখিনঃ সকলাশ্চ লোকাঃ॥

আচার্য্য সায়ণের পারিবারিক জীবন বেশ শান্তিময় ছিল। তাঁহার কম্পণ, সায়ণ ও শিঙ্গণ নামক তিন পুত্র ছিল। ইঁহাদের মধ্যে কম্পণ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিৎ। সায়ণ ছিলেন কবি। তিনি সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে এই সায়ণ এবং সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার সায়ণ-মাধব অভিন্ন ব্যক্তি। (Ind. Ant. 1916, 20) তৃতীয় পুত্র শিঙ্গণ ছিলেন, শ্রেষ্ঠ বৈদিক পণ্ডিত, 'ক্রম' ও 'জটা' পাঠে সুনিপুণ। সায়ণাচার্য্যকৃত শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষ্যের সমাপ্তি অংশ হইতে জানা যায়, শিঙ্গণ পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত পরিমাণে দান করিতেন। অলঙ্কার-সুধানিধিতে আচার্য্য সায়ণের পারিবারিক জীবনের চিত্রটি অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে ;—

"তৎ সংব্যঞ্জয় কম্পণ ব্যসনিনঃ সঙ্গীতশাস্ত্রে তব
প্রৌঢ়িং সায়ণ গদ্যপদ্য রচনা পাণ্ডিত্যমুন্মুদ্রয়।
শিক্ষাং দর্শয় শিঙ্গণ ক্রমজটা চর্চ্চাসু বেদেম্বিতি
স্বান্ পুত্রান্ উপলালয়ন্ গৃহগতঃ সম্মোদতে সায়ণঃ।"

Dr. Anfrecht এর মতে আচার্য্য সায়ণ ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে পরলোক গমন করেন। (Catalogus Catalogorum, p 711).

আচার্য্য সায়ণ বৈদিক-সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের উপর যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তিনি এই সমস্ত ভাষ্য ব্যতিরেকে আরও নানা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সায়ণের নামে বহু গ্রন্থ চলিয়া আসিলেও-ঐ সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার নিজস্ব রচনা নহে। যে সব গ্রন্থ সায়ণের রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন —যাহাতে তাঁহার নামের ভণিতা পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া যাইতেছে। এই তালিকাতে গ্রন্থসমূহ যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) 'সুভাষিত সুধানিধি'—ইহাতে নানা গ্রন্থ হইতে নৈতিক উপদেশ বাক্যসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। সায়ণ রচিত ও তৎসম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বলিয়া প্রতীতি হয়। গ্রন্থপুষ্পিকা হইতে জানা যায়, কম্প বা কম্পণের রাজত্বকালে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল।

(২) প্রায়শ্চিত্ত সুধানিধি'—বা 'কর্ম্মবিপাক' —ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ। ইহাতে কোন্ পাপকার্য্যের কি প্রায়শ্চিত্ত, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) 'ধাতুবৃত্তি'—ইহা সাধারণতঃ 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি' নামে পরিচিত। পাণিনির ধাতুপাঠ অবলম্বনে ইহা লিখিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধবের অনুপ্রেরণাতেই সায়ণাচার্য্য অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই কারণে অনেক গ্রন্থের সহিতই মাধবের নাম সংযুক্ত হইতে দেখা যায়।

(৪) 'অলঙ্কার সুধানিধি'—আচার্য্য সায়ণের জীবনবৃত্তান্তের উপকরণ এই গ্রন্থে কিছু কিছু পাওয়া যায়, এই কারণে ঐতিহাসিকদের নিকট ইহার বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাপি এই গ্রন্থের সমগ্র অংশ উপলব্ধ হয় নাই। অলঙ্কার-সুধানিধিতে দশটি 'উন্মেষ' আছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে যে গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মাত্র ৩টি উন্মেষ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য অলঙ্কার-গ্রন্থ হইতে ইহার এই বিশেষত্ব যে অলঙ্কার-গ্রন্থে সাধারণতঃ গ্রন্থকার স্বকীয় আশ্রয়-দাতার জীবনবৃত্তান্তমূলক বিষয়সমূহই উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করেন। কিন্তু 'অলঙ্কার সুধানিধিতে' সায়ণ নিজের জীবনবৃত্তান্তমূলক বিষয়সমূহ অবলম্বনেই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৫) 'পুরুষার্থ সুধানিধি'—পুরুষার্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে শ্লোকসংগ্রহ করিয়া ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। মহারাজ বুক্কের মন্ত্রী হইয়া সায়ণাচার্য্য এই গ্রন্থই প্রথম সঙ্কলিত করেন।

(৬) 'বেদভাষ্য'—ইহার পর বেদের ভাষ্যসমূহ প্রণীত হইয়াছিল।

(৭) 'আয়ুর্ব্বেদ সুধানিধি'—ভৈষজ্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

(৮) 'যজ্ঞতন্ত্রসুধানিধি'—বৈদিকযজ্ঞ সম্বন্ধে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

'আয়ুর্ব্বেদ সুধানিধি' এবং 'যজ্ঞতন্ত্রসুধানিধি' প্রথম বুক্ক নৃপতির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাই আচার্য্য সায়ণের চরম গ্রন্থ বলিয়া প্রতীতি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তি

শ্রীসুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী

বাংলা মায়ের শ্যামল কোলে প্রকাশ তুমি যবে
নিঃস্ব পল্লী-বিপ্রঘরে এই সে বিরাট ভবে।
জান্‌ত কেবা, হবে তোমার জগৎজোড়া নাম,
তোমার নামে তরবে সবে পূরবে মনস্কাম।
শৈব, জৈন, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, হিন্দু মুসলমান,
আজকে করে শ্রদ্ধাভরে, অর্ঘ্য তোমায় দান।
'মতও যত, পথও তত' কর্‌লে আবিষ্কার,
তাও বুঝালে সাধন-সুরে সবই একাকার।
কামিনী-কাঞ্চন মোহ বাঁধে অষ্টপাশে,
মুক্ত সে জন, গুরু যাঁহার থাকে হৃদয়-বাসে।
মাতৃরূপা সকল নারীই ভোগের বস্তু নয়,
বিশ্বমাঝে শিখ্যে দিলে তারি পরিচয়।
আপন স্ত্রীকে করলে পূজা, মাতৃমূর্ত্তি জেনে,
নূতন আলোক পেলে সাধক তত্ত্ব কথা শুনে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কত তৈরী করলে তুমি,
মন্ত্রে তাদের উঠ্‌ল কাঁপি সসাগরা ভূমি!

তোমার বাণী ধন্য হ'ল ধন্য বাংলা দেশ,
কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রীতির যেথায় সমাবেশ।
কেহ বলে খণ্ড তুমি, অখণ্ড কেউ বলে,
তুমি হাস, যখন তাদের তর্ক দ্বন্দ্ব চলে।
নরদেহে হে নারায়ণ করলে নরের পূজা,
দীন-ভিখারী পরমহংস তুমি রাজার রাজা।
নরেন্দ্রকে বল্লে যখন "এই রামকৃষ্ণ
ত্রেতায় যিনি রামচন্দ্র, দ্বাপরেতে কৃষ্ণ।"
সেদিন তরুণ নুইয়ে মাথা তোমার রাতুল পায়,
নূতন হ'য়ে উঠ্‌ল গ'ড়ে নূতন প্রেরণায়।
সারা জগৎ জান্‌ল সেদিন, বাংলা বটে দেশ,
অনাহত বিবেক-বাণীর নাইকো যেথায় শেষ।
শুনাও আবার জগৎগুরু বর্ষ শত পরে,
অদর্শনেও তুমি আছ কল্যাণেরি তরে।
অনাহত ধ্বনি শুনে জাগুক পুরুষ নারী,
দেখবে তারা মুক্তি-পথের পথ ও পথের দ্বারী।

পতঞ্জলি—বিভূতি ও ভুবন জ্ঞান

স্বামী বাসুদেবানন্দ

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, বিভূতি বা miracle বলে কিছু নেই, আমাদের মনের অজ্ঞতা বা দৃশ্যের সূক্ষ্মতা হেতু যে সব ঘটনার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আমরা খুঁজে পাই না, সেখানেই আমরা যাদু বা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনের সঙ্গে আপোষ করে নেই। ভূত বিজ্ঞানের অনেক ঘটনা সাধারণের নিকট যাদু বলে বোধ হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সেখানে তাঁর সূক্ষ্ম মনের দ্বারা যাদুর রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলেন। কিন্তু যৌগিক জ্ঞানটা এখনও ভূত-বিজ্ঞানীর নিকট যাদু। বিজ্ঞান এখনও মাত্র বিশ্ব-পুঁথির প্রচ্ছদপট নিয়েই ব্যস্ত। এডিংটন (Eddington) তাঁর "বিজ্ঞান ও অদৃশ্য জগৎ" (Science and the Unseen World, P 20) নামক গ্রন্থে বলছেন,—"And if to day you ask a physicist what he has finally made out the ether or the electron to be, the answer will not be a description in terms of billiard balls or fly-wheels, or anything concrete, he will point instead to a number of symbols and a set of mathematical equations which they satisfy What do the symbols stand for? The mysterious reply is given that physics is indifferent to that, it has no means of probing beneath the symbolism." ভূত বিজ্ঞান ইথার বা ইলেকট্রন সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্ত করেছেন, তা সবই আনুমানিক—অজ্ঞেয় জগতের লাক্ষণিক জ্ঞান মাত্র। কিন্তু যোগীরা বলেন যে, ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রপাতির রাজ্যে যে বিষয় রহস্যময়, যোগীর সূক্ষ্মদৃষ্টির নিকট সে তার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করে। যোগীরা প্রকৃতির সুসূক্ষ্ম ধার্ম্মিক, কালিক ও অবস্থা পরিণাম অবগত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সূক্ষ্মবিষয়ের উপর আধিপত্যও লাভ করেন এবং সেই শক্তি যখন ব্যবহারিক রাজ্যে প্রয়োগ করেন, তখন সেগুলিকে আমরা বিভূতি বা miracle বলি, (অবশ্য এখানে আমরা হাতের সাফাইকে লক্ষ্য করচি না)। এ শক্তির দ্বারাই যোগীর অতীত ও অনাগত জ্ঞান পূর্ব্ব জাতিজ্ঞান, পরচিত্ত জ্ঞান, অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি দেখা ও শুনা যায়, যার বিষয় আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। এক্ষণে আরও কয়েকটি বিভূতির বিষয় যা পতঞ্জলি তাঁর দর্শনে আলোচনা করেছেন, তা আমরা পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থাপিত করতে চাই।

যে কর্ম্মের দ্বারা আয়ু নিরূপিত হয়, তা দ্বিবিধ—(১) সোপক্রম ও (২) নিরুপক্রম (৩।২৩)। সোপক্রম ও নিরুপক্রম কর্ম্ম কী?—ব্যাস দুটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন—(১) ভিজে কাপড় বাতাসে মেলে দিলে শীঘ্র শুকিয়ে যায় এবং (২) ভিজে কাপড় গুটিয়ে রাখলে শুকুতে দীর্ঘকাল লাগে। অথবা (১) বায়ু-প্রবাহে শুষ্ক তৃণ আগুনে শীঘ্র পোড়ে, (২) একত্রিত বহু তৃণের এক অংশে আগুন দিলে পুড়তে বহুক্ষণ লাগে। সেইরূপ যাদের আয়ুর কারণ যে কর্ম্মময় জীবন—বিস্তৃত ও বহুল (সোপক্রম), তাদের আয়ু অল্প এবং যাদের জীবনে আয়ুর কারণ যে কর্ম্মসমষ্টি সঙ্কুচিত অর্থাৎ বিস্তৃত ও বহুল নয়, সেখানে আয়ু দীর্ঘ। দেখা যায়, একটি মাত্র জীব-শিক্ষার বাসনা নিয়ে যদি কোনও মহাপুরুষ পৃথিবীতে

আসেন এবং বিরাট ও বহুমুখী কর্ম্ম তাঁর জীবনে প্রকাশ পায়, তা হলে তাঁর আয়ু হয় অল্প—যেমন শঙ্কর ও বিবেকানন্দ। কিন্তু ঐ একটি বাসনাহেতু যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ কোরে ধীরে ধীরে কর্ম্ম করেন, তাঁদের জীবন হয় দীর্ঘ, যেমন বুদ্ধাদি। আয়ুর হেতু এই যে সোপক্রম ও নিরুপক্রম কর্ম্ম এতে সংযম করলে অপরান্তের বা মৃত্যুর জ্ঞান হয়। অথবা অরিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুকাল জানা যায়। এই অরিষ্ট ত্রিবিধ—(১) আধ্যাত্মিক—কর্ণ বন্ধ করলে স্বদেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া হেতু যে হু হু শব্দ, (যাকে লোকে রাবণের চিলু বা চিতা বলে) শুনতে না পাওয়া, অথবা চোখ বন্ধ করে, চোখের কোণের জ্যোতি না দেখা। (২) আধিভৌতিক—হঠাৎ যমপুরুষ বা পিতৃপুরুষ দর্শন। (৩) আধিদৈবিক—হঠাৎ স্বর্গ, সিদ্ধ বা দৃশ্য বিপরীতভাবে দেখা। এ সকল মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ। (যোগশাস্ত্রের শাখা স্বরূপ অরিষ্ট-বিজ্ঞান একটি পৃথক শাস্ত্র আছে)।

সুখী জীবে মৈত্রী ভাবনা দ্বারা সংযম করলে মৈত্রীবল লাভ হয়। সেইরূপ দুঃখী জীবে করুণা ভাবনা দ্বারা সংযম করলে করুণা-বল লাভ হয় এবং পুণ্যশীল জীবে মুদিতা ভাবনা দ্বারা সংযম করলে মুদিতা বল লাভ হয়। কিন্তু পাপীর প্রতি উপেক্ষা দ্বারা কিছু লভ্য নয়, কারণ উপেক্ষা জিনিষটা ভাবনার অভাব। উপরোক্ত তিনটি দ্বারা "অবন্ধ-বীর্য্য" অর্থাৎ অব্যর্থ বল লাভ হয়। হিংস্রক পশুরাও তাঁর বশ্য হয় এবং জগতের সকল লোকেরই তিনি প্রিয় হন।

হস্তি-বলে সংযম করলে হাতীর মত বল হয়। যেমন জ্ঞানপূর্ব্বক পেশীতে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা ব্যায়াম-বীরেরা বল বৃদ্ধি করেন।

ব্যাস বলছেন, "জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিরুক্তা"—জ্যোতিষ্মতীকে প্রবৃত্তিও বলে। জ্যোতিষ্মতীর আলোক কী, তা আমরা পূর্ব্বে (উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) একবার আলোচনা করেছি। এই জীব জ্যোতিঃ যে কোনও বিষয়ে ন্যাস বা নস্ত করলে, তা সে যত সূক্ষ্ম, ব্যবধানযুক্ত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূর) হোক, তার বিশিষ্ট জ্ঞান হবে। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক (২।৩।৬) বলছেন, "এতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মহারজনং বাসো, যথা পাণ্ডাবিকং যথেন্দ্র গোপো, যথাঽগ্ন্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্ বিদ্যুত্তের হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি। এই বাসনাময় জীব পুরুষের রূপ হরিদ্রা রক্তবস্ত্রের মত, শ্বেত-হরিদ্রা লোম সূত্রের (wool) মত, ইন্দ্রগোপকীটের মত সিন্দুর রক্ত, নীল-লোহিত অগ্নিশিখার মত, শ্বেতপদ্মের মত, চকিত বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও (২।১১) এই জ্যোতির উল্লেখ আছে—নীহার ধূমার্কানলানিলানাং খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্। এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে"—যোগাভ্যাসে রত ব্যক্তি, ব্রহ্ম অভিব্যক্তিকর যে পূর্ব্ব লক্ষণ সকল, অর্থাৎ জীবের উপাধিময় জ্যোতিঃসমূহ দর্শন করেন, যথা—তুষার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, জোনাকী, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র। এদের স্পর্শও পাওয়া যায়।

সূর্য্যে সংযম করলে ভুবন (Cosmos) জ্ঞান হয়। (১) আকাশে যে সূর্য্য দেখা যায়, তাতে সংযম করলে, সূর্য্যের সমান উপাদানে যা কিছু গঠিত তারই জ্ঞান হতে পারে এবং চক্ষের অধিপতি আদিত্য অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির দ্বারা যা কিছু প্রকাশ্য ভুবনের সেই স্থূল অংশটুকুরও মাত্র জ্ঞান হতে পারে। (২) সূর্য্য যেমন স্থূল জগতের প্রকাশক, বুদ্ধি তেমনি সূক্ষ্ম জগতের প্রকাশক। বুদ্ধি হলো শরীরীর মহত্তত্ত্বের হৃদয়াবচ্ছিন্ন অংশ। আমাদের বুদ্ধি-জ্যোতির সহিত সেই বৃহতী বুদ্ধি-জ্যোতির সহিত সংযোগ আছে। সেই সংযোগমার্গকেই সুষুম্নামার্গ বলে। এই বিশাল মহত্তত্ত্ব স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জ্ঞানের সহায়ক বলে এঁকেও সূর্য্য বলা

হয়। এই মহত্তত্ত্ব ভেদ করে প্রকৃতিতত্ত্ব এবং প্রকৃতিতত্ত্ব ভেদ করে আত্মতত্ত্ব লাভ হয় বলে মহৎ-সূর্য্যকে ব্রহ্মলোকের দ্বার বলে। মনুষ্য-বুদ্ধি যা উপলব্ধি করে তাই হচ্ছে ভূর্লোক বা জাগ্রৎ ভূমি। এর অধস্তন সপ্তলোক পাতাল পর্যান্ত বুদ্ধির আবরণ হেতু যে অসুর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ, প্রস্তরাদি অবস্থাপ্রাপ্ত জীব। বুদ্ধির আবরণের পর আবরণ উন্মোচনের সহিত ভুবঃ হতে সত্য লোক পর্য্যন্ত উপলব্ধি হয়। এ সব কথা আমরা পূর্ব্বে উদ্বোধনে অনেক আলোচনা করেছি।

যৌগিক জ্ঞানে স্বর্গাদি কিরূপ দৃশ্যমান হয়, ভাষ্যকার ব্যাস তার কিছু কিছু নিদর্শন দিয়েছেন—"সুমেরু হচ্ছে ত্রিদশদের উদ্যান-ভূমি—সেখানে মিশ্রবন, নন্দন, চৈত্ররথ ও সমানস বলে চারটি উদ্যান আছে। তা ছাড়া সেখানে সুধর্ম্মা দেবসভা, সুদর্শনপুর এবং বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদ আছে। মাহেন্দ্র লোকবাসীরা ষড়দেবনিকায় (শরীর)—(১) ত্রিদশ,(২) অগ্নিষ্বাত্ত, (৩) যাম্য, (৪) তুষিত, (৫) অপরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী এবং (৬) পরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী। এই সকল দেবতারা সঙ্কল্পসিদ্ধ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য উপপন্ন, কল্পায়ুষ, বৃন্দারক (পূজ্য), কামভোগী, ঔপপাদিক দেহ (যা বাপ মার সংসর্গ থেকে হয় না—অকস্মাৎ সঙ্কল্প শরীর), উত্তম ও অনুকূল অপ্সরাদির দ্বারা পরিচারিত। এঁদের ভোগ তান্মাত্রিক রূপরসাদির সংযোগে ঘটে। ভুব বা পিতৃলোক ও স্বর্লোক মাহেন্দ্র লোকেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রাজাপত্য বা মহর্লোকের দেবনিকায় পাঁচ প্রকার—(১) কুমুদ, (২) ঋভু, (৩) প্রতর্দ্দন, (৪) অঞ্জনাভ ও (৫) প্রচিতাভ। ইঁহারা মহাভূত বশী, সূক্ষ্ম ধ্যানাহার ও সহস্র কল্পায়ু। জনলোক হচ্ছে ব্রহ্মলোকের প্রথমস্তর। এখানকার দেবনিকায় চার রকম (১) ব্রহ্ম পুরোহিত, (২) ব্রহ্মকায়িক, (৩) ব্রহ্মমহাকায়িক ও (৪) অমর। ইঁহারা ভূতেন্দ্রিয় বশী, আয়ু প্রথমদের দ্বিসহস্র কল্প হতে আরম্ভ করে, তার পর পর প্রত্যেকের দ্বিগুণ করে। ব্রাহ্মলোকের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে তপোলোক, এখানে দেবনিকায় ত্রিবিধ—(১) আভাস্বর, (২) মহাভাস্বর ও (৩) সত্য মহাভাস্বর। ইঁহারা ভূতেন্দ্রিয় ও তন্মাত্র বশী। ইঁহাদেরও আয়ু, প্রথমদের ১৬ সহস্র কল্প হতে আরম্ভ কোরে তারপর উত্তরোত্তর প্রত্যেকের দ্বিগুণ করে। ইঁহারা ধ্যানাহার, ঊর্দ্ধরেতা এবং ঊর্দ্ধস্থ সত্যলোকের জ্ঞানের সামর্থ্যযুক্ত এবং নিম্নভূমি সকলের অনাবৃত জ্ঞানসম্পন্ন। ব্রহ্মলোকের তৃতীয় স্তর সত্যলোক — এখানে দিবনিকায় চতুর্ব্বিধ (১) অচ্যুত, (২) শুদ্ধ নিবাস, (৩) সত্যাভ, (৪) সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইঁহারা বাহ্য ভবন শূন্য, স্বপ্রতিষ্ঠ, পূর্ব্বাপূর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থিত প্রধানবশী এবং মহাকল্পায়ু। তন্মধ্যে অচ্যুতেরা বিতর্ক ধ্যানসুখী, শুদ্ধনিবাসেরা বিচার ধ্যানসুখী, সত্যাভেরা আনন্দমাত্র ধ্যানসুখী, আর সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অস্মিতামাত্র ধ্যানসুখী।

সত্যলোক যখন প্রধান বশী, তখন বুঝতে হবে যে, প্রথমেরা বিতর্ক ভূমির নীচেয় নামেন না, দ্বিতীয়েরা বিচার-ভূমির নীচেয় নামেন না ইত্যাদি। কারণ ভূর্লোকেও সবিতর্ক ধ্যান স্বাভাবিক, ভুবঃ স্বর্লোকেও বিচার-ধ্যান স্বাভাবিক, মহঃ জনঃ তপোলোকেও আনন্দ ধ্যান স্বাভাবিক এবং সত্যলোকে অস্মিতাধ্যান স্বাভাবিক। কিন্তু এ সবই মহত্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই মহত্তত্ত্ব সূর্য্যকে ভেদ করে প্রকৃতিতত্ত্ব বা বিদেহ সমাধি ব্রহ্মলোকের চতুর্থ স্তর বলা যেতে পারে। তারপর পুরুষতত্ত্ব যা হচ্ছে তত্ত্বাতীত-তত্ত্ব।

ভাষ্যকার যে অবীচি বা নরকের কথা বলেছেন, সেগুলোকে চেতনার নিম্নভূমি বলা যেতে পারে। স্থাবরত্বই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নরক। রাত্রে বোবায় পেলে যেমন আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়, এ হচ্ছে ঠিক সেইরূপ। ভিতরে সুখ দুঃখের জ্ঞান

আছে, কর্ম্মেচ্ছা আছে, কিন্তু স্থূল (দেহ) ও সূক্ষ্ম (ইন্দ্রিয়) ভোগায়তন ও ভোগকরণ সকল শৃঙ্খলিত।

শাস্ত্রে চন্দ্র শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই চন্দ্রে মনঃসংযোগের দ্বারা ইহার অর্থানুযায়ী নানাবিধ জ্ঞান লাভ করা যায়। যথা (১) চন্দ্রে মনঃসংযোগ করলে তারা ব্যূহ অর্থাৎ রাশিজ্ঞান হয়। চন্দ্র সোয়া দুইদিন অন্তর এক এক রাশিতে যান। চন্দ্রের গতি সংযমের দ্বারা প্রতি তারা-গুচ্ছের জ্ঞান হতে পারে। (২) প্রশ্ন উপনিষদে সূর্য্য ও চন্দ্র প্রাণ ও রয়ির প্রতীক। আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা এতৎ সর্ব্বং যন্ মূর্ত্তঞ্চ অমূর্ত্তঞ্চ তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ (১।৫) রয়ি হচ্ছে সূক্ষ্ম জড় কণিকা (atomic particles) চন্দ্রে মনঃসংযমের দ্বারা চন্দ্রোপাদান জড়-কণিকারূপ তারা-ব্যূহ জ্ঞান হতে পারে। চন্দ্রের নিজের কোনও আলো নেই। কিন্তু সূর্য্যের উপাদান আলোক-কণিকা (light-particles), সেই জন্য জড়-সূর্য্যে মনঃসংযমের দ্বারা তদুপাদান আলোক-কণিকার জ্ঞান হয়। অবশ্য সূক্ষ্ম জড়-কণিকা পরমাণু প্রভৃতি এই আলোক-কণিকার দ্বারা গঠিত। আলোক প্রাণবিশেষ, সূর্য্য আলোকাত্মা, সেই জন্য শাস্ত্রে সূর্য্যকে প্রাণ-প্রতীক বলা হয়েছে। (৩) চন্দ্র মনের অধিপতি। এই মনই পিতৃলোকের গতির কারণ। যাঁরা সকাম সুকৃতকারী, তাঁরা মানসলোকে গমন করেন এবং সেখানে নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় শরীরে শোভিত হন। পিতৃলোক বা ভুবর্লোক মাহেন্দ্র লোকের প্রথম স্তর, একে যাম্যলোকও বলে। এখানকার অধিপতি যম, তিনি অবীচিও শাসন করেন। বাহ্য সূর্য্য স্থূল বিরাটলোকের আলোক-কণিকারূপ উপাদান-তত্ত্বের দ্বার। বুদ্ধি বা মহদাখ্য সূর্য্য প্রাণাখ্য ব্রহ্মলোকের দ্বারা। বাহ্য চন্দ্র সূক্ষ্ম জড় কণিকা তথা রাশিচক্রসমূহ জ্ঞানের দ্বার। চন্দ্র অর্থে যখন মনাধিপতি যাঁর স্থান সুষুম্নার তালুমূল, তখন তিনি পিতৃলোকের দ্বারস্বরূপ। যখন তিনি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন তিনি উৎকৃষ্টতর দেব-লোকের প্রবেশ দ্বার।

ধ্রুবনক্ষত্রে মনস্থির করলে, নক্ষত্র সকলের গতি জ্ঞান হয়। বর্ত্তমান ভূতবৈজ্ঞানিকদেরও নক্ষত্রগতি গবেষণার বিষয়। কিন্তু যোগীরা এ বহুপূর্ব্বে অবগত ছিলেন। শাস্ত্রান্তরে আছে—ধ্রুবও গতিশীল, সেও মহাধ্রুবের চারিপাশে ঘুরছে। কেন্দ্রমুখ আকর্ষণ ও পত্রমুখ বিকর্ষণ গতির সমবায়ে যে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি চক্রাকার, যোগীরা তাও অবগত ছিলেন। আচার্য্য ব্যাস পাতঞ্জল যোগসূত্রের বিভূতি পাদ ২৭ সূত্রে ভুবন-জ্ঞান সম্বন্ধে বলছেন—"গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাস্তু ধ্রুবে নিবদ্ধা বায়ুবিক্ষেপ-নিয়মেন উপলক্ষিতপ্রচারাঃ"—গ্রহ=যারা সূর্য্যের চারিপাশে ঘোরে, যেমন পৃথিবী বৃহস্পতি, শনি; নক্ষত্র—অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টি; তারকা—অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের জন্ম, সম্পৎ প্রভৃতি ৯টি বিভাগ; সকলেই ধ্রুবের কেন্দ্রগ শক্তিতে বদ্ধ হয়ে বায়ু (পত্রমুখ বিকর্ষণ প্রাণদ্বারা) নিয়মিত হয়ে ঘুরছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষানীতি

শ্রীমীরা দেবী

যাঁহার শতবার্ষিকী স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে আজ আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার শ্রীচরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

যাঁহাদের শুভ চেষ্টায় আমরা আজ এই অবতার মহাপুরুষের কৃপার কথা আলোচনা করিবার অধিকারলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহাদিগকেও প্রণামপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রদ্ধেয়া ভগিনীগণ। আপনারা অনেকেই গত ১লা মার্চ্চ হইতে ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে তাঁহার চরিত্রের এবং কার্য্যাবলীর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, আলোচনা, নানা ভাবে, নানা ভাষায় শুনিয়াছেন, আসুন, আজ আমরা বাংলার নারী-সমাজ সকলের সমবেত-চিন্তাদ্বারা তাঁহার নিকট হইতে কি লাভ করিতে পারি, তাহার ঘরোয়া আলোচনা করি। কারণ, তিনি যে আমাদের ঘরের লোক,—অতি আপনার জন। আমি তাঁহার সন্তান, তাঁহার অশেষ কৃপার পাত্রী নিমকহারামীর ভয়ে নারী জাতির প্রতি তাঁহার করুণার কথা কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিবার এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আশা করি, যাঁহারা আজ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা কেবলমাত্র 'কি হয় দেখি' এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই আসেন নাই, যাঁহাকে লইয়া গত এক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীব্যাপী এই বিরাট অনুষ্ঠান চলিতেছে, তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিতেই আসিয়াছেন; তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী জীবন গঠন করিয়া সমাজে, গৃহে শান্তি আনয়ন করিতে পারিলেই যে, সম্যকরূপে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করা হয়, তাহাও মনে করিয়া আসিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রদ্ধা মুখের কথায়, কাণের শোনায় বা চোখের দেখায় মাত্র পর্য্যবসিত না করিয়া, সেই আদর্শ অনুসারে গঠিত জীবনও তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে। এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন, তাঁহার আদর্শে জীবন গঠন অর্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা। সকলেই জানেন, তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মমত সাধনা দ্বারা সেই ধর্ম্মে যে সত্যবস্তু আছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া যে কোনমতে আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত সাধনা করিলে যে ভগবান লাভ হয়, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে কোন্ এক অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এবং নিজে এই যুগে, এই পৃথিবীতে যাহাদ্বারা নাম, যশ, প্রতিপত্তি লাভ হয়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিয়াও জগৎ জোড়া এই নাম প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেন কি করিয়া?

যাঁহারা এতদিন আমাদের অসভ্য বর্ব্বর শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে আজ এই দরিদ্র, তথাকথিত অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের জীবন কাহিনী জানিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে দূর-দূরান্তর দেশসমূহ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কারণ, এমন এক অভিনব জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন, যাহা দেখিয়া জগৎবাসী মুগ্ধ স্তম্ভিত হইয়াছে। এমন বাণী তিনি উচ্চারণ করিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের প্রাণে শান্তি প্রদান করিয়াছে। এমন এক প্রকার কজ্জল তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা মনশ্চক্ষুতে লাগাইলে প্রত্যেক বস্তুই তাহার প্রকৃতরূপ লইয়া উজ্জ্বলভাবে সম্মুখে প্রতিভাত হয়।

তিনি বলিয়াছেন,—নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হও, মন মুখ এক কর, সত্যনিষ্ঠ হও: তাহা হইলেই সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তোমার নিকট প্রকাশিত হইবেন। একজন বিশিষ্ট ইংরাজ মহিলা বলিয়াছেন—তাঁহার কৃপায় আমি হিন্দু হই নাই, বরং একজন অপেক্ষাকৃত ভাল খৃষ্টান হইয়াছি। গত ধর্ম্ম-সভায় উপস্থিত লণ্ডনের সুবিখ্যাত পণ্ডিত সার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড বলিয়াছেন, "খৃষ্টান হইয়া আমি আজ এইকথা বলিতেছি যে, সেই মহাপুরুষ যে দিক দিয়া যে ভাবে আমাদের ধর্ম্মকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা আমাদের ধর্ম্মকে আরো ভালভাবে বুঝিতে পারিয়াছি।" উপরোক্ত কথাগুলি হইতে ইহাই কি বুঝা যায় না যে, তিনি কাহাকেও তাঁহার নিজস্ব ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে বলেন নাই, বরং তাহাতে আরো শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে বলিয়াছেন।

তিনি যেমন সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন, তেমনি স্ত্রী পুরুষ, গৃহী সন্ন্যাসী, উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর মানবের জন্যও ধর্ম্মজীবন লাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। যিনি যেখানে যে অবস্থায় আছেন, সেখানে সেই অবস্থায় থাকিয়াই যে ভগবান লাভ করিতে পারেন, তাহা তিনি শুধু মুখেই বলেন নাই, তাঁহার শিক্ষায় অনেকের জীবনে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে, দেখা গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক মহিলার কথা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় উহাতে মনঃসংযোগ করিতে না পারিয়া, একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উহা নিবেদন করেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভাব বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি?" তিনি ছোট একটী ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা উল্লেখ করিলেন। ঠাকুর তখন বলিলেন, "বেশ ত, তার জন্য যাহা কিছু করবে—তাকে খাওয়ান পরান ইত্যাদি সব গোপাল ভেবে করো, যেন গোপালরূপী ভগবান তার ভিতর রয়েছেন, তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্ছ, পরাচ্ছ।" ঐ ভাবে সাধনায় উক্ত মহিলাটীর ভাবসমাধি পর্য্যন্ত হইয়াছিল।*

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই হউক, কিম্বা কালের গতিতেই হউক, বর্ত্তমান যুগ যে আমাদের সমাজের এক মহাসমস্যার যুগ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিভাবে জীবন-যাপন করিলে যে আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারি, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। নানা নৌকায় পা দিয়া কখনো ডুবিতেছি, কখনো বা হাবুডুবু খাইয়া কোন প্রকারে কূলে উঠিতেছি। যুগোপযোগী জীবন যাপনের নির্দ্দেশ এই যুগের অবতার রূপে জন্মিয়া তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা পালন না করিলে কেমন করিয়া আমরা সুখী হইব? কেমন করিয়া মনুষ্য সমাজে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইব? কি প্রকারেই বা বাঁচিয়া থাকিব? পূজ্যপাদ স্বামিজী বলিয়াছেন—

একমাত্র ধর্ম্মের দ্বারাই আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে পারিব এবং তাহা লাভ করিবার উপায় এই যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণের শক্তি লইয়া একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতেই জানিয়া লইতে হইবে।

তাঁহার আদেশ পালন করিয়া খৃষ্টান যদি প্রকৃত খৃষ্টান হন, মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হন, হিন্দু যদি প্রকৃত হিন্দু হন, তাহা হইলে জগতে এত দ্বন্দ্ব, এত বিরোধ, অশান্তি, দুঃখকষ্ট থাকিবে কি? তখন যে সকলেই "রামরাজ্যে" বাস করিতে থাকিব।

বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রকৃতিস্থ হইলে যেমন জগতের অশান্তি দূর হইবার সম্ভাবনা, তেমনি আমরা স্ত্রীজাতি যদি তাঁহার উপদেশে প্রকৃতিস্থ হই, অর্থাৎ প্রকৃত কন্যারূপে, ভার্য্যারূপে, মাতৃরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠি, তাহা হইলে প্রতি গৃহের দুঃখ অশান্তি অনেকাংশে প্রশমিত হইবে না কি?

* লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩১ পৃষ্ঠা।

ঠাকুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ তিনটী অংশ বাংলার তিনজন মহীয়সী নারী বিশেষভাবে অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সাধনার স্থান প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন স্বনামধন্যা পূজনীয়া রাণী রাসমণি; গুরুপদে অধিষ্ঠিতা হইয়া তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবমত সাধনায় সাহায্য করিয়াছেন পূজনীয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী; আর পত্নীপদে বৃতা হইয়া, এক শয্যায় শয়নের অধিকার পাইয়া, অথণ্ড ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া, জগৎ জুড়িয়া এক অত্যাশ্চর্য্য আদর্শ স্থাপনে সাহায্য করিয়াছেন আমাদের মাতাঠাকুরাণী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদা-মণি দেবী, যিনি পরবর্ত্তী জীবনে পরমারাধ্য স্বামীর আরব্ধকার্য্য জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম, ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুপদে বরণ করিয়া, দ্বিতীয়, নিজ পত্নীকে জগদম্বারূপে পূজা করিয়া যে শ্রদ্ধা, যে সম্মান তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন, যুগযুগান্তর ধরিয়া অবনতমস্তকে পূজার অর্ঘ্য তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেও আমরা ঋণমুক্ত হইতে পারিব কিনা সন্দেহ।

এমন কি, বারবনিতার মধ্যেও জগন্মাতাকে সাক্ষাৎকার করিয়া তিনি অবাক হইয়া এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "মা তুই এখানেও এইভাবে আছিস্?" চণ্ডীতে আছে :—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে এই স্তুতি যে কতদূর সত্য, জগজ্জননী যে প্রতি স্ত্রীমূর্ত্তিতে মহামায়ারূপে বিশ্বে বিরাজিতা, তাহা অনায়াসে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার ঐ উক্তি দ্বারা তিনি যেন নারীকুলকে ইহাই বলিতেছেন, নারী, তুমি নরকের দ্বার নহ, তুমি কেবলমাত্র পুরুষের ভোগ্য বস্তুও নহ, তুমি বিদ্যারূপে জগদ্ধাত্রী—সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি পালনকর্ত্রী; তুমি মহামায়া, তুমি প্রসন্না না হইলে ইহকালে পরকালে জীবের গতি নাই। মনুও বলিয়াছেন :—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।"

কিন্তু নারী আবার অবিদ্যারূপে ধ্বংসকারিণী, যে সংসারে নারী উগ্রচণ্ডা, রুদ্রাভয়ঙ্করীরূপে বিরাজ-মানা, সেখানেই বা শান্তি কোথায়?

আমরা সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখিতে পাই, প্রতি গৃহের, প্রতি জাতির উন্নতির মূল কোন না কোন মহিমময়ী নারী। যে যে দেশে যে যে মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেইখানেই দেখা যায়, পিতা অপেক্ষা তাঁহার জীবনে মাতা অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের মত সর্ব্বপ্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশে মেয়েদের—মায়েদের যে কত উন্নত সৎশিক্ষানিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন আবশ্যক, তাহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে আমরা প্রত্যেকেই অনায়াসে বুঝিতে পারিব।

আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিতে বসিয়াছিলাম, সেই সময় তিনি তাঁহার বাণী, তাঁহার আদর্শ, আমাদের কল্যাণের জন্য, কালের স্রোত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, কঠোর সাধনাদ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি এখনও সেই ছাঁচে নিজ নিজ জীবন ঢালাই করিয়া লইবার চেষ্টা না করি, তবে সভ্যজগতে মানুষ বলিয়া কেমন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব? স্বামিজী বলিয়াছেন, "পঞ্চাশজন পুরুষের কষ্টসাধ্য কর্ম্ম পাঁচজন মেয়ে অনায়াসে করিতে পারে।" আসুন, সকলে সাক্ষাৎ শঙ্কররূপী স্বামিজীর বাক্য সফল করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। অনন্ত শক্তির আধার আমরা, আমরা ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি। এই উৎসব শেষ হইবার সঙ্গে যদি আমরা তাঁহার কথা ভুলিয়া যাই, জীবন গঠনে সচেষ্ট না হই, তাহা হইলে এই উদ্যোগ-আয়োজন সমস্তই ব্যর্থ হইবে। ভগিনীগণ, আসুন, আজ সকলে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের প্রাণে নবীন বল, নব প্রেরণা দিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যে নিষ্ঠাবতী করিয়া, দেশের সমাজের ও গৃহের কল্যাণরূপিণী, শান্তিদায়িনী হইতে আশীর্ব্বাদ করুন। আমরা যুক্তকরে তাঁহাকে আবার প্রণাম করি :—

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্ম স্বরূপিণে
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।*

---

* কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী মহিলা-সম্মেলনে পঠিত।

জলজান

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্-এস্-সি

বিশ্বকর্ম্মা জগৎ সৃষ্টি আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়া প্রথমতঃ কতকগুলি মূল পদার্থ রচনা করিলেন। তাহাদের মধ্যে দুই চারিটী এখন নিখোঁজ। কিন্তু বেশীর ভাগই তাঁহার হাতের পুতুলী হইয়া অধুনা ভাঙ্গাগড়ায় সাহায্য করিতেছে। এ সমস্ত মৌলিকদের মধ্যে জলজানের স্থান বিশেষ উচ্চে। জলজান উহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিলেও ভুল হয় না; কারণ রাসায়নিক হিসাব-নিকাশ দ্বারা দৃষ্ট হয় যে, বস্তুজগতে উহাই প্রথম পরিচয়। তারপর অন্যান্য মৌলিকগুলি একে একে অবতীর্ণ হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ গবেষকগণ বলেন, জলজানের পরমাণুদ্বারাই উহাদের পরমাণু গঠিত। বর্ত্তমানে ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠদের মধ্যে নিজকে বিলাইয়া দিয়া বিশ্বমাঝে ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে। মৌলিকদের পরিচয়ে—উহাদের ডালপালা জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

জগৎটা প্রথমতঃ বায়বীয় মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। তখন জলজানই কয়েকজন সহযোগীসহ বিশ্বদেহের সূত্রপাত করে। ইহা হালকা বায়বীয় পদার্থ। পৃথিবী স্থূলরূপ পরিগ্রহ করিলে প্রথম যখন রাসায়নিকের দ্বারা ইহা শৃঙ্খলিত হয় (১৭৬৩ খৃঃ), তখন উহার ঐরূপ বায়বীয় আকার এবং সঙ্গে সঙ্গে দাহগুণ দেখিয়া উহার নামকরণ হয় 'দাহ্য বায়ু'। সম্ভবতঃ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মহাত্মা কেভেন্‌ডিস্, (Cavendish) এজন্য ধন্যবাদার্হ। সে দিনের এক একজন বৈজ্ঞানিককে দেবতা স্থানে বসাইয়া পাদ্যার্ঘ্য দিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহাদের শক্তিমত্তার পরিমাপ করা আধুনিক ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক-দের পক্ষে অসাধ্য। কেভেন্‌ডিস্ জলজানের আবিষ্কার করিলেন কিন্তু উহার নামকরণের ভার রহিল রসায়নশাস্ত্রের জনৈক বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভসিয়ারের (Lavoisier) উপর (১৭৮৩ খৃঃ)। ধন্য—লেভসিয়ার। তোমার নাম স্মরণ করিয়া বিশ্ববাসী আজ কৃতকৃতার্থ।

জলজানকে প্রকৃতির রাজ্যে মুক্তাবস্থায় পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরির ধূমোদ্গিরণ রাসায়নিকের নিকট এক কৌতুহলের ব্যাপার। যাহাকে আমরা ধ্বংসক মনে করি, তাহাও যে কত বড় সংরক্ষক তাহা বিচার করিবার বুদ্ধি বিবেচনা আমাদের নাই। কল্যাণময়ের আশীর্ব্বাদ ঝঞ্ঝাবাত্যায়ও প্রকাশিত হয়। আগ্নেয়গিরি প্রভৃতির প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে আমরা অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু উহাদের মধ্যে বিরাটপুরুষের কি অভিলাষ লুক্কায়িত আছে তাহা ভাবিবার সুযোগ একটুও খুঁজি না। আগ্নেয়গিরি প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকদের অধ্যয়নের জন্য এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। কত নূতন মৌলিক পদার্থের লীলাক্ষেত্র সেখান হইতে সম্প্রসারিত হয়। রসরাজের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে ইহা বিশেষ পটু। জলজানকে উহার ধূমের মধ্যে পাওয়া যায়। জলজানজাতীয় বায়ু সময় সময় পর্ব্বতের বুক চিড়িয়াও বহির্গত হয়। সাধারণ বায়ুতে ইহার শতাংশের ০১ ভাগ বর্ত্তমান। ঐরূপ সূক্ষ্মদেহ লইয়া ইহার এই স্থূল পৃথিবীতে মুক্তাবস্থায় বাস করার আশা বাতুলতামাত্র। এইজন্য আকাশের সর্ব্বোচ্চস্তরে

জলজানের বাসস্থান লক্ষিত হয়। জ্যোতির্ম্মণ্ডলে বাস করাই যেন ইহার একান্ত অভিলাষ। সুদূর তারকারাশিতেও যে ইহার প্রাচুর্য্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পদার্থবিদ্ তাঁহার যন্ত্র সাহায্যে আকাশমণ্ডলকে চুলচেরা পরীক্ষা করিয়াছেন, সূর্য্য-মণ্ডলে ইহার বিশাল রাজত্ব। বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদৃষ্টি এখানেও ইহার পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছে। সূর্য্যকে ঘিরিয়া এক জলন্ত জলজান-আবরণ দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে—এমন কি উক্ত অগ্নিশিখার উচ্চতাও মোটামুটি স্থিরীকৃত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ মাইলব্যাপী এই তেজরাশির ঢেউ প্রথমতঃ অধ্যাপক ইয়াং এর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। স্বপ্নেও মানুষ এই অসীম জলজানরাশির কথা ভাবিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, এই বিশাল জলজান আমাদের পৃথিবীর মত হাজার হাজার পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। পণ্ডিতগণ বলেন, আমাদের সূর্য্যের মত আরও কত শত সূর্য্য যে ইহাতে বর্ত্তমান, তাহার পরিমাণ করা কাহারও সাধ্য নাই। বিরাট পুরুষের অসীম কার্য্যক্ষেত্রের কথা ভাবিলেও হতবুদ্ধি হইতে হয়। সাধারণ বৈজ্ঞানিক সামান্য একটু কাজের সাড়া জাগ্রত করিয়া অহংকারে আত্মহারা হইয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একবার এই অপরূপ কার্য্য চাতুর্য্যের কথা ভাবেন, তবে তাঁহাদিগকে আর দাম্ভিকতার বোঝা বহন করিতে হয় না। কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী সুদূর পল্লীতে যে জলজান বর্ত্তমান তাহার একটা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণও একবার পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অদৃশ্য জগৎ হইতে একটি আগন্তুক হঠাৎ আসিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে পতিত হয়। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল শুদ্ধ কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করার সুযোগ পাইয়া উক্ত আগন্তুক উল্কাফলকটীকে বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করা হয়, ফলে দেখা যায় যে, উহাতে জলজানের মাত্রাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা সূক্ষ্মদেহের শেষ আবাসস্থল কোথায় তাহার কতকটা আঁচ করিতে পারি। মানুষের প্রাণবায়ু যখন স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে, তখন সেই সূক্ষ্ম বায়বীয় শক্তি কোথায় যায়, এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উত্থিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা কোন এক উর্দ্ধপথে ছুটিতে থাকে, পরে যথাযোগ ধামে উপস্থিত হইয়া পরমপিতার নির্দ্দেশমত স্বর্গসুখ বা নরকদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

জলজান এত হাল্কা শরীর লইয়াও আমাদের জন্য ধরাধামের মায়া এড়াইতে পারে নাই। পৃথিবীর বুকে ইহাকে নানাভাবে নানাশরীরে রাসায়নিক সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ দেখা যায়। আকর্ষণের এতই টান। পৃথিবীর প্রাণস্বরূপ যে জলরাশি তাহার ⅑ ভাগ জলজান। তুলাদণ্ডে তুলিলে কেবলমাত্র জলের মধ্যেই উহাকে পাওয়া যায় হাজার হাজার কোটি মণ। পৃথিবীস্থ জান্তব বা উদ্ভিদ পদার্থের মধ্যে ইহা কোন না কোন প্রকারে বিজড়িত আছে। অনেক সময় দেখা যায়, উদ্ভিদের নিঃশ্বাসের সাথে জলজান উত্থিত হইতেছে। যাবতীয় অম্ল (Acid) ও তীক্ষ্ণ ক্ষার (Alkali) পদার্থের মধ্যে ইহা অবিচলিতভাবে বর্ত্তমান।

জলজান গ্যাসটী প্রত্যেক অম্লের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়া তাহা হইতে ইহাকে মুক্ত করিবার যে প্রণালী আছে, তাহাই ইহাকে পাইবার সহজ প্রণালী বলিয়া অভিহিত হয়। তীক্ষ্ণ ক্ষার পদার্থ হইতেও ইহাকে মুক্ত করিবার বিধি আছে। রসশালায় ইহাকে পাইতে হইলে জলমিশ্রিত সল্‌ফিউরিক অম্লের মধ্যে দস্তা (Zinc) নিক্ষেপ করিতে হয়, তখন জলজান বুদ্‌বুদাকারে বহির্গত হইতে থাকে। ভীষণ ফুটন্ত জল বা জলবাষ্প যদি উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ, দস্তা, এলুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম (Magnesium) বা অঙ্গার পদার্থের

সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে জলজান জল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আমাদের হস্তগত হয়। ব্যবসাক্ষেত্রে শেষোক্ত পদ্ধতিটাই অধুনা বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

রসায়ন শাস্ত্রের অনেক কিছু ব্যাপার অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া সাধারণ লোকের নিকট প্রতিভাত হয়। প্রকৃতির রাজ্যেও এরূপ সব অদ্ভুত ব্যাপার সময় সময় সংঘটিত হয়, যাহার রহস্য মুক্ত করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব না হইলেও রাসায়নিক বা পদার্থবিদের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অনটন হেতু আজও আমাদের দেশে বহু রাসায়নিকঘটনাকে কদর্থে পরিণত করা হইতেছে। পাশ্চাত্যদেশও এখন পর্যন্ত এরূপ ভুলভ্রান্তি হইতে মুক্ত নয়। জলজান যদি বায়ুর বা অম্লজানের (Oxygen) সহিত সাধারণভাবে মিশ্রিত হয় এবং সেই মিশ্রিত বায়ুতে যদি অগ্নি সংযোগ করা যায়, তবে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ উপস্থিত হয়। শুনা যায়, একবার একটি বহুমূল্য জাহাজ এরূপ একটি বিস্ফোরণের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণ-লোক কিন্তু এরূপ অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনাকে ভূত বা দৈবের ঘাড়ে চাপাইয়া হাহুতাশ করিবেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ ত এতটা সহজ বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট নন্। তাঁহারা খুঁজিয়া দেখিবেন যে, কোথায় ধ্বংসলীলার মূলসূত্র। তাঁহাদের গবেষণার পেছনে থাকে প্রবল মানসিক বল ও কর্ম্ম-প্রবণতা। এক্ষেত্রেও জাহাজ হইল ধ্বংস, বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিলেন। জাহাজের ফুটন্ত জলাধারের (Boiler) মধ্যে মূর্খ কারিকরগণ ভুলক্রমে কয়েক টুকরা দস্তা ফেলিয়া যায়। সেই দস্তাগুলি ফুটন্ত জলের সংস্পর্শে আসিয়া জলজানকে মুক্ত করিয়া দেয় এবং উক্ত জলজানাবলী ক্রমশঃ জলাধারস্থ বায়ুর সাথে মিশ্রিত হইয়া এক ভীষণ বিস্ফোরক গ্যাসে পরিণত হয় এবং কালক্রমে জাহাজটিকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে। অসাবধানতার সাজা স্বরূপ এরূপ ব্যাপার সকল দেশেই নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কোন লোক রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লৌহের উপর জল নিক্ষেপ করিতে থাকে, তাহাতেও যে এরূপ অগ্নিকাণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা কি কাহারও ভাবিবার বুদ্ধি আছে? এরূপ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের ফলে ইংলণ্ডের একটি লৌহ-কারখানায় সত্য সত্যই একটি ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। এমন কি রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকাগুলি পর্যন্ত উক্ত বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। দুইটি সূক্ষ্ম গ্যাসের যোগাযোগে কি বিরাট প্রলয় কাণ্ডই না সম্পাদিত হইতে পারে। সূক্ষ্ম জিনিসেরও কত বড় তেজ, এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহার কতকটা পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

ভারতবাসীর নিকট জলজান খুবই অপরিচিত কিন্তু এরূপ তামসিক নির্লিপ্ততা ভাল নয়। প্রত্যেক মৌলিকের সাথে আমাদের ভাব করিতে হইবে। ব্যবহারিক জীবনে সফলতার স্বাদ পাইতে হইলে রসায়নের সাথে ঘনিষ্ঠতা করা একান্ত দরকার। মেয়েদের পর্যন্ত এ বিষয়ে তৎপরতা দেখান অবশ্য কর্ত্তব্য। জলজানকে না চিনিলেও জলজানঘটিত অনেক কিছু জিনিষ আমরা সম্ভোগ করিয়া থাকি। অনেক তৈল আছে, যেগুলিকে শক্ত তৈলে পরিণত করিবার জন্য জলজানের আশ্রয় নিতে হয়। আধুনিক উদ্ভিদ ঘি (Vegetable ghee) ঐরূপ একটা সংস্করণ। জলজান ও অম্লজান মিশ্রিত যে অগ্নিশিখা তাহার তাপ খুব বেশী। এজন্য বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে উক্ত অগ্নিশিখা ব্যবহার করার বহুলপ্রচার আছে। দুর্গন্ধযুক্ত তৈলকে জলজানের সাহায্যে গন্ধমুক্ত করা যায়। এমন কি এমোনিয়া (Amonia) নামক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ার করিতে ইহারই সহায়তা দরকার।

জলজানেব হাল্কা স্বভাবটি মানুষের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কারণ হয় নাই। বায়ুর চেয়ে ১৪ গুণ হাল্কা হওয়াতে বেলুন নামক উড়ো-জাহাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ইহাব দ্বাবাই সম্ভব হইয়াছে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্যাবিসে সর্ব্বপ্রথম জলজানেব সাহায্যে আকাশে বেলুন উত্থিত হয়। রেশমের তৈয়াবী হাল্কা দেহকে জলজান দ্বাবা ভবপুব কবিয়া ছাড়িয়া দিলে হু হু করিয়া উহা উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। বহুদূব পর্য্যন্ত এরূপ উড়োজাহাজ উঠিতে পাবে। কথিত আছে বিখ্যাত পণ্ডিত গে লুজাক ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ২৩,০০০ ফিট্ উচ্চে উঠিয়াছিলেন, এবং অনৈক ভদ্রলোক ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৩০,০০০ ফিট্ উঠিয়া পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চস্থানে আবোহণ করিবাব প্রশংসা পত্র পাঠাইয়াছিলেন। আজকাল বৈদ্যুতিক যুগ। বৈদ্যুতিক কল-বাহনে অধুনা বহুদূব পর্য্যন্ত উত্থিত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু জলজানেব সাহায্যেও যে মানুষ কত বড অসম্ভব কাণ্ড করিত তাহাও ভাবিবাব বিষয়। পৃথিবীব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যৌগিক পদার্থে জলজান বর্ত্তমান। ইহাকে অবহেলা করা মূর্খতাব পবিচায়ক। ভারতবাসীকে এ শিক্ষা এখন গ্রহণ করিতে হইবে।

অভিমানী

শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

মানুষ তোমাবে সৃজন কবেছে,
ধ'বেছে বুকেব 'পব।
প্রাণেব দেউলে অর্ঘ্য দিয়েছে,
জুড়িয়া আপন কব॥

সবাব উপবে আসন দিয়েছে,
ভক্তি কুসুম কত—
তোমাব স্বরূপে নিজেবে খুঁজেছে,
ভুলিয়া আপনা যত॥

কত যুগ ধ'বে কেঁদেছে মানব,
তব অভিমান তবে।
কত ব্যথা ব'য়ে ফিবেছে,—জান কি ?
সুদূবে—বনান্তবে॥

খুঁজেছে তোমায় বিটপীলতায়,
বনবীথিকায় ঘুরে।
শৈল-শিখবে সাগরেব জলে,
তটিনীর তীরে তীরে॥

ত্যজেছে মানুষ বাজসুখ ভোগ,
বমণীব প্রেমডালা।
হ'য়েছে ভিখাবী, হাবায়েছে আঁখি,
গেঁথেছে অশ্রুমালা॥

আকুল আবেশে তব পিছু পানে,
মানুষ ছুটেছে যত।
তুমি ওগো প্রিয় দূবে স'বে গেছ,
দুষ্ট, খোকাব মত॥

জানি সখা তুমি বড অভিমানী,
সহজে চাহ না ফিবে।
মানুষ কেবলই মবে ঘুবে ঘুবে,
তোমারই প্রেমেব তরে॥

তোমাব স্বরূপ আমাবও মাঝেতে—
আমিও সে মায়া জানি।
আমিও এবার রব দূরে দূবে,
রেখ মনে, ওগো মানী॥

গীতার প্রথম অধ্যায়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী, বি-এ, বি-এস্‌সি, বি-টি

শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রথম অধ্যায় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা বা উপক্রমণিকা, এই বিবেচনায় অনেকেই এই অংশকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং এই অধ্যায়ের সার্থকতা সম্বন্ধে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। ইহা সত্য যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতেই গীতোক্ত ধর্ম্ম ও তত্ত্বকথার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্ব-লিখিত বিষয়ে উপযুক্ত ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি যে, বহু লোকেই গীতা পাঠ করিতেছেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই গ্রন্থোক্ত ধর্ম্মের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, কোন বিষয়ে যে অনধিকারী, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলেও অকৃতকার্য্য হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। সেইজন্য আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব, গীতার প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে যিনি সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনিই গীতোক্ত ধর্ম্মশিক্ষা করিবার অধিকারী, অন্যে নহে।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে সংসারের সাধারণ অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে। সূচনাতেই ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদে দেখান হইয়াছে যে, জগতে দুই শ্রেণীর মানব বর্ত্তমান—কেহ জন্মান্ধ, তাঁহারা এই জগতে বাস করিয়া বৃদ্ধত্ব লাভ করিলেও, জগৎ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করেন না, এমন কি তাঁহাদিগকে দৃষ্টিশক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না, এতই বদ্ধজীব ইঁহারা। এই শ্রেণীর মানবই অধিক, এই জন্য ইঁহাদের প্রতিনিধিকে ধৃতরাষ্ট্র বা যাহাদ্বারা সংসার গঠিত—এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণী—বিদ্বান, ইঁহারা অজ্ঞানকে সম্যক্ জয় করিয়াছেন বলিয়া ইঁহাদের প্রতিনিধি সঞ্জয় নামে কথিত হইয়াছেন। ইঁহারা দূরদর্শী ও পণ্ডিত বটেন, কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্ত সাধক নহেন। সুতরাং ইঁহারা পরকে উপদেশ ও জ্ঞান বিতরণ করিয়াই জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিতে না পারিলেও, আমরা ইঁহাদের নিকট ধর্ম্মের পন্থা ও তথ্য অবগত হইতে পারি। অতএব সঞ্জয় গীতার বক্তা।

এই জগৎ ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে জাগতিক লোকেরা স্বার্থবুদ্ধিতে পরস্পর যুযুৎসবঃ বা বিবদমান। ইহার মধ্যে কেহ বা স্বার্থান্ধ, যথা কৌরবগণ, আর কেহ বা নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য ও মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নবান, যথা—পাণ্ডবগণ। ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞানতাপ্রসূত সন্তানগণ পাপকর্ম্মা। ধৃতরাষ্ট্র বিবেকসম্পন্ন হইলেও তিনি প্রবল দুষ্প্রবৃত্তিরূপ সন্তানগণকে সংযত রাখিতে অক্ষম। তিনি কেবল আশা করেন যে, এই কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া এখানেও দুইপক্ষের সুবুদ্ধি জন্মিতে পারে, তাই সমবেত পক্ষগণ 'কিমকুর্ব্বত' অর্থাৎ কি করিলেন, তিনি এই প্রশ্ন করিতেছেন।

অতঃপর যুদ্ধোদ্যমের যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহাতে সাংসারিক লোকের রীতিনীতি পরিস্ফুট হইয়াছে। পাপকর্ম্মের সাহায্যকারী লোকের অভাব নাই, সেইজন্য কৌরবপক্ষে সংখ্যাধিক্য। বিশেষতঃ ধনীরা অর্থদ্বারা বহু লোককে বশীভূত রাখেন এবং তাহারা 'মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ' অর্থাৎ নিজ জীবন দিয়া প্রভুর ভালমন্দ সকল কাজে

সাহায্য করিবে, এইরূপ আশা করেন। ভীষ্ম ও দ্রোণের ন্যায় অনেক সাধুব্যক্তিও ধনীদের অর্থে প্রতিপালিত হইয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁহাদের অসৎ কার্য্যেও সহায়তা করেন। কিন্তু পাপীদের অন্তঃকরণে দুর্ব্বলতা ও ভীতি স্বতঃই বিদ্যমান। সেইজন্য রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান না করিয়া স্বয়ংই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া—'উপসঙ্গম্য'—পরামর্শ করিতেছেন। পাণ্ডবগণ সৈন্যসংখ্যায় কম হইলেও, রাজা তাঁহাদের সম্বন্ধে "মহতী চমূ", 'পাণ্ডবানীক,' 'ইঁহারা সকলেই মহারথ' ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন এবং দ্ব্যর্থবাচক 'পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার ভীষ্ম তাঁহার হর্ষোৎপাদনের চেষ্টা করিলেও পাণ্ডবগণের শঙ্খ নির্ঘোষে কৌরবগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

বস্তুতঃ দ্বিতীয় হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত মানবের আত্মপর ভেদজ্ঞানের প্রকটমূর্ত্তি বিবৃত হইয়াছে। 'ইহারা আমার আপন—মামকাঃ' আর 'ইহারা পর' এই বিচার আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে করিয়া থাকি এবং যাহাকে আপন বলিয়া মনে করি, তাহার স্বার্থ ও সন্তোষবিধানার্থ প্রাণপণ করিয়া থাকি। আর যে পর, তাহার অনিষ্ট যে প্রকারেই হোক্, সাধন করিতে সচেষ্ট থাকি। এই ভেদবুদ্ধিই আমাদিগকে জাগতিক প্রায় সকল কার্য্যে প্রণোদিত করিয়া থাকে।

দ্বাদশ হইতে ঊনবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত শঙ্খ-ধ্বনির বিবরণ। স্বতঃই মনে হয় যে, এই শঙ্খই আমাদের অহমিকার প্রতীক। আমরা জগতে নিজ নিজ শঙ্খ বা ঢাক বাজাইয়া আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সর্ব্বদা সমুৎসুক নহি কি? আমরা যদি কাহাকেও শঙ্খ বাজাইতে দেখি বা শুনি, তখনই আমরা নিজের শঙ্খ না বাজাইয়া স্থির থাকিতে পারি কই? তাই একের পর অন্যে যখন পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইয়া নিজেদের যোগ্যতার ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিল, তখনই জগতের আত্মাভিমানগ্রস্ত মানবসমাজের প্রকৃত চিত্র উদ্ভাসিত হইল।

ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা সচরাচর ঘটে না। সাধারণতঃ এই শঙ্খধ্বনির স্পর্দ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইয়া শস্ত্রসম্পাত আরম্ভ হইয়া যায় এবং বিনাশ ঘটে, কিন্তু এক্ষেত্রে ধনু উত্তোলন করিয়াও অর্জ্জুনের মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে, 'কাহার সহিত যুদ্ধ করিব?' ধন্য তাহার মানবজন্ম, যে ব্যক্তি কার্য্যে অগ্রসর হইয়া ক্ষণিকের জন্যও এই চিন্তা করে যে, 'কি করিতেছি'। জগতে সকলেই ত যাহাকে শত্রু মনে করিয়াছেন, তাহার নিধন, আর যাহাকে আত্মীয় মনে করিয়াছেন তাহার স্বার্থ-সাধন, জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাহা অবিচারিতভাবে সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন। কাহারও জন্যও মনে প্রশ্ন উঠিতেছে না—'কি করিতেছি'। সৌভাগ্যক্রমে যদি কাহারও মনে 'জিজ্ঞাসা' উপস্থিত হয়, তবে তাহাতেও নিস্তার নাই, কারণ, এক ভ্রম হইতে মুক্ত হইয়া আবার তদপেক্ষা ঘোরতর মোহে আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে, অর্জ্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল।

সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ধনু উত্তোলন করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাহার সহিত যুদ্ধ করিব'?—এই প্রশ্ন অত্যন্ত অস্বাভাবিক। পূর্ব্বেই তাঁহার বেশ জানা ছিল যে, তিনি আত্মীয়গণের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন; অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়গণকে দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তরের কোন কারণ দেখা যায় না। ইহা এক রহস্য বটে, কিন্তু ইহাই আমাদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জাগতিক আত্মপর ভেদবুদ্ধি দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই চালিত হইয়া থাকি। কৌরবগণ আত্মীয় হইলেও অর্জ্জুন এতদিন তাঁহাদিগকে শত্রুজ্ঞান করিয়াছেন। কারণ,

উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার সুযোগ তাঁহার গৃহে থাকাকালে ঘটে নাই। আমরা ঘরে-ঘরে কত আত্মীয়কে শত্রু মনে করিয়া বিবাদে রত রহিয়াছি, একবার উভয়পক্ষ সম্মুখীন হইলে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার সুবুদ্ধি হইলে, তৎ-ক্ষণাৎ পরস্পর পরমাত্মীয় জ্ঞানে আলিঙ্গন করা কিছুই বিচিত্র নহে এবং তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

তারপর যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা। শ্রীকৃষ্ণ গৃহে বসিয়া অর্জ্জুনকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেই পারিতেন, এ কথা সত্য। গৃহে তো দূরের কথা, তিনি কত লোককে লোকচক্ষুর অগোচরে নিবিড় বনে, গভীর গিরিগুহায় এবং উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখরে জন্ম-জন্মান্তরে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এ তো সন্ন্যাস-ধর্ম্মের শিক্ষা নহে, এ যে কর্ম্মযোগের শিক্ষা। এই সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়াও, কি করিয়া চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, তাহারই শিক্ষা; ইহার স্থান যুদ্ধক্ষেত্র না হইলে চলিবে কেন? গীতায় আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে, সংসারের মোহ ও অশান্তি দূর করিবার জন্য আমাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া তপস্যারত হওয়ার প্রয়োজন নাই। সংসারে থাকিয়াও ধর্ম্মলাভ হইতে পারে, তবে সময় সময় মনে প্রশ্ন তুলিতে হইবে 'কি করিতেছি'। যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও একটু অবসর করিয়া হৃদয়ের দেবতা হৃষীকেশকে বলিতে হইবে যে, উভয় সেনার মধ্যস্থলে নিরপেক্ষভাবে রথকে একটু স্থির কর, আমি পূর্ব্বাপর, অগ্রপশ্চাৎ একবার নিরীক্ষণ করি, আমি যাহাকে শত্রু মনে করিয়াছি, সে আমার প্রকৃত শত্রু না পরমাত্মীয়, একটু বিবেচনা করি। তামাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই—একটু অবসর করিতে বলা হইয়াছে মাত্র, এক একজন মহারথ আমরা, দিনরাত্রির মধ্যে আমাদের সময়ের বড় অভাব কি না।

আপাতদৃষ্টিতে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুন এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে বিজ্ঞের মতই কথা বলিতেছেন—(প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে) কিন্তু শ্রীভগবান এই অবস্থাকে 'ক্লৈব্য' এবং 'কশ্মল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ কাহাকেও শত্রু মনে করিয়া তাহাকে আক্রমণ করা যেরূপ পাপ, কাহাকেও আত্মীয় মনে করিয়া আবশ্যক-স্থলে তাহাকে শাসন এবং প্রয়োজন হইলে তাহার নিধন না করা ততোধিক পাপ, কারণ শত্রুজ্ঞান-রূপ ভ্রম সহজে বিদূরিত হইতে পারে কিন্তু মিত্রজ্ঞানরূপ ভ্রম দূরীভূত হওয়া কঠিন। তাহা ছাড়া শত্রুনিধনে পৌরুষ আছে আর আত্মীয়-পোষকতা দুর্ব্বলতার নামান্তর। বীরত্ব রজোগুণের প্রকাশ, আর কাপুরুষতা তমোগুণের ফল। অর্জ্জুন যেমন বুঝিয়াছিলেন যে, স্বজন বধকরা পাপ আর যুদ্ধে জয় বা রাজ্যৈশ্বর্য্যলাভ না হয় সেও স্বীকার, তথাপি ধনুঃশর ত্যাগ করাই শ্রেয়, তেমনি আমরাও সর্ব্বত্র দেখিতেছি যে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কতলোক নিষ্ক্রিয়তাকে অবলম্বন করিয়াছেন। অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহারাও বহুপ্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া থাকেন যে, তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তা ধর্ম্মসঙ্গত। কিন্তু অর্জ্জুনের এই সকল যুক্তি সমীচীন মনে হইলেও ইহার প্রধান দোষ হইয়াছে এই যে, তিনি ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, লাভালাভ, আত্মীয়-অনাত্মীয়-জ্ঞানদ্বারাই বিচার করিতেছেন। কিসে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় যদি তাহাই বিবেচনা করিতেন এবং সেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় নিজের সুবিধা অসুবিধা উপেক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর তিনি হতবুদ্ধি হইতেন না। যুগপ্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ এই সমস্ত তমো-গুণাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধর্ম্মধ্বজিতা এবং সাত্ত্বিকতার বড়াই যে সম্পূর্ণ অসার তাহা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে রজোগুণের চেষ্টা আবশ্যক এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানও ইহাকে অনার্য্যজুষ্ট, অস্বর্গ্য, অকীর্ত্তিকর, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বিশেষণে নিন্দিত করিয়াছেন।

এই উভয় প্রকার বন্ধন হইতে মানবাত্মাকে মুক্ত করার জন্যই গীতা অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু গীতা কার্য্যকরী হইবে তাঁহার প্রতি যাঁহার এই বন্ধনের বেদনা জন্মিয়াছে, যিনি শোকসংবিগ্নমানস ও বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা ত হাতের বেড়ী ও পায়ের শিকলকে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার জ্ঞানে আনন্দে নৃত্য করিতেছি, আমরা শত্রু-নিধনে আপনার শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ না করিয়া কাপুরুষোচিত ব্যবহার করা সঙ্গত মনে করিতেছি, আমরা অর্জ্জুনের ন্যায় ত্রৈলোক্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করা শ্রেয় মনে করিতেছি। কিন্তু ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে এ সমস্তই ভ্রম এবং মোহ। সত্য কি, এবং কর্ত্তব্য কি—তাহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতেছি কই? বুঝিবই বা কিরূপে? আমরা ত কেহ নিজ নিজ শঙ্খনিনাদে ব্যতিব্যস্ত, কেহ বা কঠোর কর্ত্তব্য দেখিয়া কম্পমান (বেপথুঃ), কেহ বা ত্যাগপন্থী, আর কেহ জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম রক্ষণের দোহাই দিয়া নিষ্ক্রিয় এবং জীবনদানে উদ্যত (১।৪৫)। অমরকবি বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে লিখিয়াছেন যে, কোন ভাবের প্রেরণায় জীবনদান করা অতি তুচ্ছ কাজ, এই জীবনে অনেক শ্রেষ্ঠতর কাজ করা যাইতে পারে, সে চেষ্টা যে করে সেই মানুষ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা যদি ভগবান-প্রদর্শিত সত্যপথ অবলম্বন করিতে চাই—তবে আমাদের প্রথমতঃ এই জগৎ প্রপঞ্চের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং আমরা যে পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার ভ্রমজ্ঞানে পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিতেছি তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বিজ্ঞতার অভিমানকে ত্যাগ করিয়া—কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ কিছুই বুঝি না—'ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো'—এই ধারণা জন্মাইতে হইবে। আর তৃতীয়তঃ 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—প্রভু আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, আমাকে শিক্ষা দাও, এই বলিয়া ব্যাকুলভাবে ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। যখন—'ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ—' গোবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া অর্জ্জুন স্থির ও নির্ব্বাক হইলেন, তখন 'তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত' ভগবান প্রসন্ন হইয়া উভয় সেনার মধ্যস্থলে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে গীতার কথা বলিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভগবান যখন দেখিলেন যে, অর্জ্জুন গীতার বাণী গ্রহণ করিবার যোগ্য অবস্থালাভ করিয়াছেন, তখন তিনি প্রসন্ন হইলেন এবং তাহা প্রদান করিলেন, তৎপূর্ব্বে নহে। এই অবস্থার ভিতর দিয়া আমরা নিজকে প্রস্তুত না করিলে গীতার মর্ম্মগ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

শ্রী—

১৭ই আগষ্ট, ১৯২৯ সাল, বাং ১৩৩৬ সন, ১লা ভাদ্র, কুমারটুলী ঘাট হইতে ষ্টীমারযোগে বেলুড় পৌঁছিলাম। মহাপুরুষ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি কুশলাদি প্রশ্ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ মঠের পূর্ব্বদিকের দোতলার বারাণ্ডায় আসিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া আরাম কেদারায় বসিলেন। কতিপয় গৃহী-ভক্ত তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইলেন। তন্মধ্যে একজন ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, 'মহারাজ! আপনার শরীর কেমন?' তিনি উত্তরে বলিলেন, "শরীর আমার ভাল নয়। এই বুড়ো শরীর—এই শরীর আর ভাল থাকে না, ব্যারাম ত আছেই—থাক্‌বেও। তা শরীর থাক্ বা না থাক্ তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের এই উপদেশ তোমাদের প্রতি—এই জগতে শ্রীশ্রীঠাকুরই সত্য, তিনি সকলের ভেতর র'য়েছেন—তিনি অবতার। *তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য এসেছিলেন।* তাঁকেই শুধু সত্য ব'লে জানবে—আর তাঁর গুণগান করবে! হ্যাঁ—এই সংসারে তোমরা রয়েছ, দেখো, তাঁকে ভুলো না। এখানকার কিছুই সত্যি নয়, তবে যখন সংসারে রয়েছ—সংসার ক'রবে বৈ কি? এই সংসারে থেকেও, তাঁকে যেন ভুলো না! সবই করবে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও স্মরণ রাখবে—এই আমাদের অনুরোধ!" প্রত্যেকটী কথার ভঙ্গিতে যেমনি স্নেহ ভালবাসা জড়িত—তেমনি ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ। উপস্থিত ভক্তেরা সকলেই ঠাকুরের মহিমা-কীর্ত্তন শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলেই প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। একা ছিলাম শুধু আমি। আমার মনের একটা সমস্যা, আজ ভঞ্জন করিবার সুযোগও পাইলাম। প্রথমে প্রশ্ন করিলাম, "মহারাজ! ঠাকুরের যে ছবিখানা নিত্য পূজা করি, তা বর্ত্তমানে মলিন হয়েছে, এখন কি করব? আপনি যা উপদেশ করবেন, তাই করব।" তিনি উত্তরে বলিলেন, "নূতন একখানা এনে পূজো করবে?" সমস্যা তখন আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইল। পুনরায় নিবেদন করিলাম, "পুরাতন-খানা কি করব? নিত্য যাঁর পূজা করেছি—যাঁর নিকট কত সময়ে কারণে অকারণে কত মনোবেদনা জানিয়েছি, কত তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছি! তার উপর একটা মমতাও ত জন্মে গিয়েছে?" কথাগুলি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা বৈ কি! বেশ! ওখানাও রাখবে? দু, একটা ফুলও দেবে।" আমার সকল প্রশ্নের সমাধান মুহূর্ত্ত মধ্যে হইয়া গেল।

"*মহারাজ, পূজা করবার সময় আমাদের* নিকট ছবি বলে কখনো কিন্তু মনে হয় না।"

"এইটীই ত আশ্চর্য্য ব্যাপার।"

"আমার মনে হয় হিন্দুরা কখনো সাকার মূর্ত্তি পূজা না করে থাকতেই পারে না!"

তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"তুমি যা বলেছ তা ঠিক। হিন্দুরা কখনো সাকার পূজো না ক'রে থাকতে পারে না। এইটীই যেন তাদের জন্মগত ও সংস্কারগত বলে মনে হয়।"

আমি। পূজাতে খুবই আনন্দ! তাই পূজাই প্রথম। পূজা করিলে মনে কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়, কখনো মনে হয় না ছবি পূজা করছি।

মহাপুরুষ। তাঁর সত্তা র'য়েছে যে। ঠাকুর আমাদের প্রথমে পূজোই করলেন—(অর্থাৎ পূজারী ব্রাহ্মণ হ'য়ে এলেন)।

আমি। নিরাকার কিন্তু আমাদের মনে স্থান পায় না, এ ধারণা আমরা করতেই পারি না।

মহাপুরুষ। তুমি যা ব'লেছ তা ঠিক। তবে তিনি নিরাকারও বটেন! তা তিনি যখন দরকার হয়, বুঝিয়ে দেন। মন যখন ঠিক হ'য়ে যায়, তখন তিনিই অতীন্দ্রিয় সত্য প্রকাশ করেন—ভক্ত বুঝতে পারে সবই ঠিক। তবে প্রথমে সাকারে বিশ্বাস-ভক্তি পাকা হ'লেই সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষকে জানতে পারা যায়। তখন দেখতে পায় তিনিই সাকার—তিনিই নিরাকার।

এইরূপভাবে তিনি কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—যেন যো সো করিয়া কোনও মতে যদি একদিনের জন্যও বিশ্বাসভক্তি তাঁহাতে অর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে তিনিই যেন এ সংশয় অপনোদন করিয়া দিবেন। এ প্রশ্ন আর মনে স্থান পাইবে না। আজ মহাপুরুষের এই ভাব দেখিয়া ভয়, লজ্জা এ ৩টা আবরণের কোনটাই যেন মনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, আমি নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহারাজ! কৃপা করিয়া বলুন, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায় কিসে?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"সংসার-বন্ধন হ'তে মুক্ত হবার জন্য কিছু ভেবো না। প্রকৃত ভক্ত অন্য কামনা করবে না। তার যা কর্ত্তব্য আছে, তা সে করবে। আর সেই বেড়াল-ছানার মত মার উপর তাকিয়ে থাকবে। এই হ'লো প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। সে আর কিছুই চাইবে না। মা যখন যেমন রাখেন—যে অবস্থায় রাখেন—তাই মেনে নেবে।"

আমি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

মহাপুরুষ। আমাদের আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর সততই রয়েছে। তোমাদের উপর আশীর্ব্বাদ আমাদের স্বাভাবিক।

আমি। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ খুব অল্প সময় করেছি। তবে আপনার সঙ্গ করে ধন্য হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করবেন, ঠাকুরের দরজায় যেন পড়ে থাকতে পারি।

মহারাজ সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দৃঢ় অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"খুব পারবে! নিশ্চয়ই পারবে। তোমাদের ভয় কি?"

আমি। আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের জীবন-সম্বল—আমরা আর কিছুই জানি না, আপনাকেই শুধু জানি।

মহাপুরুষ। আমাকে জানলে—তাঁকেই জানা হ'লো। কারণ তাঁর সত্তা (Spirit, নিজকে দেখাইয়া) আমাদের ভেতর রয়েছে যে।

আজ আমার কথার ভাণ্ডার অফুরন্ত, মনের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি কোন্ দিক্‌দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে,—কোনটী ফেলিয়া কোনটী বলিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। এমন আপনার জনই বা কোথায় পাইব, যাঁর নিকট অকপটভাবে সকল কথা বলিয়া শান্তি পাইব? সেই জন্যই সকল রকমের প্রশ্নই উত্থাপন করিলাম, একে একে সকল কথার উত্তর তিনি সস্নেহে দিতে লাগিলেন। মহারাজকে অফিসের কেরাণীরা কি ভাবে কাজে ফাঁকি দেয়—সাহেবেরা যে তাহা বেশ বুঝিতে পারে—কত জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মফলে এবার কেরাণী-গিরি করিতেছি—ফাঁকি দিলে আবার যে আসিতে হইবে—যাহাতে এবার সকল কর্ম্মের অবসান করিয়া যাইতে পারি—আমাদের জাতের সকল বিষয়ে ফাঁকি দিবার যে চেষ্টা আছে ইত্যাদি সব খুঁটিনাটি বলাতে—তিনি উত্তরে আমাকে বলিলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ কর্ম্ম বাকি রয়েছে বলেই ত কর্ম্ম করা, নৈলে আবার কিসের কর্ম্ম?—ফাঁকি দেওয়ার ফলেই ত এত কর্ম্ম! এত দুর্দ্দশা!"

আমি। আমরা ঠাকুরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করি—ঠাকুর তুমি ও স্বামিজী আমাদের জাতের মঙ্গল কর—মোহ দূর কর—চৈতন্য করিয়া দাও।

মহাপুরুষ। হাঁ, এইরূপ প্রার্থনা করবে। কি কষ্টই না জাতের হ'য়েছে।

ঠাকুরের সেই কথাটী উল্লেখ করিলাম—"উট কাঁটা ঘাস খায়, দরদর ক'রে রক্ত পড়ে তবুও চৈতন্য নাই।" মানুষ যাহারা তাহারা কিন্তু এই সকল দেখিয়া সহ্য করিতে পারে না।

মহাপুরুষ। ঠিক ব'লেছ—বাঙ্গালী জাতের অধঃপতনই এখন বেশী।

এইবার আরতির ঘণ্টা বাজিল, তিনিও গম্ভীর হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামিজী, শ্রীশ্রীমাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেন। মঠে আজ মৃদঙ্গ বাজিতেছে। সে সময়কার মহাপুরুষের মনোহর মূর্ত্তি যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিবেন না, তিনি এখন কোথায়, কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন! আজ আর তাঁহাকে ছাড়িয়া ঠাকুর ঘরে যাইতেও ইচ্ছা হইল না। কিছুক্ষণ পরে আবার প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন, "তোমরা যেমন শনিবারে আস—আমরাও সেইরূপ শনিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেতুম, তখন ম্যাকনলন্ ম্যাকেঞ্জির বাড়ী কাজ কর্ত্তুম। মধ্যে মধ্যে আবার কার্য্যদিবসের মধ্যেও যেতুম। ঠাকুর বলতেন, "কি ক'রে এলি রে—তোদের বুঝি আপনার লোক রয়েছে।" আমি বলতুম, 'হাঁ মশায়'।"

আমি। মহারাজ! আমরাও শনিবার হইলেই কখন আসিব তাহা ভাবি, শুক্রবার হইতেই এই ভাবনা আসে। আপনাদের দর্শন করিয়া গেলে কত যে শান্তি! কত যে আনন্দ! এক সপ্তাহ বেশ কাটিয়া যায়।

এইবার শেষ ষ্টিমার আসিবার সময় হইল, মহাপুরুষকে প্রণাম করিতেই, তিনি খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন "জয় শ্রীগুরুমহারাজ!"

ধর্ম্ম

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, এম্-এ, বি-এস্-সি, বি-এল্

আজকাল সাহিত্যে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রবন্ধ বা চিত্তাকর্ষক গল্প ও উপন্যাস দেখা যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটী বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে খুব অল্পই লিখিত হইয়াছে। তবু মনে হয়, জিনিষটী সাহিত্যের মধ্য দিয়া খুব আলোচনা দরকার। ধর্ম্ম কি? ব্যবহারিক জীবনে কতদূর কার্য্যকরী এবং পরিণতি কি? তাহাই এখন দেখিতে হইবে।

ধর্ম্ম কাহারও নিকট শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায়, কাহারও নিকট বিবাহ বা মৃত্যুর সময় ছাড়া ধর্ম্মের কোনও অস্তিত্ব নাই, মৃত্যুর পরে দেহের ব্যবস্থা লইয়া ধর্ম্মের দরকার হয়।

পৃথিবীর তুলনায় মানব অতি ক্ষুদ্র, প্রত্যেক জিনিষ তাঁকে ভয়ে অভিভূত করে। এই ভয় হইতেই কি ধর্ম্মের উৎপত্তি?

পন্টিয়াস পাইলেট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

সত্য কি? উত্তর আব তাহায় শুনা হয় নাই।

কেহ সরলভাবে ভগবানকে ডাকাই চবম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন (১), কাহাবও নিকট ধর্ম্ম প্রকাশ পায় ব্রত, উপবাস ও কঠোব তপশ্চর্য্যায়।

স্বামী সাবদানন্দ লিখিয়াছেন, পাশ্চাত্যদেশে কাহাবও ধর্ম্মে অনুবাগ হইলে দীন ও আর্ত্ত-সেবায় ইহা প্রকাশ পায়। এ দেশেব লোকেব ধাবণা যে ভগবান এ জীবনেই লাভ করা যায়।

হিন্দুধর্ম্মেব আস্পর্দ্ধা আছে, মন্ত্রবলে দেবতা আগমন কবেন, মন্ত্রেব প্রভাবে পিতৃপুরুষেবা আসিয়া উৎসর্গিত দ্রব্য গ্রহণ কবেন।

মৃত্যুর পবপারে কি, ইহা চিবন্তন প্রশ্ন। জীবন কি দুইটী ঘুমেব মধ্যে ক্ষণস্থায়ী জাগবণ? এই পৃথিবীতে অনন্ত জীব। অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রে জীবন ধাবণ হয় ত একবাবে অসম্ভব নয়। সকলেই মৃত্যুব পব কোথায় যায়?

থিয়োজফি দেখাতে চান যে, তাঁহাবা আমাদেব কাছেই থাকেন। থিয়োজফি গ্রন্থসকল পড়িলে মনে হয় যে, স্থূল জগতেব হুবহু নকল পবজগৎ। যেমন আমাদের স্থূল বঙ্গদেশেব উপব ঠিক একটী পবলোক বঙ্গদেশ আছে। সেখানে আমাদেব মৃত আত্মীয়েবা আমাদেব মঙ্গলেব জন্য ব্যস্ত, ইচ্ছা কবিলে তাহাদেব আত্মা আনা যায়।

মৃতাশৌচেব জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। কেহ বেশীদিন, কেহ বা অল্পদিন অশৌচ পালন কবেন। তাহা হইলে দাঁড়ায়, বিভিন্ন লোকেব আত্মা বিভিন্ন সময়ে স্বর্গে বা নরকে যায়। এই বিবাট হিসাব এবং সময়মত স্বর্গদ্বার মুক্ত কে করেন?

কেবল মৃত ব্যক্তির জাতির জন্য ভুগিতে হয় এমন নহে, দেবদেবীবাও পূজকের জাতি অনুসারে সম্মানেব তাবতম্য পাইয়া থাকেন। নীচজাতি (?) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতা উচ্চজাতিবা প্রণাম করেন না। বেশীদিনের কথা নয়, বাণী বাসমণিকে শ্রীশ্রীভবতাবিণী প্রতিষ্ঠিতা কবিয়া অন্নভোগ দিতে কি বেগই না পাইতে হইয়াছিল।

* * *

দেশবন্ধু গাহিয়াছিলেন, 'তাবিণি তুই নিজেবে তবা, তোব সকল অঙ্গ মবণভবা।'

জগতে এত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, কিন্তু কোন বিপদ কি তাঁহাবা নিবাবণ কবিতে পাবিয়াছেন, না প্রলোভনেব সময় তাহাবা অক্ষয় কবচের ন্যায় বক্ষা কবিয়াছেন? মা'র কোল হইতে শিশু, সতী সাধ্বীব সমস্ত ব্রত উপবাস ধূলি মুষ্টিব মত অবজ্ঞা কবিয়া যম স্বামীকে লইয়া গিয়াছেন, একা সাবিত্রী ছাড়া আর কেহ ফিবাইতে পাবেন নাই। ভগবানেব হাত বলিয়া আমবা নিশ্চিন্ত থাকি। বেশ কথা, তবে কঠোব ব্রত উপবাসেব প্রযোজন কি?

যাঁহাবা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকরূপ লোকগুরুব আসনে উপবিষ্ট তাঁহাবা নমস্য কিন্তু প্রত্যেক জীবন কি পবাজয়েব নির্ম্মম ইতিহাস নহে?

* * *

গৃহস্বামীব শবীব অসুস্থ। সকলে তাহাব দিকে চাহিয়া আছে। বাড়ীতে মহামায়া আসিবেন, কর্ত্তা মনে কবিলেন বাহিবে যাইয়া শবীবটা শোধরাইয়া আসি। ফল হিতে বিপবীত। মহামায়া আসিবাব পূর্ব্বে মৃত্যু আসিয়া কাড়িয়া লইল, মহামায়া ফিবিয়াও চাহিলেন না।

নিশীথ রাত্রি! কয়েকদিন যাবৎ ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে, নদী বিশাল জলরাশি আর বক্ষে রাখিতে পারিতেছে না। পল্লীবাসী সকলেই মনে

---

(১) পরমহংসদেব সর্ব্বদা বলিতেন—"হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম করো, তা'হলে সব পাপ তাপ চলে যাবে। যেমন গাছেরতলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলেও দেহগাছ থেকে সব অবিদ্যারূপ পাখী উড়ে পালায়।"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

করিয়াছে ভগবান রক্ষা করিবেন। হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গে মনে হইল গায়ে জল লাগিতেছে, ভাল করিয়া ঘুম ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে ক্ষুদ্র-পল্লী জলমগ্ন হইল, কত প্রাণনাশ হইল, ভগবানই জানেন।

* * *

বিদ্যাসাগর বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন, "যখন দুর্ভিক্ষে দুমুঠো ভাতের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়, তখন আমি ভগবান বিশ্বাস করি না।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না। যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুক্‌রা রুটি দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।"

* * *

আমাদের দেশের বিধবাদের বড় কষ্ট। উপবাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহারা সংসারে পরগাছার মত থাকেন। কোন আশা নাই, ভরসাও নাই। সম্পূর্ণ নিরাভরণা হইয়া অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়।

কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনের মনের দিকে তাকান আমাদের সমাজিকধর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন না। গলবস্ত্র হইয়া আত্মীয়স্বজনকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। উদ্‌গত অশ্রুরুদ্ধ করিয়া পাষাণে বুক বাঁধিয়া ফর্দ্দমত জিনিষ কিনিতে হইবে। যিনি পূর্ব্বে হয় ত এক পয়সা দান পাইলে কৃতার্থ হইতেন, তিনিও উপযুক্ত ভোজন দক্ষিণা না পাইলে শ্রাদ্ধে আহার করিবেন না।

* * *

বাঁচিবার অধিকারের চেয়ে হয় ত বড় ধর্ম্ম নাই। জার্ম্মাণী ইহার প্রেরণায় বাইবেলের নূতন সংস্করণ করিয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির দিকে তাকাইলে মনে হয় যে, ধর্ম্ম তাহাদিগের জীবনকে চতুর্দ্দিকে বাঁধিয়া রাখে নাই।

অবশেষে এই প্রশ্নই উঠে, ধর্ম্ম কি? আশা করা যায়, সুধীগণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইহার আলোচনা করিয়া আমাদিগকে নূতন আলোক দিবেন।

কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, পরলোকবাদ সবই সাধারণের নিকট প্রহেলিকার মত থাকিবে। পরলোকের উন্নতির আশায় যদি আমরা ইহজগতের উন্নতির চেষ্টা না করি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যদি আমরা সাধারণ কর্ত্তব্য কার্য্যেও পশ্চাৎপদ হই, তাহা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে?

প্রাচীনকে ধরিয়া থাকিলে চলিবে না, কারণ প্রাচীন অভ্রান্ত নয়। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার ন্যায় পূর্ব্বে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে নিজের সততা প্রমাণ করিতে হইলে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্য দিয়া বা উত্তপ্ত লৌহের উপর দিয়া যাইতে হইত। ঐসব অত্যাচারের ফলে এক অংশ প্রোটাষ্টাণ্ট হইয়া বাঁচিল, অপর অংশ তখন লুপ্ত হইবার ভয়ে অমানুষিক ধর্ম্মাচরণ (?) সকল উঠাইয়া দিল। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। উহা আইনের জোরে বন্ধ হওয়াতে দেশশুদ্ধ সকলে অসতী হইয়া যান নাই। সেইরূপ বর্ত্তমানে যাহা আমরা ধর্ম্ম মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হই, তাহাও হয় ত যুক্তি ও আলোচনার সম্মুখে ভাসিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে আমরা অধার্ম্মিক হইব না।

* * *

হের হিট্‌লার দরিদ্র সন্তান। নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে তিনি আজ জার্ম্মাণীর ভাগ্য-বিধাতা। তাঁহার অভিজ্ঞতার নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে। তিনি তাঁহার অমূল্যগ্রন্থ "Mein Camp"-এ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ইহার তিনটী অংশের ভাবার্থ দিয়া আমরা উপসংহার করিব।

"পূর্ব্বে যে বীজ আমরা রোপণ করেছি, তাহার ফল এখন পাচ্ছি। চতুর্দ্দিকে যে ধ্বংসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, তা'র মূলে হচ্ছে সুনির্দ্দিষ্ট এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত জীবনধর্ম্মের অভাব; এবং এর আর একটী ফল এই যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় আমরা কোন সিদ্ধান্তে শীঘ্র উপনীত হতে পারি না বা দৃঢ় সংগ্রাম করতে পারি না। আমাদের জীবনের শিক্ষার প্রথম বর্ষ থেকেই আমরা নিজদের বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে অর্দ্ধ সত্য চর্ব্বণ করতে থাকি এবং অবশেষে আমরা এমন অপদার্থ হয়ে পড়ি যে, যা' আমরা পূর্ব্বে নিতান্ত ঘৃণিত বলে জানতাম, তা'তেও আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।"

"সব চেয়ে ধ্বংসকারী, ধর্ম্মের নামে নিজদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করা। যারা রাজনৈতিক বা আর্থিকলাভের জন্য ধর্ম্মের ভাণ করে তাদের যথাযথ বর্ণনা দিতে ভাষা অক্ষম। এই নির্লজ্জ ভণ্ডরা ধর্ম্মের কথা সমস্ত পৃথিবীর সমক্ষে জোর গলায় চীৎকার করতে থাকে, যাতে তাদের মত অন্যান্য পাপীরা শুনতে পায়। অবশ্য যখন ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করার প্রয়োজন হয় তখন এদের টুঁ' পর্য্যন্ত শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না, কেবল যখন কোন লাভের সম্ভাবনা থাকে তখনই তাদের চীৎকার শুনা যায়। রাজনৈতিক কোন সুবিধার আশা থাকলে তারা আবার ধর্ম্ম বিসর্জ্জনও দিতে পারে। শাসন-পরিষদে দশটী আসন বেশী পাবার জন্য তারা সর্ব্বধর্ম্ম-বিদ্বেষী মার্কসবাদীর সহিত মিতালী করে এবং মন্ত্রীসভায় একটী আসন পাবার জন্য তারা সয়তানের সঙ্গেও বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে, কেবল সয়তানের কিছু আত্মসম্মান আছে এবং সে জন্য তাদের থেকে দূরে পালিয়ে যায়।"

"রাজনৈতিক নেতার কখনও ধর্ম্মবিষয়ে বা প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ধর্ম্ম বিষয়ে তার যদি অনুরাগ ও ক্ষমতা থাকে তবে রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না হয়ে ধর্ম্ম-সংস্কারক হলেই ভাল হয়।"

* * *

বার্ণার্ড শ' বলেন—"Religion is the mother of scepticism: Science is the mother of credulity" বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের নামে যাহা বলা যায় তাহা সকলেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ধর্ম্মালোচনা করিতে গেলে মনে সন্দেহ উঠা হয় ত অবশ্যম্ভাবী। "উদ্বোধন" দীর্ঘ ৩৮ বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম-আলোচনা করিয়াছেন, গল্প ও উপন্যাস প্লাবিত মাসিক সাহিত্যের যুগে ইহা কম কথা নয়। ধর্ম্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের ভাগ্য নিরূপণ করে বলিয়া অর্থনীতিজ্ঞদের অভিমত এবং উহা সত্য হইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য ধর্ম্ম কতদূর দায়ী তাহাও বিবেচনার বিষয়। "উদ্বোধনের" উপর ভার অর্পণ করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

বাংলার সাধক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম্-এ, এম্-আর-এ-এস্, বিদ্যাবিনোদ

৭ম দৃশ্য

দুর্গাদাসের বৈঠকখানা

দুর্গাদাস পাইন ও বলাই সেন

দুর্গাদাস। দেখ, বলাই, গদাইএর সব ভাল কিন্তু একটা বিষম দোষ আছে।

বলাই। সেটা কি ?

দুর্গাদাস। ও সেদিন মেয়েদের সঙ্গে বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়েছিল কেন বল ত ?

বলাই। তা মায়েদের সঙ্গে ছেলে থাক্‌বে তাতে দোষ কি ?

দুর্গাদাস। (অপ্রতিভ হইয়া) না, এমন কোন দোষ নয়— তবে—

বলাই। 'তবে' কি ?

দুর্গাদাস। তবে সে ত আর নেহাৎ ছেলে-মানুষ নয় ? হাজার হ'ক পুরুষ তো বটে !

বলাই। তুমি পাগল, না নির্ব্বোধ ?

দুর্গাদাস। ওহে আমি পাগলও নই, নির্ব্বোধও নই। পুরুষমানুষ পাঁচ বছরের হ'ক, আর পচিশ বছরের হ'ক, সে তো পুরুষ, মেয়ে মানুষ তো নয়। ত্যাখ, এই ঘি আর আগুন এক সঙ্গে রাখতে নেই। যাই বল ভাই, তার ইচ্ছামত অন্তঃপুরে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না।

বলাই। তুমি বল্লালীধরণের খাঁটী হিন্দু দেখ্‌ছি। আজকাল অবরোধ প্রথা উঠে যাচ্ছে।

দুর্গাদাস। উঠে যাচ্ছে তোমাদের কাছে কিন্তু সনাতনী হিন্দুদের কাছে নয়। অন্তঃপুরের মর্য্যাদা যেখানে না থাকে, তাকে হিন্দুর বাড়ী বলা যায় না। আজকালকার শিক্ষিত সমাজের কথা ছেড়ে দাও। এই দেখনা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজে কি না অনাচার চ'লেছে। হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা একালে অচল—এখন এক ব্রহ্মে এসে ঠেকেছে। অপরন্তু কিং ভবিষ্যতি !

বলাই। তা রামমোহন রায় ভালই ক'রেছে। তোমাদের মত গোঁড়াদের জ্বালায় যারা অস্থির হ'য়ে উঠেছে, তারা আর এখন খৃষ্টান না হ'য়ে ব্রাহ্ম হ'চ্ছে—তারা কূল পেয়েছে।

(ময়লা কাপড় পরা চুবড়ি হাতে জনৈকা স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

দুর্গাদাস। কে গা বাছা ? তুমি কি চাও ?

স্ত্রী। আজ্ঞে, বাবা, আমি তাঁতিদের মেয়ে, হাটে সুতো বেচতে এসেছিনু, আমার সঙ্গীরা সব ছেড়ে চ'লে গেছে—আজ রাত্রে আমায় যদি একটু স্থান দেন।

দুর্গাদাস। তোমার বাড়ী কোথায়, বাছা ?

স্ত্রী। আমার বাড়ী দুর্গাপুর।

দুর্গাদাস। বেশ! বাড়ীর ভিতর যাও—মেয়েদের কাছে আজ থাক গে, এমন সন্ধ্যার সময় আর কোথায় যাবে ?

(স্ত্রীলোকটী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল)

বলাই। আচ্ছা, যাক্ ওসব কথা। আমি বল্‌ছিলুম, আমাদের এই গাঁয়ের গদাই কালে একটা অসাধারণ লোক হবে, কি বল ?

দুর্গাদাস। তা হ'লেও হ'তে পারে। আমি অত বুঝি না,—তবে ছোক্‌রা যে ধর্ম্মপ্রাণ—তাতে আর সন্দেহ নেই।

(এমন সময় রামেশ্বর প্রবেশ করিলেন)

রামেশ্বর। গদাই, গদাই, গদাই এখানে আছিস্ রে।

(অন্তঃপুর হইতে তন্তুবায় রমণীবেশে :—দাদা, যাচ্ছি গো—বলিয়া গদাই বাহিরে আসিল)

দুর্গাদাস। (আশ্চর্য্য হইয়া) কে হে, গদাই ?

গদাধর। আজ্ঞে হাঁ—

দুর্গাদাস। (হাসিয়া) বেশ মেয়ে সেজেছিস্ তো ?

বলাই। বাঃ! ঠিক যেন মেয়ে মানুষ।

গদাধর। (দুর্গাদাসের প্রতি) আমি সেদিন বলিনি যে আমি ইচ্ছে কর্‌লে আপনার পরিবারের মেয়েদের দেখ্‌তে পারি, আর অন্দরের সব কথা জানতে পারি ?

দুর্গাদাস। আমি হার মেনেছি গদাই।

গদাই। অন্তঃপুরের দরজায় কড়া পাহারা রাখলে হয় না! স্ত্রীলোকদের চরিত্র রক্ষা কর্‌তে হ'লে সুশিক্ষা, দেবভক্তি, ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হয়, শুধু বন্ধ ক'রে রাখলে ধর্ম্মরক্ষা হয় না। আচ্ছা, আজ আসি,—দাদা, চল।

(গদাই ও রামেশ্বরের প্রস্থান)

বলাই। দেখ্‌লে, কেমন শিক্ষা দিলে ?

দুর্গাদাস। তাই ত হে, ছেলেটা কেমন সেজেছে ছাখ! আশ্চর্য্য! ওর অভিনয় কর্‌বার ক্ষমতা আছে বেশ।

বলাই। শুধু অভিনয় কর্‌বার নয়,—গদাই গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে একটা যাত্রার দল খুলেছে।

দুর্গাদাস। তাই নাকি ? মহলা কোথায় হয় ?

বলাই। কেন, মাণিকরাজার আম বাগানে। নীচে তৃণের সবুজ বিছানা পাতা, উপরে ঘন পল্লবের নীল চন্দ্রাতপ। গদাইএর মধুর তানে বনের পাখী নিঝুম হয়, চাষী লাঙ্গল ছেড়ে দাঁড়ায়।

দুর্গাদাস। আমাদের কামারপুকুর ধন্য!

বলাই। আর একদিন দেখি, গদাই কালীর মূর্ত্তি স্বহস্তে গ'ড়ে তার সাম্‌নে ব'সে মা, মা ব'লে কাঁদছে! মূর্ত্তিখানি দেখে মনে হয় যে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ছাড়া কল্পনায় এরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি অসম্ভব। এমন মহাপুরুষ এখানে জন্মেছেন। ধন্য কামারপুকুর! ধন্য চন্দ্রাদেবী! আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির নাম একদিন সারাবিশ্বে বিখ্যাত হবে। আচ্ছা, যাক্—রাত হ'য়ে গেল, এখন আসি।

দুর্গাদাস। আচ্ছা, এস।

৮ম দৃশ্য

কামারপুকুর—গৃহ

চন্দ্রাদেবী ও রামকুমার

চন্দ্রাদেবী। তিনি তো চ'লে গেলেন, রঘুবীরের কৃপায় অস্বচ্ছলতার মধ্যেও সংসার কোন রকমে চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন সংসারে লোক বেড়েছে, আয় বাড়েনি। রামেশ্বর বড় হ'য়ে উঠেছে। সর্ব্বমঙ্গলারও বিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

রামকুমার। তা ত দেখছি, মা! লেখাপড়া শিখেও রামেশ্বর সংসারে উদাসীন। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই ত ঋণ বেড়েই চ'লেছে। দেশে থেকে দুর্দ্দশার প্রতিকার হবে ব'লে মনে হয় না—আমি ক'লকাতায় গিয়ে টোল খুলে বসি, তা নইলে সংসার ত আর চলে না।

চন্দ্রাদেবী। ক'লকাতায় টোল কি চ'লবে ? আজকাল ক'লকাতার লোক সাহেব ঘেঁসা হ'য়েছে। ওরা কি আর হিন্দুর দশকর্ম্ম মানে, না কর্‌তে চায় ?

রামকুমার। যদি চলে, তো ক'লকাতায়ই চ'ল্‌বে। নিরক্ষর গণ্ডমুখ্যুগুলো ক'লকেতায় গিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার কর্‌ছে, আমি পার্‌বো না ? আর ওখানকার লোকেরা বাইরে সাহেব, খুব ফিট্‌ফাট্, কেতা দুরস্তো, কিন্তু ঘরে ওরা ষষ্ঠী মাকাল পুজো করে, পাঁজি না দেখে পা বাড়ায় না।

চন্দ্রাদেবী। তবে তাই কর।

রামকুমার। গদাইকে জোর ক'রে কোন কাজ যেন করান না হয়। দেখ্‌লে না ক'দিন তার মূর্চ্ছা ছিল? আবার কি রকম একগুঁয়েও। কারুর কথা শুন্‌লে না, পৈতের সময় ধনী কামারণীর কাছে সবার আগে ভিক্ষে নিলে।

চন্দ্রাদেবী। উনি ব'লতেন, গদাই আমাদের মহাপুরুষ। মহাপুরুষদের অমন হ'য়ে থাকে।

রামকুমার। সাধন ভজন, তপস্যা না কর্‌লে কি সমাধি হয় মা? চোদ্দ বছরের বালক সে, তার আবার সমাধি? ওটা বায়ুরোগ। তা যাই হ'ক, ওর কোন কাজে বাধা দিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি করো না। তাহ'লে রোগ বেড়ে যাবে। আমি এখন যাওয়ার আয়োজন করি।

চন্দ্রাদেবী। রঘুবীর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

(রামকুমারের প্রস্থান)

বায়ুরোগ গদাইএর! তিনি ব'লেছিলেন—চন্দ্রা, স্বপ্ন দেখেছি, গয়াধামে শ্রীমন্দির আলো, সৌরভে পূর্ণ ক'রে কে যেন ব'ল্‌ছে—ব্রাহ্মণ, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি। তোমার গৃহে জন্ম গ্রহণ ক'রে তোমাকে আমার সেবাধিকার দেব। না, না, তাঁর কথা কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। আরও মনে আছে, গর্ভাবস্থায় কত বিচিত্র স্বপ্ন! জাগ্রত অবস্থায়ও দেখেছি দেবতাদের আনাগোনা। রঘুবীরের মন্দিরে দেবসমাগম, স্তুতিগান—সকলই কি মিথ্যা, ভ্রম? না, তা নয়, রামকুমার ভুল বুঝেছে,—গদাই আমার দেবতার অবতার।

(গদাধরের প্রবেশ)

গদাধর। মা, মা,—দাদা কোথা গেল, মা—ক'লকাতায়?

চন্দ্রাদেবী। তুই পাঠশালে যাবি নে?

গদাধর। যেতে পারি, গুরুমশাই যদি শুভঙ্করীর অঙ্ক ক'ষতে না দেন। ও টাকা, আনা, পয়সার জমাখরচ আমি পারি না।

চন্দ্রাদেবী। ক'লকাতায় দাদার কাছে থাক্‌বি? সেখানে ভাল ভাল ইস্কুল আছে। ইংরেজী প'ড়বি?

গদাধর। ইংরেজী প'ড়ে কি হবে? চাকরী—দুবেলা বুট জুতোর গোঁজা খেতে আমি পারব না।

চন্দ্রাদেবী। না রে, চাকরী কর্‌তে হবে না। তোর দাদার টোলে প'ড়বি, ঠাকুর পূজো কর্‌বি, পণ্ডিত হবি।

গদাধর। ও বিদ্যেয় আমার দরকার নেই। আমি পণ্ডিত হ'য়ে টিকি নাড়্‌তে পারব না।

চন্দ্রাদেবী। কেন রে শাস্তর পড়া কি দোষের?

গদাধর। শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, শাস্ত্র আওড়ায় কিন্তু তার নজর কামিনীকাঞ্চনে। শকুনি ওড়ে খুব উঁচুতে কিন্তু তার নজর থাকে ভাগাড়ে।

চন্দ্রাদেবী। আরে বই না প'ড়লে কি জ্ঞান হয়?

গদাধর। বই না প'ড়েও জ্ঞান হয়। বই হাজার পড়, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরা যায় না।

চন্দ্রাদেবী। তা হ'লে তুই ক'লকাতা যাবি না?

গদাধর। ক'লকাতা যাব, তবে টোলেও প'ড়ব না, ইস্কুলেও যাব না—তা আমি তোমায় ব'লে দিচ্ছি, দাদাকে ব'লে দিও।

চন্দ্রাদেবী। আচ্ছা, তা ব'লে দেব।

(ছেলেদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

প্রাণভ'রে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ ক'রেছ, হরি ব'লে নাচ ভাই॥
বল্‌বে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোলরে তোল হরিনামের রোল;
পাও নি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি ব'লে কাঁদ,
হেরবি হৃদয় চাঁদ,
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে তাই॥

গদাধর। তুমি শুনেছ মা, আজ আমাদের 'শিবঠাকুরের বিয়ে' পালা গান হবে? তুমি শুন্‌তে যাবে মা, আমি শিব সেজে বেরুবো?

চন্দ্রাদেবী। কোথায় রে?

গদাধর। কেন, পাইন বাবুদের বাড়ীতে। অনেক লোক এসেছে শুন্‌বে ব'লে।

চন্দ্রাদেবী। আচ্ছা, যাবো—যাত্রা আরম্ভ হ'ক।

গদাধর। (সঙ্গীদের প্রতি) তবে চল্‌রে, শীগগির চল—দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—গান গাইতে গাইতে চল—

(গান গাইতে গাইতে সকলের গমন—প্রাণ ভ'রে ইত্যাদি)

চন্দ্রাদেবী। এসব কি বালকের কথা? তিনি ঠিকই ব'লেছিলেন, গদাই আমার নরদেবতা হ'যে জন্মেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ীর কক্ষ

রাসমণি ও মথুর বাবু

রাসমণি। একটা কথা ব'লবো ব'লে তোমায় ডেকেছি। আজ কয়েকমাস থেকে আমার মনটা বড় চঞ্চল হ'য়েছে। তিনি স্বর্গগত হওয়ার পর থেকেই সম্পত্তি রক্ষা ক'রে আস্‌ছি। যাদের জন্য ক'রেছি, তারা এখন বড় হ'য়েছে। আর কেন? অনেক কাল বিষয়সেবা ক'রেছি, ওপারের ডাক শোনা যাচ্ছে কিন্তু পাথেয় কোথায়? তোমার ওপর ভার দিয়ে বিষয় সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাই।

মথুর। কেন মা, আপনি ত আজকাল বিষয় থেকে দূরেই থাকেন।

রাসমণি। দূরে থাক্‌লে কি হয়? তৃষ্ণা তো যায় না। দুর্ভাবনাও তো ফুরায় না? আজ এখানে প্রজা বিদ্রোহী হ'য়েছে, খাজনা দিচ্ছে না, কাল সেখানে মোকদ্দমা বেধেছে—এই রকম শত শত ঘটনা কাণে পৌঁছায়, মনকে অস্থির ক'রে তোলে। আর কতকাল এই অন্তর্দাহে পুড়বো? তাই অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বিষয় সম্পর্ক ছাড়তে চাই। কাশী দর্শনে ইচ্ছে হচ্ছে।

মথুর। তা ত ভালই। আমি আজই তার ব্যবস্থা কর্‌ছি। আপনি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত থাক্‌বেন।

রাসমণি। আচ্ছা, বাবা।

(রাণীর প্রস্থান)

মথুর। এত দান, দয়া—দেবভক্তি, অতিথি সেবা, তবু মন চঞ্চল? কাশী দর্শন? সে আর কি? আচ্ছা, তাই হ'ক। রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের দরবারে তাঁর মনে শান্তি আস্‌তে পারে।

(ম্যানেজারের প্রবেশ ও নমস্কার)

ম্যানেজার। এত রাত্রে কেন ডেকেছেন, বাবু?

মথুর। হাঁ, এই ব'লছিলুম, রাণী মা কাশী যাত্রা করবেন। একশ'খানা নৌকা, আর ওঁর সঙ্গে যাবার লোকজন, জিনিষপত্র যেন প্রস্তুত থাকে।

ম্যানেজার। তা থাকবে'খন। আমি সব ব্যবস্থা কর্‌ছি।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

মাণিকরাজার আম বাগান

গদাই একাকী বসিয়া

(চন্দ্রাদেবীর প্রবেশ)

চন্দ্রাদেবী। গদাই, তুই এখানে ব'সে? আমি তোকে সারাবাড়ি খুঁজছি। চল, বাবা, বাড়ী ফিরে চল—সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। এই আঁধারে একেলা ব'সে থাকিস্‌নে।

গদাই। আচ্ছা, চল।

চন্দ্রাদেবী। তোর দাদা তোকে ক'লকাতা যেতে ব'লেছে, যাবি?

গদাই। হাঁ, যাবো—কিন্তু—

চন্দ্রাদেবী। আবার 'কিন্তু' কিরে ?

গদাই। কিন্তু তুমি দাদাকে চিঠি লিখে দাও যেন আমায় প'ড়তে না বলে।

চন্দ্রাদেবী। কেন রে প'ড়বি নি ? ওমা, সে কি কথা গো ? লেখাপড়া না শিখলে বামুনের ছেলের চলে ? ছিঃ বাবা, লক্ষ্মীটি আমার, ওকথা মুখে আন্‌তে নেই, দাদা রাগ করবে।

গদাই। তা করুক গে—আমি অত কারুর মন জুগিয়ে কথা বলিনি, যা পারব না, তা ব'লব কেন ?

চন্দ্রাদেবী। এখন ক'লকাতা যাবি তো ?

গদাই। হাঁ, গো, হাঁ—যাবো—যাবো—যাবো—।

(ক্ষান্তমণির প্রবেশ)

ক্ষান্তমণি। কোথায় যে থাক, বাপু, তোমায় খুঁজে খুঁজে তো হাল্লাক হলুম—

চন্দ্রাদেবী। কেন কি হ'য়েছে, যত্নর মা ?

ক্ষান্ত। ঐত তোমার ছেলেও এখানে আছে—তা থাকুলইবা, আমি বাপু, অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় ভালবাসি নে। যা বলি স্পষ্টকথা মুখের উপর বলি, তা তিনি বাজাই হোন্ আর বাদশাই হ'ন।

চন্দ্রাদেবী। কি হ'য়েছে, দিদি, অত রাগ করছিস কেন, ভাই ? গদাই আমার কিছু কি অন্যায় ক'রেছে ?

ক্ষান্ত। বুড়ো ধেড়ে ছেলে—আমি বাবু কারুর খাতির রেখে কথা কই নি,—কইতে জানিনে—আমি স্পষ্টকথা বলি—মেয়েদের ঘাটে চান করবে—ওমা ব'লতে লজ্জা করে।

চন্দ্রাদেবী। কে চান করে গো ? কি লজ্জা ?

ক্ষান্ত। তোমার গদাই গো, তোমার গদাই। আমরা বুড়োথুড়ো মানুষ, চান ক'রে কোথা একটু আহ্নিক করব—না গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়, কাদা তুলে দৈ ক'রে দেয়—আর ছুঁড়িগুলোর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে। আরও শুনবে—তোমার গদাইএর কীর্ত্তি ? সেদিন আমরা ওকে জল থেকে তুলে দিলুম, আর ছোঁড়া গিয়ে ঘাটের উপর কদমগাছের পাশ থেকে লুকিয়ে মেয়েগুলোকে দেখ্‌ছে। ছিষ্টিছাড়া ছেলে, বাবা—এমন কোথাও দেখিনে—

গদাই। বেশ করব, আবার করব—খুব করব—যা ক'রতে হয়, কর গে যাও।

ক্ষান্ত। দেখ্‌লে, সাক্ষাতেই দেখলে ? আমার অমন ছেলে হ'লে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম।

চন্দ্রাদেবী। ক্ষ্যান্ত দিদি, তুমি বাড়ী যাও—আমি গদাইকে ব'লে দেব, ও আর কখন মেয়েদের ঘাটে যাবে না।

ক্ষান্ত। এবার যদি মেয়েদের ঘাটে যেতে দেখি, তা হ'লে—

(শাসাতে শাসাতে ক্ষান্তমণির প্রস্থান)

চন্দ্রাদেবী। গদাই, চান করবার সময় মেয়েদের ঘাটে যেতে আছে, বাবা ?

গদাই। কেন নেই ? ওরাও ত মানুষ, আমি কি মানুষ নই ? মেয়েমানুষ হ'য়েছে ব'লে পীর হ'য়ে গ্যাছে আর কি। খুব ক'রেছি, বেশ ক'রেছি—আবার যাবো।

চন্দ্রাদেবী। ওখানে গেলে যদি ওরা বিরক্ত হয়, নেই বা গেলে ? বল্, বাবা, আমার দিব্যি ক'রে বল্ আর যাবিনি তো ?

গদাই। আচ্ছা, তোমার কাছে ব'লছি আর যাবো না কখ্‌খনো।

চন্দ্রাদেবী। চল, বাবা, এখন বাড়ী যাই।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায

(শঙ্কা)—একই বস্তুর একই সময়ে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই হয়, এইরূপ বলা ঠিক হয় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ঠিক হয় না'র অর্থ কি? তাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই? অথবা তাহা যুক্তিহীন বলিয়া একেবারেই অসম্ভব? (এইরূপ দুইটি বিকল্প হইতে পারে)। যদি বল, কেহ কখনও দেখে নাই, তবে বলি—

অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ।
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥১২

অন্বয়—অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ (আনন্দস্য) ভানে অপি অভানম্ (ভবতি)। ভানস্য প্রতিবন্ধেন (ভানে অপি অভানম্) যুজ্যতে।

অনুবাদ—একসঙ্গে অনেক বালক যখন (উচ্চৈঃস্বরে) পাঠ করে, তখন পুত্রের কণ্ঠস্বর যেমন (পিতার কর্ণে সামান্যতঃ) অনুভূত হইয়াও (বিশেষভাবে) অনুভূত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি হইয়াও হয় না। প্রতীতির প্রতিবন্ধক থাকায়, 'প্রতীতি হইয়াও হয় না' এইরূপ কথা সঙ্গত হয়।

টীকা—"অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ"—বেদপাঠক (বালক)দিগের বর্গ বা সমূহ মধ্যে অবস্থিত পুত্রের অধ্যয়ন শব্দের ন্যায়, অর্থাৎ পুত্রকৃত অধ্যয়নের শব্দ যেমন বহিঃস্থিত পিতার নিকট সামান্যতঃ প্রতীত হইয়া, 'ঐটি আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর'—এইরূপ বিশেষভাবে প্রতীত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি হইয়াও হয় না। দ্বিতীয় বিকল্পের উত্তরে বলিতেছেন—ভানস্য "প্রতিবন্ধেন (ভানে অপি অভানম্) যুজ্যতে"—এইরূপে শব্দত্রয় সংযোজিত করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। অর্থ এই—সেই ভানের অর্থাৎ স্ফুরণের, (ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত) প্রতিবন্ধক হেতু ভান হইয়াও অভান অর্থাৎ সামান্য ভাবে প্রতীতি হইলেও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, সঙ্গত হয়। আনন্দের এই সাধারণভাবে প্রতীতি ও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, যাহাতে আত্মায় পরম প্রেম সত্ত্বেও বিষয়েচ্ছা সম্ভবপর হয়, তাহা অজ্ঞানীতে দামাচ্ছাদিত জলাশয়ে দামাচ্ছাদিত জলের ন্যায় অথবা অন্তঃসলিলা নদীতে বালুকাচ্ছাদিত জলের ন্যায় অপ্রকাশ, এবং জ্ঞানীতে দামনির্মুক্ত অংশ-বিশেষে বা বালুকা মধ্যে খাত গর্ত্তে, জলের ন্যায় সপ্রকাশ। অজ্ঞানীতে আবরণই সেই জলের প্রকাশপ্রতিবন্ধক এবং জ্ঞানীতে দামের বা বালুকার অনিবারণ অর্থাৎ অবিচার বশতঃ সাময়িক বহির্মুখবৃত্তি, জলের বা আনন্দের সাময়িক অপ্রকাশের কারণ। সেই আবরণই ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।১২

সেই প্রতিবন্ধকটি কি প্রকার? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন—

প্রতিবন্ধোঽস্তিভাতীতি ব্যবহারার্হবস্তুনি।
তন্নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোৎপাদনমুচ্যতে ॥ ১৩

অন্বয়—অস্তি ভাতি ইতি ব্যবহারার্হবস্তুনি তম্ নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্য উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—"আছে," "প্রকাশ পাইতেছে" এইরূপে ব্যবহার যোগ্য বস্তু সম্বন্ধে তদ্বিরুদ্ধ "নাই" "প্রকাশ পাইতেছে না"—এইরূপে নাস্তিত্ব ও

অপ্রকাশত্ব ব্যবহারের উৎপাদনকেই প্রতিবন্ধক বলে।

টীকা—"অস্তি ভাতি ইতি"—আছে, প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রকারে "ব্যবহারার্হবস্তুনি"—প্রতীতি ও কথনের যোগ্য—বস্তু বিষয়ে,"তম্ নিরস্ত' পূর্ব্বোক্ত 'বিদ্যমান আছে,' 'প্রকাশ পাইতেছে'—এইরূপ ব্যবহারকে বিদূরিত করিয়া, "বিরুদ্ধস্য তস্য" —উক্ত ব্যবহারের বিপরীত 'বিদ্যমান নাই' 'প্রকাশ পাইতেছে না'—এইরূপ ব্যবহারের "উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে"—উৎপত্তিকে প্রতিবন্ধ বলে।১৩

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিবন্ধকের কারণ, দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক এই দুইটিতে যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন—

তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্॥ ১৪

অন্বয়—পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ, ইহ ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ অনাদিঃ অবিদ্যা এব।

অনুবাদ—দৃষ্টান্তে, পুত্রের অধ্যয়নশব্দের বিশেষভাবে শ্রবণবিষয়ে যে বাধা হয়, তাহা হইতেছে তৎসদৃশ নানাশব্দের সহিত সম্মেলন। দার্ষ্টান্তিকে —আত্মার আনন্দরূপতার বিশেষভাবে পরিজ্ঞানের যে বাধা হয়, তাহার কারণ অনাদি অবিদ্যা যাহা বিপরীতজ্ঞানের মুখ্য কারণ।

টীকা—"পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ"—পুত্রের কণ্ঠস্বর শ্রবণ রূপ দৃষ্টান্তে। "তস্য"—সেই প্রতিবন্ধের, "হেতুঃ"—কারণ, "সমানাভিহারঃ"—অনেকের সহিত (এক সঙ্গে) উচ্চারণ। "ইহ"—দার্ষ্টান্তিকে, "ব্যামোহেক নিবন্ধনম্"—ব্যামোহ সমূহের অর্থাৎ বিবিধ বিপরীত জ্ঞানের এক অর্থাৎ মুখ্য, কারণ, "অনাদিঃ"—উৎপত্তিহীন "অবিদ্যা"—অবিদ্যা, যাহা পরে বর্ণিত হইতেছে, তাহাই প্রতিবন্ধের হেতু। ১৪।

এই প্রকারে প্রদর্শিত হইল যে সম্বিৎই আত্মা এবং আত্মাই পরমানন্দ।

এক্ষণে প্রতিবন্ধের হেতুস্বরূপ সেই অবিদ্যার বর্ণন করিবার জন্য সেই অবিদ্যার মূলকারণ প্রকৃতির প্রতিপাদন করিতেছেন, (অর্থাৎ প্রকৃতিরহিত ব্রহ্মে প্রকৃতির আরোপ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন)—

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥ ১৫

অন্বয়—চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা, তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিঃ, সা দ্বিবিধা চ।

অনুবাদ—চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা রূপ। তাহা দুই প্রকার, -(মায়া ও অবিদ্যা)।

টীকা—"চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা" — চিদানন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রতিচ্ছায়া যাহাতে বিদ্যমান, সেইরূপ। "তমোরজঃসত্ত্বগুণা"—সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের যে সাম্যাবস্থা "প্রকৃতিঃ"—তাহাকেই প্রকৃতি বলে। "সা দ্বিধা চ" সেই প্রকৃতি দুইপ্রকার। মূলশ্লোকস্থিত 'চ'কার দ্বারা ইহাই সূচনা করিতেছেন যে, প্রকৃতির তমঃপ্রধানা তৃতীয় প্রকার রূপ আছে, তাহা অষ্টাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১৫

কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতির প্রকারদ্বয় বুঝাইতেছেন—

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥১৬

অন্বয়—সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাম্ তে চ মায়াবিদ্যে মতে। মায়াবিম্বঃ তাম্ বশীকৃত্য সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—(পূর্ব্বোক্ত) প্রকৃতির সত্ত্বগুণ, শুদ্ধ হইলে, তাহাকে মায়া বলা হয়—এবং তাহাই অবিশুদ্ধ হইলে, তাহাকে অবিদ্যা বলা হয়। মায়ায় প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব, সেই মায়াকে আপনার বশবর্ত্তিনী করিলে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হন।

টীকা — "সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাম্"— প্রকাশস্বরূপ সত্ত্বগুণের 'শুদ্ধি'—অপর দুই গুণের অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণের, দ্বারা মলিন না হওয়া—এবং 'অবিশুদ্ধি' সেইরূপে মলিন হওয়া, এই দুইটি দ্বারা "তে চ মায়াবিদ্যে মতে"—সেই দুইটি প্রকার, যথাক্রমে মায়া ও অবিদ্যা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই মায়া এবং যাহাতে মলিন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই অবিদ্যা।

যে প্রয়োজনে মায়া ও অবিদ্যার ভেদ বর্ণন করিলেন, এখন সেই প্রয়োজন বুঝাইতেছেন—"মায়াবিম্বঃ তাম্ বশীকৃত্য"—মায়াতে প্রতিফলিত চিদাত্মা, সেই মায়াকে আপনার বশে আনিয়া বিদ্যমান হইলে, "সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ স্যাৎ"—সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বর হন। ১৬

অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥১৭

অন্বয়—অবিদ্যাবশগঃ তু অন্যঃ, তদ্বৈচিত্র্যাৎ অনেকধা। সা কারণশরীরম্। তত্র অভিমানবান্ প্রাজ্ঞঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—কিন্তু অন্যটি অর্থাৎ অবিদ্যায় প্রতিফলিত চিদাত্মা বা জীব, অবিদ্যার বশবর্ত্তী। সেই অবিদ্যার অবিশুদ্ধির তারতম্যানুসারে জীবও তির্য্যগাদিভেদে নানাপ্রকার। সেই অবিদ্যাই কারণশরীর। সেই কারণশরীরে তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ জীব যখন আপনাকে কারণশরীর বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নাম হয় "প্রাজ্ঞ"।

টীকা—"অবিদ্যাবশগঃ তু অন্যঃ"—অবিদ্যায় প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত এবং অবিদ্যার অধীন, হইয়া চিদাত্মা কিন্তু জীব হইয়া থাকে। সেই জীব "তদ্বৈচিত্র্যাৎ"—সেই উপাধিভূত অবিদ্যার বিচিত্রতা হেতু অর্থাৎ অবিশুদ্ধির তারতম্যবশতঃ, "অনেকধা"—অনেক প্রকার অর্থাৎ, দেবতা, তির্য্যক্ প্রভৃতি ভেদে বিবিধপ্রকার হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। অগ্রে ৪২ সংখ্যক শ্লোকে, শরীরত্রয় হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্কৃত জীবেরই ব্রহ্মভাব বর্ণনা করিবেন,—"যেমন মুঞ্জতৃণ হইতে শলাকাটি (কৌশলে) নিষ্কাসিত হয়, সেইরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয় হইতে ধীর পুরুষদিগের কর্ত্তৃক বিচার দ্বারা আত্মা পৃথক্কৃত হইলে, আত্মা পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।" সেই স্থলে সেই শরীর তিনটি কি কি? আর সেই সেই শরীররূপ উপাধি-বিশিষ্ট জীব কি কি রূপ ধরে, এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া, সেই গুলি একে একে বলিতেছেন—"সা কারণশরীরম্ স্যাৎ"—সেই অবিদ্যাই কারণ-শরীর ইত্যাদিরূপে। সেই অবিদ্যাই স্থূল, সূক্ষ্ম শরীরাদির কারণরূপ হয়। সেই অবিদ্যা, (মূল কারণ) প্রকৃতিরই অবস্থা বিশেষ বলিয়া, সেই অবিদ্যাকে উপচারপূর্ব্বক কারণ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ'অবিদ্যা' শব্দের শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া, অনিয়ত সম্বন্ধে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের কারণ এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেমন মঞ্চ সকল চীৎকার করিতেছে বলিলে মাঁচার উপরে উপবিষ্ট পুরুষদিগকে বুঝায়, তথায় মাঁচার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ অনিয়ত। যাহা 'শীর্ণ' হয়, তাহাকে শরীর বলে। সেই অবিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়—এই কারণে তাহাকে 'শরীর' বলা হয়। "তত্র অভিমানবান্"—সেই অবিদ্যারূপ কারণ-শরীরে অভেদ অধ্যাস করিয়া, আমি 'হইতেছি অজ্ঞ', (আমি কিছুই জানি না) এইরূপ অবস্থাপন্ন জীব "প্রাজ্ঞঃ স্যাৎ"—প্রজ্ঞা যাঁহার আছে, তিনি প্রজ্ঞ। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ অবিনাশিস্বরূপ জ্ঞানদৃষ্টি। প্রজ্ঞেরই নামান্তর প্রাজ্ঞ (প্রজ্ঞা + স্বার্থে অণ্)।১৭

এই প্রকারে প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইল।

কারণশরীরের পর সূক্ষ্মশরীর, এইরূপ উৎপত্তির ক্রমে, বিচারার্থ উপস্থিত, সূক্ষ্মশরীরের এবং সেই সূক্ষ্মশরীর যাহার উপাধি, সেই জীবের,

বর্ণন করিবার জন্য, সেই সূক্ষ্মশরীরের কারণ আকাশাদির উৎপত্তি বর্ণন করিতেছেন :—

তমঃ প্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া
বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে ।১৮

অন্বয়—তদ্ভোগায় তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ ঈশ্বরাজ্ঞয়া বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবঃ ভূতানি জজ্ঞিরে।

অনুবাদ—সেই প্রাজ্ঞ নামক জীবগণের ভোগের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় তমঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত জন্মিল।

টীকা—"তদ্ভোগায়"—সেই প্রাজ্ঞনামক জীবগণের ভোগের জন্য অর্থাৎ তাহাদিগের সুখদুঃখ সাক্ষাৎকার সিদ্ধ করিবার জন্য, "তমঃপ্রধান প্রকৃতেঃ"—তমোগুণ যাহাতে মুখ্য, এইরূপ যে জগতের উপাদানরূপ তৃতীয় প্রকারের প্রকৃতি, ১৫শ শ্লোকে 'চ'কার দ্বারা সূচিত হইয়াছে, তাহা হইতে, "ঈশ্বরাজ্ঞয়া"—প্রেরণাদিশক্তিবিশিষ্ট জগদধিষ্ঠাতার ঈক্ষণা পূর্ব্বক সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাবশতঃ, যে ইচ্ছা জগতের নিমিত্তকারণ, সেই ইচ্ছারূপ আজ্ঞা দ্বারা, আকাশাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত "ভূতানি জজ্ঞিরে"—পঞ্চভূত আবির্ভূত বা উৎপন্ন হইল। ইহাই অর্থ। ১৮

এইরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণন করিয়া, সেই পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ সৃষ্টির বর্ণনা করিবার জন্য প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টির বর্ণনা করিতেছেন—

সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে ॥ ১৯

অন্বয়—তেষাং পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যম্ ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ক্রমাৎ উপজায়তে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের পাঁচটি সাত্ত্বিকাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—"তেষাম্"—সেই আকাশাদির, "পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ"—পাঁচটি, উপাদানরূপ সত্ত্বগুণের ভাগ দ্বারা, "শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যাম্ ইন্দ্রিয়পঞ্চকম্"—শ্রোত্র ত্বক্, অক্ষি, রসনা, ঘ্রাণ এই এই নামযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চক, "ক্রমাৎ উপজায়তে"—যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। এক একটি ভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—ইহাই অর্থ। ১৯।

পঞ্চভূতের পাঁচটি সত্ত্বাংশের প্রত্যেকটির অনন্যসাধারণ কার্য্যের অর্থাৎ এতদুৎপন্ন এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে পঞ্চভূতের সকলগুলিরই সত্ত্বাংশ সমূহের সাধারণ কার্য্যের উল্লেখ করিতেছেন :—

তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তদ্দ্বিধা।
মনো বিমর্ষরূপং স্যাৎ বুদ্ধিঃস্যান্নিশ্চয়াত্মিকা ॥২০

অন্বয়ঃ—তৈঃ সর্ব্বৈঃ অন্তঃকরণম্ (উপজায়তে); তৎ বৃত্তিভেদেন দ্বিধা। বিমর্ষরূপম্ মনঃ স্যাৎ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ দ্বিবিধ, সংশয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি।

টীকা—"তৈঃ সর্ব্বৈঃ"- সেই সত্ত্বাংশসমূহ সম্মিলিত হইলে তদ্দ্বারা, "অন্তঃকরণম্"—মন বুদ্ধির উপাদানস্বরূপ অন্তঃকরণদ্রব্য, (উপজায়তে) উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণের অবান্তর ভেদ দেখাইতেছেন এবং কি নিমিত্ত সেই ভেদ করা হয়, তাহাও দেখাইতেছেন :—"তৎ"—সেই অন্তঃকরণ, "বৃত্তিভেদেন"—অন্তঃকরণের পরিণাম-ভেদে, "দ্বিধা"—দুই প্রকারের হয়। বৃত্তির ভেদ দেখাইতেছেন—"মনঃ বিমর্ষরূপম্ স্যাৎ, বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা স্যাৎ"—মন বিমর্ষরূপ অর্থাৎ সংশয়-বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন, নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি। বিমর্ষরূপম্—বিমর্ষ শব্দের অর্থ সংশয়াত্মিকা বৃত্তি, তাহাই 'রূপ' যাহার তাহা 'বিমর্ষরূপ', তাহাই হইতেছে মন। "নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ স্যাৎ"—নিশ্চয় হইয়াছে স্বরূপ যাহার, এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাই হইতেছে বুদ্ধি। ২০

সমালোচনা

বেদান্ত প্রবেশ—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবিদ্যার্ণব লিখিত, একাদশ পরিচ্ছেদে ১৭৭ অনুচ্ছেদে ১৭৯ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। মূল্য ১৷৷০। প্রকাশক—ভারতী-ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তকে বেদান্তসূত্রের কতিপয় প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা, বিষয়সমূহের ক্রমসন্নিবেশ, বিভিন্ন বিচার্য্যবিষয়ের সংক্ষেপ নির্দ্দেশ, স্থলবিশেষে সুচিন্তিত মন্তব্যবাক্য প্রভৃতি লেখকের দীর্ঘকালীন শাস্ত্রালোচনানৈপুণ্যসহকারে সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ব্যক্ত করিতেছে। লেখক—"শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যস্থানীয় গ্রন্থ" এই সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যের অবিরোধে বেদান্ত ও বেদান্ত-সূত্রের অর্থ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐরূপ নিরূপণ বলদেবব্যাখ্যানুসারে ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থাবলম্বনে সম্পাদিত হইলে সমুচিত সাফল্য প্রাপ্ত হইত। বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যানে যে মত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, তাদৃশ বৈলক্ষণ্য শ্রীমদ্ভাগবতেও পূর্ব্বাবধি চলিতেছে। এই হেতু পরমার্থবাদী বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যাতা মহামতি শঙ্কর, রামানুজ, ভাস্কর, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বিজ্ঞানভিক্ষু, বলদেবাদি পরমাচার্য্যগণ মধ্যে যে কোন আচার্য্য-বর্য্যের মতাবলম্বনেই এবম্বিধ পুস্তক লিখিত হওয়া আবশ্যক। স্বমতানুবর্ত্তী লেখক পুস্তকের বিভিন্নভাগে প্রাচীনাচার্য্যগণ-সম্মত বিরুদ্ধ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তৎফলে পুস্তকের অপ্রামাণ্য শঙ্কা অবার্য্য হইয়াছে। লেখক নিজ বাক্যবিরোধ দূর করিতে পারেন নাই। যেমন মায়া সতী অসতী বা সদসতী নহে, এইরূপ বলিয়া স্থলান্তরে নিত্য সত্যরূপে মায়ার নির্ব্বচন করা হইয়াছে, এবং স্থলান্তরে সৃষ্টি মিথ্যা নহে নশ্বর, এইরূপ বলা হইয়াছে। সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ভাব ও মূর্ত্তামূর্ত্তাদি ভাব তৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পরন্তু ঐরূপ উক্তিতে যে বিরোধ তাহা যেন লক্ষিত হয় নাই। ঘড়ির পূর্ণের একদিকে শূন্য, দোলকের দৃষ্টান্ত, দেশ ও কাল দোলকের দোলনের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংজড়িত ইত্যাদি ভাষার সাহায্যে শাস্ত্রবহির্ভূত দৃষ্টান্তাবলম্বনে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্ব্বত্র যথোচিত রক্ষিত হয় নাই, লীলা ও খেলার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত না হওয়ায় "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" এই সূত্রের তাৎপর্য্য বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। সামান্য প্রমাদ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। পূর্ণ পর্য্যালোচনা যেরূপেই করা হউক, লেখকের খণ্ডশঃ উক্তিসমূহ সাধারণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে মহোপকার সাধন করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। লেখক দেবী ভাগবতের নীলকণ্ঠ কৃত টীকা আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্ব বিষয়ে প্রকৃত রহস্য সম্যক্ অবগত হইতে পারেন, তৎফলে এই পুস্তকের শেষাংশের আলোচনা নির্দ্দোষ হইতে পারে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র তর্কাচার্য্য, ষট্তীর্থ

শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ—শ্রীবিনোদিনী মিত্র (নাগ-দুহিতা) প্রণীত—মূল্য ।৵০।

প্রকাশক শ্রীদুর্গাপদ মিত্র—৭৭, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাগ মহাশয়কে আমরা আদর্শভক্ত বলিয়া জানি এবং শ্রদ্ধায় তাঁহার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করি।

তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির যতই আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়গুলি ভক্তদিগকে আনন্দই দিবে। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহাকে ইষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন, তাই নিজেকে 'নাগদুহিতা' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ লোকে এইরূপ সম্বন্ধ অপ্রকাশিত রাখিয়া থাকে, কারণ ইহা অন্তরের বস্তু।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

ভাগবত-কল্প-লতিকা—লেখক—শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, উত্তরসুতা, চকদীঘি, জেলা বর্দ্ধমান। ২৭ পৃষ্ঠা, দাম চারি আনা।

ভক্তিযোগ বিষয়ে একটি নিবন্ধ। নানা ভক্তিশাস্ত্র হইতে শ্লোক ও বচন উদ্ধৃত করিয়া অসাম্প্রদায়িকভাবে সরল ভাষায় বেশ গুছাইয়া লেখা। ভালই লাগিল।

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

মা ও সন্তান—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ২২ পৃষ্ঠা, দাম ।৵০ আনা।

নিবেদনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'সুকুমার মতি বালক বালিকাগণের হৃদয়ে মাতৃভক্তির উন্মেষ করানই আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।' মা ও মা নামের মাহাত্ম্য এবং সন্তানের মাতৃভক্তি বিষয়ে পয়ার ছন্দে লেখক পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। মঙ্গলাচরণটি অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

মনে রাখিবার ও মুখস্থ করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়াই বোধহয় গ্রন্থকার কবিতার অবতারণা করিয়াছেন। অমূল্য উপদেশগুলি মুখস্থ করাইবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বিদ্যাসাগর, গুরুদাস, আশুতোষ প্রভৃতি মহাত্মাদের মাতৃভক্তির কাহিনী যদি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থকার অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। 'গভীর নিশীথে যবে সুপ্ত মর্ত্ত্যধাম। উচ্চরবে ঝিল্লী তবে জপে মাতৃনাম।॥' প্রভৃতি কথা অবাস্তব হইয়াছে।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও উদ্যম প্রশংসনীয়। এই পুস্তক পাঠে কোমলমতি বালক বালিকাগণ সত্যই উপকৃত হইবে।

অমিতাভ দত্ত

বৈদিকযুগে—স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মণ্ডলেশ্বর প্রণীত ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি কর্তৃক শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসিসঙ্ঘ, লালতারাবাগ, হরিদ্বার হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা, পৃষ্ঠা ৵০+১৯৬।

বর্ত্তমান গ্রন্থকার বেদের বাক্যসমূহকে অবলম্বন করিয়া স্বরচিত গ্রন্থে বৈদিকযুগের সভ্যতা, তাহার দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী, উপাসনা-পদ্ধতি ও সামাজিক আচার ব্যবহার ইত্যাদির একটী চিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়সমূহকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, (১) বেদের সনাতন দার্শনিকতত্ত্ব ও তদানুষঙ্গিক উপাসনা পদ্ধতির বর্ণনা এবং (২) বৈদিকযুগের কাল নির্দ্ধারণ ও প্রাচীন আর্য্যগণের আদি বাসভূমি নির্ণয়, ঋষিসম্প্রদায়ের পরম্পরাগত ক্রম আবিষ্কার প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা।

ঐতিহাসিক আলোচনায় লেখক পাশ্চাত্যের প্রথিতনামা পণ্ডিতগণের মত স্থলে স্থলে বর্জ্জন করিয়াছেন ও বৈদিক সভ্যতার প্রাচীনত্বকে আরও দূরবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গবেষণা এত সংক্ষিপ্ত যে, নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহা ভাল করিয়া বোঝা কঠিন। তদুপরি আবার গ্রন্থকার বেদকে একাধারে অপৌরুষেয় ও ঐতিহাসিক বলিয়া তাঁহার গ্রন্থের আলোচ্য

বিষয়কে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন। জৈমিনি, ব্যাস প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিতে গিয়া তাহার ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বেদের আখ্যায়িকা-সমূহ কাল্পনিক অর্থবাদমাত্র। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই মতের সমর্থন করেন না এবং তাঁহারা বেদের ভিতর ঐতিহাসিক উপকরণ দেখিতে পান। গ্রন্থকার একাধারে কিরূপে বিরোধী মতকে নিজগ্রন্থে স্থান দিলেন, তাহা তাঁহার দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল।

বেদের সনাতন দার্শনিকতত্ত্ব ও উপাসনা পদ্ধতি বর্ণনে গ্রন্থকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বেদের নানাস্থান হইতে নানাবিধ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উচ্চারিত অদ্বৈতবাদই বেদের সার কথা, অপরাপর মত তাহার সোপান মাত্র।

শিবপূজা ও কালিকা পূজার বৈদিকত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও ঐতিহাসিক ব্যাপার বলিয়া বিরোধী মতের খণ্ডন আরও বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থখানিতে স্থানে স্থানে পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মতের সহিত বৈদিক অদ্বৈতবাদের তুলনা আছে। কৃতী লেখক পরিশিষ্টে গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্ট, ফিকটে ও সোপেনহাওয়ারের ভিতর বেদান্তের আভাস দেখিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন, তাঁহাদের প্রাচ্য দর্শনের অধ্যয়নই ইহার নিগূঢ় কারণ। এই মতের ঐতিহাসিকত্ব গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা ঐতিহাসিক বিচার করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার দার্শনিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

গ্রন্থখানি সারবান্ কিন্তু স্থানে স্থানে সংক্ষেপ দোষে দুষ্ট। মনে হয় লেখক শুধু বেদ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন এবং ইতিহাসও আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার সব মত গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত না হইলেও গ্রন্থখানি যে সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব, এম্-এ

মনের খেলা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৯৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা সাহিত্যের একজন যশস্বী লেখক। পাশ্চাত্যের প্রথিতযশাঃ মনস্তত্ত্ব-বিদগণ মনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, এই পুস্তকখানিতে উহারই প্রধান প্রধান বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্যে যাঁহারা মনস্তত্ত্বের বিস্তীর্ণ রাজ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের বিশেষ উপকারে লাগিবে। গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের অভিব্যক্তি লেখকের অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। পুস্তকে উল্লিখিত ইংরাজী শব্দগুলির বাংলা অনুবাদ থাকিলে ইহা বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য হইত। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

ভ্রম সংশোধন—গত বৈশাখ মাসের উদ্বোধনে ২৪৪ পৃষ্ঠার ২০, ২৯ ও ৩৮ ছত্রে Welur স্থানে Weber হইবে।

পরলোকে বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় গত ২৭শে চৈত্র, শনিবার অপরাহ্ন ৪-৩০ মিনিটের সময় সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। শনিবার অপরাহ্নে জলযোগের পর তাঁহার শরীর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি বিছানার উপর শয়ন করিয়া জপ করিতে থাকেন। এই অবস্থায় অকস্মাৎ তাঁহার দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় নদীয়া জেলার অন্তর্গত বেলপুকুর গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের পুত্র। অতি অল্প বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। যে দিন তিনি নৌকাযোগে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলেন, সেইদিন সেই নৌকায় পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজও ছিলেন। এই নৌকার মধ্যেই উভয়ের সঙ্গে উভয়ের প্রথম পরিচয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় তিনি কাশীপুরে আসিলে সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ বরাহনগরে মঠ স্থাপন করিলে সান্ন্যাল মহাশয় তাহাতে যোগদান করেন। তিনি শ্রদ্ধের স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সহিত উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করেন। কয়েক বৎসর ঘুরিয়া তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া চাকুরী গ্রহণ করেন।

তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করিয়া কাশীমিত্রের ঘাটে লইয়া গিয়া সৎকার করা হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি চারিটী পুত্র এবং দুইটী বিধবা কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী—গত ২৯শে মার্চ্চ, শুক্রবার সন্ধ্যার সময় বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ২৮তম বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু সন্ন্যাসী ও গৃহী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠের পর সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়, তৎপরে মিশনের সেক্রেটারী স্বামী বিরজানন্দ ১৯৩৬ সনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। গত বৎসরের কার্য্যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে:—

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্ট, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও

মিশনের সমুদয় কেন্দ্রের সংখ্যা ১৯৩৬ সনের শেষে ৯৩টি ছিল। উহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও উহার শাখাগুলিকে বাদ দিলে মিশন কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৭টি হয়।

স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয়বিধ কার্য্যই মিশন-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঁকুড়া, হুগলী, খুলনা, মালদহ, বীরভূম, গুন্টুর, কাণপুর, মেদিনীপুর এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝটিকা ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের সময় মিশন কর্ত্তৃক জনসাধারণের মধ্যে যথাসাধ্য সেবাকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল।

জনসেবা

জনসেবা, শিক্ষা ও প্রচার এই তিন বিভাগে মিশনের স্থায়ী কাজ হইয়াছে এবং মিশনের প্রতি কেন্দ্রেই উহাদের মধ্যে এক বা একাধিক কাজের অনুষ্ঠান হইয়াছে। জনসেবার দিক দিয়া নিম্নলিখিত তিন প্রকার কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

হাসপাতালে অন্তর্বিভাগের কাজ, দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাজ, নিয়মিত ও সাময়িক অন্যান্য প্রকারের সেবা। ৪৭টি কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩২টিতে এই জাতীয় এক বা একাধিক সেবাকার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। মিশনের অধীনে সর্ব্বসমেত ৭টি হাসপাতাল পরিচালিত হইতেছে। ভবানীপুরের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন প্রসূতি-চিকিৎসালয় ইহাদের অন্যতম। এতদ্ব্যতীত ৩১টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দিল্লীর যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় ইহাদের অন্যতম। কাশী, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ প্রভৃতি তীর্থস্থানে এবং রেঙ্গুন, বোম্বাই, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে মিশনের কেন্দ্রসমূহে বহুবিধ জনসেবার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কাশীসেবাশ্রম মিশনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জনসেবার প্রতিষ্ঠান। রেঙ্গুন হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে ১৯৩৬ সনে ২,২৭,৩৩৫টি রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে।

উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সারগাছি, সোণারগাঁ (ঢাকা) প্রভৃতি মিশনের পল্লীকেন্দ্রেও জনসেবার কাজ পরিচালিত হইয়াছে।

মিশনের হাসপাতালসমূহের অন্তর্বিভাগে ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সনে রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮৩৯ ও ৭৭০০ এবং দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহে রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯০০০০০ এবং ১০,২৯,৩৪৯ হইয়াছিল। নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা শতকরা ৩৭ ও ৬৩ অনুপাতে ছিল।

শিক্ষা বিভাগ

মিশনের শিক্ষাবিভাগের কাজ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল। ইহাতে ম্যাট্রিকুলেশন হইতে নিম্নপ্রাথমিক পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি ছাত্রভবন ও অনাথালয় প্রভৃতিও মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য অনেক নৈশ ও দিবাবিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে।

৪৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৪টিতে কোন না কোন প্রকার শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ১৫টি ছাত্রভবন, ৩টি অনাথালয়, ৪টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ২টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, ৩৫টি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি নৈশ বিদ্যালয়, ৩টি শিল্প শিক্ষালয় এবং সিংহল ও মালয়দ্বীপে ১৪টি ইংরাজী বিদ্যালয় ও স্থানীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ৩টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। সেখানে ছাত্রগণের জন্য বাসভবনও আছে।

ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শিক্ষাভবন কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এবং কয়েকটি জামসেদপুর, দেওঘর ও বরিশাল প্রভৃতি সহরে অবস্থিত। এই সকল স্থানে ছাত্রগণের শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত সরিষা গ্রামে, মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথিতে ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ প্রভৃতি কেন্দ্রে পল্লীশিক্ষা-বিস্তারের কাজ পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইতেছে। সরিষাকেন্দ্রে ৫০০ ছাত্র ও ছাত্রী আছে এবং বর্ত্তমানে উহার বাৎসরিক ব্যয় বার হাজার টাকা।

শিল্প শিক্ষালয়গুলিতে নানা বিভাগের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যথা, সূতাকাটা, রঞ্জন, বয়ন, ক্যালিকো ছাপা ও দর্জ্জির কাজ, বেতের কাজ, পাদুকা নির্ম্মাণ, মোটর ইঞ্জিনীয়ারীং ইত্যাদি। মাদ্রাজের শিল্প শিক্ষালয়ে মোটর ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ ৫ বৎসরে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং মিশনের প্রদত্ত সার্টিফিকেট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়।

হবিগঞ্জ কেন্দ্রে স্থানীয় মুচি বালকদের শিক্ষার জন্য দুইটি পাদুকা নির্ম্মাণের কারখানা এবং অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সমবায় ঋণ-সমিতিসমূহ পরিচালিত হইতেছে।

মাদ্রাজ ও কলিকাতার ছাত্রভবন, দেওঘরের বিদ্যাপীঠ, কলিকাতার সিষ্টার নিবেদিতা স্কুল এবং সরিষাকেন্দ্র মিশনের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে মাদ্রাজের শিক্ষাকেন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে ১৯৩৬ সনে ১৩১৭টি ছাত্র ছিল এবং ইহার বাৎসরিক ব্যয় ৫০ হাজার টাকার উপর হইয়াছে।

১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সনে মিশনের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৬০৩৪ ও ৭৩৯০ ছিল; শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে ৫৭৯০টি ছাত্র ও ১৬০০টি ছাত্রী।

ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে জনসেবা ও শিক্ষার কার্য্যে মিশনের মোটামুটি ব্যয় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকারও অধিক হইয়াছে।

পুস্তকালয় ও পাঠাগার

প্রায় প্রতি কেন্দ্রেই একটি করিয়া পুস্তকালয় ও পাঠাগার আছে এবং এইরূপে প্রায় ৬০টি পুস্তকালয় ও পাঠাগার চলিতেছে। রেঙ্গুনে মিশন সোসাইটীর কাজ উত্তমরূপে চলিতেছে এবং আলোচ্যবর্ষে দৈনিক গড়ে একশত পাঠক সেখানকার পাঠাগারে যোগদান করিয়াছেন। মাদ্রাজের ছাত্রভবনের পুস্তকালয়ে ১৯ হাজারের উপর পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রচার বিভাগ

মিশনের সন্ন্যাসীরা ভারতের সর্ব্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। প্রবুদ্ধ ভারত (মায়াবতী), বেদান্ত কেশরী (মাদ্রাজ), মেসেজ অফ দি ইষ্ট (বোষ্টন), উদ্বোধন (কলিকাতা), রামকৃষ্ণ বিজয়ম্ (তামিল) মাসিক পত্রিকা এবং অন্যান্য পুস্তকাদির সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত বেদান্তের বাণী ও শিক্ষার সমধিক প্রচার হইয়াছে। মিশনের বহু কেন্দ্রে, সভাসমিতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, বক্তৃতা ও বেতার বার্ত্তার দ্বারাও প্রচার কার্য্য হইয়াছে।

কতকগুলি কেন্দ্রে হরিজন ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ত্রিচুর (কোচিন) এবং সেলা (খাসিয়া পাহাড়) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত স্থানে মিশনের সন্ন্যাসিগণ বার বৎসরের অধিককাল যাবৎ সমাজের উপেক্ষিত জনসাধারণের উন্নতিকল্পে শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্য কাজ করিতেছেন।

সেবার আদর্শ

সভার শেষে মিশনের কর্তৃপক্ষ শ্রোতৃবৃন্দকে জাতি বর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানবসেবার আদর্শ পালন করিতে অনুরোধ করেন। মিশনের গৌরবময় আদর্শ যত অধিক সংখ্যক লোক গ্রহণ করিবেন, ততই মিশনের কার্য্যে সফলতা আসিবে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সনে মিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতের যুবকবৃন্দ উত্তরোত্তর সেই আহ্বানে সাড়া দিলে দেশের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। বক্তৃতার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলন স্মৃতিগ্রন্থ—শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক কমিটির উদ্যোগে কলিকাতায় গত মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। গ্রন্থখানা "মানব ধর্ম্ম" নামে অভিহিত হইবে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি, নিউ ইয়র্ক (আমেরিকা)—গত ৩১শে জানুয়ারী, নিউইয়র্ক সহরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ "স্বামী বিবেকানন্দের প্রতীচ্য তীর্থযাত্রা" শীর্ষক একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হিন্দু ধরণে মিষ্টান্ন বিতরণান্তে এই দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুনরায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ক্র্যাফটস্ রেঁস্তোরাঁয় একটী ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। 'এসিয়া' পত্রিকার সহ সম্পাদিকা মিস্ এল, সি ওয়েল, নিউইয়র্কের কলেজের প্রেসিডেন্ট ডঃ ফ্রেডারিক বি. রবিনসন এবং স্বামী নিখিলানন্দ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। ভারতীয় ষ্টেট রেলওয়ের মিঃ এন্, এস্, সেন চলচ্চিত্র দেখাইলে এই দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বেদান্ত সোসাইটি, সিকাগো (আমেরিকা)—গত ১৯শে ও ২১শে মার্চ্চ তারিখে সিকাগো নগরীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে 'কংগ্রেস হোটেলে' একটী ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। সিকাগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ও প্রভিডেন্স কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দ সমস্বরে একটী সংস্কৃত স্তব পাঠ করিলে মিসেস রাথ এভাবেট, অধ্যাপক চার্লস এস্ ব্র্যাডেন এবং অধ্যাপক জর্জ্জ ভি বোব্রিনস্কয় সময়োপযোগী বক্তৃতা দান করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জন বিধান করেন।

২১শে মার্চ্চ তারিখে অপরাহ্ণে স্বামী অখিলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচনা করেন। কয়েকটী হিন্দু-সঙ্গীত গীত হইলে এই অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কো (আমেরিকা)—গত মার্চ্চ মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ নিম্নলিখিত বক্তৃতা দান করিয়াছেন :—

৩রা মার্চ্চ—"আধ্যাত্মিক জীবনে নীতির স্থান।" ৭ই মার্চ্চ—"আন্তর্জ্জাতিক মন এবং ইহার নিয়মন।" ১০ই মার্চ্চ—"বিবেক হইতে সহজ জ্ঞান।" ১৭ই মার্চ্চ—"শ্রীরামকৃষ্ণ—ভারতের দেব-মানব।" ১৭ই মার্চ্চ—"শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা।" ২১শে মার্চ্চ—"সমাহার, ধ্যান, মুক্তি।" ২৪শে মার্চ্চ—"ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম।" ২৮শে মার্চ্চ—"মৃতোত্থান

বা পুনর্জন্ম।" ৩১শে মার্চ—"কৃচ্ছ্র সাধন এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা।"

গত ১৪ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী অশোকানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ, দিল্লী—শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে নিউ দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে গত ১৩ই এবং ১৪ই মার্চ পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং সর্দার সন্তসিংহের সভাপতিত্বে সভার অধিবেশন হয়। স্বামী বিশ্বনাথানন্দ কর্তৃক প্রারম্ভিক সঙ্গীত এবং পণ্ডিত কৃষ্ণ দত্ত শাস্ত্রী, এম্-এ কর্তৃক বেদমন্ত্র গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মিঃ এম্, এন্, মজুমদার, এম্-এ গত উৎসবের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে হিন্দু-মহাসভার নেতা ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, স্বামী কৈলাসানন্দ, মিঃ কে, সান্তনম্, জমেৎ উল উলেমার সম্পাদক মৌলানা আমেদ সৈয়দ, মিঃ গোপাল আয়েঙ্গার "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবন এবং উপদেশ" সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ এস্, কে, বানার্জ্জি, এম্-এ হিন্দী ভাষায় লিখিত একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর স্বামী কৈলাসানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে প্রসাদ বিতরণান্তে উৎসব কার্য্য শেষ হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-হাসপাতাল, দিল্লী—গত ৮ই মার্চ লেডি লিন্‌লিথ্‌গো (বড়লাটপত্নী) দিল্লীর তুর্গাগঞ্জস্থিত রামকৃষ্ণমিশন যক্ষ্মা-হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। মেজর এ, আর, চৌধুরী মহাশয় হাসপাতালের এক্‌স্‌রে এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি প্রদর্শন করেন। লেডি লিন্‌লিথ্‌গো অতি আগ্রহের সহিত প্রত্যেকটী বিভাগ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। বিদায় লইবার সময় তিনি বলেন—"রামকৃষ্ণ মিশন অতি আশ্চর্য্য কার্য্য করিতেছে। আমি কাশী ও রেঙ্গুনে মিশনের সেবাকার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর—আমরা দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পঞ্চদশ বার্ষিক (১৯৩৬ সাল) রিপোর্ট পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরের শেষে বিদ্যাপীঠে ১৩২ জন ছাত্র ছিল। ১৯৩৫ সালে ছাত্র ছিল ১২৪ জন। বিদ্যাপীঠের শিক্ষকগণের মধ্যে ১২ জন গ্র্যাজুয়েট ও ১৪জন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। তাঁহাদের অধিকাংশই রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী। কতিপয় আত্মত্যাগী কর্ম্মীও নামমাত্র পারিশ্রমিক লইয়া শিক্ষকতা করিতেছেন।

আলোচ্য বৎসরে দশম মানে ছয়জন ছাত্র ছিল। এই ছয়জনই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়, ইহাদের মধ্যে পাঁচজন প্রথম বিভাগে ও একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের স্বাস্থ্য বৎসরের আগাগোড়াই ভাল ছিল। অনেকের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। ডাঃ হিরণ্যকুমার বানার্জ্জি, এল এম-এস, ডাঃ সৌরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, এল-এম-এস, ডাঃ নিশিকান্ত বানার্জ্জি (হোমিওপ্যাথ) প্রভৃতি চিকিৎসক পারিশ্রমিক না লইয়া চিকিৎসা করিয়াছেন। বিদ্যাপীঠে ছাত্রদের নানা প্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা, প্রমোদ ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দেওঘরের পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখান হইয়াছে।

এই বিদ্যাপীঠে বৃত্তি-শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও টাইপ-রাইটিং ও উদ্যান-রচনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গীত ও কলা শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণ যাহাতে গঠনশক্তি, পরিচালনক্ষমতা প্রভৃতি গুণ আয়ত্ত করিতে পারে, তজ্জন্য কতকগুলি বিষয়ের ভার তাহাদের উপরই দেওয়া হয়। "বিদ্যাপীঠ" নামে তাহাদের পরিচালিত একখানা পত্রিকাও আছে।

শত-বার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যাপীঠ হইতে 'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প' নামে একখানা সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে বিদ্যাপীঠের লাইব্রেরীর জন্য ৩০০৲ ব্যয়ে ২৩০খানা নূতন পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। বৎসরের শেষে বিদ্যাপীঠের লাইব্রেরীতে ২৭৬৬ খানা পুস্তক ছিল।

বেলুড়ের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দানে বিদ্যাপীঠে মেডিকেল ওয়ার্ড নির্ম্মিত হইয়াছে এবং গত বৎসর জানুয়ারী মাসে ইহার দ্বারোদ্ঘাটিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বিদ্যাপীঠের ডিস্পেন্সারীতে তিন হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ইহাকে যেরূপ আকারে পরিণত করিতে চাহেন, তাহা করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর আনুকূল্য ব্যতীত এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা আশা করি, বদান্য ব্যক্তিগণের সহায়তায় এই বিদ্যালয়টী উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে।

রামপুরহাট—ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব স্থানীয় সর্ব্বসাধারণ ও ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহানুভূতিতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় স্থানীয় স্কুল-ছাত্রাবাস হইতে পত্রপুষ্প সুসজ্জিত ঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ এক সুবৃহৎ নগরসংকীর্ত্তনের দল বহির্গত হয়। ইহাতে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান ছাত্রেরা ও অনেক গণ্যমান্য লোক যোগদান করিয়াছিলেন। ৯ই এপ্রিল, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সুবৃহৎ সভা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দ ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া সভায় সকলকে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করেন। ১০ই এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭টায় স্বামী জপানন্দ 'মনুষ্য জীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি' শীর্ষক বক্তৃতা করেন। ১১ই এপ্রিল, রবিবার প্রায় ১৫০০ দরিদ্র-নারায়ণ উপস্থিত হইয়া সেবা গ্রহণ করিয়াছিল। এই সেবার ব্যয়ভার রামপুরহাটের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস মহাশয়ের সহৃদয়া পত্নী মুক্তহস্তে বহন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে স্কুল-প্রাঙ্গণে এক মহিলা-সভায় বিবেকানন্দ সোসাইটির শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র জানা মহাশয় ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও ভগবল্লাভের জন্য কঠোর সাধনা ও প্রেরণা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় পাঁচ ছয় শত মহিলা এই সভায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। ১২ই এপ্রিল, সোমবারও ছায়াচিত্রযোগে ঠাকুরের জীবনী পুনরালোচনা করা হয়। এই সভায়ও প্রায় সাত আট শত নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ময়মনসিংহ)—বিগত ৩০শে ফাল্গুন, রবিবার হইতে ৭ই চৈত্র, রবিবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে নিম্নোক্ত-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ৩০শে ফাল্গুন, আশ্রমে বিশেষ পূজা পাঠ এবং ভজনাদি। ১লা চৈত্র, কেওটখালি এ, বি, আর ইনষ্টিটিউটে ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার চাটার্জ্জি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা ও বক্তৃতা। ২রা চৈত্র, আশ্রমে ভাগবতপাঠ। ৩রা, ময়মনসিংহ ই, বি, আর ইনষ্টিটিউটে স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা। উহাতে অধ্যাপক গিরিজাকান্ত মজুমদার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান খানবাহাদুর মৌলবি সরফউদ্দিন আহাম্মদ এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বানার্জ্জি

প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ৪ঠা, আশ্রমে বৈঠকী-সঙ্গীত। ৫ই, স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে সুসংএর জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা। ৬ই, আশ্রমে সিভিল সার্জ্জন লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল এস, নাগ, আই, এম, এস্, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় সহরের প্রায় ৫০০ শত বিশিষ্ট নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের সারগর্ভ ধর্ম্মালোচনা সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ৭ই চৈত্র, সমস্ত দিনব্যাপী পদকীর্ত্তন ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুমান ১৫ হাজার নরনারী সমবেত হইয়া প্রসাদ ধারণ ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণে পরমতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কাঁথি (মেদিনীপুর)—বিগত ৩রা ৪ঠা এপ্রিল স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সৌজন্যে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৩রা এপ্রিল, শনিবার প্রাতে উষা-কীর্ত্তন, পূজা, পাঠ ইত্যাদি হইয়াছে এবং মধ্যাহ্নে প্রায় দুই সহস্র নরনারী পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আশ্রম-প্রাঙ্গণ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করে। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় হরিসভায় বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রেমধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

৪ঠা এপ্রিল, রবিবার প্রাতে পূজা, পাঠ ও ভজন ইত্যাদি হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় হাই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বামী জপানন্দ উক্ত সভায় "শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। তৎপরে সভাপতি মহোদয় "শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ-রচয়িতাগণকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

সৈয়দপুর—গত ১২ই এপ্রিল হইতে ১৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সৈয়দপুর (রংপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে নয়দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম পাঁচ দিবস প্রত্যহ সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের স্বামী গিরিজানন্দ আশ্রমে উপনিষদ ও ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসাব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সুরথকুমার বসু মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষিত দল কর্ত্তৃক "নিমাই সন্ন্যাস" গীতাভিনয় হয়। ১৮ই এপ্রিল, রবিবার মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, পাঠ, হোম এবং আলোকদিহির কীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "নিমাই-সন্ন্যাস" গীতাভিনয় হয়। প্রায় দুই হাজার নরনারী অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈকালে স্থানীয় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত করুণাচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী আলোচনা সভায় বেলুড় মঠের স্বামী গিরিজানন্দ, স্বামী গদাধরানন্দ ও ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য এবং নিলফামারির শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ঠাকুরের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রাত্রে পুনরায় আলোকদিহির কীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "মানভঞ্জন" অভিনীত হয়। পরদিন ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় স্বামী গিরিজানন্দ ছায়াচিত্র যোগে বৈদিক আর্য্য কৃষ্টিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ পর্য্যন্ত একটী ধারাবাহিক চিত্র শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বর্ণন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, যশোহর—স্থানীয় সেবাশ্রম ও জনসাধারণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে গত ২০শে ও ২১শে চৈত্র শনিবার ও রবিবার দুই দিবসব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অপূর্ব্বানন্দ ও স্বামী মেধেশ্বরানন্দ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ২০শে চৈত্র, শনিবার স্বামী অপূর্ব্বানন্দের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় সেবাশ্রমের কার্য্যবিবরণী পঠিত হওয়ার পর স্বামী মেধেশ্বরানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও যুগপ্রয়োজন" সম্বন্ধে অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর উদ্দেশ্য এবং বর্ত্তমান সভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণের দান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে কলিকাতার সুবিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া, শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের মধুর কীর্ত্তন বহু নরনারীকে আনন্দ দান করিয়াছে।

২১শে চৈত্র, রবিবার অতি প্রত্যুষেই ভজনকীর্ত্তন পূজা পাঠ হোম ইত্যাদি আরম্ভ হয়। দলে দলে কীর্ত্তনের দল আশ্রম-প্রাঙ্গণে আসিতে থাকে। অপরাহ্নে প্রায় তিন সহস্র নরনারীকে পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ দেওয়া হয়। অতঃপর ভাগবৎ পাঠ, ভজন-সঙ্গীত ও আরাত্রিক ইত্যাদির পরে একটী বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। তাহাতে উক্ত স্বামীজিদ্বয় "শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও সেবাধর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতাদ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী রচনা-প্রতিযোগীদিগের মধ্যে পারিতোষিক বিতরিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের মহাসমাধিলাভের পর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য। চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়া নামক স্থানে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। এই সময় তাঁহার সহপাঠী শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) এবং শরতের (স্বামী সারদানন্দ) সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রয়াগধামে অবস্থান করিতেছেন। এই পুণ্যতীর্থে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একটী শাখা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি

স্বামী অখণ্ডানন্দ

একদিন ঠাকুরের কাছে গেছি, কয়েকজন ভক্ত ক্রমে ক্রমে এসেছিলেন। ঠাকুর সেদিন কত রকমের কথাই বললেন। প্রথমেই বললেন, 'আমি কালী-ঘরে বসে আছি, দেখি, একজন মন্দিরে এসে এক স্তব পাঠ করলে। শব্দে মন্দির কেঁপে উঠেছিল। পেছন ফিরে দেখি, পাগলের মত বেশভূষা —ছেঁড়া কাপড় সব গায়ে। লোকজন খেয়েদেয়ে যেখানে পাতা ও উচ্ছিষ্ট ফেলেছে, সেখানে অনেক কুকুর সব জুটেছে, আমি দেখ্‌ছি, সে পাগল সেই খানে গিয়ে একটা কুকুরের কান ধরে বলছেন, 'তুইও খা আমিও খাই।' আশ্চর্য্য, সেই কান ধরায় কুকুরটা শান্তভাবে রইল, যেন কতদিনের ভাব।' তারপর তাঁকে ভাল খাবার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খেলেন না, না খেয়ে হন হন করে ফটক দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ঠাকুরের আদেশে হৃদয় তাঁর পেছন পেছন খানিকটা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্য কি?' তার উত্তরে তিনি ডোবার জল দেখিয়ে বললেন, 'এই জল আর গঙ্গার জল যেদিন এক হবে—সেদিন হবে' (সত্য বোধ হবে)।

ঠাকুর বলছেন, 'দেখ, ছোট ছোট ছেলেরা সব চৈতন্যময় দেখে, তাদের চক্ষে যেন জড় বস্তু নেই, সব চৈতন্যময়। কেন বলছি জানিস? একদিন দেখি, একটি ছেলে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। ফড়িংএর কাছে একটা শালপাতা পড়েছিল, পাতার একটা দিক চাপা। এখন হয়েছে কি, বাতাসে শালপাতার একদিকটা পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে, পাছে পাতার শব্দে ফড়িং উড়ে পালিয়ে যায়, তাই সে পাতাটাকে বলছে, 'চুপ্‌ চুপ্‌।' আমি দেখছি, আনন্দে ভাবছি; দেখেছ, পাতাটাকে একেবারে জীবন্ত দেখছে'।

'আর একদিন শিবু—ছোট্ট ছেলে, মেঘ করে খুব বিদ্যুৎ হানছে। তাই দেখে সে একবার করে বাইরে যাচ্ছে আর ভেতরে এসে বলছে, 'খুড়ো ঐ চক্‌মকি ঝাড়ছে'। আমি বল্লাম, 'চক্‌মকি কিরে ?' সে আকাশে বিদ্যুৎ চমকান দেখে বলছে 'ঐযে', তখন চক্‌মকির কাল।

একদিন বলছেন, 'আগে এখানে সব তান্ত্রিক সাধকরা এসে তাঁদের সব ক্রিয়া কর্ম্ম করতেন। কোতরঙ্গের (কোন্নগরের কাছে) অচলানন্দ তীর্থ স্বামী তাঁর উত্তর সাধকদের নিয়ে পঞ্চবটীতে সাধন করতে আসত। আমি তাদের মুদ্রা যথা—চাল ভাজা কাঁচালঙ্কা এই সব দিয়ে আসতাম। সকলেই কারণ করত। অচলানন্দও খুব কারণ করত। ছিরাসনে গম্ভীর ভাবে বসে ধ্যান জপ খুব করতে পারত। অপর সব ধমি টমি করে আর পেরে উঠত না।'

ঠাকুর একদিন (সেদিন রাত্রে ছিলাম) সকালে আমাকে কালীঘরে নিয়ে গেলেন। একলা গেলে ঐ চৌকাঠের বাইরে যেখানে সকলে গিয়ে চরণামৃত নেয়—সেইখানে গিয়ে দেখতাম, মন্দিরে শিব শুয়ে আছেন; মাথা দক্ষিণদিকে আর পা উত্তর দিকে। বাইরে থেকে তাঁর (শিবের) মুখ দেখা যেত না। শুধু মনে হত, যেন সোণার জটা শিবের মাথায় জড়ান। শিবের মুখখানা কখনও দেখতে পেতাম না। সেদিন ঠাকুর একেবারে মন্দিরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বলছেন, 'এই দেখ্ চৈতন্যময় শিব।' আমার মনে হল যেন চৈতন্যময় নিশ্বাস ফেলছেন। ঠাকুর বলছেন, 'দেখ্ দেখ্ এই চৈতন্যময় কি করে শুয়ে আছেন।' আমি ত স্তম্ভিত—আমার ঠিক বোধ হল যেন সত্যই চৈতন্য-ময় শিবই শুয়ে আছেন। এতদিন ভাবতাম যে সব যায়গায় যেমন শিব, এও তেমনি, কিন্তু একি, এযে জীবন্ত দর্শন করছি। সে যে কি আনন্দ ঠাকুর প্রাণে ঢেলে দিলেন তা মুখে আর কি বল্‌ব —অনুভূতিরই বিষয়।

তারপর ঠাকুর (তাঁর কাপড় প্রায় খসে পড়েছে) মার কাপড় একটু টেনে দিলেন, পাঁজর একটু সরিয়ে দিলেন, বাউটী একটু নেড়ে দিলেন, যেখানকার যেটী ঠিক করে দিলেন। পরে ফিরে আসবার সময় একেবারে উলঙ্গ। পাঁচ সাত বোতল মদ খেলে যেমন হয় তেমন উন্মত্ত, অনেক কষ্টে তাঁকে ঘরে আনবার পর অনেকক্ষণ তিনি সমাধিস্থ হয়ে রইলেন।

সেদিনকার কথা আর কি বলব—আমাকে কি দেখালেন ঠাকুর—এই ভাবতে ভাবতে দিনটা যে কোনদিক দিয়ে গেল তা জানতেও পারলাম না। ঠাকুরও ভাবে কত গান করলেন।

আর একদিন গিয়ে দেখি, ঠাকুরের ঘরটি বড় বাজারের মাড়োয়ারী সমাজে পূর্ণ। কয়েকজনের হাতে তুলসীমালা এবং তাঁরা ঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে জপ করছেন। আর ঠাকুরের সম্মুখেই নানা রকমের উৎকৃষ্ট মেওয়া, বেদানা, আঙ্গুর, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, খোবানী, জলগুজিয়া ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে রাখছেন দেখলাম—এঁরাই এনেছেন। এঁদের ভক্তির তারিফ করতে হয়। যাঁরা জপ করছেন, তাঁদের আর অন্যদৃষ্টি নেই। ঠাকুর ঐরকম যখনই হিন্দু-স্থানী বা রাজপুতানার ভক্তরা তাঁর কাছে আসতেন তখন তিনি এই গানটি গাইতেন—

"হরিসে লাগি রহোরে ভাই,
তেরা বনত বনত বনি যাই,
তেরা বিগড়ি বাত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই
শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে
মীরাবাঈ।"

হাসতে হাসতে এ গানটিও গাইতেন—

"(মেরা) রামকো না চিনা হায়, দেল, চিনা
হায় তুম্ ক্যারে।
আওর্ জানা হায় তুম ক্যারে।

সন্ত্ ওহি যো, রাম-রস চাখে, আওর্ বিষয়-রস-
চাখা হ্যায় সো ক্যাবে।
পুত্র ওহি যো কুলকো তারে, আওর্ যো সব
পুত্র হ্যায় সো ক্যাবে।"

দাশরথি রায়ের গানটি হাসতে হাসতে রঙ্গ করে গাইতেন—

"আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল
ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল, মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ
রাম হৃদয়ে।
শ্রীরাম-কল্পতরুমূলে বই, যে ফল বাঞ্ছা করি
সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই (ধনি লো, আমি) ও ফল
গ্রাহক নই,
যাব তোদের প্রতিফল বিলায়ে।"

তাঁরা যে একমনে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে জপ করে যাচ্ছেন তাই দেখে তিনি বলছেন, "শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতা যখন বনবাসে তখন একটি পাখী জল খাচ্ছে আর 'রাম রাম রাম' 'রাম রাম রাম' জপ কচ্ছে, তাই দেখে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন, 'লক্ষ্মণ, দেখ দেখ জল খাচ্ছে—আর ঠোঁটে বলছে, 'রাম রাম রাম'। রাম ভগবানের নাম।

"ওহি রাম দশরথকি বেটা,
ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।
ওহি রাম জগত বনায়া
(পসেরা),
ওহি রাম সবসে নিয়ারা।"

রাজপুতানার ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর বড় রঙ্গ করলেন। আর যে সব রাজপুতানার ভক্তদের আমি দেখলাম, তাঁরাও ভক্তচূড়ামণি।

আর একদিন গিয়ে দেখি, রাজপুতানার মাড়োয়ারী অনেক ভক্ত পঞ্চবটী তলায় বন-ভোজনের আয়োজন করেছেন। বাট্টী, চুরমা আর ডাল, এই তাঁদের বনভোজনের খাদ্য। প্রকাণ্ড ঘুঁটের পাঁজার আগুনে আটার তাল পাকিয়ে দেয় এবং তারপর যখন ফেটে যায় তখন উপরের শক্ত অংশটি দিয়ে বাট্টী তৈরী হয়, আর ডাল দিয়ে খায়; ভেতরের নরম ভাগটিতে যথেষ্ট পরিমাণ ঘি চিনি পেস্তা, বাদাম্ কিসমিস, এলাচ ইত্যাদি দস্তুর মত মেখে বড় বড় লাড্ডু পাকায়—তাকেই চুরমা বলে। এঁদের কাছে অতি উপাদেয়। ঐ রকম লাড্ডু পরাত ভরে ঠাকুরকে তাঁরা এনে সব দিলে। এ দেখে ঠাকুর বড় আনন্দ করতে লাগলেন। তাঁরা চলে গেলে তখনি ঠাকুর বললেন, 'নরেনকে ডাকিয়ে এনে খাওয়াতে হবে। এ জিনিষ এক নরেন ভিন্ন কেউ হজম কর্ত্তে পার্ব্বে না, এ সব নরেন না খেলে হজম করবে কে? নরেন যেন জলন্ত অগ্নি। কলাগাছ ফেলে দিলেও পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।' বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য একা স্বামীজিই সব চেয়ে বেশী খেতেন।

আর একদিন আমি খুব আনন্দময় একজন সাধু দেখেছিলাম। তিনি হিন্দীতে অনর্গল জ্ঞানগর্ভ ছড়া সর্ব্বদা বলতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও আমি কিছুদিন তাঁর সঙ্গ করে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। তাঁর হিন্দী ছড়ার মধ্যে একটির কয়েক ছত্র এখনও আমার মনে আছে। সেই সাধু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ কর্ত্তে কর্ত্তে ভগবদ্দর্শনের জন্য অতিশয় ব্যাকুল—সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বাবার অনাদি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ দুই হাত দিয়ে ধরে বলেছিলেন, 'আমি ব্রহ্মজ্ঞান না পেলে তোমায় ছাড়ব না।' বলতেই মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল, কারণ মন্দিরের মধ্যে গিয়ে বাবাকে স্পর্শ করতে কেউ পারত না। পূজারী পাণ্ডারা তাঁকে ধাক্কা মেরে মন্দির থেকে বার করে দিলেন। সেই অবধি বাবার কাছে আনন্দ পেয়ে সাধু আনন্দময় পুরুষ হয়ে ভ্রমণ করছেন। সেই সাধুর কথা আমি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলে একটি ছড়ার দু'এক ছত্র বলেছিলাম, যথা—

"শুন নর লোই—ছোটা বড়া হ্যায় না কোই,
আর জোই ব্রহ্ম পিলমে—পিপিল ভী সোই
হ্যায়।"

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'মানে কি?' আমি বললাম, 'হে নবলোক, তোমরা সকলে শোন, ছোট বড কেউ নেই, যে ব্রহ্ম পিল কিনা হাতীতে—সেই ব্রহ্ম পিপিল কিনা পিপড়েতে। একই ব্রহ্ম হাতী ও পিঁপড়েতে সমান ভাবে রয়েছে, এর ছোট বড নেই। ঠাকুর শুনেই হাসতে হাসতে বললেন, 'হাতীর শক্তি আর পিপড়েব শক্তিটা ত এক নয়। ব্রহ্ম এক কিন্তু শক্তিতে ছোট বড় নেই?' ঠাকুরের সঙ্গে যখন এই কথা হয় তখন আমি একা, আর কেউ ছিল না। তারপর দেখতে দেখতে কত ভক্ত এসে ঠাকুরের ঘর ভরে গেল।

তখন আমি হয়ত পঞ্চবটী বা বেলতলায় গিয়ে বসে গেলাম। সব সময়েই ঠাকুরের ঘরে অত ভিড়ের মধে চুপ করে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারতাম না।

আর একদিন গেছি, সকালে গিয়েই দেখি, ঠাকুর তাঁর ঘরের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় উত্তর দিকের ভিত ঘেঁসে পূর্ব্বাস্য হয়ে দাড়িচুল কামাচ্ছেন। আমায় বল্লেন, 'আজ থাক্, আমি থেকে গেলাম।'

দক্ষিণেশ্বরে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়। স্কুল পালিয়ে যেতেন, গলায় কোঁচার খুঁট, খুব সরল, কাজকর্ম্মে খুব পরিষ্কার, ঠাকুর তাঁকে ভাল বাসতেন।

আর একদিন গিয়ে দেখি, হাতে বাব বাঁধা, গলায় ব্যাণ্ডেজ। শুনলাম, ভাবের সময় পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল।

তারপর বলরামবাবুদের বাড়ীতে ঠাকুরকে কয়েকবার যেমন দেখেছি ও আমার যা মনে আছে তাই লিখছি।

বলরামবাবুদের বাড়ীতে খুব ভিড় হয়েছে, সব রকম লোক আছেন। ভক্ত অভক্ত দুইই। শশধর তর্কচূড়ামণি—দোহারা চেহারা—সাদাধুতি—কাঁধে সাদা উড়ানি ও গলায় একছড়া মালা—অবনত দৃষ্টি, তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্য পটলডাঙ্গার ভূধর চাটুয্যেও ছিল। ঠাকুর শশধর তর্কচূড়ামণিকে বলছেন, 'ওগো এখানে ত অনেক লোক, তুমি কিছু বল না।' শশধর তর্কচূড়ামণি বললেন, 'আমি নাস্তিদেরই কাছে কিছু বলি, এখানে সব আস্তিক ভক্ত, এখানে আমি কি বলব? আপনিই বলুন।' ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'দেখ, তোমাকে আগে জানতাম তুমি একটা ভূয়ো পণ্ডিত, কিন্তু এখন দেখি তুমি একজন সাধক।' শশধর তর্কচূড়ামণির চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারে জল পড়তে লাগল। সেদিন ভাবমুখে ঠাকুরের কত নৃত্য, কীর্ত্তন ইত্যাদি হতে লাগল।

আর একদিনের কথা ঠাকুর সকাল সকাল বলরামবাবুর বাড়ী এসেছেন। অনেক ভক্ত তাঁর চারদিকে বসে আছেন। এমন সময় স্বামীজি একটা কামিজ গায়ে এসে ঠাকুরের খুব কাছে বসলেন। ঠাকুর, 'হ্যাঁরে, যাস নি কেন?' এরূপ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজি গুন্ গুন্ করে গান ধরলেন, 'নেরে মন রামনাম নিতি নিতি নেরে' ইত্যাদি। ঠাকুর শুনে মুগ্ধ এবং সকলেই স্তব্ধ। ক্রমশঃ ভক্ত অভক্ত নানা শ্রেণীর লোক সমাগমে বলরামবাবুর বাড়ী ভরে গেল। কিছুক্ষণ এরূপ কথাবার্ত্তার পরই ঠাকুর হঠাৎ ভাবমুখে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ অবস্থার নৃত্যগীত আরম্ভ করলেন। তাই শুনে ভক্তগণের মধ্যে অনেকেরই ভাবান্তর উপস্থিত হল। কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ ধ্যানস্থ, কারও পুলক, অদ্ভুত ব্যাপার! যারা এসেছিল তামাসা দেখতে তারাও নাব্‌বার সময় বলতে লাগল, 'বা! কি মা নাম করে রে পরমহংস—একবারে বুকের মধ্যে কড় কড় করে কেটে ঢুকে যায়।'

আর একবার রথের দিন ঠাকুর বলরামবাবুর বাড়ী এসেছিলেন। কি আনন্দের বন্যাই বয়েছিল। সংকীর্ত্তন আর উদ্দাম নৃত্য। ঠাকুর ছেলেদের বলছেন, 'ওরে নাচ্ গা, তবে ত বলরাম মালপো দেবে।' এই কথায় ছেলেরা খুব নাম ও কীর্ত্তন করতে লাগল।

আর একদিন সকালে ঠাকুর বলরামবাবুর বাড়ী এসেছেন। এসে, উপরে উঠতেই ডান হাতে পশ্চিম দিকে যে ছোট ঘরটি তাতে বসেছেন। আরো কয়েকজন ছিলেন। আমি প্রণাম করে তাঁর পাশেই গিয়ে বসলাম। ঠাকুরের অবস্থা সেদিন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ। দুটা চারটা কথা কন আর ভাবস্থ হয়ে যান। এই অবস্থায় তিনি রামলালার কথা তুললেন, কেমন করে রামলালাকে স্নান করাতেন, রামলালা কেমন দুরন্তপনা করতেন ইত্যাদি রামলালার লীলাবৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। একদিন খৈ খাওয়াতে গিয়ে একটা ধান রামলালার মুখে লেগে যায়। 'যে মুখে মা কৌশল্যা কত ক্ষীর সর ননী দিতেও সঙ্কোচ বোধ করতেন, আজ আমি সেই মুখেই ধান দিলাম,' এই বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং ভাবস্থ হয়ে গেলেন। যখন হুঁস হলো, আবার সেই রামলালার কথা। আর কত আঁখর দিয়ে তাঁর সেই প্রাণমাতান কণ্ঠে রামলালার গুণগান করতে লাগলেন। এইরূপ বহুক্ষণ রামলালার ভাবে কেটে গেল। পরে ভাবমুখে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকবার পরই মার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, 'মা, তোমাকে আমি মনপ্রাণ দিব কি? তুমি যে মনোময়ী, তুমি যে প্রাণময়ী'। এইরূপ মায়ের সঙ্গে কত কথাই না বল্লেন, আমার কি আর সে সব কথা মনে আছে যে লিখে সকলকে জানাব? এই ভাব কেটে যাবার পর ডান হাত মুটো করে সামনে ধরে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবমুখে নিজে নিজেই বলতে লাগলেন, 'থু থু, কামকাঞ্চনে যাদের মন আসক্ত তাদের ত কিছু হবে না মা,' এই বলে কতবার নিজের হাতে থুতু ফেলতে লাগলেন। সেই থুতু হাতের নীচ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং জাজিম পর্য্যন্ত ভিজে গেল।

সেইদিন ঠাকুরের যে অদ্ভুত ভাব দেখেছিলাম তা চিরজীবনের অবলম্বন হয়ে রয়েছে। আমার মত আর যাঁরা তখন সেখানে ছিলেন তাঁদেরও তাই।

আমি একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। ঠাকুরের অবস্থা সেদিন মুহুর্মুহু অন্তর্মুখ। বাহ্যজ্ঞান হলেই আত্মসাক্ষাৎকারের ও ঈশ্বরলাভ সম্বন্ধে বললেন, 'যার যে ইষ্ট, তার সেই আত্মা, ইষ্ট আর আত্মা অভেদ। ইষ্ট সাক্ষাৎকার হলেই আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হলেই ইষ্ট সাক্ষাৎকার।'

ঠাকুর বলতেন, 'প্রহ্লাদের কি ভাবই ছিল।' কখনো বলতেন, 'নাহং নাহং,' আবার এক অবস্থা 'দাসোঽহং দাসোঽহং,' তারপরই 'সোঽহং সোঽহং' বলেই চুপ থাকতেন।

আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। বারান্দায় তক্তাপোসে রাত্রে ছিলাম। দেড় ঘণ্টা রাত থাকতে ঠাকুর প্রণব ধ্বনি করতে করতে সমাধিস্থ। ওদিকে আর একজনের সুমধুর দুর্গানাম—যথা অজপার ন্যায় 'দুর্গা দুর্গা, শিব শিব দুর্গা, শিব শিব দুর্গা, শিব শিব দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী দুর্গা, শিব শিব দুর্গা, শিব শিব দুর্গা।' সেই দিন সেই শুভমুহূর্ত্তে ঠাকুরের ঘর আকাশ বাতাস সব যেন সমাধিস্থ! ভগবান্ তখন অন্তরে বাহিরে হস্তামলকবৎ মনে হলো।

(সমাপ্ত)

নবীন চীনের নূতন ধর্ম্ম

"তাও য়্যুযান্"

সম্পাদক

চীনদেশে "তাও য়্যুয়ান্" বা "তাও কলেজ" নামক ধর্ম্মমতের অভ্যুদয় প্রাচীন তাও ধর্ম্মের আধুনিক অভিব্যক্তি। এই অভিনব ধর্ম্ম-সম্প্রদায় চীনের "লাং মেন্" বা "উত্তর তাও" (Northern Tao) মতবাদ হইতে উদ্ভূত, কাজেই ইহা চীনের সুপ্রাচীন তাও ধর্ম্মমতের একটী শাখা বলিয়া গণ্য। "লাং মেন্" সম্প্রদায়ের ইংরাজী নাম "ড্রাগন্ গেট্ স্কুল"। য়্যুয়ান্ রাজবংশের সময় এই মতবাদিগণ তাওগণ কর্ত্তৃক ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত যাদুবিদ্যার অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া দার্শনিক তত্ত্বপ্রচার ও ধ্যান-ধারণার উপর জোর দেওয়ায় মূল তাও ধর্ম্ম হইতে পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চু রাজবংশের রাজত্বকালে উ ফু ইং নামক শানটাং-এর জনৈক বিচারক "তাও-য়্যুয়ান্" সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক রাজধানী তিনান নামক সহরে এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং তথায় এই মতবাদ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করে। উ ফু ইং পরলোকগত আত্মাআহ্বানকারী যন্ত্রের (Planchet) সাহায্যে স্বর্গগত একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষের আত্মাকে আনয়ন করিয়া তাঁহার উপদেশমূলে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা চীনের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পেকিং সহরে এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে চীনের প্রধান প্রধান স্থানে এবং জাপানে ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপসমূহে এই সম্প্রদায়ের তিন শতাধিক শাখা আছে।

প্রাচীন তাও ধর্ম্মের দার্শনিক আচার্য্যগণের প্রতি "তাও য়্যুয়ান্" সম্প্রদায় বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ। চীনদেশে বর্ত্তমানে প্রচলিত কনফুসে ধর্ম্ম, তাওধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা এই মতবাদের বিশেষত্ব। চীনদেশে বহুল প্রচারিত এই পাঁচটী আপাতবিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-সূত্র আবিষ্কার করিয়া এই মতবাদিগণ চৈনিক জাতিকে সাম্প্রদায়িকতার কবাল কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মের মূল উৎস এক বলিয়া "তাও য়্যুয়ান্"গণ খুব জোরের সহিত প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। ইঁহারা সকল ধর্ম্মমতের মিশ্রণ (potpourri of creeds) সমর্থন করেন এবং বলেন যে, ঈশ্বরীয় তত্ত্বপ্রচারই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সুতরাং ধর্ম্মাবলম্বিমাত্রই যখন এক ধর্ম্মপথের পথিক, তখন আর পরস্পর বিবাদে প্রয়োজন কি? এই সমন্বয়নীতিমূলে "তাও য়্যুযান্"গণ প্রাগুক্ত পাঁচটী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকদিগের নিকট প্রার্থনা করেন। এই উদ্দেশ্যে পরলোকগত আত্মাআহ্বানকারী যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং নিয়মিতভাবে প্রত্যেক কেন্দ্রে "ভবিষ্যৎ কথন অধিবেশন" (Divination Session) হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্মোহিত হইয়া দুইজন ব্যাখ্যাকারী স্বর্গীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের সমাগত আত্মার উপদেশ লিপিবদ্ধ করেন। য়্যুয়ান্ নেতৃবৃন্দ বলেন যে, এইভাবে এক ঘণ্টায় দশ হাজার অক্ষর লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছে। অন্যান্য

ধর্ম্মাপেক্ষা তাও ধর্ম্মের আচার্য্যগণের আত্মাই অধিক সংখ্যায় আগমন করেন। তবে অন্যান্য ধর্ম্মের পরলোকগত আচার্য্যগণের আত্মাও সময় সময় আসিয়া থাকেন। এইরূপে মহাত্মা মহম্মদ এবং কনফুসে একবার আসিয়া অনেক বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন। একদিন সেণ্টপল আসিয়া উপদেশ দিয়াছেন। সেণ্ট মেরী একদিন আসিয়া য়ুয়ান্‌গণকে ধর্ম্মবিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে এবং কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা জানাইতে উপদেশ দান করিয়াছেন। য়ুয়ান্ মতাবলম্বিগণ বলেন যে, "ভবিষ্যৎ কথন অধিবেশনে" একদিন খৃষ্ট আসিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কৈফঙ্গ নামক স্থানে একদিন এইভাবে খৃষ্টের আত্মা আগমন করিয়া প্লেটোর দার্শনিক চিন্তার প্রসারকে বিশ্বযুদ্ধের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই, সুতরাং উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে বিরোধ অজ্ঞতামূলক। অপর একদিন য়্যানকিং নামক স্থানে তাঁহার আত্মা আগমন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আত্মার মুক্তিই সকল ধর্ম্মের বিশ্বজনীন শিক্ষা।" য়ুয়ান্‌গণ বলেন যে, খৃষ্ট আসিয়া ইংরাজী ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু ইংরাজীভাষাবিদ্ কেহ ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না, কাজেই তাও ধর্ম্মের পরলোকগত একজন বিশিষ্ট আচার্য্যের আত্মাকে আনয়ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে খৃষ্টের উপদেশের অনুবাদ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল।

এই সকল অদ্ভুত অপ্রাকৃত বিষয়ের ভিতর দিয়া "তাও য়ুয়ান্" সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত বিশেষভাবে পরিস্ফুট বলিয়াই এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা হইল। এবম্বিধ নানাপ্রকার রাহস্যিক ব্যাপারে বিশ্বাস সত্ত্বেও চীনদেশের শিক্ষিত সমাজের উপর এই সম্প্রদায় ক্রমেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরোধ চীনদেশে সার্ব্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন। য়ুয়ান্ সম্প্রদায় চীনের পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় আবিষ্কার করিয়া ঐক্য স্থাপনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে বলিয়া ইহা তথাকার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে। প্রচলিত সকল ধর্ম্মমতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার এই প্রয়াস অদূর ভবিষ্যতে যে সমগ্র চীনকে একটী অখণ্ড সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিবে, এ সম্বন্ধে তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই।

"তাও য়ুয়ান" ধর্ম্মমতের অপর দিক "বিশ্ব লাল স্বস্তিক সমিতির" কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া প্রকটিত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দৈব নির্দ্দেশে "তাও য়ুয়ান্' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই বিভাগ স্থাপিত হয়। সর্ব্ববিধ দুর্ঘটনার নিবৃত্তি, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মানুষমাত্রেরই সকলপ্রকার দুঃখ দূর করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কর্ম্মপ্রবর্ত্তন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন এই সমিতির উদ্দেশ্য। অতি অল্পদিনের মধ্যেই জনহিতকর সেবাকার্য্যে ইহা চীনের আন্তর্জ্জাতিক "রেডক্রস্ সোসাইটী"কে পর্য্যন্ত পরাভূত করিয়াছে। পেকিং সহরে এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। ইতোমধ্যেই চীনদেশের প্রায় প্রত্যেক সহরে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রধান সরকারী কর্ম্মচারী মাত্রই ইহার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

১৯২৩ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি জাপানের ভূমিকম্পে এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে চীন রুশের দ্বন্দ্বের সময় সাইবিরিয়ার সীমান্ত প্রদেশে দীর্ঘকাল সেবাকার্য্য পরিচালন করিয়াছিল। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত চীনদেশে ইহা ব্যাপকভাবে বিবিধ প্রকার সেবাকার্য্য করিয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে

নানকিং যুদ্ধের সময় এই সমিতি অসংখ্য বৈদেশিককে আশ্রয়দান করিয়া তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল এবং ১৯৩১ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীন জাপানের অঘোষিত যুদ্ধের সময় ইহা সন্তোষজনকভাবে সেবাকার্য্য পরিচালন করিয়াছিল। গত গ্রীষ্মের সময় যখন শানটাং প্রদেশের অর্দ্ধেক স্থান জলমগ্ন হইয়াছিল, তখন "লাল স্বস্তিকের" কর্ম্মিগণ খাদ্য ও ঔষধের বোঝা বহন করিয়া পীত নদীর প্লাবনে প্রপীড়িত জনসঙ্ঘের মধ্যে অক্লান্ত সেবা চালাইয়াছিলেন।

এই সকল আকস্মিক সেবাকার্য্য ভিন্ন এই সমিতির অধীনে চীনদেশের স্থানে স্থানে অনেক স্থায়ী সেবা কেন্দ্র আছে। ইহাদের মধ্যে অবৈতনিক হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয়, দরিদ্রের শিক্ষার জন্য বিবিধ কারখানা, অনাথালয়, লোন-অফিস, ছেঁড়া কাগজ সংগ্রহ বিভাগ, শব সংকার বিভাগ, বস্ত্র ও খাদ্যদান বিভাগ, সংবাদ পত্র ও গ্রন্থপ্রচার বিভাগ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ সকল মানুষকে সমভাবে সেবা করিয়া থাকেন এবং সেবাকার্য্য পরিচালনে মানুষের জাতি ধর্ম্ম বা বর্ণের পার্থক্য কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় না।

বিগত চৌদ্দ বৎসরের মধ্যেই এই সমিতি চীনদেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে এবং "তাও য়ুয়ানের" ন্যায় বর্ত্তমানে ইহারও তিন শতের অধিক শাখা স্থাপিত হইয়াছে। দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর সমর্থনে এই সঙ্ঘের কার্য্য ক্রমেই অধিকমাত্রায় বিস্তারলাভ করিতেছে। অধুনা এই সমিতির সভ্যগণের নিকট হইতে বার্ষিক নিয়মিত পাঁচ হাজার ডলার চাঁদা আদায় হয় এবং কোন আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে তজ্জন্য ইঁহাদের নিকট হইতে এককালীন দানস্বরূপে আরও দুই হাজার ডলার পাইবেন বলিয়া ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণ আশা করেন। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মকারিগণের মধ্যে এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা অসাধারণ। সমিতির প্রধানকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া দর্শকমাত্রই ইহার বহুমুখী জনহিতকর কার্য্যাবলীর প্রতি আপনিই আন্তরিক সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। পাশ্চাত্যের যে কোন বৃহৎ জনসেবামূলক "সামাজিক ক্লাবের" সঙ্গে এই সমিতির তুলনা চলিতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ অবসর সময় এই সমিতিতে আসিয়া ধ্যান-ধারণা, উচ্চতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ, বন্ধু-বান্ধবদের সহিত সদালোচনা ও চা পানে সময় অতিবাহিত করেন। যুবক এবং ছাত্রসভ্যগণের জন্য চাঁদার হার অপেক্ষাকৃত কম। স্ত্রীলোকদিগকে এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। "স্বস্তিক সমিতির" মোট সভ্য সংখ্যা কত তাহা ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণও সঠিকরূপে বলিতে পারেন না। কোন কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা দেশের বদান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে উহা পাইয়া থাকেন।

এই সমিতিকর্ত্তৃক ব্যবহৃত স্বস্তিক "হিটলারিজম্" বা নাৎসীবাদের প্রতীক নহে। সমিতির কার্য্যবিবরণ-পত্রে লিখিত আছে যে, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এই প্রতীক গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহাতে সমাজের প্রতি ব্যক্তির সীমাহীন দায়িত্ব পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত। স্বস্তিকের চারিটী দিক তাও ধর্ম্মোক্ত ঐক্য জ্ঞাপক এবং ইহার মধ্যভাগের আড়াআড়ি চিহ্ন মুক্তির দ্যোতক খৃষ্টীয় ক্রুশকাষ্ঠ। "স্বস্তিক সমিতির" পরিচালকগণ বিশ্বমানবত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য্য পরিচালন করেন। ইহার সকল শক্তি "জগদ্ধিতায়" নিয়োজিত।

এই নবস্থাপিত সঙ্ঘের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের মধ্যে চৈনিক জাতীয় জীবনের সর্ব্বতোমুখী জাগরণের অভিব্যক্তিই প্রকটিত। নবপ্রবর্ত্তিত "তাও য়ুয়ান্" ধর্ম্মমত এবং ইহার অঙ্গস্বরূপ "স্বস্তিক

সমিতি”র পরার্থপর সেবাকার্য্য যে ভাবে সমগ্র চীনদেশবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, তাও ধর্ম্মের এই যুগোপযোগী সংস্করণ অদূর ভবিষ্যতে এই প্রাচীন সভ্যজাতির সকল সমস্যার সমাধান করিয়া চীনদেশকে বিশ্বের দরবারে সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত করিবে।

এই প্রবন্ধে আলোচিত সম্প্রদায়ের দুইটী দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। “তাও য়ুয়ান্” চীনদেশের ধর্ম্মমতসমূহের মধ্যে ঐক্য বা সমন্বয় সংস্থাপন এবং ইহার শাখাস্বরূপ “স্বস্তিক সমিতি” জাতিধর্ম্মবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘপ্রবর্ত্তিত মঠ ও মিশনের সহিত এই সম্প্রদায়ের দুইটী বিভাগের সর্ব্বাংশে মিল না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য দেখা যায় না। আচার্য্য কেশব সেনের চেষ্টায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাদের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক নর-নারায়ণ সেবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে “তাও য়ুয়ান” ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে “স্বস্তিক সমিতি” স্থাপিত হয়। কাজেই এই দুইটীর উপর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। “তাও য়ুয়ান্” ধর্ম্মমতে “থীয়সোফির” প্রভাবও থাকিতে পারে। আমরা বিশেষজ্ঞগণকে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সত্যনির্ণয় করিতে অনুরোধ করিতেছি।*

* Tao Te Ching by Arthur Waley অবলম্বনে Hsu Ti-Shan লিখিত Tao In To-day's China হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত।

গীতার দেবতা

শ্রীপদ্মলোচন নায়ক

কুরুক্ষেত্ররণে তুমি সুদূর অতীতে
বসিয়া সারথিরূপে ফাল্গুনীর কর্ণে
শুনাইলে মহাবাণী—“ধর্ম্ম সমন্বয়”—
—জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম্ম, ভক্তি—ভিন্ন ভিন্ন পথ।
শুনাইলে মধু স্বরে পার্থ ধনুর্দ্ধরে
বিশ্বের কল্যাণ হেতু হে বিশ্বপালক!—
—শ্রেয় কর্ম্মফলত্যাগ, নহে কর্ম্মত্যাগ।—
বেদের রহস্য গুপ্ত দিব্য অগ্নি মন্ত্র।
কহিলে যতনে দেব পাণ্ডব সখায়
কপিধ্বজরথে বসি বেদান্তের কথা—
—বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে
অন্তর্যামীরূপে তুমি আছ সমভাবে।
তব শিক্ষাফলে বিশ্ব হইল জাগ্রত
ধর্ম্মদ্বেষ, ধর্ম্মগ্লানি হলো অন্তর্হিত।
ভোগ মার্গ তাজি নর বরিল সাদরে
ত্যাগ মার্গ মুক্তি হেতু অমৃত সন্ধানে।
বিদ্বেষ পঙ্কিল পয়ঃ ত্যজিয়া মানব
মহানন্দে সন্তরিল পূত প্রেমনীরে।
হায়। বিশ্ব বিস্মরিল সেই মহামন্ত্র
কালের করাল চক্রে পড়ি কর্ম্মদোষে।
ধর্ম্মদ্বেষ ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িল প্রবল,
মানবে মানবে প্রেম না রহিল ভবে।
আবার আসিলে তুমি আবার আসিলে
সারথীর বেশে নহে পূজকের বেশে।
পবিত্র দক্ষিণেশ্বরে যতনে কহিলে
বালক নরেন্দ্র কর্ণে গোপনে গোপনে—
‘যত মত তত পথ,—কামিনী কাঞ্চন—
ত্যাগে, নহে কর্ম্মত্যাগে বিশ্বের কল্যাণ।’
দেখিল বালক সেই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে
সম্মুখে তাহার বিশ্বপিতা বহুরূপে
করিছেন বিশ্বলীলা নিত্যলীলাময়;
জীবরূপে শিব সদা করিছেন খেলা।
চলিল নরেন্দ্রনাথ ত্যজিয়া সংসার
প্রচারিতে সেবাধর্ম্ম বিশ্বের মাঝারে।
যদি কেহ ধরাতলে থাক চক্ষুষ্মান্
নয়ন খুলিয়া দেখ কি ঘটিছে ভবে।

উপনিষদে ভক্তিতত্ত্ব

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

শ্রুতির সংহিতাভাগে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি, নমস্কার প্রভৃতির মধ্যে ভক্তির একটা সুস্পষ্ট ধারা লক্ষিত হইলেও পরবর্ত্তীকালে পুরাণ ও স্মৃতি-সমূহে যাহা নিষ্কাম, শ্রদ্ধাভক্তি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তাহার প্রথম সূত্রপাত বোধ হয় উপনিষদেই। সংহিতায় উপাসক নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে ব্যাকুল—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক নানা বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার সকল সঙ্কল্প ও চেষ্টা নিয়োজিত, কাজেই তাঁহার উপাসনায় স্বার্থলেশশূন্য অহৈতুকতার সন্ধান খুব কম পাওয়া যায়।

যে ভালবাসায় কোন স্বার্থানুসন্ধানের গন্ধ নাই, যাহা ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা, সেই ভালবাসাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহা দ্বারাই উপাসক মুক্তির অধিকারী হন। বিভিন্ন ভক্তিসূত্র, ভাগবতাদি পুরাণ, গীতাদি গ্রন্থসমূহে এই নিষ্কাম ভক্তি-তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা দেখা যায়, কিন্তু হিন্দুর সকল শাস্ত্রের আকর বেদের উপনিষদ ভাগেও ভক্তিতত্ত্বের মূল রহস্যটী কিছু কম জোর করিয়া বলা হয় নাই।

ভক্তিবাদের আচার্যগণ ভক্তির নানা সংজ্ঞা দিয়াছেন। উহাদের সকল গুলিই যেন এই একই সাধারণ তত্ত্বটী বুঝাইতে চায় যে, ভক্তি এমন একটা হৃদয়বৃত্তি যাহা জগতের সব কিছুর আকর্ষণকে পশ্চাতে রাখিয়া মনকে একান্ত ইষ্টাভিমুখী করিয়া রাখে—ইষ্টের স্মৃতি, ইষ্টের কথা, ইষ্টের জন্য কর্ম্ম সমগ্র জীবনকে এমন একটা অভিনিবেশে মাতাইয়া রাখে যে, অন্য কিছুর অবসর তাহাতে বড় আর থাকে না। এই তন্ময়তা ভক্তের জীবনে আনে এক অপরিসীম আনন্দ যাহার নিকট ইহলোকের ও পরলোকের সকল সুখ অনায়াসে তুচ্ছ হইয়া যায়।

উপনিষদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, উহার ছন্দে ছন্দে এই তন্ময়তারই কথা,—জগৎ হইতে চোখ ফিরাইয়া আরাধ্যের প্রতি এই একমুখীতা আনিবার উপদেশ, অতি প্রিয় সত্য ও আনন্দের বাঁধনে জীবনকে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য দিব্য উৎসাহবাণী। তবে ঔপনিষদ্ সাধনকে ভক্তি বলিতে বাধা কি? বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে অষ্টম মন্ত্রটী পড়িয়া দেখুন—কী আবেগময়ী ভাষায় আরাধ্যকে সম্বোধন ও তাঁহার উপাসনার জন্য প্রেরণা দান। "এই যে অন্তরতম আত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়তর—বিত্ত হইতে প্রিয়তর—জগতের সর্ব্ববস্তু হইতে প্রিয়তর—ইঁহা হইতে অপর কিছু অধিক প্রিয় নাই · · · · · এই প্রাণপ্রিয়তমকে উপাসনা করিতে ভুলিও না।"

ঐ উপনিষদেরই মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য বিদুষী স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে যে আত্মতত্ত্ব বুঝাইলেন তাহা ভক্তিতত্ত্বই। "জান কি মৈত্রেয়ী এই অসংখ্য প্রিয় বস্তুর প্রিয়ত্ব কিসে? পতি পত্নীর নিকট প্রিয়, পত্নী পতির নিকট প্রিয় রূপের জন্য নয়—দেহসুখের জন্য নয়। এক পরম প্রেমঘনপুরুষ পত্নীর হৃদয়ে বাস করিতেছেন—আবার পতির বক্ষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে জুড়িয়া বসিয়া আছেন—তাই ত উভ-য়ের উভয়ের প্রতি এত আকর্ষণ—উভয়ে উভয়ের সহিত মিলনের জন্য এত ব্যাকুল। সেই প্রেমের নিদান প্রেমময় দেবতা—যখন আবার এই বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠেন তখন প্রকৃতিকে আমরা দেখি সুন্দর। মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল অম্বরে—

বিচিত্র বর্ণে গন্ধে শোভমান রাশি রাশি কুসুমগুচ্ছে, —হরিৎরঞ্জিত প্রসারিত শস্যক্ষেত্রে,—লতায় লতায়, বৃক্ষের পাতায় পাতায়—তাঁহারই হাসি ফুটিয়া উঠে। তাই তাহারা এত নয়নাকর্ষী। পুত্র তাঁহারই জন্য প্রিয়—বিত্ত তাঁহারই জন্য প্রিয়—জগতের যত আনন্দ সকলের উৎস তিনিই। আবার ইহজগৎ ছাড়া পরজগতের কথা যদি বল সেখানকার আনন্দও তাঁহারই সত্তা হইতে। তাঁহাকে যদি জানিতে পার, তবে সকল জিনিষ জানা হইয়া যাইবে, তাঁহাকে যদি আপনার করিয়া লইতে পার তবে ব্রহ্মাণ্ড তোমার আপনার হইয়া যাইবে।"

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিপাদ্য ছিল 'আত্মা'—কিন্তু এই বক্তৃতাতে তিনি যে আত্মার ছবি আঁকিলেন তাহা ত ভক্তের ভগবানেরই ছবি। ভক্তও ত তাঁহার আরাধ্যকে ঐরূপই অন্তরতম, সুন্দরতম, সর্ব্বোত্তম বলিয়া চিন্তা করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই আত্মার মহিমাবর্ণন পাঠকের হৃদয়ে যে ভাবের উন্মেষ করে তাহা কি শুষ্ক কঠোর ভাব অথবা সরস সুন্দর প্রীতির ভাব?

আত্মা শব্দের অর্থ 'নিজে'। যে ভক্ত তাঁহার আরাধ্যকে 'নিজ' বলিয়া জানেন তাঁহার ভক্তি সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় গিয়া পৌঁছিয়াছে—তিনি ইষ্টের ও আপনার মধ্যে কোন ব্যবধান রাখেন নাই—ইষ্টকে অন্তরের অন্তরে আনিয়া বসাইয়াছেন—নিজের আমির সঙ্গে ইষ্টের সত্তাকে মিলাইয়া দিয়া ইষ্টময় হইয়া গিয়াছেন। অতএব উপনিষদের আত্মবাদ রাগাত্মিকা ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রচার করে।

ছান্দোগ্যে যখন ভাবুক উপাসকের গদ্‌গদবাণী পাঠ করি—'এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাজ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ন্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ····· এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মীতি·····।'* (৩।১৪।৩—৪)। তখন মনে হয় প্রীতির কতদূর উৎকর্ষ হইলে না জানি এইরূপ আবেগ বাহির হইতে পারে।

ভক্তিবাদের একটী প্রধান কথা ইষ্টের গুণ শ্রবণ। তাঁহার গুণ গান শুনিলে বা করিলে তাঁহার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। উপনিষদ অতি মিষ্ট ভাষায় প্রাণ ঢালিয়া নানা স্থানে আত্মার গুণ গান করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় হয়ত বালক শ্রীরামচন্দ্রের বাল্য বিভূতি বা মদনমোহনের ব্রজলীলার ন্যায় বিশেষ বিশেষ অবতার লীলার বর্ণনা নাই। কিন্তু যাহা আছে তাহা অমৃতের ন্যায় উপাদেয়, তাহা হৃদয়ের শুদ্ধা প্রীতির নিশ্চিত উদ্বোধক—ভক্তের ভক্তিসাধনার অপূর্ব্ব সহায়ক। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের কথা ধরুন। জনকের সভায় উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অন্তর্যামী কে জান কি? শুনিয়াছি তাঁহাকে জানিলে ব্রহ্মবিৎ, লোকবিৎ, বেদবিৎ, সর্ব্ববিৎ হওয়া যায়। যদি জান ত বল।" আত্মজ্ঞ ঋষি আত্মানন্দে সর্ব্বদাই মাতিয়া ছিলেন। এই প্রশ্ন তাঁহার অন্তরের রুদ্ধভাবের স্রোত খুলিয়া দিল।

"জানি, জানি উদ্দালক, অন্তর্যামীকে জানি—কিন্তু বলিব কি করিয়া? পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে যিনি নিয়মিত করিতেছেন—কিন্তু পৃথিবী

* এই যে আমার আত্মা আমার অন্তরের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন ইনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাকধান্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র শস্যসমূহ হইতে ক্ষুদ্রতর আবার পৃথিবী হইতে অন্তরিক্ষ হইতে, দ্যুলোক ভূলোক প্রভৃতি সকল লোক হইতে বৃহত্তর। সকল কর্ম্ম ইঁহাতে, সকল কামনার পরিপূর্ত্তি ইঁহাতে, সকল গন্ধ, সকল রস, সকল রূপ ইঁহাতেই। আমার হৃদয়ে ইঁহার শাশ্বত আসন পাতিয়াছি, আমার সহিত ইঁহার আর বিচ্ছেদ নাই। পঞ্চভূতাত্মক দেহ যখন পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে তখনও আমি ইঁহাতেই বাস করিব।

(ছান্দোগ্য উঃ ৩।১৪।৩—৪)।

যাঁহাকে জানিতে পারেনা—ইনিই সেই অন্তর্যামী —তোমারও অন্তরের আত্মা ইনি—অমৃত, অব্যয়, অসীম। জলে, অগ্নিতে, আকাশে, বাতাসে, দ্যুলোকে, ভূলোকে দশদিকে—অনন্ত গ্রহনক্ষত্রে —আবার অন্ধকারে, আলোকে—সর্ব্বভূতে, সর্ব্বপ্রাণীতে, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে, মনে বুদ্ধিতে—রক্তে মাংসে, অহঙ্কারে সর্ব্বত্র ইঁহারই নিয়ন্ত্রণ চলিয়াছে। সকলকে চালাইতেছেন সকলের অন্তরালে থাকিয়া কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতেছে না—বুঝিতেছে না। ইনিই সেই অন্তর্যামী অন্তরাত্মা, পরমপুরুষ। ইনি ছাড়া আর কেহ দ্রষ্টা নাই, আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই, আর কেহ শ্রোতা নাই। "অতোঽন্য দার্ত্তম্।' ইনি ছাড়া আর সকলই অসার।"

বক্তা আর বলিতে পারিলেন না - ভাবাধিক্যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। শ্রোতাও স্তব্ধ আর কোন জিজ্ঞাসা আসিল না—আত্মার মহিমা তাঁহার ক্ষুব্ধ অন্তরকে শান্ত করিয়া দিল।

উপনিষদের ভক্তিবাদ পৌরাণিক ভক্তিবাদের ভিত্তি—অথচ পৌরাণিক ভক্তিবাদে যে সকল সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, অস্বাভাবিকতা ঢুকিয়া গিয়াছে উপনিষদের ভক্তিব্যাখ্যানে সে সকলের লেশমাত্র চিহ্ন নাই। পৌরাণিক ভক্তিবাদ জন-সাধারণের জন্য খুব উপযোগী কিন্তু যুক্তিবাদী বা আধুনিক বিজ্ঞানের যাঁহারা অনুশীলন করেন তাঁহাদের নিকট উহা অনেকস্থলে খুব মনোমত হয় না। উপনিষদের ভক্তিবাদে সে আশঙ্কা নাই। উহা সকলকেই তুষ্টি দিবে, কাহারও সংস্কারে বাধা দিবে না।

উপনিষদ ভগবানের কোন বিশেষ বিগ্রহের রূপ বর্ণনা করেন নাই—তাঁহার বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। মুণ্ডকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে দেখি—

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে
বাগ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী
হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ *

কঠ তাঁহার জ্যোতির পরিচয় দিতেছেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা
সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

"তাঁহার জ্যোতির কথা কি বলিব– সূর্য্য, চন্দ্র, তারা বিদ্যুৎ সকলের জ্যোতিই সে জ্যোতির নিকট ম্লান—অগ্নির ত কথাই নাই। তাঁহারই কিরণ লইয়া সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। তিনি না থাকিলে কোন কিছুরই প্রকাশ সম্ভবপর হইত না।"

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মানুষ কাহার তেজে বলীয়ান?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আদিত্যের তেজে"।

জনক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"আদিত্য যখন অস্ত যান তখন?"

ঋষি উত্তর দিলেন—"চন্দ্রের তেজে।"

"চন্দ্র যখন অস্ত যান?"

"অগ্নির তেজে।"

"অগ্নিও যখন অনুপস্থিত?"

"বাকের তেজে।"

"বাকশক্তিরও যদি অভাব হয়?"

এইবার ঋষি হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন— "আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি।"

'ভয় কি? সকল জ্যোতির উৎস আত্মার ত কখন অভাব নাই—সেই আত্মার জ্যোতিঃ মানুষকে বলীয়ান রাখিবে।' পরিশেষে উপসংহার করিলেন

* অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার চক্ষুদ্বয়, দশদিক তাঁহার কর্ণ, বেদমন্ত্র তাঁহার বাণী, বায়ু তাঁহার প্রাণ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার হৃদয় আর তাঁহার পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই বিশাল পৃথিবী। সকলের অন্তরাত্মা সেই বিরাট পুরুষ সকল অস্তিত্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

—"এষ এব পরম আনন্দ সম্রাট্।" হে সম্রাট সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ এই আত্মা হইতেছেন পরম আনন্দ স্বরূপ।

উপনিষদে আত্মার এই বিশ্বরূপত্ব এবং স্বয়ং-জ্যোতিত্ব-বর্ণনাই পরবর্ত্তীকালে পুরাণ এবং স্মৃতি সমূহে শ্রীভগবানের নানা রূপ বর্ণনার জন্ম দিয়াছে। রূপচিন্তন ভক্তদিগের একটী প্রধান সাধন। উপনিষদ্ অসাম্প্রদায়িকভাবে ইহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

ভক্তের নিকট ভগবান আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি। রসাস্বাদন ভক্তির অন্যতম লক্ষ্য। এই আনন্দ-তত্ত্বেরও সূত্রপাত উপনিষদেই দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"—'আত্মা রসস্বরূপ'।

অপরস্থানে বলিতেছেন—"আনন্দ হইতে ভূত সমূহের উৎপত্তি আনন্দে স্থিতি এবং আনন্দেই লয়।" বৃহদারণ্যকে দেখি—"এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" 'এই আনন্দ-স্বরূপ আত্মার আনন্দের কণামাত্র লইয়া জগতের যত আনন্দ।'

ভক্তিতত্ত্বের আর একটী দিকও যাহা নামধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত—উপনিষদ আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়। ভক্তেরা বলেন, ভগবানের নাম জপ বা সংকীর্ত্তন করা ভক্তিলাভের অন্যতম উপায়। উপনিষদই এই নামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তবে উপনিষদ কালী, কৃষ্ণ বা রাম প্রভৃতি বিশেষ কোন নামের কথা বলেন নাই। সকল পুণ্যনাম যে পবিত্রতম নামের মধ্যে নিহিত, যে নাম এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনটী মাত্র বর্ণের সংযোগে গঠিত, সকল হিন্দুর বন্দনীয় সেই গম্ভীর সুমিষ্ট 'ওঁ'কারের সংকীর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন।

যম কঠোপনিষদে নচিকেতাকে বলিলেন—সকল বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করে, সকল তপস্যা, সকল ব্রত যাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই ব্যবস্থিত—সংক্ষেপে আমি তোমাকে তাঁহার কথা বলি। তিনি হইতেছেন—ওম্। (কঠ ১।২।১৫)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় খণ্ডে মুণ্ডক অনেকগুলি মন্ত্রে আত্মার মহিমা বর্ণনা করিলেন আর সর্ব্বশেষে বলিলেন—"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্" 'আত্মাকে 'ওম্' এই নামে চিন্তা করিবে।' মাণ্ডুক্য ওঙ্কারের পৃথক তিনটী বর্ণের বিশ্লেষণ করিয়া প্রণবতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ের ১ম বল্লীর সপ্তম অনুবাকে—

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বং। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি।"*

ছান্দোগ্য উপনিষদেরও নানাস্থানে প্রণবের উপাসনা দেখা যায়। 'নাম ব্রহ্ম' কথাটী এই উপনিষদেরই।

ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের বিশেষ বিশেষ লীলাস্মরণে বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ করিয়া উহাদের জপ বা গানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে বিষ্ণুর সহস্র নাম বা কালীর শতনাম প্রভৃতির প্রচলন দেখিতে পাই। এই লীলা অনুযায়ী নাম করণের বীজও উপনিষদই রাখিয়া গিয়াছেন। তবে লীলা এখানে পুরাণ বা স্মৃতির ন্যায় পূতনাবধ বা মহিষাসুর বিনাশ প্রভৃতির ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট লীলা নয়—সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বকালিক কোন বিশ্বলীলার স্মরণেই উপনিষদে আত্মার নানা নাম করণ।

ঐতরেয় বলেন—আত্মার নাম 'ইদন্দ্র' বা সংক্ষেপে 'ইন্দ্র' কেন না তাঁহাকে লোকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে (ইদং+দৃশ ধাতু)।

কেনোপনিষদে ব্রহ্মের একটী নামকরণ দেখি—'তদ্বনং' (তিনি সম্ভজনীয়)।

ছান্দোগ্য তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডে ব্রহ্মের

* ওঙ্কার ব্রহ্ম। ওঙ্কার এই সকলই। ওম্ বলিয়াই সামগান করে। ব্রহ্মজ্ঞ ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া বলেন, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই—ব্রহ্মকেই তিনি প্রাপ্ত হন।

একটী নাম বলিয়াছেন—"তজ্জলান্"। (তস্মাৎ জায়তে, তস্মিন লীয়তে, তৎ অনিতি) তাঁহা হইতে সকল বস্তু জন্মগ্রহণ করে, তাঁহাতে লয় হয় এবং তিনি সকলকে রক্ষা করেন। এইজন্য তাঁহার নাম "তজ্জলান্"। ঐ উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডে আত্মাকে বলা হইয়াছে—'সংযদ্বাম'। কেন তাহা উপনিষদ নিজেই বলিতেছেন—'এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি'—ইঁহাতে সকল পুণ্যকর্ম্ম আসিয়া মিলিত হয়। উহার একটু পরে আরও দুটী নাম দেখি—"বামনী"—সকল বাম বা পুণ্য আনয়ন করেন এবং "ভামনী" সমস্ত লোকে ইঁহার প্রভা বিস্তৃত হয়।

সাধুসঙ্গ, গুরুকরণ, বিনয় প্রভৃতির ভক্তি শাস্ত্রোল্লিখিত সাধনসমূহেরও মূল অন্বেষণ করিলে উপনিষদেই গিয়া পৌঁছিতে হয়। ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তস্থৈর্য্য, ধ্যান প্রভৃতি সর্ব্বমতসম্মত সাধনগুলির উল্লেখ নাই করিলাম। উপনিষদের পাতায় পাতায় উহাদের উপযোগিতার কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিলাভ করিতে গেলেও সর্ব্বাগ্রে উহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। কাজেই ভক্তিযোগের সাধক এই বিষয়েও উপনিষদ হইতে প্রভূত প্রেরণা পাইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—ভারতের ধর্ম্ম-সাধনায় নবপ্রাণ আনিতে গেলে আমাদিগকে উপনিষদের আলোচনার দিকে অবহিত হইতে হইবে। কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম, কি ভক্তি সকল পথের উপাসকের জন্যই জগতের এই আদি অধ্যাত্মশাস্ত্রে রহিয়াছে অফুরন্ত প্রেরণা। 'কৃষ্ণ' নাম নাই বা 'কালী' নাম নাই বলিয়া আমাদের ভক্তির ব্যাঘাত করিবে এই আশঙ্কায় আমরা সেই প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান করিব অথবা উদার বিশ্বদৃষ্টি লইয়া সেই জীবনপ্রদ তত্ত্বগুলির সানুরাগ অনুধ্যানে জীবনকে দিব্য জ্ঞান, ভক্তির আলোকে দীপ্তিময় করিয়া তুলিব ?

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারীসমাজ

শ্রীকুমুদবালা সেনগুপ্তা

যে মহাপুরুষের কীর্ত্তি-গাথা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, যাঁহার অপূর্ব্বত্যাগ, সহজ সরল জীবন যাপন, ধর্ম্মসমন্বয়-বাণী জগতে অতুলনীয়, যাঁহার অপূর্ব্ব প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের মত পুরুষ সিংহকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যিনি লৌকিক বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইয়াও ভারতের বিখ্যাত বক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশব, প্রতাপ প্রমুখ মনীষিগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি যুগাবতার—এমন কি যাঁহাকে অবতার-শ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, পরস্পর বিবদমান, হিংসা-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত, ভোগের বাহুল্যে অশান্ত পশ্চিম যাঁহার অপূর্ব্ব বাণী শুনিবার জন্য, গ্রহণ করিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে,—সেই ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বলিবার মত শক্তি আমার মত শক্তিহীনা নারীর পক্ষে কোথায় ? বিশেষতঃ যাঁহার উপমা জগতে মিলে না, যিনি সর্ব্ব গুণাকর, তাঁহার সম্বন্ধে কি ই বা বলিতে পারি, বলিয়া কতটুকুই বা গৌরব বাড়াইতে পারি।

কবি রঙ্গলালের ভাষায়—

'কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গজমুক্তা ফল রাজি,
মাজিলে কি বাড়ে সমুজ্জ্বল ?'

তবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত তাঁহারই অপূর্ব্ব জীবন-কথা, তাঁহারই বাণী হইতে গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করিব। অনেকেই ভগবান রামকৃষ্ণের সুধাময় জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। আমি সেই দিক দিয়া যাইব না। আমি শুধু তাঁহার চরিত্রের একটা দিক, যাহা আমি সহজ বুদ্ধিতে ধারণা করিয়াছি, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু কুলায় তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমার এই আলোচনায় অনেক ত্রুটি থাকিতে পারে, আমার আলোচনা নিখুঁত হইবে না তাহা আমি জানি, তবুও পূত মনে যাহা চিন্তা করিয়াছি, ত্রুটি মলিন হইলেও তাহা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে পৌছিবে, আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

আমাদের নারীজাতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কিরূপ ধারণা, তাঁহার হৃদয়ে নারীজাতি কতটুকু স্থান পাইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়। নারী সমাজের হিতার্থেই যে এবারকার যুগাবতারের আগমনের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বহুদিন পূর্ব্বে কোন মাসিক পত্রিকায় আমাদের এক ভগ্নী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাবাণী 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের' উপদেশের মধ্যে, 'কামিনীত্যাগের' কথা কেন তিনি বলিলেন এই লইয়া একটু ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি নিজেও দুই এক জনকে ঐ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের মধ্যে নারীজাতির প্রতি একটু অসম্মানকর ইঙ্গিত আছে, ইহা তাঁহাদের বুঝিবার সম্পূর্ণ ভুল। আমি মনে করি, ঠাকুরের এই সুমহান্ বাণী নারীজাতির প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানকর বাণী।

যে দেশে নারী শুধু পুরুষের কামনা পূরণের ভোগ্য বস্তু, যে দেশের নারী 'কামিনী,' 'রমণী' প্রভৃতি অসম্মানকর আখ্যায় অভিহিতা, যে দেশের নারী আজ পথে ঘাটে লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা সেই হতভাগ্য দেশে শুভক্ষণে ঠাকুর রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া প্রচার করিলেন, নারী পুরুষের ভোগের বস্তু নহে। প্রত্যেক নারীর ভিতরে মহাশক্তি বিরাজিতা। নারীকে 'কামিনী' না ভাবিয়া জগজ্জননী ভাবিতে হইবে। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে একবার নদীয়ার চাঁদ নিমাই রাধারভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কত উচ্চাঙ্গের তাহা নিজে আস্বাদন করিয়া জগতকে বুঝাইয়া গিয়াছিলেন। তখন সমগ্র বাংলাদেশের নরনারী গৌরাঙ্গের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব ভাবের বন্যায় সমস্ত দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। যুগানুযায়ী প্রয়োজনীয়তা বোধে শ্রীচৈতন্যদেব আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী দর্শন কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সেই নারী-বর্জ্জিত সন্ন্যাসি-দলের অনুসরণকারিগণ নারীজাতির প্রতি সম্মান ভুলিয়া গেল, ধর্ম্মের নামে তাহারা সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া নারীদেহকে উপভোগের বস্তু করিয়া তুলিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে নারী সেবাদাসীরূপে দেখা দিল, নেড়া-নেড়ী দলের সৃষ্টি হইল। নারী যে জগজ্জননীর অংশভূতা, নারী বর্জ্জিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহা ভুলিয়া গিয়া নারীকে বাহিরে ধর্ম্মাচরণের সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া ঘৃণ্য কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিল। এমন সময়ে পরমহংসদেবের আবির্ভাব। তিনি আসিয়া অবজ্ঞাত নারীজাতির মধ্যে মায়ের সম্মান দান করিলেন। নারীজাতি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, এক অলৌকিক মহাপুরুষ 'মা, মা' বলিয়া হীনা পতিতার উদ্দেশ্যেও প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর নারীবর্জ্জন করিতে বলিলেন না, শুধু নারীকে 'কামিনী'রূপে গ্রহণ করিতে, কামনা চরিতার্থের বিষয় করিয়া লইতে দৃঢ়স্বরে নিষেধ করিলেন। তিনি সমস্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই জন্যই

আমরা দেখিতে পাই ঠাকুর আপনার সহধর্ম্মিণীকে 'ষোড়শী'রূপে পূজা করিতেছেন।

এক বারাঙ্গনাকে কালীঘরে কালীমূর্ত্তির মধ্যে দেখিয়া ভাবে তন্ময় হইয়া মাকে পতিতা নারী হইতে অভিন্ন মনে করিয়া তাঁহাকে পূজা দিতেছেন। জগতের ইতিহাসে কোন ধর্ম্মে কোন অবতারে উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সমস্ত নারী সমাজকে এরূপ ভাবে জগজ্জননী মূর্ত্তিতে উচ্চাসন দিতে, পূজা করিতে দেখা যায় না। ঠাকুর আমাদের নারী জাতির যে গৌরব বাড়াইয়া দিয়াছেন, আমরা যেন সেই গৌরব রক্ষা করিতে পারি। জগন্মাতার ভাব লইয়াই যেন আমরা সন্তান-স্থানে দুর্ব্বল দেশ-বাসীদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধন করিতে পারি।

ভারতের পুরুষজাতি যে দিন ঠাকুরের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সমস্ত নারীজাতিকে মাতৃস্থানে সম্মান করিবে, সেই দিন ভারতে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইবে। আমরা নারীজাতি সেইদিন আপনাদিগকে অবলা, দুর্ব্বলা ভাবিয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকিব না। আপনাদের প্রতি আমরা হীন ধারণা পোষণ করিব না,—মাতৃ-উপাসক সন্তানের নিকট ভীতা সঙ্কুচিতা হইয়া নিজেকে আড়ালে রাখিবারও কোন কারণ আমাদের থাকিবে না। সন্তানের 'মা' ডাকে তাহাদের মঙ্গল সাধনের জন্য মাতৃস্নেহ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে। জাগ্রত মাতৃশক্তি ভারতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবে। নতুবা যতদিন পর্য্যন্ত নারী পুরুষের 'জননী'র আসনে না বসিয়া তাহার পাশে শুধু 'কামিনী'রূপে দেখা দিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের কল্যাণলক্ষ্মী কখনও আবির্ভূতা হইবেন না। যাহারা কামনার দাস, তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তির মূল্য কি? লৌকিক বিদ্যায় বাহবা পাইতে পারে, কিন্তু তাহারা মানুষ গড়িতে পারে না, দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। যুগাবতার মহাপুরুষগণ "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।" ভগবান্ রামকৃষ্ণ ভারতের নরনারীর বর্ত্তমানে কোথায় দুর্ব্বলতা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই কামনা বর্জ্জন করিয়া কিরূপে সমস্ত নারীজাতিকে মাতৃমূর্ত্তিতে ভাবা যায়, তাহা নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

আজকাল অনেকেই বলেন ঠাকুরের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় বাণীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাণী। আমি কিন্তু তাহা মনে করিনা। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই ধারণা হয় যে, ভারতের সমস্ত অবজ্ঞাত নারী-জাতিকে উচ্চমাতৃআদর্শে পরিণত করাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল। পুরুষ যাহাতে সমস্ত নারীর ভিতরই এই মাতৃভাব পোষণ করে তাহার জন্য কত ভাবে তিনি ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে কামনা বর্জ্জিত হইয়া নারীকে সম্মান করিতে শিখে, এমন কি বারাঙ্গনার মোহিনীমূর্ত্তিকেও 'মা' ভিন্ন অন্য কিছু মনে না করে, তজ্জন্য তিনি তাঁহার ভক্তদের প্রতি একস্থলে শ্রীমুখে বলিতেছেন—"মা আমাকে বুঝিয়ে দিলে বেশ্যাও আমি, তা' ছাড়া কিছু নেই, একদিন গাড়ী করে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি, সেজেগুজে খোঁপা বেঁধে টিপ্ পরে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুকোয় তামাক খাচ্ছে, আর মোহিনী হ'য়ে সকলের মন ভুলুচ্ছে। দেখে অবাক হয়ে বললুম 'মা তুই এখানে এ ভাবে রয়েছিস' বলে প্রণাম করলুম।" সর্ব্বপ্রকারের নারীকে এইভাবে প্রণাম করাই প্রকৃত মঙ্গল পথ। ঠাকুর নিজ জীবনে তাহা আচরণ করিয়া এই তত্ত্ব ভক্তদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দেও শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ একটি কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে বলিতেছেন—'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"। এখানেও ভক্তকবি সুকৌশলে নারীর চরণ যে কামনার হলাহল দূর করিতে পারে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা গভীর তত্ত্ব বিষয়ক

আর কি আছে! একমাত্র সন্তানই নারীর চরণ ধারণের অধিকারী সেখানে কামনাকলুষ থাকিতে পারে না। নারীর 'মোহিনী' মূর্ত্তিতে মুগ্ধ না হইয়া তাহাকে মাতৃজ্ঞানে ধারণা করিবার জন্যই যুগাবতারের এই শিক্ষা। আমরা নবনারী এই সকল বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না।

'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্' এই কথাটী স্বামী-স্ত্রী-ঘটিত মান অভিমানের মধ্যে একটা রঙ্গ তামাসার সৃষ্টি করে, কিন্তু এই চরণকে যে কবি "স্মর-গরলখণ্ডনং" বলিয়াছেন, তাহা আমরা ভাবিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি না।

যুগাবতার ঠাকুর সর্ব্ববিধ নারীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা মহাপুরুষদের শিক্ষা প্রকৃত তত্ত্বের দিক দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি না, নিজ জীবনে ফলাইতেও চেষ্টা করি না। তাই আমাদের এইরূপ অধোগতি।

ঠাকুর বাল্যকাল হইতেই হৃদয়ে নারীভাব পোষণ করিতেন, কাজেই অবাধে তিনি নারীদের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন। কোনরূপ সঙ্কোচ ছিল না। যে পুরুষ নিজের ভিতর নারীসত্তা বোধ করে তাহার মধ্যে কামনার অবকাশ কোথায়? ভিতরে নারী বাহিরে পুরুষ, এইরূপ অপূর্ব্ব মানুষকে কোন নারী সঙ্কোচের সহিত দেখে না। তাঁহার ভিতরের শুদ্ধ সত্তা বাহিরেও প্রকট হয়, এবং অজ্ঞাতসারে সকলের হৃদয়কে এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া তোলে। ইহার ভিতর কামনার পূতিগন্ধ নাই। তাই ঠাকুর বাল্যকালে কামার পুকুরের রক্ষণশীল লাহাদের অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন এবং লাহাদের বাড়ীর মেয়েরা অসঙ্কোচে তাঁহার সহিত মিশিতে দ্বিধা প্রকাশ করিত না। গ্রামের সরলা মেয়েদের কাছে তিনি আত্ম-গোপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মহামানব-রূপ তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। অনেক মেয়ে নিজেদের গায়ের অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে গোপনে বাঁশী গড়াইয়া দিত, কোন কোন মেয়ে তাঁহাকে ফুলের মালা গাঁথিয়া দিত। ঠাকুরের মোহনরূপ দেখিয়া এই সব মেয়েদের ভিতর বৃন্দাবনের মধুর ভাব অলক্ষ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর ভবিষ্যজ্জীবনে অবশ্য শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের নিকট আপনার ভাব গোপন রাখিতে পারেন নাই। যেই রাম, যেই কৃষ্ণ তিনিই যে রামকৃষ্ণ, ভক্তেরা যদিও অবশেষে তাহা বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন কিন্তু নারীদের কাছেই তিনি সর্ব্ব প্রথম ধরা দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ধনী কামারণী, গোপালের মা প্রভৃতি ঠাকুরকে যশোদার ভাবে ভাবান্বিতা হইয়া 'গোপাল' রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি লাহাদের মেয়েরা, গ্রামের সরলা বালিকাগণ তাঁহাকে ব্রজকিশোরের রূপেই চিনিয়া ফেলিয়া ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যখন অনেকের নিকট উন্মাদ বলিয়া পরিচিত, ঠাকুরের দিব্য ভাব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাকুল ভাব যখন উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়া সকলে প্রকাশ করিতেছিল, সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথম ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসিয়া তাঁহাকে প্রথম দর্শনেই চিনিয়া ফেলিলেন এবং ইহা যে উন্মাদের লক্ষণ নয় ররং পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীচৈতন্যাদি মহাপুরুষদের মতই দিব্য ভাবের লক্ষণ, তাহা সর্ব্বসমক্ষে শাস্ত্র বচনাদি দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন।

ঠাকুর সরল বালকের মত আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে মথুর বাবুকে বলিয়াছিলেন, 'ব্রাহ্মণী যাহা বলিতেছে তাহা যাচাইতে হইবে।' ঠাকুর এখানেও এই ঘটনায় নারী-জাতির গৌরব বাড়াইয়া দিলেন, সন্দেহ নাই। যে নারীকে শাস্ত্রকার নরকের দ্বার স্বরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, সাধুসন্তগণ যাহাকে 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী' জ্ঞানে সভয়ে ত্যাগ করিয়াছেন,

ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব যে নারীর নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, আজ যুগাবতার রামকৃষ্ণ আসিয়া সেই নারীর কাছেই সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ পাইলেন। সকল পুরুষের অজ্ঞতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া একজন নারীই সর্ব্ব প্রথম তাঁহাকে চিনিয়া লইলেন, এবং ঠাকুরের ঐ ভাবোন্মাদ অবস্থা যে সাধারণ উন্মাদের লক্ষণ নহে তাহা অবিচলিত কণ্ঠে প্রচার করিলেন। ঠাকুর আত্মগোপনের যে মায়াজাল আপনার চারিধারে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এক নারীই সর্ব্ব প্রথম তাহা মোচন করিয়া ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সকলের সম্মুখে দিবালোকের মত দেখাইয়া দিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমস্ত সাধক ও সন্ন্যাসী দেখিতে পাই, তাঁহারা অধিকাংশই স্নেহময়ী মাতার স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া একান্ত অনুগতা পত্নীর কোমল হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া মুক্তির পথ অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। মাতা ও পত্নীর কাতর অশ্রু উপেক্ষা করিয়া মুক্তি-সুধার সন্ধানে ছুটিয়া গিয়াছেন। কেহ বা সুধার সন্ধান পাইয়া শুধু নিজে নিজেই উহা পান করিয়াছেন, অন্যকে তাহা জানিতে দেন নাই। পাছে অন্যে বিনা পরিশ্রমে তাঁহার কষ্ট-লব্ধ সুধা-ভাণ্ডের অংশীদার হয়। কেহ বা জগতের জন্য কিছু রাখিয়া গিয়াছেন এমন গুহ্যস্থানে, যাহা সহজে পাওয়ার উপায় নাই। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন অন্য ধরণের। তিনি অতি সহজ ভাবে সাধারণ কথায় সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিলেন আপামর নরনারীর মধ্যে। যে শূদ্র জাতি, স্ত্রীজাতি পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশের অনধিকারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, আজ তাহাদের জন্য দ্বার খুলিল সকলের আগে। হীনা বারাঙ্গনারাও তাঁর অভয় তলে আসার অধিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্ত্রীজাতির কোমল প্রাণে আঘাত দেন নাই। আপনার পত্নী ও মাতাকে উপেক্ষা করিয়া ত্যাগের গর্ব্ব প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীশ্রীমা যখন বহু কষ্টে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি এসেছ মথুর বাবু নাই, কে তোমার আদর যত্ন করবে।' এই কথার ভিতর শ্রীশ্রীমার জন্য তাঁহার কতখানি উদ্বেগ, কতখানি মমত্ব বোধ ছিল, তাহা একমাত্র শ্রীশ্রীমাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অন্য সাধক হয়ত এই অবস্থায় স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিয়া ত্যাগের একটা বাহাদুরী প্রদর্শন করিতে কখনও বিরত হইতেন না। কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, যিনি তাঁহারই অবতার স্বরূপ, সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে যিনি আদ্যাশক্তির রূপ দর্শন করিতেন, তাঁহার মনে নিজ সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করার কল্পনাও আসিতে পারে না। ঠাকুর তাঁহাকে নহবতে স্থান দিলেন, তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এমন কি সময়ে সময়ে শ্রীশ্রীমাকে নিজের ঘরে ডাকিতেন ও তাঁহার গায়ে, হাতে, পায়ে হাত বুলাইতে বলিতেন। সেই উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত উপদেশও দিতেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে ধর্ম্মোপদেশ ছাড়া স্ত্রীলোকের সাংসারিক কর্ম্মাদি সম্বন্ধেও উপদেশ দিতেন। যাহাতে সমগ্র স্ত্রীজাতি শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে, এই জন্য সকল দিক্ দিয়া তাঁহাকে আদর্শ নারী করিয়া তুলিবার চেষ্টা নিজেই করিয়া গিয়াছেন। নারী যে স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে পারে, ধর্ম্মপথের অনুবর্ত্তী সংযমী স্বামীর ধর্ম্ম পথের বাধা স্বরূপ না হইয়া অতি উচ্চাঙ্গের সহায়কারিণী হইতে পারে এবং ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ স্তরে নারীও স্থান অধিকার করিতে পারে, ঠাকুর শ্রীশ্রীমার ভিতর দিয়া তাহা দেখাইলেন।

আপন গর্ভধারিণী জননীর প্রতি সন্তানের কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও আকর্ষণ থাকা দরকার নিজ জননী চন্দ্রাদেবীর প্রতি তাহা প্রদর্শন করিয়া সকলকে সেই আদর্শ দেখাইয়া গেলেন।

বর্ত্তমান যুগের অবাধ্য বালক, শিক্ষা-গর্ব্বে-গর্ব্বিত যুবক, এমন কি সংসার ত্যাগী সাধক সকলের জন্য মাতৃ-ভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। যত দিন ঠাকুরের জননী চন্দ্রামণি দেবী জীবিতা ছিলেন ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া থাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। একবার মথুর বাবুর সঙ্গে ঠাকুর বৃন্দাবনে গিয়াছেন। সেখানে গঙ্গামাতা নামে এক ভক্তিমতী নারীর আশ্রমে যাওয়া মাত্র গঙ্গামাতা ঠাকুরের মধ্যে শ্রীমতী রাধার মহাভাব দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে 'দুলালী' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুরও গঙ্গামাতার ভক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন না। একজন ভক্তিমতী নারীর ভক্তির টান বোধ হয় দক্ষিণেশ্বরের সমস্ত ভক্তদের টান ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তাই ঠাকুর সমস্ত ভুলিয়া গঙ্গামাতার কাছেই বরাবর থাকিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। এই অবস্থায় যেই তাঁহার গর্ভধারিণীর কথা ঠাকুরের মনে হইল, অমনি তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুর বাবুর সঙ্গে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। মাতৃভক্তির এরূপ অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না, বিশেষ করিয়া এক জন সাধকের পক্ষে মাতা পত্নী, সর্ব্ব প্রকারের নারীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, ঠাকুর নিজে তাহা পালন করিয়া জগতকে শিখাইয়া গিয়াছেন।

ভারতের অবজ্ঞাতা নারীদের সর্ব্ববিধ গ্লানি নিবারণের জন্য পুরুষের লালসা দৃষ্টির সম্মুখে তাহাদিগকে নারীর মহীয়সী মূর্ত্তি জগজ্জননীরূপে তুলিয়া ধরিবার জন্য, তাঁহার আগমনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। আগমনের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে 'পরিত্রাণায় নারীণাম্' এই উদ্দেশ্যটীই যে সর্ব্বপ্রধান ছিল এই কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলিতেন, 'সকলেই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।' আমরা স্ত্রীজাতি আমাদেরও ঈশ্বরলাভের অধিকার আছে, এর চেয়ে আশ্বাসবাণী আর কোথায় পাইব! আসুন, আমরা ঠাকুরের এই উদার বাণীতে বিশ্বাস রাখিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হই, অবশ্যই ঈশ্বর লাভ হইবে। ঠাকুর আমাদের মধ্যে জগজ্জননীর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেন, ইহা হইতে উচ্চ গৌরব আর কোথায় পাইব! আমরা যাহাতে এই গৌরব চিরদিন বজায় রাখিতে পারি তজ্জন্য সচেষ্ট হই। ঠাকুরের মত আশ্চর্য্য কামজয়ী মহাপুরুষের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে দিন পুরুষজাতি নারীকে সম্মান করিতে শিখিবে, সেই দিন ভারতের ঘরে ঘরে আবার সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, অরুন্ধতীর আবির্ভাব হইবে। সেই দিন ভারতে আবার নূতন যুগ ফিরিয়া আসিবে। কবির ভাষায় বলিতে হয়—

"সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন।"

আজকাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূজা ঘরে ঘরে হইতেছে। তাঁহার আদর্শও ঘরে ঘরে অনুসৃত হইবে। আমরা সে শুভ দিনের জন্য আশান্বিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছি—

"সে নহে কাহিনী, সে নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।"

দেবীদাস

(গল্প)

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

স্বদেশী যুগের প্রথম উত্তমকে রাজশক্তি যে দিন কঠোর হস্তে বাধা দিয়ে নির্ম্মম শাসনে দেশের নেতাগণকে জেল, ফাঁসি ও দ্বীপান্তর পাঠাতে লাগলেন, সেদিন দেশের জাগ্রত কর্ম্মশক্তি একটু রূপান্তরিত হয়ে গঠনমূলক কার্য্যে সেবারূপে ব্যাপকভাবে সহর পল্লীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্ল। সেবাসমিতি, নৈশ-বিদ্যালয়, পাঠাগার অনেক কিছু গড়ে উঠ্ল। গ্রামে গ্রামে সেবক সমিতি নানাভাবে সেবা-কাজ আরম্ভ করল এবং তরুণের দল সেবক শ্রেণীভুক্ত হয়ে নিঃস্বার্থ দেশসেবায় ব্রতী হল।

যে সব যুবক কর্ম্মী প্রমাণাভাবে সরকারের কবল হতে অব্যাহতি পেয়ে ফিরে এলেন, তাঁরাই গ্রামের এসব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণস্বরূপ হয়ে কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পবিত্রতা, সুগঠিত দেহ, আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি সদ্-গুণের প্রভাবেই তাঁরা গ্রাম্য সাধারণের নিকট হতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে লাগলেন।

আমাদের দেবীদাসও এদেরই একজন দেশ-সেবক বা কর্ম্মী। দু তিনবার রাজদ্রোহ অপরাধে জেলে যেতে যেতে ভগবানের নিতান্ত অনুগ্রহে ছাড় পেয়েছে। অবশ্য হাজতবাস তার অদৃষ্টে অনেকবারই হয়েছে, কিন্তু এতে তার মনে কোন আপশোষ নেই। সর্ব্বদাই মুখে তার হাসি, কণ্ঠে গান, 'ক্রন্দন নয় বন্ধন এ শিকল ঝন্ ঝনা, মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা'। বর্ত্তমানে গ্রামের ভিতর একটী সেবাসমিতি স্থাপন করে পাশের কয়টী পল্লীর যুবক ও বালকদের নিয়ে সে একটী সেবাদল গড়ে তুলেছে। জীবনের আরম্ভ হ'তেই নিজের সব রকম সুখ সুবিধা ত্যাগ করে দেবীদাস দেশের নিঃস্বার্থ সেবাব্রতেই জীবন উৎসর্গের মন্ত্র নিয়েছে। ছেলেদের প্রাণেও দেশাত্মবোধের ভিতর দিয়েই সেবা ভাবটী জাগিয়ে দেবার তার আপ্রাণ চেষ্টা। বৈকালে ছেলের দল নিয়ে সে মুক্ত ময়দানে নানা প্রকার ব্যায়াম ও লাঠি খেলার কৌশল শিক্ষা দেয়, তার প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র পাঠাগারের বইগুলি ছেলেরা অতি আগ্রহে পাঠ করে। দুটী নৈশ বিদ্যালয় চল্‌ছে, সেবকদলই নিয়মিতভাবে সেখানে নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষরদের মুখে ভাষা ফুটিয়ে তোলে। রবিবার ছুটীর দিন সব ছেলেরা দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে গ্রামের অতি দুস্থ অসহায়দের ভিতর এ চাল বিতরণ করে। স্কুলের দীর্ঘ ছুটীতে সেবকদল গ্রামের রাস্তা তৈরী, জঙ্গল পরিষ্কার, এবং নানারকম সদনুষ্ঠান ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের আয়োজন করে।

এই সব কাজের পরিচালক ও প্রাণস্বরূপ হল দেবীদাস। সে সর্ব্বদাই কথা ও কাজের ভিতর দিয়ে ছেলেদের আত্মশক্তি জাগিয়ে তোল্‌বার ইঙ্গিত করে। ছেলেরা তার মিষ্টি হাসি ও আন্তরিক ভালবাসায় এতই মুগ্ধ যে, তাকে অতি আপনার জনের মত 'দেবী দা' বলে ডাকে। তাদের যত আব্দার সবই দেবীদার কাছে। দেবীদা না হলে তাদের গল্প জমে না, খেলা ভাল লাগে না, সমস্ত আনন্দই যেন ম্লান হয়ে যায়। তাকে সবাই ভয় করে, ভালও বাসে। তার অসামান্য ব্যক্তিত্বকে

কেউ শ্রদ্ধা না করে পারে না। দেবীদাসের সাথে সেবকদলের এতটা আপনার ভাব হয়েছে যে, যে-কোন সময়ে সেবকদল তার আদেশ পালন করতে আনন্দে এগিয়ে যায়, হয়ত মা বাবার কথাও ছেলেরা এতটা শোনে না। সত্যিই দেবীদাসও সর্ব্বক্ষণ ছেলেদের মঙ্গল চিন্তাই করে। ছেলের দল এক দিন দেবীদা'কে না দেখ্‌লে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এত সব আনন্দ উৎসাহের ভিতর দিয়েই দেবীদাস আপন কর্ম্মশক্তি সবটুকু প্রয়োগ করে সেবকদলটী সুন্দরভাবে গড়ে তুলছে। ছেলেদের ভিতর দিন দিন এমন একটা প্রীতির ভাব বিস্তার লাভ করেছে যে, একে অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করে—এমন কি দরকার হলে বিপদে কারও জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

গ্রামে কখনও কোন আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হলে দেবীদাস বেছে বেছে বড় ছেলেদের নিয়ে নিজেই সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। ছেলেরা দেবীদাসের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে মহা আনন্দে ও আগ্রহে তার আদেশ পালন করে। কোথায়ও রাত দুপুরে আগুন লেগেছে, সেবকদল মহা উৎসাহে আগুন নেবাতে চল্‌ল। সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হলেই সেবকদল গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ঔষধ বিতরণ, রোগীর সেবা ও সকলকে সতর্ক করে দিতে এগিয়ে যায়। সেবার পাশের একটী গাঁয়ে বসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, দেবীদাসের সেবকদল এমন অক্লান্তভাবে রোগীদের সেবা ও যত্ন করেছিল—যা দেখে জেলার বড় সাহেব পর্য্যন্ত এদের প্রশংসা না করে পারেন নি। গ্রামবাসীরা ছেলেদের এরূপ সেবা দেখে বিস্মিত হল। এদের নির্ম্মল চরিত্র, সুন্দর স্বাস্থ্য ও অমায়িক ভাব দিন দিন সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। আসে পাশের গাঁয়েও এমন হল যে, একটী ছেলেরও বিপথে যাবার উপায় নেই—সবাইকেই সেবাদলে এসে নিজেকে তৈরী করতে হবে। গ্রামের লোকের শ্রদ্ধা বিশ্বাস দেবীদাসের প্রতি দেবতার মতই বেড়ে চলল। বিপদে, সম্পদে দেবীদাস সবার পাশে আপন বন্ধুর মত হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। দু একজন যারা দেবীদাসের বিরুদ্ধ সমালোচক ছিল, তারাও তার অদ্ভুত সেবা কার্য্য দেখে মুগ্ধচিত্তে প্রশংসা করতে লাগ্‌ল—এই ভাবেই সেবকদলটী ধীরে ধীরে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করলো। মাঝে মাঝে দেবীদাস তার সেবকদল নিয়ে গ্রামের নির্জ্জন প্রান্তে কালীমন্দিরে গিয়ে মায়ের নিকট প্রার্থনা করত, আর সব ছেলেদের বলত, তোরা মায়ের নিকট প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা কর, "মা আমাদের শক্তি দাও, আত্মবিশ্বাস দাও, আমরা তেজস্বী শক্তিমান হয়ে দেশের সেবায় আত্ম নিবেদন করব। আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম যেন চিরদিন অটুট থাকে—এই করিস্ মা।" আবার দেবীমূর্ত্তির পানে চেয়ে বল্‌ত—'ঐ দেখ সাক্ষাৎ জগজ্জননী মা আমাদের—শক্তি, সাহস, বল, বীর্য্য—সবই মায়ের কাছে চাইলে পাবি।' ছোট ছেলেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করত, "সত্যিই দেবীদা, ইনি কি আমাদের মা?" দেবীদাস উত্তর দিত, "হাঁ রে হাঁ—এই আমাদের সবার মা—ইনি জগতের শক্তির মূল। মায়ের নিকট যা চাইবি তাই পাবি।" ছেলেরা প্রাণের বিশ্বাসে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে প্রার্থনা করত, "মা আমাদের মানুষ কর।" দেবীদাস যে মায়ের এতবড় বীরভক্ত তা বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যেত না। দেবীদাস মন্দিরে গিয়ে দেবীর সম্মুখে একান্তে বসে তাঁর পানে চেয়ে কি যেন ভাবত, খানিক বাদে মুখখানা তার গম্ভীর ভাবপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত, আঁখি দুটী তার হয়ে উঠ্‌ত অশ্রুভারাক্রান্ত, কাতরভাবে মায়ের নিকট বল্‌ত, "মা, তোর ইচ্ছা পূর্ণ হোক, দেবী আমাদের মানুষ কর, মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে দে।" ছেলেরা দেবীদাসের মাতৃপূজা দেখে তার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসে আরও অনুগত হয়ে পড়েছিল। দেবীদাসই ছিল তাদের আদর্শ।

এমন সুন্দরভাবে পল্লীর ভবিষ্যৎ আশাস্থল এই বালকদল গড়ে উঠ্‌ছে, হঠাৎ নিজেদের গ্রামেই প্রবলভাবে মহামারী দেখা দিল। দেবীদাস তার সেবকদল নিয়ে সেবায় ব্যস্ত হল। নিত্যই দু চারজন করে মারা যেতে লাগ্‌ল। সেবকদল ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে সাহস উৎসাহ দিয়ে সরকারী ডাক্তারদের আদেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থেকে ব্যাধির প্রকোপ হতে রক্ষা পাবার উপায় বলে দিতে লাগ্‌ল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও মৃত্যু সংখ্যা বেড়েই চলল। ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল আকাশ বাতাস ছাপিয়ে উঠ্‌ল। দেবীদাস প্রাণে দারুণ আঘাত পেলে। চারদিকে মৃত্যুর করাল ছায়া। তার অনেক পরিচিত হিতৈষী প্রাণ ত্যাগ কর্‌ল। প্রাণের ব্যথা খুব ধৈর্য্যের সাথে চেপে গিয়ে বাইরে সে মহা উৎসাহে স্থির ভাবে সেবক দল নিয়ে সেবা কর্‌তে লাগ্‌ল। সে নিজে নিরুৎসাহ হলে যে সেবকদের ভিতরও তার প্রতিক্রিয়া হবে, তাই খুবই উৎসাহে নিয়মিত আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে সবাইকে নিয়ে সেবায় আত্মনিয়োগ করল। সরকারী ডাক্তারগণ এদের আপ্রাণ সেবা দেখে অবাক্ হল—নিজের আত্মীয়ের জন্যও যে অনেকে এতটা করতে পারে না!

এত চেষ্টা ও যত্নে কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না, গ্রামে ব্যাধির প্রকোপ বেড়েই চল্‌ল। নিত্য মৃত্যুর সংখ্যা অসংখ্য হয়ে উঠ্‌ল। দেবীদাস প্রাণে প্রাণে বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়্‌ল। মাঝে মাঝে মায়ের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে—উৎসাহ জাগিয়ে তোলে প্রাণে।

দেবীদাসের মানসিক এই অবস্থার উপর আরও বিপদ ঘনিয়ে এল। হঠাৎ একদিন তার দুটী প্রিয় সেবক একই সময়ে কলেরায় আক্রান্ত হল। দেবীদাস এতে খুবই চিন্তিত ও বিব্রত হয়ে পড়্‌ল। ডাক্তার সেবক দুটীর জন্য বিশেষ ঔষধ ব্যবস্থা করলেন। দলের অপর সেবকগণ প্রাণ দিয়ে তাদের সহকর্ম্মী ভাইদের সেবা কর্‌তে লাগ্‌ল। একদিন পরেও কোন ভাল লক্ষণ দেখা গেল না। ক্রমে অবস্থা খারাপ হয়ে চল্‌ল, মাঝে মাঝে বিকার-গ্রস্ত হয়ে ভুল বকার সাথে 'দেবীদা দেবীদা' বলে ডেকে ওঠে; দেবীদাস সাম্‌নে বসে তাদের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, এই যে আমি, ভয় কি! খুব কি কষ্ট হচ্ছে? শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠ্‌বে, মাই তোমাদের ভাল কর্‌বেন। দেবীদাস এদের সম্বন্ধে আশা নিরাশার দোলায় দুল্‌ছে, ছেলেরা নিরাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণও সেবক দুটীর সম্বন্ধে আশাপ্রদ কোন কথা ভরসা করে বল্‌তে পার্‌লেন না।

রাত অনেক হয়েছে, দেবীদাস শুশ্রূষাকারী সেবকদের ভরসা দিয়ে বল্‌লে, "ওরে ভয় নেই, এরা ভাল হবেই, তোরা একটু যত্ন করে সেবা কর। আমি পাড়ার অপর রোগীদের দেখতে চললাম।" বাইরে এসে দেবীদাস সব রোগীদের বাড়ী গিয়ে সেবকদের খুব উৎসাহ দিয়ে রাত্রিকার সেবার ব্যবস্থা করে ধীরে ধীরে চল্‌ল গ্রামের প্রান্তে—সেই দেবী মন্দিরে। মনের ভিতর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি ভয়ানক অভিমান জেগে উঠেছে। গ্রামের বালকগণ দেবীকে স্মরণ করেই দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের প্রতি এরূপ নির্ম্মম শাসন! একথাই শুধু তার বার বার মনে হচ্ছে, বড়ই ব্যথা ভারাক্রান্ত প্রাণে চলেছে সে আজ এ বিপদে মন্দিরে মায়ের নিকট করুণ নিবেদন জানাতে, এ সময় আর কেউ নেই একমাত্র ঐ বিপদনাশিনী মা ছাড়া।

গভীর আঁধার রাত্রি, একেবারে নীরব, নিঝুম থম্‌থমে! সাড়া নাই, শব্দ নাই, শুধু আঁধারের পর আঁধার কুণ্ডলি পাকিয়ে চারদিক ছেয়ে ফেলেছে। শুধু নিবিড় আঁধার, আঁধারেরও যে একটা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রূপ আছে, তা আজ চোখের সাম্‌নে

ভেসে উঠ্ছে! নীরবতা ভঙ্গ ক'রে শুধু দূরে দু একটা পেচকের বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এই গভীর ঘোর আঁধার নিশিতে একাকী দেবীদাস মন্দিরে দেবীর সম্মুখে একান্ত মনে তাঁর ধ্যানে মগ্ন, মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠ্ছে, ব্যাকুল হয়ে আবার মায়ের নিকট অভিমান ও আব্দারের সুরে বল্‌ছে, "মা তোর ঐ সংহার মূর্ত্তি সংবরণ কর— ওগো লোলরসনা বিবসনা উগ্রচণ্ডী প্রলয়রূপিণী ক্রোধ সংবরণ কর, গ্রামগুলি যে জনশূন্য হয়ে একেবারে ধ্বংস হতে চল্‌ল; দেবী, গ্রামবাসীরা তোর পায়ে কী অপরাধ করেছে,—ক্ষমা কর ওগো ক্ষেমঙ্করী! আমরা যে বড়ই অবোধ সন্তান তোর, যদিও জানি তোর হাতেই জগতের জন্ম মৃত্যু, তোর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে ও হবে, তাহলেও আজ কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা কর্‌ছি, ওগো মহামায়া, তোর ঐ উগ্ররূপ শান্ত করে বরাভয়রূপে আবির্ভূতা হ, পল্লীবাসীকে রক্ষা কর; দেশ শান্ত হোক, সবার প্রাণে শান্তি জাগুক, আজ এ তোর অধম সন্তানের প্রার্থনা পূরণ কর, আমি তোর ঐ রক্তরাঙ্গা পাদ-পদ্মে আজ এ জীবন দান করব; দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রাখিস্ না, এই নে আমার প্রাণ, গ্রামবাসীদের নিরাময় কর মা, আর যে কান্নার রোল শুন্‌তে পার্‌ছি না, প্রাণ ফেটে যায়।"

প্রার্থনার সাথে সাথে দেবীদাসের আঁখি বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে। কোথায়ও কেউ নেই, একমাত্র এ নির্জ্জনে দেবীর সম্মুখে দেবীদাস বসে আছে। দূর হতে এই আঁধার কালিমা ভেদ করে পুত্র-পরিজনের পরম আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় করুণ ক্রন্দন মাঝে মাঝে ভেসে আস্‌ছে, হঠাৎ দেবীদাসের মুখে দু ঝলক রক্ত গড়িয়ে এল, মুখটী তার উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, কণ্ঠে শুধু মা মা শব্দ উচ্চারণ করতে করতে সে যেন লুটিয়ে পড়ল মায়ের অভয় পদমূলে। সত্যিই জগজ্জননী মা তাঁর সন্তানের প্রাণের প্রার্থনা শুন্‌লেন, পূজার অর্ঘ্যরূপে সেবক সন্তানকে তুলে নিলেন।

পরদিন প্রভাতের অবস্থা দেখে সবারই মনে হল কোন দৈব শক্তির প্রভাবে যেন গ্রামের পরিবর্ত্তন হয়েছে, মুমূর্ষু রোগিগণও মৃত্যুর হাত হতে প্রাণ পেয়েছে, আজ আর কারও মৃত্যু হয় নি, সেবক দুটীও ভালর দিকেই। সেবক দলের সবার মুখেই এত পরিশ্রমের পরও একটা আশা ও আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছে, সত্যিই সবার প্রাণে এত দিনের আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা যেন হঠাৎ আপনিই দূর হয়ে গেল।

কিন্তু একটু বেলায় বায়ুবেগে সমস্ত গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়্‌ল, কাল নৈশ যোগে সবার অতি আপনার জন দেবীদাস, দেশের জন্য, দশের জন্য মন্দিরে মায়ের পায়ে জীবন উৎসর্গ করেছে। এই নিদারুণ মর্ম্মদাহী সংবাদে তার অতি প্রিয় সেবকদল হতে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ নরনারী আকস্মিক বজ্রাঘাতের মত স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারও মুখে কথা নেই, সকলের চোখে চোখে অশ্রুর প্লাবন বয়ে গেল। সবাই নীরব—শুধু দূরে আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—দেবীদাস দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে।

পুরুষত্রয়*

শ্রীঅরবিন্দ

গীতার শিক্ষা প্রাবম্ভ হইতে শেষ পর্যান্ত তাহাব সকল ধারায় এবং সকল সাবলীল গতি বৈচিত্র্যেব ভিতব দিযা একটি কেন্দ্রীয় ভাবেব অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, এবং বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়েব মত-বৈষম্য সকলের সাম্যতা সাধন ও সামঞ্জস্য কবিয়া এবং যত্নসহকাব অধ্যাত্ম অনুভূতি সমূহেব সমন্বয় সাধন কবিযা সেই কেন্দ্রীয়ভাবে উপনীত হইতেছে, এই সকল অধ্যাত্ম অনুভূতিব আলোক অনেক সময়েই পবস্পববিবোধী, অন্ততঃ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ কবিলে এবং অনন্যভাবে তাহাদেব বিকীবণের বাহ্যিক বেখা ধবিয়া চলিলে তাহাবা বিভিন্ন দিকে লইয়া যায, কিন্তু এখানে যে সকলকে সংগ্রহ কবিযা এক সমন্বয় সাধক দৃষ্টিতে এক কেন্দ্রানুগত কবা হইয়াছে। এই যে কেন্দ্রীযভাব, ইহা হইতেছে ত্রিধা চৈতন্যেব পবিকল্পনা, এই চৈতন্য তিন অথচ এক, ইহা সৃষ্টির সকল স্তব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই জগতেব মধ্যে এমন এক অধ্যাত্ম সত্তা কাজ কবিতেছে যাহা অগণন বাহ্যরূপেব মধ্যেও এক। ইহাই জন্ম ও কর্ম্মেব বিকাশকর্ত্তা, জীবনেব গতিদায়ক শক্তি, প্রকৃতির অসংখ্য পবিবর্ত্তনেব মধ্যে অন্তর্যামী ও সহযোগী চৈতন্য, দেশ ও কালেব মধ্যে এই যে-সব বিক্ষোভ, উহাই এই সবেব উপাদানভূত সদ্বস্তু; উহা নিজেই কাল ও দেশ ও ঘটনা। উহাই জগৎসমূহের মধ্যে এই সব বহুসংখ্যক আত্মা, উহাই সমুদয় দেব, মানব, জীব, বস্তু, শক্তি, গুণ, পবিমাণ, বিভূতি ও অধিষ্ঠাতা। উহাই প্রকৃতি, ঐ অধ্যাত্ম সত্তার শক্তি, উহাই বিষয়সমূহ, নাম ও ভাব ও রূপের মধ্যে উহারই বাহ্যপ্রকাশ; উহাই সর্ব্বভূত, সকলেই এই অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভু অধ্যাত্ম বস্তুর, এই এক ও শাশ্বতেব নানা অংশ, নানা জন্ম, নানা সম্ভূতি। কিন্তু আমবা চক্ষুব সম্মুখে যাহাকে স্পষ্টতঃ ক্রিয়মান দেখিতেছি তাহা এই শাশ্বত এবং তাহাব চৈতন্যময়ী শক্তি নহে, ইহা হইতেছে প্রকৃতি, সে তাহার ক্রিয়াবলীব অন্ধ আবেগে তাহাব কর্ম্মেব অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞান। তাহাব কাজ যন্ত্রবৎচালিত কতকগুলি মূল গুণ বা শক্তিতত্ত্বের বিশৃঙ্খল, অজ্ঞান, সীমাবদ্ধক্রিয়া এবং তাহাদের স্থিরনির্দ্দিষ্ট বা পবিবর্ত্তনশীল পবিণাম পরম্পবা। আব তাহাব ক্রিয়াব বশে যে-কোন আত্মা সম্মুখে প্রকট হইতেছে সেও দৃশ্যতঃ অজ্ঞান, দুঃখভোগী, এবং এই নিম্নতন প্রকৃতিব অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষ-জনক ক্রিয়ায় আবদ্ধ। তথাপি এই প্রকৃতিব মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি তাহা আপাততঃ যেরূপ দেখায় বস্তুতঃ সেরূপ নহে; কাবণ ইহাই পুরুষ, বিশ্ব-আত্মা, বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও প্রকটনেব যে ক্ষরভাব তাহাবই অন্তবাত্মা—ইহাব সত্য স্বরূপ লুক্কায়িত বাহ্যরূপই ব্যক্ত, মূলতঃ ইহা অক্ষর ও পবমপুরুষের সহিত অভিন্ন। ইহার ব্যক্ত বাহ্যরূপ সমূহের পাশ্চাতে যে-সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, আমাদিগকে সেইখানেই যাইতে হইবে; এই সকল আবরণের অন্তবালে যে অধ্যাত্ম সত্তা বহিয়াছে আমাদিগকে তাহাবই সন্ধান লইতে হইবে এবং সবকেই এক বলিয়া দেখিতে হইবে, 'বাসুদেবঃ ইতি সর্ব্বম্,' ব্যষ্টি-গত, বিশ্বগত, বিশ্বাতীত সবই সেই এক বাসুদেব।

* গীতা—পঞ্চদশ অধ্যায়।

কিন্তু যতক্ষণ আমরা নিম্নতন প্রকৃতিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া বাস করি, ততক্ষণ, আভ্যন্তরীণ সত্য অনুসারে সম্পূর্ণভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। কারণ এই নিম্নতর ক্রিয়ার প্রকৃতি হইতেছে এক অজ্ঞান, এক মায়া; সে নিজের অঞ্চলের অন্তরালে ভগবানকে রাখিয়াছে, নিজের নিকটে এবং নিজের জীবসকলের নিকটে তাঁহাকে গোপন করিতেছে। ভগবান নিজেরই সর্ব্বসৃজনকারিণী যোগমায়া দ্বারা লুক্কায়িত হইয়াছেন, নিত্য অনিত্যের রূপে প্রকট হইয়াছে, পুরুষ নিজেরই অভিব্যক্তি সমূহের দ্বারা সমাহিত ও সমাবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ক্ষরপুরুষকে যদি একক স্বতন্ত্রভাবে ধরা যায়, অবিভাজ্য অক্ষর বিশ্বপুরুষ এবং বিশ্বাতীতপুরুষ হইতে পৃথকভাবে যদি ক্ষর সত্তাকে দেখা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না, আমাদের সত্তার পূর্ণতা হয় না, অতএব মুক্তিও হয় না।

কিন্তু অন্য আর একটি অধ্যাত্ম সত্তা আমরা অবগত হই, তাহা এই সবের কোনটিই নহে, তাহা হইতেছে আত্মা, শুধু আত্মাই আর কিছুই নহে। এই অধ্যাত্ম সত্তা শাশ্বত, চিরকাল একই প্রকার, তাহা কখনই অভিব্যক্তির দ্বারা পরিবর্ত্তিত বা প্রভাবিত হয় না, তাহা এক, অবিচল, অবিভক্ত স্বয়ম্ভূ সত্তা, তাহা প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তি সকলের বিভাগের দ্বারা যেন বিভক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মানও হয় না, তাহা প্রকৃতির কর্ম্মের মধ্যে নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির গতির মধ্যে গতিহীন। ইহাই সর্ব্বভূতের আত্মা, অথচ অবিচল, উদাসীন, স্পর্শাতীত, যেন এই যে-সব বস্তু তাহার উপর নির্ভর করিতেছে ইহারা অনাত্মা, ইহারা যেন তাহার নিজেরই ফল নহে, শক্তি নহে, পরিণাম নহে, পরন্তু এক অবিচল অসহযোগী দ্রষ্টার সম্মুখে যেন এক কর্ম্মের অভিনয় প্রকটিত হইতেছে। কারণ যে মন এই অভিনয়মঞ্চে নামিয়া ইহাতে যোগ দিতেছে সে আত্মা নহে, আত্মা উদাসীনভাবে এই অভিনয়কে নিজের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছে। অধ্যাত্ম সত্তা কালের অতীত, যদিও তাহাকে আমরা কালের মধ্যেই দেখিতে পাই; তাহা দেশে পরিব্যাপ্ত নহে, যদিও আমরা দেখি তাহা যেন দেশ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাকে আমরা সেই পরিমাণে জানিতে পারি যে পরিমাণে আমরা বাহির হইতে ফিরিয়া অন্তর্মুখী হই, অথবা ক্রিয়া ও গতির পশ্চাতে যে এক শাশ্বত ও অবিচল সত্তা রহিয়াছে তাহার সন্ধান করি, অথবা কাল এবং তাহার সৃষ্টি হইতে সরিয়া যাহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই তাহাতে যাই, প্রকট প্রপঞ্চ হইতে সরিয়া মূল সত্তায় যাই, ব্যক্তি হইতে নির্ব্যক্তিকতায়, বিবর্ত্ত হইতে অপরিবর্ত্তনীয় স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় যাই। এইটিই অক্ষর পুরুষ, ক্ষরের মধ্যে অক্ষর, চলমানের মধ্যে অবিচল, নশ্বর বস্তু সকলের মধ্যে অবিনশ্বর। অথবা যেহেতু ব্যাপ্তি কেবল প্রতিভাস মাত্র যেহেতু বলিতে পারা যায় যে, অক্ষর অবিচল ও অবিনশ্বরের মধ্যেই সকল ক্ষর ও নশ্বর বস্তুর গতিক্রিয়া চলিতেছে।

যে ক্ষর সত্তা সকল প্রাকৃত বস্তু বলিয়া এবং সর্ব্বভূত বলিয়া আমাদের সম্মুখে দৃষ্ট হইতেছে তাহা অবিচল ও শাশ্বত অক্ষরের মধ্যেই বিচরণ করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে। আত্মার এই চলিষ্ণু শক্তি আত্মার সেই মূলগত অবিচলতার মধ্যেই ক্রিয়া করিতেছে, যেমন জড় প্রকৃতির দ্বিতীয় তত্ত্ব বায়ু— তাহার একীকরণ ও স্বতন্ত্রীকরণের, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের স্পর্শগুণাত্মক শক্তি লইয়া, তৈজস (দীপ্তিময়, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক) ও অন্যান্য ভৌতিক ক্রিয়ার সৃজনাত্মক শক্তিকে সমর্থন করিয়া— আকাশের সূক্ষ্ম বিরাট নিশ্চলতার মধ্যে ব্যাপকভাবে বিচরণ করিতেছে। এই অক্ষর পুরুষ হইতেছে বুদ্ধির ঊর্দ্ধে আত্মা, 'যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ',—ইহা আমাদের সত্তার মধ্যেই প্রকৃতির উচ্চতম আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব মুক্তিদায়ক বুদ্ধিরও অতীত, এই বুদ্ধির ভিতর

দিয়াই মানুষ তাহার অস্থির চিরচঞ্চল মানসিক সত্তা হইতে তাহার স্থির শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবশেষে জন্মের দৃঢ়ানুবন্ধতা ও কর্ম্মের সুদীর্ঘ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। এই আত্মাই তাহার উচ্চতম স্থিতিতে, [পরং ধামঃ] সেই অব্যক্ত যাহা আদ্যা বিশ্বপ্রকৃতির অব্যক্ত তত্ত্ব হইতেও ঊর্দ্ধে, এবং যদি জীব এই অক্ষরের মধ্যে ফিরিয়া যায় তাহা হইলেও বিশ্ব ও প্রকৃতির বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়ে এবং সে জন্ম অতিক্রম করিয়া এক অপরিণামী শাশ্বত সত্তার মধ্যে চলিয়া যায়। তাহা হইলে জগতে আমরা এই দুইটি পুরুষকেই দেখিতে পাই, একটি ইহার ক্রিয়ার সম্মুখে আসিয়া প্রকট হইতেছে, অপরটি রহিয়াছে, পশ্চাতে, চির-নীরবতায় অচঞ্চল, তাহা হইতেই কর্ম্ম উদ্ভূত হইতেছে, তাহার মধ্যেই সকল কর্ম্ম কালাতীত সত্তায় বিরতি ও নির্ব্বাণ লাভ করিতেছে। 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।'

যে সমস্যাটি আমাদের বুদ্ধি সমাধান করিতে পারে না সেটি হইতেছে এই যে, মনে হয় যেন এই দুইটি পুরুষ সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধের কোন প্রকৃত সূত্র নাই অথবা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছেদ সাধন না করিয়া একটি হইতে অপরটিতে যাইবার কোন পথ নাই। ক্ষর পুরুষ কর্ম্ম করিতেছে, অন্ততঃ কর্ম্মের প্রেরণা দিতেছে, অক্ষরের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে, অক্ষর পুরুষ সরিয়া রহিয়াছে, আত্ম-সমাহিত, নিজের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষর হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, যদি আমরা সাংখ্যদের ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির আদি ও সনাতন দ্বিত্ব মানিয়া লই (যদিও চিরন্তন বহুপুরুষ স্বীকার না করি) তাহা হইলেই সম্ভবতঃ ভাল হয়। জিনিষটি অধিকতর যুক্তি সঙ্গত ও সহজবোধ্য হয়। তখন আমাদের অক্ষরের অনুভূতি হইবে প্রত্যেক পুরুষের নিজেরই মধ্যে প্রত্যাহার, প্রকৃতি হইতে এবং সেই জন্যই জীবনের ব্যবহারে অন্যান্য জীবের সহিত সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আসা, কারণ প্রত্যেক পুরুষই নিজের মূলসত্তার স্বয়ংসিদ্ধ, অনন্ত ও পূর্ণ। কিন্তু সে যাহাই হউক, শেষ অনুভূতি হইতেছে সকল সত্তার একত্বের অনুভূতি, তাহা কেবল অনুভূতির সাম্য নহে, একই প্রাকৃত শক্তির নিকট সকলের সমান বশ্যতা নহে, কিন্তু অধ্যাত্মসত্তার একত্ব, এই সব অন্তহীন রূপবৈচিত্র্যের ঊর্দ্ধে, আপেক্ষিক জীবনের এই সকল আপাতদৃশ্য ভেদবিভাগের পশ্চাতে সচেতন সত্তার বিরাট একাত্মতা। সেই উচ্চতম অনুভূতির উপরেই গীতার প্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃ মনে হয় বটে যে, গীতা বহুপুরুষের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারা তাহাদের শাশ্বত ঐক্যের অনুগত এবং তাহার দ্বারা বিধৃত, কারণ বিশ্বপ্রপঞ্চ চিরন্তন, এবং অন্তহীন যুগযুগান্তের ভিতর দিয়া প্রকট চলিয়াছে; আর গীতা এমন কথা কোথাও স্পষ্টভাবে বলে নাই বা কোন বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিতও করে নাই যে, জীবাত্মা অনন্ত সত্তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইবে, লয় হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও গীতা জোর দিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, অক্ষর পুরুষই হইতেছে এই সব বহুজীবের এক আত্মা, অতএব ইহা স্পষ্ট যে, এই দুইপুরুষই হইতেছে একই শাশ্বত ও বিশ্বসত্তার দ্বৈত স্থিতি। এইটি হইতেছে একটি অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত, উপনিষদের যে উদারতম দৃষ্টি, এই সিদ্ধান্তটিই হইতেছে তাহার সমগ্র ভিত্তি; যথা, ঈশা উপনিষদ বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম অচল ও সচল দুইই, 'তদেজতি তন্নৈজতি', এক এবং বহু, আত্মা এবং সর্ব্বভূত, বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সনাতন অজাত স্থিতি এবং সর্ব্বভূতের সম্ভূতি, এবং ইহাদের মধ্যে একটিতে বাস করিয়া তাহার নিত্য সঙ্গী অপরটিকে বাদ দেওয়াকে ঈশা অন্ধতমঃ বলিয়া, একদেশদর্শী জ্ঞানের অন্ধকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

গীতার ন্যায় ঈশা উপনিষদও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে যে, অমৃতত্ব উপভোগ করিতে হইলে এবং শাশ্বতের মধ্যে বাস করিতে হইলে মানুষের পক্ষে উভয় তত্ত্বকেই জানা আবশ্যক, গ্রহণ করা আবশ্যক, গীতা যেমন বলিয়াছে, 'সমগ্রম্ মাম্'। গীতার শিক্ষা এবং উপনিষদ্ সমূহের এই দিকের শিক্ষা এ পর্য্যন্ত একই; কারণ তাহারা সত্ত্বার দুইটি দিকই অবলোকন করে, স্বীকার করে অথচ সিদ্ধান্তরূপে এবং বিশ্বের পরম সত্যরূপে একত্বে উপনীত হয়।

কিন্তু এই যে মহত্তর জ্ঞান ও উপলব্ধি, আমাদের ঊর্দ্ধতম দৃষ্টির নিকট ইহা যতই সত্য হউক, যতই হৃদয়গ্রাহী হউক, ইহাকে এখনও একটি অতিবাস্তব ও গুরুতর সমস্যা খণ্ডন করিতে হইবে, ব্যবহারের দিক দিয়া এবং যুক্তির দিক দিয়াও যে বিরোধ রহিয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইবে; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই বিরোধ অধ্যাত্ম উপলব্ধির উচ্চতম শিখর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই যে সচল আভ্যন্তর ও বাহ্য উপলব্ধি, শাশ্বত পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা এক মহত্তর চেতনা আছে, 'ন ইদম্ যদ্ উপাসতে', অথচ সেই সঙ্গেই এই সবই সেই শাশ্বত পুরুষ, এই সবই আত্মার চিরন্তন আত্মদর্শন, 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম,' 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম' (মাণ্ডুক উপনিষদ)। শাশ্বত পুরুষই সর্ব্বভূত হইয়াছেন, 'আত্মা অভূৎ সর্ব্বভূতানি' (ঈশা উপনিষদ)। মুণ্ডকোপনিষদ যেমন বলিয়াছে, তুমিই ঐ কুমার, তুমিই ঐ কুমারী, আবার তুমিই ঐ বৃদ্ধ দণ্ড হস্তে চলিতেছ,* ঠিক যেমন গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনিই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, ব্যাস ও উশনা, তিনিই সিংহ, তিনিই অশ্বত্থ বৃক্ষ, তিনিই সকল জীবের চেতনা, বুদ্ধি, সকল গুণ ও অন্তরাত্মা। কিন্তু এই দুইটি পুরুষ কেমন করিয়া এক হয়? তাহারা যে প্রকৃতিতে এতটা বিপরীত শুধু তাহাই নহে, উপলব্ধিতেও তাহাদিগকে এক করা কঠিন। কারণ যখন আমরা বিবর্ত্তনের চঞ্চলতায় বাস করি, তখন আমরা কালাতীত স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার অমৃতত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারিলেও তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি কিনা সন্দেহ। আবার যখন আমরা কালাতীত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখন কাল ও দেশ ও ঘটনা আমাদের নিকট হইতে খসিয়া পড়ে এবং অনন্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম দৃষ্টিতে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বোধ্য সিদ্ধান্ত ইহাই হয় যে, প্রকৃতিতে পুরুষের যে চঞ্চলতা তাহা ভ্রান্তি, যতক্ষণ আমরা ইহার মধ্যে বাস করি ততক্ষণই ইহা সত্য কিন্তু মূলতঃ সত্য নহে, এবং সেই জন্যই যখন আমরা আত্মার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হই, উহা আমাদের নিষ্কলঙ্ক মূল সত্তা হইতে খসিয়া পড়ে। এই ভাবেই সাধারণতঃ এই সমস্যার সহজ সমাধান করা হয়। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।'

গীতা এই ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, ইহার নিজের মধ্যে অত্যধিক ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা ছাড়া ইহা ঐ ভ্রান্তির কোন সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারে না,—কারণ ইহা শুধুই বলে যে, এসব হইতেছে এক রহস্যময় ও দুর্ব্বোধ্য মায়া, তাহা হইলে আমরাও ত ঠিক ঐ ভাবেই বলিতে পারি যে, ইহা এক রহস্যময় ও দুর্ব্বোধ্য যুগ্ম-তত্ত্ব, আত্মা নিজেকে আত্মার নিকট হইতে লুকাইতেছে। গীতা মায়ার কথা বলিয়াছে, কিন্তু গীতার মতে উহা হইতেছে কেবল এক ভ্রান্তি-উৎপাদক আংশিক চেতনা, তাহা পূর্ণ সত্যকে ধরিতে পারে না, চঞ্চলা প্রকৃতির ব্যাপার সকলের মধ্যেই বাস করে, যে পুরুষের সে সক্রিয় শক্তি

* ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যখন আমরা এই মায়াকে অতিক্রম করি, জগৎ লুপ্ত হইয়া যায় না, কেবল ইহার সমগ্র অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমরা দেখি না যে, এ সবের কোন অস্তিত্বই নাই, পরন্তু দেখি যে, সবই আছে, কিন্তু যে অর্থে আছে তাহা বর্ত্তমান ভ্রান্ত অর্থ অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সবই ভাগবত আত্মা, ভাগবত সত্তা, ভাগবত প্রকৃতি, সবই বাসুদেব। গীতার নিকট জগৎ সত্য, ঈশ্বরের সৃষ্টি, শাশ্বতের শক্তি, পরব্রহ্মের প্রকটন, এমন কি ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ এই যে নিম্নতর প্রকৃতি ইহাও পরাভাগবত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। আর আমরা একান্ত ভাবে এই প্রভেদেরও আশ্রয় লইতে পারি না যে, এখানে দুইটি তত্ত্ব রহিয়াছে, একটি নিম্নতর, সক্রিয় ও অনিত্য আর একটি কর্ম্মের অতীত উর্দ্ধতন শান্ত স্তব্ধ, শাশ্বত তত্ত্ব, এবং আমাদের মুক্তি হইতেছে এই আংশিক তত্ত্ব হইতে উঠিয়া সেই মহৎ তত্ত্বে যাওয়া, কর্ম্ম হইতে নীরবতায় যাওয়া। কারণ গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে যে, যতদিন আমাদের জীবন ততদিন আমরা আত্মা ও তাহার নীরবতায় সচেতন হইয়া থাকিতে পারি, অথচ প্রাকৃত জগতে শক্তির সহিত কর্ম্ম করিতে পারি এবং এইরূপ করাই কর্ত্তব্য। এবং গীতা স্বয়ং ভগবানেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছে, তিনি জন্মগ্রহণের বাধ্যতায় বদ্ধ নহেন, পরন্তু মুক্ত, বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, অথচ তিনি চিরকাল কর্ম্মে রত রহিয়াছেন, বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি'। অতএব সমগ্র ভাগবত প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াই এই দ্বৈত উপলব্ধির সম্পূর্ণ একত্ব সাধন সম্ভব হয়। কিন্তু এই একত্বের মূল সূত্র কি?

পুরুষোত্তম সম্বন্ধে গীতার যে পরম দৃষ্টি তাহারই মধ্যে গীতা এই একত্বের সূত্র পাইয়াছে; কারণ গীতার মতে সেইটিই হইতেছে পূর্ণ ও উচ্চতম উপলব্ধির আদর্শ স্বরূপ, ইহা হইতেছে কৃৎস্নবিদ্‌গণের সমগ্র জ্ঞানশীল ব্যক্তিগণের জ্ঞান। অক্ষর হইতেছেন "পর" যেসব বস্তু রহিয়াছে, যে কর্ম্ম চলিতেছে তাহাদের সম্পর্কে অক্ষর পুরুষ হইতেছেন পরম সত্তা। ইহাই সর্ব্বভূতের অক্ষর আত্মা এবং পুরুষোত্তমই সর্ব্বভূতের অক্ষর আত্মা। প্রকৃতিতে তাঁহার নিজেরই শক্তি দ্বারা অস্পৃষ্ট, তাঁহার নিজেরই বিবর্ত্তনের প্রেরণা দ্বারা অক্ষুব্ধ, তাঁহার নিজেরই গুণ সকলের ক্রিয়া দ্বারা অবিচলিত তাঁহার যে স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, সেই সত্তার মুক্ত অবস্থাতেই তিনি অক্ষর। কিন্তু ইহা সমগ্র জ্ঞানের একটি প্রধান দিক হইলেও, কেবল একটি দিক মাত্র। পুরুষোত্তম আবার সেই সঙ্গেই অক্ষর পুরুষের অতীত, কারণ তিনি এই অক্ষরতা অপেক্ষা বৃহত্তর, তিনি তাহার সত্তার শাশ্বত পদের, পরমধামের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নহেন। তথাপি আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শাশ্বত ও অক্ষর রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়াই আমরা সেই পরম পদে পৌছিতে পারি যেখান হইতে আর পুনর্জ্জন্মের মধ্যে আসিতে হয় না, এবং এইরূপ মুক্তিই প্রাচীন কালের মনীষিগণের, প্রাচীন ঋষিগণের সাধনার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যখন শুধু অক্ষরের ভিতর দিয়া সন্ধান করা যায়, তখন এই মুক্তির প্রয়াস হয় অনির্দ্দেশ্যের সন্ধান, ইহা আমাদের প্রকৃতির পক্ষে কষ্টসাধ্য কারণ আমরা এখানে জড়ের মধ্যে দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছি, 'গতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'। আমাদের অন্তরস্থিত শুদ্ধ সূক্ষ্ম আত্মা, অক্ষর, বৈরাগ্যের প্রেরণায় যে অনির্দ্দেশ্যের মধ্যে উঠিয়া যায় তাহা এক 'পরো অব্যক্তঃ', সেই পরম অব্যক্তও পুরুষোত্তম। সেইজন্যই গীতা বলিয়াছে, যাহারা অনির্দ্দেশ্যের উপাসনা করে তাহারাও আমাকে, শাশ্বত ভগবানকে লাভ করে। কিন্তু তিনি আবার পরম অব্যক্ত অক্ষর হইতেও মহত্তর, সকল পরম অসৎ হইতে, নেতি নেতি হইতে মহত্তর কারণ—তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়াও জানিতে হইবে, যিনি

তাঁহার নিজের সত্তায় এই সমগ্র বিশ্বকে বিস্তৃত করিয়াছেন। তিনি এক পরম রহস্যময় সর্ব্ব, এখানকার সকল জিনিষের এক অনির্ব্বচনীয় পরম অসৎ। তিনি ক্ষরের মধ্যে ঈশ্বর, তিনি শুধু ঊর্দ্ধেই পুরুষোত্তম নহেন, পরন্তু এখানে সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশেই ঈশ্বর। আর যেখানে, তাঁহার উচ্চতম শাশ্বত "পরঃ অব্যক্ত" পদেও তিনি পরমেশ্বর, তিনি উদাসীন ও সম্বন্ধবর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য নহেন, পরন্তু তিনি আত্মা এবং বিশ্বের মূল, পিতা ও মাতা, আদি প্রতিষ্ঠা ও শাশ্বত আশ্রয়, তিনি সকল লোকের ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্'। তাঁহাকে জানিতে হইবে যুগপৎ ক্ষরে ও অক্ষরে, তাঁহাকে জানিতে হইবে অজাত পুরুষরূপে, তিনি সকলের জন্মে নিজেকে আংশিক ভাবে এরূই করিতেছেন এবং নিত্য অবতাররূপে নিজেও অবতীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার সমগ্রতায় জানিতে হইবে, 'সমগ্রম্ মাম্',—কেবল তাহা হইলেই জীব নীচের প্রকৃতির বাহ্যরূপ সকল হইতে সহজেই মুক্ত হইতে পারে এবং এক বিরাট ত্বরিত বিকাশ ও প্রশস্ত অপরিমেয় ঊর্দ্ধায়নের দ্বারা ভাগবত সত্তা ও পরা প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে। কারণ ক্ষরের সত্যও পুরুষোত্তমের সত্য। পুরুষোত্তম সর্ব্বভূতের হৃদয়-মধ্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহার অগণন বিভূতির মধ্যে প্রকট হইতেছেন, পুরুষোত্তম হইতেছেন কালের মধ্যে বিশ্বপুরুষ, এবং তিনিই মুক্ত মানবাত্মাকে দিব্য কর্ম্মের জন্য আদেশ দিতেছেন। তিনি অক্ষর ও ক্ষর দুইই, অথচ তিনি অন্য কারণ তিনি এই দুই বিপরীত সত্তা অপেক্ষা অধিকতর এবং মহত্তর,—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

"কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক হইতেছেন উত্তম পুরুষ, তিনি পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত, তিনি অক্ষয় ঈশ্বর হইয়াও লোকত্রয়ে প্রবেশ করিতেছেন এবং তাহাদিগকে ধারণ করিতেছেন।" গীতা আমাদের জীবনের এই দুইটি আপাত বিরোধী দিকের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, এই শ্লোকটিই তাহার মূল সূত্র।

প্রথম হইতেই পুরুষোত্তম তত্ত্বের সূচনা করা হইয়াছে, আভাস দেওয়া হইয়াছে, উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম হইতেই এইটিকে পরোক্ষভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেবল এখন এই পঞ্চদশ অধ্যায়েই ইহাকে স্পষ্ট ভাবে বিবৃত করা হইতেছে এবং একটি বিশেষ নাম দিয়া প্রভেদটিকে পরিস্ফুট করা হইতেছে। পরক্ষণেই কি ভাবে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিকাশ করা হইয়াছে তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠিতে হইলে, মানুষকে প্রথমে পূর্ণ অধ্যাত্ম সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির উপরে উঠিতে হইবে। এইভাবে নীচের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমরা নির্ব্যক্তিকতায় সুদৃঢ় হই, কর্ম্মের ঊর্দ্ধে অবিকল প্রতিষ্ঠা লাভ করি,—গুণের সকল সীমা, সকল সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হই—এবং এইটিই হইতেছে পুরুষোত্তমের প্রকট প্রভৃতির একটি দিক। আত্মার অনন্ত ও একত্বরূপে, অক্ষররূপে তাঁহার আবির্ভাব। কিন্তু আবার পুরুষোত্তমের এক অনির্ব্বচনীয় শাশ্বত বহুত্বও রহিয়াছে, জীবের প্রকটনের আদি রহস্যের পশ্চাতে এইটিই হইতেছে উচ্চতম, সত্যতম সত্য। অনন্তের আছে এক শাশ্বত শক্তি, তাঁহার দিব্য প্রকৃতির এক আদিহীন অন্তহীন ক্রিয়া, এবং বাহ্যতঃ নির্ব্যক্তিক শক্তি সকলের মধ্য হইতে সেই ক্রিয়ায় জীব-ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য্য রহস্য আবির্ভূত হইতেছে, 'প্রকৃতিঃ জীবভূতা'। ইহা সম্ভব এই জন্য যে, ব্যক্তিত্বও ভগবানের একটি স্বরূপ এবং অনন্তের

মধ্যেই ইহার উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য ও অর্থ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু অনন্তের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা নীচের প্রকৃতির অহংভাবাপন্ন, ভেদাত্মক, আত্ম-বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব নহে, তাহা হইতেছে এক উন্নীত, বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত, অমৃত ও দিব্য বস্তু। পরম পুরুষের এই রহস্যই হইতেছে প্রেম ও ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব। আমাদের মধ্যে যে পুরুষ, যে শাশ্বত জীবাত্মা রহিয়াছে সে যে শাশ্বত ভগবানের, পরম পুরুষ পরমেশ্বরের একটি অংশ তাঁহার নিকটে নিজেকে, নিজের যাহা কিছু, নিজে যাহা কিছু সবকেই অর্পণ করিতেছে। এই যে আত্মসমর্পণ, আমাদের ব্যক্তিস্বরূপের ও ইহার কর্ম্ম সকলের যিনি অনির্ব্বচনীয় অধিশ্বর তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নয়ন—ইহাতেই জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করে, ইহাতেই কর্ম্ম-যজ্ঞের পূর্ণ পরিণতি ও পূর্ণ সার্থকতা। অতএব এই সকল জিনিষের ভিতর দিয়াই মানবাত্মা—ভাগবত প্রকৃতির এই যে অন্য মহান ও নিগূঢ় দিক, এই যে অনন্ত শক্তিময় গতিময় রহস্য, ইহার মধ্যে নিজেকে পূর্ণতমভাবে সিদ্ধ করিয়া তোলে এবং সেই সিদ্ধি দ্বারা অমৃতত্ব, ঐকান্তিক সুখ এবং শাশ্বত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এই যে যুগ্ম প্রয়োজন, এক অদ্বিতীয় আত্মার সমতা এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, এই দুইটি যেন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের, ব্রহ্মভূয়ায়, দুইটি স্বতন্ত্র পন্থা—একটি শান্তিময় সন্ন্যাসের পথ, অপরটি দিব্য প্রেম ও দিব্য কর্ম্মের পথ—এইভাবে পৃথকরূপে বর্ণনা করিয়া গীতা এখন পুরুষোত্তমের মধ্যেই ব্যক্তিক ও নির্ব্যক্তিকের সমন্বয় করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইতেছে। কারণ গীতার লক্ষ্য হইতেছে একদেশদর্শিতা ও ভেদাত্মক অত্যুক্তি বর্জ্জন করিয়া জ্ঞান ও অধ্যাত্ম অনুভূতির দুইটি দিককে একত্র মিলিত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভের একক ও পূর্ণতম পন্থায় পরিণত করা।*

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

* মূল ইংরাজী হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্তৃক অনূদিত।

বিশ্বাস

শ্রীরণদাসুন্দর পাল, এম্-এ

নাই বা আমার কাট্‌লো প্রভু
মোহ ঘুমের অন্ধকার,
স্মরণ তোমার মরণ পারে
দেখিয়ে দিবে মুক্ত দ্বার।

স্বামীজি

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, তর্কতীর্থ

১

দেবতা,

কঠিন জীবন-ব্রত হেথায় আবস্ত তব,
হেথায় আবস্ত তব ব্রহ্মচর্য্য অভিনব।
কুলিশ কঠোবতম
স্মবিলে এখনো মম,
অন্ধ বিষয়-বন্ধ হৃদয়-পাথাব
আপনা ভুলিয়া যায় আজি বার বাব॥

২

ধূমাচ্ছন্ন ধরণীব নীবব ক্রন্দনে,
ব্যথিত হইয়া আসি' এ নিঃস্ব ভুবনে
শত বিজলীর বেখা
তুমি দেখাইলে একা,
অঙ্কে আলোক দিয়ে ব্যাকুল পবাণে.
লইলে আপন বুকে পরম যতনে॥

৩

যেই ক্ষুদ্র আববণ মানবেবে চিবদিন,
নিঃস্ব কবিয়া বাখে জগতের কাছে হীন,
তাবা শুভক্ষণ পেয়ে
তব পদে ছুটে গিয়ে,
অনন্ত পবম পদে তাবাও কবিল লীন,
নিবিড় তিমিরে ছিল লুকাইয়া এতদিন॥

৪

ঠাকুবেব ছেলে যত সেখানে আছিল হায়।
সকলে দেখিতে তুমি আপন পবাণ প্রায়,
পবেব সুখেব তবে
জীবন ভুলিতে পাবে,
জাবনের প্রতি অঙ্কে ইহা দেখাইলে তুমি,
হে মোব পবাণ-প্রিয় হে অন্তবযামি॥

৫

অসীম ব্যথাব মাঝে কখনো তোমার,
বন্ধ হয়নি কভু মুক্ত হৃদয়-দ্বার,
সুখ দুঃখে সমজ্ঞানে
সকলে ডাকিয়ে এনে,
দিয়াছ পবাণে স্থান অনন্ত অপার,
হে পুণ্য পরম শান্ত দেবতা আমাব॥

৬

স্বপনে শুনেছ তুমি অনাথ-ক্রন্দন,
জাগরণে কবিযাছ প্রাণ বিতরণ।
অনন্ত ঠাকুব-ছেলে
অনাহারে অবহেলে,
প্রাণ দেয় দেখে তুমি করেছ ক্রন্দন,
হে মোর পরাণ ভোলা অমূল্য রতন॥

পূর্বজন্ম-স্মৃতি

শ্রীসাহাজী

গীতার উক্তি—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। ২।১৬

সুতরাং এক্ষণে যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, বুঝিতে হইবে, সৃষ্টির আদিতেও তিনি ছিলেন এবং অন্তেও তিনি থাকিবেন। প্রত্যেক জীব, এই হেতু, নিত্য এবং শাশ্বত। জন্মে জন্মে তাহার শুধু রূপান্তর হয়, এইমাত্র। সুতরাং তাহার সেই অখণ্ড জীবন এই খণ্ড জীবনগুলিরই সমষ্টি এবং তাহার এই খণ্ডজীবনগুলি আবার সেই এক অখণ্ড জীবনেরই এক একটি অংশ মাত্র।

যাহা হৌক, এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এক্ষণে প্রশ্ন এই, সেই সকল পূর্বজন্ম স্মৃতি জীবের তাহা হইলে মনে থাকে না কেন?

অনেকের বিশ্বাস, সাধনার দ্বারা জীবের পূর্বজন্ম-স্মৃতি জাগরিত হইতে পারে এবং অনেকের তাহা হইয়াও থাকে। অনেক সাধু মহাত্মার পূর্বজন্ম-স্মৃতি জাগরিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৪।৫

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি যে অন্ততঃ তাঁহার নিজের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত জানিতেন, সে কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তবে, এই সত্য তিনি (১) *fundamentally* কিম্বা (২) in facts জানিতেন, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন। কোনও বিষয় তত্ত্বতঃ এবং বস্তুতঃ জানা এক নয়। গীতা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ, ইহাতে মিথ্যা জল্পনা কল্পনার স্থান হওয়া এইজন্যই অসম্ভব। এই হেতু, 'বেদ' ক্রিয়াটির প্রথমোক্ত অর্থই এস্থলে আমাদের নিকটে অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

যাহা হৌক, পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি কোনো কোনো ব্যক্তির মনে উদিত হয়, একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও অধিকাংশ লোকেরই যে তাহা হয় না, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সকল সাধারণ নিয়মেরই যখন ব্যতিক্রম আছে, তখন এ ক্ষেত্রেও উহার অন্যথা হইবার আশা করা অন্যায়। অতএব, লোকের পূর্বজন্ম-স্মৃতি প্রনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই যে পূর্বজন্ম-স্মৃতির বিলোপ, ইহার কারণ কি এবং ইহা কি জীবের মঙ্গলের জন্য?

অনেকের মত এই যে, জীবের কর্মানুযায়ী জন্ম হয়। যাহার যেরূপ কর্ম, তাহার জন্মও তদনুরূপ হইয়া থাকে। পুণ্যকর্মীর সুখময় দিব্য জন্ম এবং মন্দ-কর্মীর দুঃখময় হীন জন্ম লাভ হইয়া থাকে। এমতস্থলে, পূর্বজন্ম-স্মৃতি যদি জাগরিত থাকে, তাহা হইলে পরজন্মে পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল ভোগে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। মনে করুন, পূর্বজন্মে 'ধনী' 'মণি'র সবিশেষ অনিষ্ট করিয়াছিল। তাহারই ফলে পরজন্মে মণি ধনীর পুত্ররূপে ঐ ঋণ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া নিল, নিয়া ধনীকে কাঁদাইয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিল। এইরূপে, ধনীর কৃতকর্মের ফল ভোগ সম্পূর্ণ হইল। এস্থলে ধনীর যদি পূর্বজন্ম-স্মৃতি মনে থাকে, তাহা হইলে সে জন্মিবামাত্র মণিকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে; এবং তাহা হইলে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হয় না, উহার জের থাকিয়াই যায় এবং জেল-আইন-ভঙ্গের জন্য জেল-কয়েদীর শাস্তিবৃদ্ধির ন্যায়

পৌনঃপুনিক দশমিকের মতন উহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতে থাকে।

কিন্তু এ কথার যৌক্তিকতা আদৌ স্বীকার করা যায় না। ধনীর যদি মণির প্রতি অহিতাচরণের কথা মনে থাকে, তাহা হইলে সে যে আগন্তুকের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া তাহার নিজকৃত অনর্থের প্রতিকার জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত হইতে না পারে, তাহাও নয়। ধনী যদি জ্ঞানী হয়, তাহা হইলে তাহার ঐরূপ করাই স্বাভাবিক। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে জ্ঞান-বৃদ্ধ ভীষ্ম এইজন্যই শিখণ্ডীর (পূর্বজন্মের অম্বা) নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আর, সে যদি তাহা না করিয়া মণিকে গলা টিপিয়াই মারিয়া ফেলে (এবং মন্দলোক হইলে তাহার তাহা করা অস্বাভাবিকও নয়), তাহা হইলে উহার শাস্তির হাতও সে আর তখন এড়াইতে পারে না। জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিলে কয়েদীকে কঠিনতর শাস্তি পাইতে হয়। কোনো কোনো কয়েদী যে তাহা করে, তাহা তাহারা জানিয়া শুনিয়াই করিয়া থাকে এবং সেজন্য কঠিনতর শাস্তিও পাইয়া থাকে। মানুষের আইন যদি এই প্রকার হয়, বিশ্বনিয়ন্তার আইন তাহা হইলে উহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হইতে পারে না। সুতরাং, কোন্ কর্মের ফলে তাহার এই দুঃখভোগ, দণ্ডভোগকালে জীবকে তাহা জানিতে না দিবার সঙ্গত কোনও কারণ দেখা যায় না; বরং জানিতে দেওয়াই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কেননা, তাহাতে তাহার চরিত্রদোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা অধিকতর হয়। যদি বলেন, মৃত্যুর পর অর্থাৎ সংসার-জেলখানা হইতে খালাস পাইবার পর, কোন্ পাপে তাহার কী দণ্ড হইল, তখন তাহার বুঝাপড়া হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই, দণ্ডভোগ-কালেই সে যদি তাহার পাপের কথা না বুঝিতে পারে, তাহা হইলে পরে তাহাকে সে কথা বুঝাইয়া দেওয়া আর না-দেওয়া দুই-ই সমান; বরং সে কথা সেই সময়েই তাহার বেশি করিয়া জানা আবশ্যক; কেননা, তাহা হইলে সে ধীরভাবে নত শিরে সমস্ত দণ্ডের ভার বহন করিতে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধানও হইতে পারে। যাহা হৌক, ইহার দ্বারা পূর্বজন্মকৃত মন্দ-কর্মের স্মৃতি কেন লোপ পায়, তাহা না-হয় বুঝা যায়, তাই বলিয়া পূর্বজন্মকৃত সৎকর্মের স্মৃতি কেন লোপ পায়, তাহা কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝা যায় না। এবং সংসারে সৎলোক যে একেবারেই নাই, তাহাও নয়; সমস্ত সংসারকেই ভগবানের জেলখানা ধরিয়া লওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহা তাই বস্তুতঃই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। সুতরাং পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে থাকিলে পরজন্মে পূর্বজন্মকৃত কর্মের শাস্তি ফাঁকি দিয়া এড়ান সহজ হয়, এই বিশ্বাস আদৌ যুক্তি-সহ নয়। ইহাতে মানবের মর্যাদা-বুদ্ধির উপর প্রচণ্ড আঘাত করা হয় এবং তাহাকে ছাগল ভেড়ার সমান মনে করিয়া লওয়া হয়।

স্বকৃত কর্মের যে শাস্তি, তাহা নিজেকে অবশ্য ভোগ করিতে হয়, তাহার হাত এড়ান যায় না। কেননা, তাহা বাহিরের কোনও কারণ হইতে উদ্ভূত কিম্বা বাহিরের কোনও ব্যক্তি কর্তৃক পরিকল্পিত নয়। যাহা আগন্তুক কিম্বা যাহা অন্য কর্তৃক নিজের উপর আরোপিত, তাহা ঝাড়িয়া ফেলা কঠিন নয়। কিন্তু যাহা স্বকৃত, কমঠের কঠিন পৃষ্ঠাবরণীর ন্যায় তাহা অপরিহার্য এবং অনিবার্য, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সেই পৃষ্ঠভার বহন করিতেই হয়। কূর্ম তাহার পৃষ্ঠভার, জানুক আর নাই জানুক, কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং, পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল যখন কদাপি এড়ান যায় না, তখন সেই সকলের স্মৃতি থাকিলেও তাহাতে তাই কোনও ক্ষতি হইবার কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ধনীর ঋণ আদায় জন্য মণিকে যদি তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাও অবশ্য ভোগ করিতে

হয়। সে বড় সহজ কথা নয়। এ যেন এক পয়সার তহুরি আদায় করিবার জন্য দশ ক্রোশ মাটি দৌড়াদৌড়ি। 'ধাবে বামুন সেও দোষ, ধাবায় বামুন সেও দোষ'—ব্যাপারটা তাহা হইলে এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং জীবের পূর্বজন্ম স্মৃতিলোপের কারণ এইরূপ হইতেই পারে না। পাপপুণ্য এবং দণ্ড পুরস্কারের নীতির সাহায্যে ইহার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব।

বৈষ্ণব দার্শনিকেরা এইজন্যই পাপপুণ্য কল্পনার সার্থকতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বালঘ্নী পুতনারও এই জন্যই পরমাগতি লাভ হইয়াছিল। বৈষ্ণব ভক্তগণের এই অভিমত ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। পান-রসিক ব্যক্তিকে মদ্যপানে নিরস্ত করা সহজ নয়। রৌরব নরকের যতই ব্যবস্থা নীতিবিদ্‌রা তাহার জন্য করিয়া রাখুন, নরকের সেই খাত সুপ্রশস্ত করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা খনিত্র হস্তে যমপুরীর দ্বার পর্যন্ত যতই ছুটাছুটি করিতে থাকুন, তথাপি ভবী কিন্তু ভুলিবার নয়। সুরাপান সে করিবেই, নেশা তাহার ছাড়িবার নয়।

যাহা-হৌক, তাহার এইরূপ করিবার কারণ কি? সে কি তবে স্বর্গের লোভ, নরকের ভয় করে না?—করা অসম্ভব নয়। কিন্তু করিলেও ঐগুলি তাহার নিকটে তখন গৌণ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সুরাপান করিতে তাহার ভালো লাগে। মূলে এই ভালো লাগার প্রবৃত্তি থাকে বলিয়াই, স্বর্গ নরক দূরের কথা, যকৃদ্‌বিকারে মরিতে বসিলেও সুরাপান সে ছাড়িতে পারে না। সুরাপানে সে আনন্দ পায়। সেই আনন্দের জন্যই কী দৈহিক ব্যাধি, কী আর্থিক ক্ষতি, কী লোক-গঞ্জনা, কী পারলৌকিক ভয় কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতীর ভালো লাগিয়াছিল। তাঁহার জন্য তিনি তাই কুলধর্মে, সমাজভয়ে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। এবং এইরূপ কর্মের যে ফল, তাহাও তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেজন্য তাঁহার দুঃখ বা ক্ষোভ হয় নাই। এবং সে ক্ষতি তিনি জানিয়া শুনিয়াই (১) অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কেননা, কৃষ্ণ-প্রেম-জনিত আনন্দে তাঁহার সেই ক্ষতি শতগুণে পোষাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং মূলের এই আনন্দের জন্যই জীবের কর্মফল ভোগ তখন আর কর্মফল ভোগ বলিয়া মনে হয় না। কর্মফলের হাত এড়াইবার চেষ্টাও তখন আর তাহার এইজন্যই হয় না। কর্মের পৃষ্ঠাবরণী আপাত দৃষ্টিতে ভারস্বরূপ বলিয়া মনে হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উহা কিন্তু তাহার আত্ম-রক্ষার অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ বলিয়াই প্রতীত হয়। নিজের প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য মণি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, অবশ্য, ঐ কর্মে সে যদি আনন্দ পায়, তবেই, অন্যথা নয়। নতুবা, সামান্য প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য জন্ম-মৃত্যুর শত যোজন পথ হাঁটাহাটি করিবার প্রবৃত্তি তাহার সহজে হইবার কথা নয়। জীবের প্রত্যেক কর্মের উদ্দেশ্য এইরূপ আনন্দলাভ। পাপ-পুণ্য ভোগ উহার গৌণফল মাত্র।

Birds of the same feathers flock together Equal atoms draw equal ones. সমধর্মী সমধর্মীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। পান-রসিক এইহেতু পান রসিকেরই সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়ায়। এইরূপ, জন্মান্তরেও সে নিজের স্বভাবানুরূপ environmentsই খুঁজিয়া লয়, কেননা, অন্যত্র সে সুখ পায় না। সমাজ-গর্হিত কার্য করিবার ফলে শ্রীমতীর যদি নরক বাসই

(১) এই জন্যই লোকে বলে, জ্ঞান পাপীর উদ্ধার নাই, কেননা, উদ্ধার সে চায় না। তবে, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"—(৪।৩৭। গীতা)। জ্ঞান স্বয়ংই মুক্তি-স্বরূপ। প্রকৃত জ্ঞানীর অধোগতি এইজন্যই সম্ভবপর হয় না। "অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ (৪।৩৬। গীতা)

ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রেমিকগণের নরকেই তাঁহার গতি হইয়াছিল। সুতরাং ঐ নরকবাস তাঁহার নিকটে বস্তুতঃ কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাসেরও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতএব, কী ইহলোকে, কী নরলোকে পাপপুণ্যের হিসাব খতান নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। শূকর পূরীষ ভোজন করে। নীতি এবং রুচিবাগীশদের মতে ইহা যদি তাহার কর্ম হয়, তাহা হইলে ইহাতে তাহার দুঃখ নাই। কেন না, সন্দেশ অপেক্ষা বিষ্ঠাতেই তাহার অধিক নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। * * * যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।৬।৪১
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্॥৬।৪৩

এই উক্তি, শুধু যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির নয়, সকল জীবের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

ইহজন্মেই হউক আর পরজন্মেই হউক, যতদিন ভালো লাগে, পান-রসিক পান-দোষ ততদিন পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যখনই উহা আর তাহার ভালো লাগে না, তখনই উহা তাহার ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু বহুদিনের সংস্কার একদিনে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, ছাড়িয়া দেওয়া সহজ নয়। কর্মের খণ্ডন কর্মের দ্বারাই করিতে হয়। অভ্যস্ত পুরাতন কর্মের সংস্কার নবগৃহীত কর্মের পুনঃপুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হয় সত্য, কিন্তু তথাপি সেই অভ্যস্ত পুরাতন কর্মের প্রতি যাহাতে আত্যন্তিকী অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহাও করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং অভ্যস্ত পুরাতন কর্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হওয়া যুক্তি-সঙ্গত নয়। অর্জুনের এই প্রকার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্ মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।
১৮। ৬০। গীতা

অর্জুন পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। সুতরাং বহু জন্মব্যাপী সাধনার ফলে ইহজন্মে তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছিল। কোনও পথের চরম সীমায় গিয়া যখন পৌছান যায়, তখনই মোড় ফিরিয়া অন্যপথের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন হয়। ক্ষত্রিয়বীর্য পারদর্শী অর্জুনেরও যে অবশেষে ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল, তাহা তাই অস্বাভাবিক নয়। তিনি তাই উগ্র পরিত্যাগ পূর্বক অহিংসাধর্মের আশ্রয়গ্রহণে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু বহুজন্মের অভ্যস্ত সংস্কার একদিনে পরিত্যাগ করা যায় না; করিলে তাহার ফলও ভালো হয় না। (২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এস্থলে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অর্জুনের বহুজন্মব্যাপী কৃত কর্মের দৃঢ়-বদ্ধ সংস্কার সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন। কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধ সেই প্রচণ্ড আঘাত। এই আঘাতের ফলে অর্জুনের মনে ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতি বিরাগ দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছিল, এবং এইরূপে তিনি অহিংসার মাহাত্ম্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং যদি বলি, এই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনই পরবর্তিযুগে শ্রীবুদ্ধ এবং অশোকের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, আশা করি, তাহা হইলে তাহা অযৌক্তিক হয় না। কেননা, ক্ষাত্রশক্তির অতিবৃদ্ধি সংহত করিয়া ভারতের সর্বত্র শান্তি-সংস্থাপনের জন্যই চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ ভয়াবহ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সংঘটন করিয়াছিলেন এবং শ্রীবুদ্ধ যে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী অবতার, অবতার-দশকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অপিচ, হিংসার আত্যন্তিকী বৃদ্ধির পরিণামে অহিংসার অভ্যুত্থান অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও নয়।

(২) মদীয় "গীতায় গণবাদ" প্রবন্ধে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণও তাই বলিয়াছেন,—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
১৮।৩৭

সুতরাং জীব যখন যে কর্মে আনন্দ পায়, তখন সেই কর্মই সে করিয়া থাকে ; এবং যখন যে কর্মে সে আনন্দ পায় না, সেই কর্ম তখন আর সে করে না। ইহার মধ্যে পাপপুণ্য বা দণ্ডপুরস্কারের কোনও কথা নাই। তবে, পুরাতন কর্ম ছাড়িয়া সে যখন নূতন কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে তখন বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু মূলে আনন্দের প্রেরণা থাকে বলিয়াই সে সকল অসুবিধা সে গ্রাহ্য করে না।

মধু মালতী স্বামী স্ত্রী, কেহ কাহাকেও চোখের আড়াল করিতে পারে না—এম্‌নি তাহাদের অটুট বাঁধন। কিন্তু হায়! দুইদিন না যাইতে এমন যে মালতী, সেও এমন যে মধু, তাহাকে ফেলিয়া ফাঁকি দিয়া পরলোকে চলিয়া যায়।

এই যে সে স্বামীকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়, সে কি ইহা ভালো লাগে বলিয়া করে ?

ভালো লাগে বলিয়া সে যে ইহা করে তাহা নয়। যাহা ভালো লাগে, জীব যে সব সময়ে তাহা করিতে পারে, এমন কথা আমরা কোথাও বলি নাই ; বরং যাহা ভালো লাগে, তাহা করিতে হইলে তাহাকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, সেই কথারই আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি। সুরাপান করিতে হইলে পান রসিকের, শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে শ্রীরাধার কত কষ্ট সহিতে হয়, সে কথা আমরা বিবৃত করিয়াছি। আমাদের এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, জীব যাহা চায়, যাহা তাহার ভালো লাগে, তাহার জন্য কোনওরূপ মূল্য দিতে, কোনওরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেই, সে কুণ্ঠিত হয় না। কেননা, সেই সকল দুঃখভোগ, সেই সকল ক্ষতি স্বীকার তাহার নিকটে দুঃখভোগ এবং ক্ষতি-স্বীকার বলিয়া আদৌ মনে হয় না। সুতরাং যাহার যাহা ভালো লাগে, তাহার তাহা অপ্রাপ্য থাকিতে পারে না ; দুইদিন অগ্রেই হউক আর পরেই হউক, সহস্র দুঃখ সহিয়াও সে তাহা লাভ করিয়া থাকে।

স্বকীয় অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক কিম্বা স্বেচ্ছা-বরিতই হউক, যে দুঃখ নিজকৃত, অন্য কর্তৃক যাহা নিজের উপর আরোপিত নয়, যতই গুরুভার হউক, জীব তাহা বহন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কিন্তু পাপপুণ্য বোধের সহিত পরকর্তৃত্বের ভাব বিজড়িত থাকে বলিয়াই পাপ-পুণ্য এবং তজ্জনিত সুখদুঃখের বিরুদ্ধে তাহাকে তাদৃশ বিদ্রোহ করিতে দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞানের উৎকর্ষ বশতঃ—তাহার কার্যের কর্তা সে নিজে, তাহাতে অন্যের কর্তৃত্ব নাই, তাহার যাহা কিছু অকৃতকার্যতা সে সকল তাহার নিজেরই অক্ষমতার ফল—একথা সে যখন বুঝিতে পারে, পাপ-পুণ্যাদি-বোধ তাহার তখন তুচ্ছ হইয়া যায়। এইহেতু, সুরুচি যখন ধ্রুবকে তিরস্কৃত করিয়াছিলেন, তিনি তখন কাহারও সহিত বিরোধ করিতে অগ্রসর হন নাই কিম্বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। তাঁহার যাহা কিছু অভিযান, সে সকলই তাঁহার নিজের অক্ষমতার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছিল। যথার্থ জ্ঞানীর অভিযান, এইহেতু, প্রায়শঃ পর-পীড়ন-মূলক না হইয়া আত্মগঠন-মূলক হইতেই অধিক দেখা গিয়া থাকে।

প্রকৃত কথা এই যে, যাহা ভালো লাগে, সকল সময়েই জীব তাহা করিতে চায় ; কিন্তু অনেক সময়ে সে তাহা করিতে পারে না ; তথাপি সেজন্য তাহার কিন্তু দুঃখ করাও সঙ্গত নয় ; কেননা, তাহার সেই করিতে-না-পারাই তাহার করিতে-পারার শক্তির রুদ্ধ উৎসমুখ খুলিয়া দেয় এবং উহারই ফলে যাহা তাহার প্রেয়ঃ, অবশেষে সে তাহা করিতে সমর্থ হয়। বাধাতেই শক্তি স্ফূর্তি পায়, বাধা তাই নিরর্থক নয়।

মধুর ভালবাসা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, দুইদিন অগ্রেই হউক আর পরেই হউক মালতীর সহিত তাহার পুনর্মিলন অবশ্যম্ভাবী; মৃত্যুর সাধ্য নাই, সে তাহাতে বাধা দেয়। পরলোকগতা মালতীর সম্বন্ধেও সেই একই কথা। মৃত্যু বরং এ স্থলে তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসার গভীরতার পরিমাণ বুঝিবার সুযোগ করিয়া দিয়া তাহাদের বন্ধুর কার্যই করিয়া থাকে। সাবিত্রীর সত্যবানের সহিত বিচ্ছেদ এইজন্যই সম্ভবপর হয় নাই। উভয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বলিয়াই তাহাদের পুনর্মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। তবে, এই পুনর্মিলন ইহজন্মে কি পরজন্মে ঘটিয়াছিল, মর্মজ্ঞ পুরাণকার শুধু সেই কথাটিই খুলিয়া বলেন নাই; কিন্তু খুলিয়া না বলিলেও রহস্যবিৎ জ্ঞানী ব্যক্তির তাহা বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। সত্যবানের মৃত্যু হইলে সাবিত্রী নিজেও যে যমপুরীতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই গমন যে স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বকীয় তপস্যালব্ধ, সত্যদর্শী-পুরাণকার সে কথারও কিন্তু অপলাপ করেন নাই। সুতরাং তাহাদের পুনর্মিলন যে পরবর্তি জন্মে ঘটিয়াছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। অনন্ত জীবনব্যাপী অনন্ত মিলনের যাহারা অধিকারী, তাহাদের দুই এক জন্মের বিচ্ছেদে কাতর হওয়া তাই শোভা পায় না। বিশেষতঃ, মিলনানন্দের পূর্ণতা বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়, সে কথাও ভুলিয়া যাওয়া কর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে, মালতীর প্রতি মধুর ভালবাসা যদি যথার্থ না হয়, তাহার মৃত্যুতে সে যদি তাহার অভাব অনুভব না করিয়া কেবলমাত্র স্ত্রীর অভাব অনুভব করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করে এবং এইরূপে তাহার সকল দুঃখের তখন অবসান হইয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রেও—যাহার যাহা ভালো লাগে সে তাহাই করে—এই প্রকার নীতিরই সার্থকতা আমরা দেখিতে পাইতেছি। স্ত্রীর মৃত্যুতে যে 'স্ত্রী' চায়, সে 'স্ত্রীই' পায়; যে 'হারানো মণিকে' চায়, সেই 'হারানো মণিকেই' ফিরিয়া পায় যেমনি পূজা তার তেমনি দক্ষিণা। এক পয়সায় মাটির হাঁড়ি মেলে, কিন্তু পিতলে হাঁড়ি কিনিতে হইলে বেশি দাম দিতে হয়। "হারামণিকে" পাইতে হইলে বেশি দাম না দিলে চলিবে কেন? সাত রাজার ধন এক মাণিক—পরম দুর্লভ সে ধন। সে অল্প তপস্যার জিনিষ নয়। সুতরাং পাপপুণ্যের কথা এখানেও আসে না, এখানেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভালো লাগার কথাই আসিয়া পড়ে—যে যাহা যথার্থ চায়, তাহা পাইবার জন্য তাহার অদেয় কিছু থাকিতে পারে না। যে স্ত্রী চায় সে খুঁজিয়া বেড়ায় "দেশে দেশে চ কলত্রাণি"। নব নব স্ত্রীও, এইহেতু, তাহার জুটিয়া যায়। সুতরাং স্ত্রীর মৃত্যু তাহার নিকটে মর্মান্তিক নয়; তবে যে সে কাঁদে, উহা তাহার স্বার্থহারা মনের ক্ষণিক বিকার মাত্র। পক্ষান্তরে প্রাণ-প্রিয়াকে হারাইয়া মণিহারা ফণীর ন্যায় যে হাহাকার করিয়া বেড়ায়, সে তাহাকেই চায়, অবশেষে তাহাকেই খুঁজিয়া পায়; ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতুই নাই।

সুতরাং, চিত্তের নিম্নতর ভূমিতেই জীবের কর্ম, তাহার পাপপুণ্য এবং সুখ দুঃখাদি বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য, কিন্তু সূক্ষ্ম উচ্চতর ভূমিতে উহা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে একমাত্র তাহার "ভালো লাগা বা না-লাগা" বুদ্ধির দ্বারা। অনেক স্থলে, জীবের পাপপুণ্যাদি বোধের মূলেও তাহার এই "ভালো লাগা বা না লাগা"র প্রবৃত্তিই প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেতু, চতুরশীতি লক্ষ নরকের সৃষ্টি হইবার পরও, মানবের পাপভীতি বা পুণ্য-প্রীতি কিছুমাত্র বাড়ে নাই; এবং শাস্ত্র পুঁথি এত অধিক রচিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা গোটা পৃথিবী-পৃষ্ঠ মুড়িয়া দেওয়া গেলেও সে কিন্তু যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। মাথায় ব্যথা হইলে পায়ে 'পোলটিস' লাগাইয়া তাহা সারিবে আশা করা অন্যায়। গীতাকার যথার্থ ই বলিয়াছেন,—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥৫।১৫

সংসার ভগবানের গারদ বা কয়েদখানা নয়, ইহা তাঁহার সংশোধনাগার। এখানকার ব্যবস্থা তাই আনন্দের মধ্য দিয়া জীবকে পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া। শাস্তির ভাব যদিই বা কিছু থাকে, উহা তাহা হইলে গৌণ মাত্র, আনন্দের প্রলেপ দিয়া উহাকে এখানে সংশোধনে রূপান্তরিত করিয়া লওয়া হয়। ভগবান নিষ্ঠুর শাস্তা নন, তিনি পিতা—পরম প্রেমময়।

জীবের পূর্বজন্মস্মৃতি থাকে না সত্য, না থাকিলেও পূর্বজন্মের সংস্কার কিন্তু তাহার যায় না। খাস বিলাতের সাহেব যখন এখানকার কারবার উঠাইয়া দিয়া বিলাতে যায়, সে তখন এখানকার জিনিস-পত্র বেচিয়া দেনা-পাওনা চুকাইয়া ফ্যালে এবং পুঁজিটি আঁচলে বাঁধিয়া সাগরে পাড়ি জমায়। জিনিস-পত্রের গন্ধমাদন এবং দেনা-পাওনার দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়াই সে এইরূপ করিয়া থাকে। পূর্বজন্ম সংস্কার এই পুঁজি। জীব তাই আসল জিনিস এই পুঁজিটিই সঙ্গে নিয়া যায়, আর সব 'হেঁজি পেঁজি' পিছনে পড়িয়া থাকে। পরজন্মে সেই পুঁজি ভাঙাইয়া সে পুনরায় নূতন কারবার ফাঁদে। সুতরাং জীবের এই যে পূর্বজন্ম-স্মৃতিলোপ, ইহা কতকটা তাহার insolvency নেওয়ার মত ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। insolvency না লইলে পূর্বদেনা পাওনাদারদের সহিত সংশ্রব থাকিয়া যাওয়ায় নূতন কারবার পরিচালনায় নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ফলে, অনেক সময়ে কারবারটিই নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই বিশ্বরাষ্ট্রের স্মৃতিলোপ রূপ এই insolvency বিধান। পূর্বজন্মের কথা মনে থাকিলে সেই জন্মের স্ত্রীপুত্রাদির কথাও মনে থাকে। ফলে, ইহজন্মের স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি নিষ্ঠার অভাব ঘটে। (৩) ইহাতে সকল কর্মই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ায় নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যখনকার যে কার্য তাহাতে অখণ্ড মনোযোগ দিতে না পারিলে বিশৃঙ্খলা হইবারই কথা।

সুতরাং অনর্থকর বা অনাবশ্যক বলিয়াই পূর্বজন্ম স্মৃতি জীবের মনে থাকে না। কিন্তু আবশ্যক হইলে উহা মনে পড়া তাই বিচিত্র নয়। জড়ভরতের আবশ্যক হইয়াছিল, উহা তাই তাঁহার মনেও পড়িয়াছিল। তবে, পুরাতন নথি ঘাঁটিবার প্রয়োজন সচরাচর হয় না।

শরীরের অস্থি এবং যন্ত্রাদির সংস্থান যেমন রঞ্জন-রশ্মির সহায়তায় প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, নিজের আত্মার পূর্বাপর সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে হইলে আমাদেরও সেইরূপ পরাজ্ঞান-রূপ রঞ্জন-রশ্মি সংগ্রহ করিতে হয়। এবং তাহা যখন সংগৃহীত হয়, তখন তাহারই সাহায্যে আমরা আমাদের আত্মার পূর্বাপর সকল কথাই জানিতে পারি, মৃত্যু জনিত বিস্মৃতির অসদ্ভাবহেতু আমাদের সমুদয় খণ্ড জীবন গুলি তখন আমাদের নিকটে এক অখণ্ড জীবন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। মহাভাগ প্রহ্লাদ এবং মানবতার সর্বপ্রধান আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই দিব্য অবস্থালাভ হইয়াছিল, শাস্ত্র পুরাণাদি পাঠে আমরা তাহা জানিতে পারি এবং ইহা আমরা অসম্ভব বলিয়াও মনে করি না। সাধারণ জীব আসক্তির বশীভূত, সুতরাং সমদৃষ্টি শূন্য। ইহজীবনে নিজের এবং নিজের আত্মীয় পরিজনের সুখ দুঃখের বোঝা বহিয়াই সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে. ইহার উপর পূর্বজন্মস্মৃতি যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে তাহার কষ্টের বৃদ্ধি ভিন্ন লাঘব হয় না। পূর্বজন্মস্মৃতির বিলয়, এইহেতু, দয়ানিধানেরই দয়ার বিধান। কিন্তু

(৩) পূর্বজন্মে যাহারা স্বামি-স্ত্রী ছিল, পরবর্তী জন্মেও তাহাদের স্বামি-স্ত্রী হওয়া অসম্ভব নয়, অবশ্য তাহাদের প্রেম যদি একনিষ্ঠ হয়, তবেই, অন্যথা নয়। এবং সেরূপ স্থলে তাহাদের পূর্বজন্মস্মৃতি জাগরিত থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ ঘটনা অত্যন্ত দুর্লভ।

মহাপুরুষেরা আসক্তি পরিশূন্য এবং সমদর্শী, তাঁহাদের আত্মীয়-পর-ভেদ বুদ্ধি থাকে না; কী ইহজন্মের, কী পূর্বজন্মের, কোনও জন্মের কর্ম-বন্ধনই, এই হেতু, তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্বজন্ম স্মৃতি তাঁহারা যে লাভ করেন, তাহা তাঁহারা যোগ্য বলিয়াই লাভ করিয়া থাকেন। First deserve, then desire নিখিলের সর্বত্রই এই একই নিয়ম।

সুতরাং মৃত্যুজনিত যে বিস্মৃতি, তাহা জীবের মঙ্গলেরই জন্য জন্মান্তরের স্মৃতি যখন থাকে না, তখন জন্মান্তরও নাই, এই প্রকার যুক্তি বালকোচিত। অবস্থা বৈগুণ্যে ইহজন্মেরই কোনও কোনও বিষয়ের স্মৃতি আমাদের নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ইহার দ্বারা ঐ ঐ বিষয় ঘটিয়াছিল না, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না। স্মৃতি পাঞ্চভৌতিক মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষ। মস্তিষ্কের বিনাশের সহিত উহারও তাই বিনাশ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মে বন্যার কথা

স্বামী সুন্দরানন্দ

১৯৩২ সনের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পেগু জেলার প্লাবনের সংবাদ রেঙ্গুনের খবরের কাগজে বের হল, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করে বন্যার ব্যাপকতা ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা গেল না। এ সম্বন্ধে তেমন আন্দোলন-আলোচনা হল না বটে, কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেলাম যে, ছিটাংনদীর জল সহসা আট নয় ফিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থান প্লাবিত করেছে, অনেক গ্রামের ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হয়েছে, শত শত গো-মেষাদি ভেসে গিয়েছে, সদ্য-রোপিত বিস্তর শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হয়েছে, স্থানে স্থানে রেল লাইন ও পুল ভেঙ্গে গিয়েছে, লোকজনের দুর্দশার সীমা নেই।

কয়েক বৎসর পূর্বে ভীষণ ভূমিকম্পে পেগু শহর ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়; স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ স্থানীয় বদান্যব্যক্তিদের সাহায্যে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এর সেবাকার্য পরিচালন করেন। বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবার বন্দোবস্ত করবার জন্য আমি ১৫ই আগষ্ট তারিখে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দের সঙ্গে পেগু এসে ডেপুটি কমিশনার মিঃ ওয়াইজ-এর সঙ্গে দেখা করি। এ দেশে সরকারের সম্মতি ভিন্ন সেবাকার্য করা শুধু বিপজ্জনক নয়—একরূপ অসম্ভব বললেই চলে। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য সম্বন্ধে কথাবার্তার পর ডেপুটি কমিশনার সাহেব অতি আগ্রহে তাঁর অফিস গৃহের দেয়ালে টাঙানো পেগু জেলার একটি বৃহৎ মানচিত্রের কাছে যেয়ে বন্যাক্রান্ত স্থানগুলি দেখালেন। আমি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের অদ্ভুত নামগুলি নোট করে নিলাম। আমরা বন্যার ব্যাপকতার বিষয় জেনে আশ্চর্য হলাম, ভাবলাম, এই হতভাগ্য দেশে এত বড় প্লাবন হয়ে গেল তবু দেশের লোকগুলোর কোন সাড়াশব্দ নেই। দেশাত্মবোধ এ দেশে এখনও জাগে নি। এ জন্য এক শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা অপর শ্রেণীর মনে সাড়া জাগায় না। মিঃ ওয়াইজ আমাদিগকে মিচু যেয়ে সরকারী রিলিফ অফিসার মিঃ টিড্-এর সঙ্গে দেখা করে সেবা-কার্যের স্থান নির্বাচন করতে বললেন এবং তাঁর

কাছে একখানা পরিচয়-পত্র দিলেন। কিন্তু ভারতবাসীদের পক্ষে এ সময় এই বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নয় বলে বারংবার মত প্রকাশ করলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদের মনে সাময়িক ভয়ের সঞ্চার হলেও আমরা সেবাকার্য পরিচালন করাই স্থির করে মঙ্গলবার প্রাতের ট্রেনে পেগু হতে রওনা হয়ে ১৬ মাইল দূরবর্তী ওয়া নামক স্থানে নেবে সেখান হতে একটি ক্ষুদ্র লঞ্চে মিচু অভিমুখে যাত্রা করলাম। ওয়া হতে মিচু ১৬ মাইল। ক্ষুদ্রকায় একটি স্রোতস্বিনী দিয়ে জলযানটি চলল, দু-পাশে বন্যা-বিধ্বংসিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এবং স্থানে স্থানে দুর্গত অধিবাসীদের বিক্ষিপ্ত পর্ণ-কুটিরের মাঝখানে সোণালী রংএর ছোট বড় সুদৃশ্য প্যাগোডা দাঁড়িয়ে রয়েছে। নদীর ধারে কয়েকটি চালের কল দেখলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা মিচু বন্দরে এসে জনৈক ধনবান চেট্টির আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

মিচু একটি ক্ষুদ্র বন্দর। এর পশ্চিমে একটি বড় নদী, উত্তরে একটি খাল এবং অদূরে গগনচুম্বী পর্বতশ্রেণী। এখানে জল-সেচন বিভাগের (Irrigation Department) একটি বাঁধ আছে। বন্যার জল নেবে গেলেও তার চিহ্ন এই বন্দরটিতে এখনও বিদ্যমান। চুলিয়া ও বর্মাদের ছোট ছোট কয়েকটি দোকান, কয়েক ঘর চেট্টি মহাজন, পুলিশ ষ্টেসন এবং শতাধিক বর্মা অধিবাসী এ বন্দরে আছে। দেখলাম, এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকজন বালক-বালিকা একসঙ্গে পড়াশুনা করছে। এ দেশে প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামে এক বা একাধিক ফুঙ্গিচঙের (বৌদ্ধমঠ বা বিহার) সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এ জন্য ব্রহ্মদেশে লেখাপড়াজানা লোকের সংখ্যা ভারতের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু এখানকার শিক্ষার বাহন বর্মাভাষা একেবারেই সম্পদপূর্ণ নয় বলে এ ভাষায় শিক্ষাদানের ফলে নিরক্ষরতা দূর হলেও বর্তমান জগতের আবহাওয়ার সঙ্গে আদৌ পরিচয় হয় না। শুনলাম, এখানকার অধিবাসীরা কিছুদিন হয় মাত্র ছাড়িয়ে ভারতবাসীদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়ে উঠেছেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্রহ্মের সর্বত্র ভারতবাসীদের উপর এখন অত্যাচার চলছে। এখানে ভারত-বিদ্বেষ অস্বাভাবিক আকার ধারণ করেছে। চাটগেঁয়ে মুসলমান এবং মাদ্রাজের কুরঙ্গী কৃষকরা এদিকে স্থানে স্থানে বসবাস করে কৃষিকার্যাদি করছে। চেট্টি মহাজনরা অধিকাংশ স্থলেই জমিজমা বন্ধক রেখে স্থানীয় অধিবাসিগণকে উচ্চ সুদে টাকা ধার দেয়; এ জন্য অপরিনামদর্শী অলস বর্মিগণের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রমেই এই শ্রেণীর ভারতবাসীর হাতে এসে পড়ছে। এ ছাড়া *ব্রহ্মের সর্বত্র প্রায় প্রত্যেক জেলা এবং মহকুমায়* বাঙালি আইনজীবিগণের অস্বাভাবিক প্রাধান্য। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় আইনজ্ঞগণ পরাজিত। এজন্যও ভারতবাসীমাত্রই শিক্ষিত বর্মাদের বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছে। এর উপর ব্রহ্ম-দেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করার আন্দোলন এই বিদ্বেষের মাত্রাকে ষোলকলায় পূর্ণ করেছে! অবশ্য ব্রহ্মের সমগ্র অধিবাসী ভারতবিদ্বেষী নয়। বর্মাদের ভারতবিদ্বেষের বিষময় ফলস্বরূপ স্থানে স্থানে ভারতীয়দের গৃহদাহ, সর্বস্ব লুণ্ঠন ও হত্যা প্রভৃতি এ অঞ্চলে এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার! এখানে এখন ভারতবাসীমাত্রই প্রাণভয়ে সর্বদা তটস্থ। আমরা রাত্রে আহারাদি শেষ করে জনৈক চেট্টির একটি কাষ্ঠনির্মিত গৃহের রুদ্ধদ্বার দ্বিতল প্রকোষ্ঠে সে রাত্রির জন্য স্থান পেলাম। গৃহটি পুলিশ ষ্টেসনের গা ঘেঁষা হলেও বাইরের দরজায় দু-জন রাইফেলধারী শিখ সারারাত ভীষণ হৈ চৈ করে পাহারা দিল।

পরদিন প্রাতে এখানকার ডাকবাঙলার রক্ষক ও জনৈক পাঞ্জাবী অভারসিয়ারের নিকট জানলাম, সরকারী রিলিফের ভারপ্রাপ্ত মিঃ টিড সাহেব সম্প্রতি এখান হতে ১২ মাইল দূরবর্তী তোয়েঙ্গা

নামক একটি গ্রামে আছেন, মাঝে মাঝে তিনি এখানে আসেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অভিপ্রায়ে বুধবার প্রাতে চাটগেঁয়ে মুসলমান মাঝির একটি সাম্পানে রওনা হয়ে বেলা ১২টায় তোয়েঙ্গা গ্রামে যেয়ে জানলাম যে, তিনি গাডক শহরে চলে গেছেন। তোয়েঙ্গা হতে মাডক ৩২ মাইল। এ জলপথটি স্থানে স্থানে এত সংকীর্ণ যে সাম্পান যোগে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়; এ দেশী 'হ্লে' (লম্বা রকমের একগেছে ক্ষুদ্র নৌকা) যোগে সেখানে যেতে একদিন লাগে। এই বর্ষাকালে এত দীর্ঘ সময় ভয়ানক বিপদসংকুল স্থান দিয়ে মাত্র এক-হাত প্রসারিত খোলা নৌকায় একভাবে বসে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় মনে করে মিচু বন্দরে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলাম।

তোয়েঙ্গা গ্রামটি বেশ বড়, প্রায় পাঁচ-শ ঘর লোকের বাস। অধিকাংশ লোকই দারিদ্রের গভীর পঙ্কে ডুবে আছে। একটি প্রকাণ্ড নদীর দু-ধারে গ্রামবাসীদের বসতি। বন্যার ধ্বংসলীলা সমস্ত রাস্তায় দেখেছি, এ পল্লীতেও তার চিহ্ন এখনও বর্তমান। খোঁজ করে জানলাম, গ্রামের 'লুজি' (প্রধান ব্যক্তি বা মোড়ল) উপস্থিত নেই। পল্লীটির ভিতরে যেয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দোভাষী মাঝির সাহায্যে আলাপ করে জানলাম, এখানে ২৯শে জুলাই নদীর জল অকস্মাৎ বাড়তে থাকে এবং দু তিন দিনের মধ্যে ৫।৬ হাত জল বেড়ে অধিকাংশ লোকের ঘরে প্রবেশ করে। জল ৩।৪ দিন ছিল। গ্রামটির অনেক ঘর পড়ে গিয়েছে এবং প্রায় দু-শতাধিক গো-মেষাদি ভেসে গিয়েছে। নিকটবর্তী একটি গ্রামে কয়েকজন লোকও প্রাণ হারায়েছে। এ দেশের ঘরগুলি সবই কাঠের তৈরী, সকলেই ঘরে মাচানের উপর বাস করে। দেখলাম, অধিকাংশ লোকের কাপড়-চোপড় পরিষ্কৃত হলেও গৃহের আসবাবপত্রগুলি নোংরা এবং এলোমেলোভাবে রক্ষিত। ঘরের চারদিকও অপরিচ্ছন্ন। আমরা যখন পল্লীটির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন পল্লীবাসীরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে আমাদের মত অদ্ভুত বেশধারী জীবকে দেখছিল। জানলাম, এখানে তিন-শ দুরবস্থ পরিবারকে সাহায্য করা দরকার। সরকারী রিলিফ অফিসার ঘরপ্রতি ২।৩ বিশে (এক বিশায় ১৮ সের) চাল এ পর্যন্ত তিনবার দিয়ে সাহায্য বন্ধ করেছেন। খাদ্যাভাবে গ্রামের লোক এখন মরতে বসেছে। আমরা অপরাহ্ণ তিনটায় এ গ্রাম হতে রওনা হলাম। সমগ্র রাস্তায় শস্য ক্ষেতের চিহ্নমাত্র দেখলাম না। চারদিকে দিগন্তপ্রসারিত শূন্য মাঠ ধু ধু করছে। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের ভগ্ন পর্ণ-কুটির তাদের দৈন্য-দুর্দশার মর্মন্তুদ বার্তা ঘোষণা করছে। সন্ধ্যায় মিচু পৌছেই জানতে পারলাম যে, মিঃ টিড সম্প্রতি ন্যাংলাবিন শহরে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে রিলিফ আরম্ভ করা সম্ভব নয় দেখে সেই রাত্রেই ৮টার সময় অপর একটি সাম্পানযোগে পুনরায় যাত্রা করলাম।

ব্রহ্মদেশের পল্লী অঞ্চলে দিনের বেলাই ইদানীং ভারতীয়দের পক্ষে চলাফেরা করা ভীষণ বিপদ-সংকুল, রাত্রে স্থানান্তরে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নয়। সাম্পানের চাটগেঁয়ে মুসলমান মাঝিদ্বয় রাত্রে রওনা হতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিল না, কেবল অর্থের লোভেই তারা ভয়ে ভয়ে সাম্পান বেয়ে চলল। সামান্য কিছুদূর যেয়েই একটা স্থান দেখিয়ে একজন মাঝি শুষ্ককণ্ঠে বললে—'কয়েক-দিনমাত্র হয় এখানে একজন সাম্পানওয়ালাকে বর্মা-দস্যুরা দা দিয়ে খুন করে তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছে।' মাঝির কথা শুনে আমাদের মনে কতকটা ভয়ের সঞ্চার হলেও আমরা মাঝিদ্বয়কে নির্ভীকভাবে চলতে উৎসাহ দিতে লাগলাম! মাঝিদের মন বিষয়ান্তরে রাখবার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে এ দেশের নানা রকম কথাবার্তা বলতে বলতে

রাত ১১টায় ওথা পৌছে ১॥টাব ট্রেনে পেগু রওনা হলাম, এবং রাত ৪টায় পেগু যেয়ে ষ্টেসনেই সময় কাটায়ে প্রাতে ৬টাব ট্রেনে ন্যাংলাবিন যাত্রা কবলাম।

বন্যায় এই লাইনের তিনটি পুল এবং মাঝে মাঝে রেলেব সড়ক ভেঙ্গে গিয়েছে, কোন বকমে এ সব মেবামত করে অতি সন্তর্পণে মন্থর গতিতে (dead slow) গাড়ী চালান হচ্ছে। দেখলাম, রেল-লাইনেব বাঁ পাশেব দিঙ্মণ্ডলবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র এবং স্থানে স্থানে গ্রামগুলি বন্যায় বিনষ্ট হয়েছে। লোকেব দারুণ দুববস্থাব কথা আলোচনা কবতে করতে বেলা ১২টায় ন্যাংলাবিন পৌছে মিঃ টিড-এর সঙ্গে দেখা করে জানতে পাবলাম যে, তিনি কয়েকদিন হয় সবকাবী কাজে ইস্তাফা দিয়েছেন, সুতরাং বিলিফ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে পাববেন না। যে জন্য আমাদের এত ঘোবাঘুবি তা সবই বৃথা হল। ঐ দিনই বেলা ২টার সময় ন্যাংলাবিনের আধাসবকাবী বন্যাবিলিফ কমিটিব এক সভাব অধিবেশন হবে জেনে আমবা সেখানে উপস্থিত হলাম। কমিটিব অধিকাংশ সভ্যই বর্মা। আমাদেব অভিপ্রায় বর্ণনা কবে আমবা কমিটিব নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবলাম কিন্তু আবেদন বৃথা হল। সভায সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হল যে, সর্বসাধাবণেব নিকট হতে বিলিফেব জন্য যে অর্থাদি সংগৃহীত হবে, তা সবই পেগুব ডেপুটি কমিশনাব সাহেবের নিকট পাঠান হবে, তিনি যা হয কববেন। অর্থ সংগ্রহ করাব চেয়ে সরকাবী সম্মতিলাভই এখন আমাদের প্রথম দবকাব। এই উদ্দেশ্যেই আমরা এত হাঁটাহাটি কবছি। পবদিন বেলা ১০টার ট্রেনে রওনা হয়ে বেলা ৩টায় পেগু পৌছে ডেপুটি কমিশনাব মিঃ ওয়াইল্ডকে আমাদেব অভিযান সম্বন্ধে সব বললাম। তিনি বললেন—'মিঃ কেলি নামক জনৈক নবাগত আই-সি-এস্ অফিসার রিলিফের ভার লয়ে শীঘ্রই আসছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে আমি কিছু বলতে পাবব না।' আমবা লোকজনের দুর্দশার কথা বলে একটু চেপে ধরায় তিনি মিঃ টিডকে ফোনে ডেকে তাঁব সঙ্গে পরামর্শ কবে সোঙ্গে হতে সাঁজে পর্যন্ত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি গ্রাম আমাদেব রিলিফেব জন্য নির্দেশ কবে দিলেন। এতদিনে আমাদেব ঘোবাঘুরি সার্থক হল। ডেপুটি কমিশনাবেব নিকট হতে পাবিচয়-পত্র নিয়ে পবদিন বেলা ১টায় পুন ন্যাংলাবিনে পৌছে সেখানকাব সবডিভিসন্যাল অফিসার মিঃ উ বা গিন্-এব সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব বললাম। তিনি ঐ দিনই অপবাহ্নে স্থানীয় বিলিফ-কমিটিব সভা ডেকে নগদ ২৫৲ ও ২৫ বস্তা চাল আমাদেব রিলিফেব জন্য মঞ্জুর কবলেন এবং ঐ ৯টি গ্রামেব 'লুজি'ব নামে পবিচয-পত্রসহ জনৈক দোভাষী বর্মা পথ-প্রদর্শককে সঙ্গে দিলেন। সন্ধ্যাব পব আমবা ন্যাংলাবিন শহব পবিদর্শনে বেব হলাম। শহবটি নাতি বৃহৎ, বাস্তা ঘাট বেশ পবিষ্কার পবিচ্ছন্ন, মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্ত বেশ ভাল। বিদ্যুৎ, জলেব কল, সিনেমা, মটব বাস্, স্কুল, সুসজ্জিত দোকান পসাব প্রভৃতি বর্তমান সভ্যতাব সব উপাদানই শহবটিতে বিদ্যমান। জলবায়ু স্বাস্থ্যকব। অধিবাসী অধিকাংশই বর্মা।

পবদিন বেলা ১২টাব ট্রেনে আমবা রিলিফ-কেন্দ্রে বওনা হলাম। এই ট্রেনেই আমাদেব নির্দেশমত বেঙ্গুন হতে প্রেবিত দুজন কর্মীকে পেলাম। বেলা ২টাব সময় আমবা মাডক ষ্টেসনে উপস্থিত হলাম। বেল-লাইন এখানেই শেষ হয়েছে। এখানকাব বাঙালি ষ্টেসন মাষ্টাব আমাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য কবলেন। মাডকের 'লুজি'কে ডেকে সঙ্গীয় দোভাষীব সাহায্যে আবশ্যকীয় কথাবার্তা বলে আমরা চাটগেঁয়ে মুসলমান মাঝির সাম্পানযোগে রিলিফকেন্দ্র

পরিদর্শনে রওনা হলাম। যে ছিটাং নদীর জলোচ্ছ্বাস এ অঞ্চলকে প্লাবিত করেছে তারই বিস্তীর্ণ খরস্রোত দিয়ে সাম্পানটি তীববেগে ছুটল। নদীর অপর তীর ঘেঁসে টাঙ্গু জেলাব গগনচুম্বী পর্বতরাজি মণিপুব ও লুসাই হয়ে হিমালয়েব সঙ্গে মিশেছে। পর্বত-গাত্রে এবং পাদদেশে নদীব ধারে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটিরগুলিব দৃশ্য মনোবম। স্থানে স্থানে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত ছোট বড় ধপ্‌ধপে সাদা প্যাগোডা এই দৃশ্যকে আবও উপভোগ্য কবে রেখেছে। এই পর্বতে লুকিয়ে থেকে সুবিখ্যাত বর্মা-বিদ্রোহী সিয়াসেন তাঁব দলবল নিয়ে কয়েক বৎসব ব্রিটিশ-সিংহেব আতঙ্ক উৎপাদন কবে-ছিলেন। নদীব অপর তীবে সমতল জমিতে বন্যা-বিধ্বস্ত শস্যক্ষেত্র এবং স্থানে স্থানে দবিদ্র গ্রামবাসীদেব ভগ্ন পর্ণ-কুটিরবাজি বর্তমান। সূর্যাস্তেব প্রাক্কালে দুটি বিবাটকায স্রোতস্বিনীব মোহনায় অবস্থিত সাঁজে নামক একটি পল্লীতে এসে উপস্থিত হলাম। এখানকাব ঘবগুলিব ভিতব এখনও জল দাঁডাযে আছে। দাবিদ্র যেন নগ্নমূর্ত হয়ে এখানকাব লোকগুলোকে গ্রাস কবতে উদ্যত। মাছধবা এবং চাষবাসে কুলিব কাজ কবা এদের ব্যবসা। একটি চীনা ও একটি বর্মা মুদি দোকান আছে। শুনলাম, কয়েকদিন হয় একদল বর্মা-দস্যু এসে এখানকার কয়েকজন ভারতীয়কে হত্যা কবে তাদেব সর্বস্ব লুণ্ঠন কবেছে। এ জন্য সম্প্রতি একজন বন্দুকধারী বর্মা পুলিশ এখানে পাহাবা দিচ্ছে। এখানে আমাদের থাকা একেবারেই নিরাপদ নয় বলে এখানকার ভারতীয়গণ সমস্বরে মত প্রকাশ করলেন। সাম্পানটি বর্মাব দোকানেব সামনে যাওয়া মাত্র এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখে শরীর শিউরে উঠল! দেখলাম, একটি ৫।৬ বছরের বর্মা ছেলে একজন বয়স্ক বর্মার কোলে থেকে একটা কাঁচা গলদা চিংড়ি খাচ্ছে! মাছটা তখনও নড়ছিল। অনুসন্ধান করে জানলাম, ছেলেটিকে আদর করে কাঁচা চিংড়িটি খেতে দেওয়া হয়েছে। ভাবলাম, অভ্যাসে মানুষ কী না কবতে পারে!

এখান হতে আমাদেব গন্তব্য স্থান জাউণ্টা গ্রামেব 'লুজি', মং ডো-নো-ব বাড়ী ৪ মাইল দূরে। 'হ্লে'ব সাহায্য ছাড়া সেথানে যাওয়াব উপায় নেই। সঙ্গীব পথ-প্রদর্শক বর্মাকে 'লুজি'ব সন্ধানে পাঠায়ে আমবা স্থানীয় লোকেব পরামর্শে এ গ্রামের একপ্রান্তে অবস্থিত এক ভাসমান "ফুঙ্গিচঙ্গে" এসে উপস্থিত হলাম। বাঁশেব মই বেয়ে আমরা "ফুঙ্গিচঙ্গে"ব মাচানে উঠলাম। মঠেব অধ্যক্ষ ভিক্ষু গুণাউণ্টা আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা কবলেন। মঠেব চাবদিক জলময়। ঠিক নবৎখানাব মত একটি ঘর, আচ্ছাদন কতকটা কবোগেটেড্ টিনেব—কতকটা নারকেল পাতাব। পাতার দিকটা ভগ্নপ্রায়। কাঠেব মাচানেব উপর ভিক্ষুর অবস্থানেব জন্য একটি বাঁশেব মাচান। এর এক-পাশে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রকোষ্ঠে একটি শ্বেত পাথবেব সুন্দরদর্শন বুদ্ধমূর্তি। এখানে ৪জন বালক ভিক্ষুব নিকট থেকে পড়াশুনা কবে। বালকেবা দুবেলা এই মূর্তিকে পত্রপুষ্পে সাজায়ে বাতি, ধূপধুনা এবং সামান্য ভোগ দেয়। আমরা নতজানু হয়ে ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম করে মাচানেব উপর বসলাম। ভিক্ষুব বয়স প্রায় ৬০ বছব হবে। ইনি কযেকবার ভাবতে গিয়ে বুদ্ধগয়া, কাশী, সাবনাথ, নালন্দা প্রভৃতি দর্শন করে এসেছেন, এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি জানেন। ভিক্ষু আমাদেব উদ্দেশ্য শুনে নানাভাবে অভয় দিয়ে এই মঠে থেকেই রিলিফের কাজ করতে উৎসাহ দিতে লাগলেন এবং বললেন যে, এ অঞ্চলের সব লোকই তাঁব বিশেষ অনুগত, সুতরাং এখানে ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষুর উপর স্থানীয়

লোকের অসাধারণ শ্রদ্ধার বিবরণ শুনে আমরা এখান হতেই রিলিফের কাজ করা ঠিক করলাম।

রাত্রে সাম্পানে আমাদের রন্ধনক্রিয়া চলছে, এমন সময় ভিক্ষুর নির্দেশে এ গ্রামের 'চেঙ্গম' (Headman) উ পু অং সদলবলে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিতে আসল। আমাদের দস্যু-ভীতি চলে গেল। বাঁশের মাচানের একপাশে আমাদের দুজনের শোবার স্থান করা হল। ভিক্ষু আর এক-পাশে শুলেন। আমাদের সঙ্গীরা কোন রকমে সাম্পানে স্থান করে নিল। আহারান্তে বিছানায় বসে ভিক্ষুর সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা চলল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, বন্যার স্রোতে পর্বত হতে একটা কিং-কোবরা ভেসে এসে আমাদের মস্তকোপরি চালে আশ্রয় নিয়ে এখনও অবস্থান করছে! সাক্ষাৎ যমদূত কিং কোবরা মাথার উপর আছে শুনে আমরা চমকে উঠলাম এবং এখানে রাত্রিবাস করতে মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ক্ষুদ্র সাম্পানেও একেবারেই স্থানাভাব। উপায়ান্তর চিন্তা করতে করতে সারাদিনের ক্লান্তির ফলে আমরা উভয়েই আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘুমায়ে পড়লাম।

পরদিন প্রাতে স্থানীয় লোকেরা দলে দলে মাছ মাংসের নানারকম খাবার নিয়ে আসতে লাগল। বুঝলাম, আতিথ্য-সৎকার এর অন্যতম উদ্দেশ্য। শুনলাম, ছেলেরা রোজ গ্রামে যেয়ে ভিক্ষুর জন্য খাবার আনে। সব খাবার হতে সামান্য কিছু কিছু একটা বাটিতে সংগ্রহ করে এক গ্লাস জলসহ বুদ্ধদেবের মূর্তির নিকট দেওয়া হল। এ রকমভাবে রোজ ভোগ হয় কিন্তু এই প্রসাদ গ্রহণ না করে ফেলে দেওয়া হয়। সিংহলেও এই নিয়ম দেখেছি। গৃহস্থগণ দলে দলে এসে নতজানু হয়ে ভিক্ষুকে তিনবার নমস্কার করল। মহাত্মা গান্ধীর নাম ব্রহ্মদেশের এ অঞ্চলেও সর্বত্র পরিচিত। কৃষ্ণ, রাম, মহম্মদ বা খৃষ্টের নাম এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ জানে না কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নাম এখানে সকলেই জানে। মহাত্মা গান্ধীর কথা বলতে এরা প্রকৃতই গর্ব অনুভব করে। "আমরা গান্ধীর লোক—এ দেশবাসীর দুঃখের সময় সাহায্য করতে এসেছি"— বলে ভিক্ষু পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করে আমাদিগকে এই সরল গ্রামবাসীদের নিকট পরিচয় করে দিতে লাগলেন। আমরা তাঁর উৎসাহের আতিশয্যে এই পরিচয় প্রদানে আপত্তি না করে বরং আনন্দই অনুভব করলাম। আমাদের রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালও "গান্ধী-হাসপাতাল" নামে এ দেশের জনসাধারণের নিকট পরিচিত। ভিক্ষু আমাদিগকে আহার্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু আমরা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলাম। আমার সন্ন্যাসী বন্ধুটি খাঁটি নিরামিষভোজী। সংখ্যাতীত রকমের মাছ মাংসের খাদ্যগুলি গ্রহণ করতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি না থাকলেও নাপ্পীর (মাছ পচানো রস) দুর্গন্ধের জন্য এ সব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভিক্ষুর বিরাট আয়োজন ব্যর্থ হল দেখে তিনি মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ হলেন কিন্তু অন্য উপায় ছিল না। আমরা গরম-জলে বর্মা চা দিয়ে এক এক কাপ গ্রহণ করে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলাম। এ দেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বেলা ১২টার পর জল ভিন্ন কিছু খান না, এর পূর্বে যতবার ইচ্ছা খেতে পারেন। সিংহলেও এই নিয়ম দেখেছি। এ দেশে খাওয়ার পর গরম জলে কিছু চা ফেলে সেবন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাজা মাছ খাওয়া নিয়ম। এ দিকের অপর একটি ফুঙ্গিচঙ্গে একদিন নাপ্পী শুঁটভাজা মাছ ও গরম জলে চা মিশিয়ে খেয়েছিলাম।

বেলা ৯টার সময় আমাদের পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে জাউণ্টা গ্রামের 'লুজি' বন্দুক নিয়ে সদলবলে আসলেন। তাঁর সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে কথা-বার্তা বলে আমরা 'হ্লে'যোগে পেগু জেলাধীন

সাঁজে, খানিউয়া, চাঁউজু, চাংওয়া, ছাউন্‌জু, সুন্দুন, জাউঙ্‌টা এবং টাঙ্গু জেলাধীন সাঁজে, সুঙ্গোয়ে ও টাজো নামক ১০টি পল্লী পরিদর্শন করে সন্ধ্যায় ফুঙ্গিচঙ্গে ফিবে এলাম। পবদিন এই ১০টি গ্রামের ১২৬টি দুস্থ পবিবাবভুক্ত ৫০১ জনকে এক সপ্তাহেব জন্য ৩৪৴ মণ চাল দেওয়া হল।

২৪শে আগষ্ট প্রাতঃকালে আমবা দুজন সাম্পানযোগে পুন মাডক যাত্রা কবলাম। বাস্তায় দুটি গ্রামে চাল বিতবণ করা হল। সাম্পানটিব মাঝি মাত্র একজন। অনুকূল হাওয়াব অভাবে নদীর ভীষণ স্রোতেব প্রতিকূলে যেতে তাকে অত্যন্ত বেগ পেতে হল। কিছুদুব যেয়ে নৌকাটিব হাল ভেঙ্গে গেল। ওদিকে দিঙ্‌মণ্ডল তিমিবাবৃত কবে সূর্যদেব অস্তগামী হলেন। উপায় না দেখে আমবা গলদঘর্ম হয়ে মাঝিকে সাহায্য করতে লাগলাম। রাত্রি ৯টাব সময় সাম্পানটি অতি কষ্টে মাডক এসে উপস্থিত হল। কয়েকদিন হয় এখানে কয়েকজন ভাবতবাসীকে বর্মা দস্যুবা হত্যা কবেছে, ভয়ে কোন ভারতবাসী সন্ধ্যার পর গৃহত্যাগ কবে না। আমবা কয়েকজন বর্মাকে তরবাবীর মত লম্বা দা নিয়ে নদীর ধার দিয়ে যেতে দেখলাম। প্রাণ হাতে করে আমরা বেল ষ্টেসনে যেয়ে এখানকার বাঙালি ষ্টেসন মাষ্টারেব সৌজন্যে প্রথম শ্রেণীব বিশ্রামাগাবে রাত্রি যাপন কবলাম।

পরদিন রিলিফ-ক্যাম্পেব জন্য স্থানীয় 'লুজি' ও ষ্টেসন মাষ্টারের সাহায্যে একটি ঘর ভাড়া করে দুজন কর্মীকে সেখানে রেখে আমরা স্যাংলাবিন বওনা হলাম। স্যাংলাবিনের সবডিভিসন্যাল অফিসারের সঙ্গে দেখা করে বিলিফের সাপ্তাহিক বিপোর্ট দিলাম। রিলিফ সম্বন্ধে সবিস্তর জিজ্ঞাসা কবে তিনি সব খবর জেনে নিলেন। দু-তিন মাস বিলিফ চালাতে হবে শুনে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'এখানকাব রিলিফ ফণ্ডেব টাকা শুধু কৃষকদের জমির বীজ বাবদ খরচ কবতে ডেপুটি কমিশনাব সাহেব পবামর্শ দিয়েছেন, দৈনন্দিন খোবাকী বাবদ কোন সাহায্য এ ফণ্ড হতে দেওয়া হবে না।' আমবা বললাম, 'লোকের ঘরে খাবার নেই, খেতে না পেলে লোকে কি করে বাঁচবে? এই গবীব লোকগুলোকে প্রথমত খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে বাখতে না পাবলে চাষাবাদ কি করে সম্ভব হবে?' কিন্তু সব বৃথা হল। বুঝলাম, আমাদের কথায় সুচিন্তিত সরকাবী নীতিব পরিবর্তন হবে না! অবস্থাদৃষ্টে আমবা সরকাবী সাহায্য ছাড়াই বিলিফেব কাজ পবিচালন করা ঠিক কবলাম। এব মধ্যে একটি জরুরি তাবের খবব পেয়ে আমি বেঙ্গুন বওনা হলাম। আমার সহযোগী স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ দুজন কর্মী নিয়ে বিলিফেব কাজ চালাতে মাডক চলে গেলেন।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

এইরূপে সাত্ত্বিকাংশের কার্য্যবর্ণনের পর অনন্তর-প্রাপ্ত ভূতপঞ্চকের রজোগুণের অংশসমূহের এক একটির অসাধারণ কার্য্য বর্ণনা করিতেছেন :—

রজোংঽশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি
জজ্ঞিরে ॥ ২১

অন্বয়—তেষাং পঞ্চভিঃ রজোংঽশৈঃ বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ক্রমাৎ জজ্ঞিরে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের রাজসিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য এবং উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—"তেষাং"—সেই আকাশাদির, "পঞ্চভিঃ রজোংঽশৈঃ"—উপাদানস্বরূপ পাঁচটি রজোগুণের ভাগ দ্বারা, "বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি"—বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য, এবং শিশ্ন নামক পাঁচটি ক্রিয়াজনক কর্ম্মেন্দ্রিয়, "ক্রমাৎ জজ্ঞিরে"—ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। এক এক ভূতের এক এক রজোগুণের ভাগ হইতে এক একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল, ইহাই অর্থ। ২১

ভূতপঞ্চকের রজোগুণসমূহের সাধারণ কার্য্য বর্ণন করিতেছেন—

তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ
স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে
পুনঃ ॥ ২২

অন্বয়—সহিতৈঃ তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণঃ ; সঃ প্রাণঃ বৃত্তিভেদাৎ পঞ্চধা ভবন্তি। তে পুনঃ প্রাণঃ, অপানঃ, সমানঃ চ উদান ব্যানৌ চ ভবতি।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। বৃত্তিভেদে প্রাণ পাঁচ প্রকারের, যথা :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান।

টীকা—"সহিতৈ' তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণঃ"—মিলিত হইলে যাহারা উপাদানকারণ হয়, এইরূপ পাঁচটি রজোগুণভাগ দ্বারা প্রাণ জন্মে। সেই প্রাণের অবান্তর ভেদ বলিতেছেন :—"সঃ বৃত্তিভেদাৎ পঞ্চধা ভবন্তি" সেই প্রাণ, প্রাণন আদি ক্রিয়ার ভেদে পাঁচ প্রকার। সেই ক্রিয়াভেদ দেখাইতেছেন :—"তে পুনঃ"—সেই সকল ভেদ, 'প্রাণ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সূচিত হয়। (অর্থাৎ হৃদয়দেশে অবস্থিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস রূপে বাহিরে ভিতরে, যাইলে ও আসিলে, তাহার নাম প্রাণন ক্রিয়া। পায়ূপস্থদেশে থাকিয়া মলমূত্র নীচে বাহির করিয়া দেওয়ার নাম অপানন ক্রিয়া। নাভিদেশে থাকিয়া ভুক্ত অন্নের রসকে বাহির করিয়া নাড়ী দ্বারা সর্ব্বশরীরে পৌছাইয়া দেওয়ার নাম সমানন ক্রিয়া। কণ্ঠদেশে থাকিয়া ভুক্তপীত অন্নজলকে বিভাগ করিয়া দেওয়া এবং উদ্গার প্রভৃতি করার নাম উদানন ক্রিয়া। আর সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্ব্ব শরীরের সন্ধিসমূহকে ফিরাইবার নাম ব্যানন ক্রিয়া। ঐ ঐ ক্রিয়া যে যে বায়ুর স্বভাব, তাহারা যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে অভিহিত হয়।) ২২

এই প্রকারে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইল।

যে প্রয়োজনে 'আকাশ' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন, সেই প্রয়োজন এখন দেখাইতেছেন :—

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ২৩

অন্বয়—বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ মনসা ধিয়া সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মম্ শরীরম্। তৎ লিঙ্গম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এই তিন পঞ্চক, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ (অঙ্গে), সূক্ষ্ম শরীর (গঠিত) ; তাহাই লিঙ্গ শরীর নামে কথিত হয়।

টীকা—"বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ—" বুদ্ধি—জ্ঞান ; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই হইতেছে বুদ্ধীন্দ্রিয়। কর্ম্ম—ক্রিয়া তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই তিন পঞ্চক এবং "মনসা"—সংশয়রূপ মন, "ধিয়া চ"—ও নিশ্চয়রূপ বুদ্ধি, "সপ্তদশভিঃ"—এই সকলগুলি মিলিয়া সে সতেরটি তত্ত্ব হয়, তাহাদের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মিত হয়। সেই সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম বলিতেছেন—"তৎ লিঙ্গম্ উচ্যতে"—সেই সূক্ষ্ম শরীর উপনিষৎসমূহে 'লিঙ্গ' নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহাই অর্থ। ২৩

এই প্রকারে সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা করিয়া সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানতাবশতঃ প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাই দেখাইতেছেন। ['প্রাজ্ঞ'—ব্যষ্টিসুষুপ্তির অভিমানী যে জীব, 'প্র' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট স্বয়ংপ্রকাশরূপ আনন্দাত্মা হইয়াও অজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞানের বৃত্তিরূপ বোধযুক্ত। সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানের সংস্কাররূপ অস্পষ্ট উপাধিযুক্ত হওয়াতে এবং সেই উপাধি দ্বারা আবৃত হওয়াতে, যাহার অতিপ্রকাশতা তিরোহিত হয়, সেই সুষুপ্তির অভিমানী জীবের নাম 'প্রাজ্ঞ'। 'ঈশ্বর'—সকলজীবের কর্ম্মানুসারে 'ঈশিতা' অর্থাৎ ফলদাতা হন বলিয়া পরমাত্মাই 'ঈশ্বর'।]

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতা ॥ ২৪

অন্বয়—প্রাজ্ঞঃ তত্র অভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে, ঈশঃ হিরণ্যগর্ভতাম্ (প্রপদ্যতে)। তয়োঃ ব্যষ্টি সমষ্টিতা।

অনুবাদ—সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবশতঃ জীবের নাম হয় 'তৈজস', ঈশ্বরের নাম হয় 'হিরণ্যগর্ভ'। (তদুভয়ের প্রভেদ এই), 'তৈজস' ব্যষ্টি, এবং 'হিরণ্যগর্ভ' সমষ্টি, অর্থাৎ এক একটি সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী জীবের নাম হয় 'তৈজস', এবং সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী ঈশ্বরের নাম হয় 'হিরণ্যগর্ভ'।

টীকা—"প্রাজ্ঞঃ"—যে অবিদ্যার মলিন সত্ত্ব-গুণেরই প্রাধান্য, সেই অবিদ্যাই যাহার উপাধি, সেই কারণ শরীরাভিমানী জীব 'প্রাজ্ঞ'। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ 'তেজঃ' শব্দে যে অন্তঃকরণকে বুঝায় তাহার সহিত, তৎসম্বন্ধ পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় লইয়া যে সূক্ষ্ম শরীর হয়, তাহাতে ; "অভিমানেন"—তাহা হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া, 'তৈজসত্বম্ প্রপদ্যতে"—'তৈজস' নাম প্রাপ্ত হয়। যেমন "লাল দৌড়িতেছে" এস্থলে, লোহিতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বাদি কোন জন্তু দৌড়িতেছে, এইরূপ বুঝিতে হয়, সেইরূপ 'তৈজস' বলিতে প্রকাশস্বভাব অন্তঃকরণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় পঞ্চক ও প্রাণপঞ্চক—অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরকে বুঝিতে হয়। অথবা, তেজের অর্থাৎ অন্তঃ-করণের স্বামী 'তৈজস'—স্বপ্নাভিমানী জীব বা চিদাভাস। "ঈশঃ"—যে মায়ায় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য সেই মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট পরমেশ্বর "তত্র"—সেই লিঙ্গশরীরে, 'আমি হইতেছি তাহাই, এইরূপ অভেদাভিমান দ্বারা "হিরণ্যগর্ভতাম্"

—হিরণ্যগর্ভ' বা সূত্রাত্মা এই নাম প্রাপ্ত হন। এইরূপে পূর্ব্ববাক্য হইতে 'প্রপদ্যতে' শব্দটির যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—'ভাল, লিঙ্গশরীরে অভিমান —ইহা ত' তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েরই সমান; তাহা হইলে কি কারণে তদুভয়ের পরস্পর ভেদ? এই হেতু বলিতেছেন—"তয়োঃব্যষ্টিসমষ্টিতা"— সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির যথাক্রমে ব্যষ্টিভাব ও সমষ্টিভাব থাকাতেই, সেইরূপ ভেদ হয়, অর্থাৎ সকল জীবের প্রত্যেকটিই নিজ নিজ লিঙ্গশরীরকে বনের অন্তর্গত এক একটি বৃক্ষের ন্যায়, অনেক বুদ্ধির বিষয় করে এবং ঈশ্বর সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরকে বনের ন্যায় এক বুদ্ধির বিষয় করেন বলিয়াই সেইরূপ ভেদ—ইহাই অর্থ। ২৪

ঈশ্বরের 'সমষ্টি'রূপতার—এবং জীবের 'ব্যষ্টি'-রূপতার কারণ বলিতেছেন :—

সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্য বেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ॥২৫

অন্বয়—ঈশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ সমষ্টিঃ। ততঃ অন্যেতু তদভাবাৎ ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া কথ্যন্তে।

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা সকল জীবের সূক্ষ্মশরীরের সহিত আপনার অভেদ বিদিত আছেন বলিয়া, তাঁহাকে 'সমষ্টি' বলা হয়। আর 'তৈজস' জীবসকলের সেইরূপজ্ঞান নাই বলিয়া তাহাদিগকে 'ব্যষ্টি' বলা হয়।

টীকা—"ঈশঃ"—ঈশ্বর যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনি "সর্ব্বেষাম্"—লিঙ্গ শরীররূপ উপাধি বিশিষ্ট সমস্ত 'তৈজস' জীবের, "স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ"—'স্বাত্মা' অর্থাৎ স্বরূপ, তাহার সহিত আপনার একতার জ্ঞানহেতু—"সমষ্টিঃ (স্যাৎ)"—সমষ্টি হন। "ততঃ অন্যে তু"—কিন্তু সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে জীব, "তদভাবাৎ"—সেই সমস্ত তৈজস জীবের স্বরূপের সহিত আপনার একতার জ্ঞানের অভাবহেতু, "ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া কথ্যন্তে"—'ব্যষ্টি' শব্দে অভিহিত হয়। ২৫

এই বসে সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ নিরূপিত হইল।

এইরূপে লিঙ্গশরীরের, এবং সেই লিঙ্গ শরীর যাঁহাদের উপাধি সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির বর্ণনা করিয়া, স্থূল শরীরাদির অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তিসিদ্ধির নিমিত্ত পঞ্চীকরণ নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন :—

তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য ভোগায়তনজন্মনে।
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং
বিয়দাদিকম্ ॥২৬

অন্বয়—ভগবান্ পুনঃ তদ্ভোগায় ভোগ্যভোগায়-তনজন্মনে বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্ পঞ্চীকরোতি।

অনুবাদ—ভগবান্ সেই জীবগণের ভোগের নিমিত্ত, অন্নপানাদি ভোগ্য, এবং ভোগায়তন দেহের উৎপত্তির জন্য, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই পঞ্চীকরণ করিয়া থাকেন।

টীকা—"ভগবান্"—ঐশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্ন অর্থাৎ (১) সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি, (২) সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, (৩) সম্পূর্ণ যশঃ (৪) সম্পূর্ণ লক্ষ্মী, (৫) সম্পূর্ণ জ্ঞান, ও (৬) সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বর। "পুন"—আবার, "তদ্ভোগায়"—সেই জীবগণের ভোগের অর্থাৎ সুখদুঃখানুভবের নিমিত্তই, "ভোগ্য —ভোগায়তনজন্মনে"—'ভোগ্যের' অন্নপানাদির, 'ভোগায়তনের' জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চারি প্রকার শরীররূপ ভোগস্থানের উৎপত্তির নিমিত্ত, "বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্"—আকাশাদি পাঁচটি ভূতের এক একটিকে, "পঞ্চীকরোতি"— পঞ্চাত্মক করেন। যাহা পঞ্চরূপাত্মক ছিল না তাহাকে পঞ্চরূপাত্মক করার নাম পঞ্চীকরণ। ২৬

সমালোচনা

য়্যান য়্যানালাইসিস্ অব দি গীতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, এম্-এল, বি-সি-এস্ প্রণীত। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

আমরা অনেকেই সংস্কৃতের চর্চ্চা রাখি না বলে ভাষ্যকারদের শাস্ত্র বিশ্লেষণ আমাদের কাছে একরূপ হিবরুই থেকে যায়। আবার বাংলাতে যে সব ভাষ্যানুবাদ হয়েছে, অতিরিক্ত সংস্কৃত-তন্ত্র বলে তা-ও আমাদের কাছে অনেক সময় উদ্ভট হয়ে পড়ে। কাজেকাজেই ইংরাজীর চর্চ্চা আমরা রাখি বলে, আলোচ্য গীতার বিশ্লিষ্ট টীকা খানি গীতা-তত্ত্বের অনুসন্ধানীদের কাছে যে দক্ষ পাইলটের কাজ করবে, এ বিষয়ে হলফ্ করা যায়। তবে পুঁথি খানির প্রাঞ্জল চিন্তাধারার অনুসরণ করতে করতে যে যে পৃষ্ঠায় মন হঠাৎ আহত হয়ে গতি ছন্দে বিশৃঙ্খলা ঘটায় তারই কিছু কিছু নির্দ্দেশ করা গেল।

ধর্ম্ম যদি মানবের পূর্ণতা বা ঈশ্বর লাভের একটা চির আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য যুগে যুগে নানাবিধ কল্পনারই সৃষ্টি হয়, তা হলে ভ্রম-প্রমাদ-যুক্ত মানব কোন কালেই যথার্থ সত্য কী তা জানতে পারবে না। আর না হয় বলতে হয়, কোনও কোনও মানব যথার্থ সত্যের সম্মুখীন হয়ে সেই সত্য লোক-কল্যাণের জন্য প্রচার করে গেছেন। তবে সে সত্য হয়ত অনন্তের একটা দিক মাত্র—কিন্তু মিথ্যা বা কল্পনা নয়। তা ছাড়া সত্যদর্শী মানবগণ সত্যের যে একটা বিবৃতি মাত্রই দিয়ে গেছেন, শুধু তা নয়, তাঁরা যে উপায়ে এবং যে আবেষ্টনীর মধ্যে সত্য লাভ করেছেন, তার একটা সাধন পদ্ধতিও জগতের নিকট পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত করেছেন। সত্য উপলব্ধির বস্তু—যুক্তি সে পথে আমাদের কিছুদূর অগ্রসর করে দেয় মাত্র—যুক্তির দ্বারা আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টির চরম সত্যের কোনও দিকই নির্ণীত হয় নি—সাধনার দ্বারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ভূমিতে সত্যের অপরোক্ষানুভূতিই ঘটে। যুক্তি তখন সেইটাকে অবলম্বন করে জাগতিক সমস্যার সাময়িক সমাধান করতে গিয়ে তাতে ভবিষ্যৎ অপবাদের বীজ নিহিত করে রাখে। যুক্তি অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষানুভূতি নয়, তাই শাস্ত্রে যেখানেই যুক্তির ইন্দ্রিয় তান্ত্রিক আপাত-সত্য অনুমান, সেখানেই ভবিষ্যতে তার খণ্ডনও দেখা যায়। সত্যদর্শী পূর্ণ মানবগণের প্রচারিত মূল সত্য চিরকালই এক—উপনিষদের তত্ত্বকথা কালবিজয়ী, পরন্তু কল্পসূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন ও পুরাণ-কথা চিরপরিবর্ত্তনশীল, কারণ তারা চরমসত্যগুলিকে অবলম্বন করে যুগোপযোগী সমস্যা-গুলির সাময়িক সমাধান মাত্রই করে গেছে। যেখানে অপরোক্ষানুভূতির উপর বিশ্বাস সেখানে বিরোধ নাই—যেখানেই অনুমান-প্রধান সেখানেই বিবাদ-বিসংবাদ। ভারত অতীন্দ্রিয় সত্যে অপর জাতি অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী বলেই তারা অপরজাতি অপেক্ষা অধিক পরমতসহিষ্ণু—পরন্তু ভারতেতর প্রদেশে ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুমান ও কল্পনার প্রাধান্য বলেই, তথাকথিত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তরবারির দ্বারা। একটি ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হলেই যে ধর্ম্ম তার উপকারক হবে এমন কথা বলা যায় না, মনস্তত্ত্বের অনুযায়ী ধর্ম্মের যেমন বৈচিত্র্য ঘটেছে তেমনি তার উপযোগী নির্ব্বাচনও দরকার। (পৃঃ ৪, ৫, ৬, ৭)।

ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগেও দেখা যায় যে একটা বেদ বিরোধী দল ছিল। ক্রমে যখন তারা খুব প্রবল হয়ে পড়ে তখনই ষড়দর্শন বা ঔপনিষদিক দর্শন সৃষ্টি হয়। ঔপনিষদিক দর্শনগুলি বেদের প্রতি অনাস্থা হেতু উৎপত্তি হয় নি, বৈদিকতত্ত্ব সমর্থনের জন্যই হয়েছিল। তবে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল আপ্ত-প্রমাণ বেদকেও তর্কমার্জ্জিত করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পূর্ব্ব এবং উত্তর মীমাংসকেরা বেদকে স্বীকার করে অবৈদিক মত সমূহ তর্কের দ্বারা নিরস্ত করেছেন। কারণ যুক্তি প্রত্যক্ষ-তন্ত্র। বেদ অলৌকিক সত্যের জ্ঞাপক। অলৌকিক সত্য অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য। সেইজন্য সেখানে যুক্তির প্রবেশ নিষেধ। সেইজন্য তাঁরা অবৈদিক অনুমান সম্বন্ধেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেছেন। গীতা শাস্ত্রও বেদের কোনও অংশই পরিত্যাগ করেন নি, মাত্র যাঁরা মোক্ষকামী তাঁদের স্বর্গাদি প্রাপক কর্ম্ম হতে নিরস্ত করেছেন। দেহ ও মনের গঠনানুযায়ী মানুষের আদর্শ চারটি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বেদ সর্ব্ববিধ মানবেরই উপদেষ্টা বলে সর্ব্ববিধ তত্ত্বই বেদের মধ্যে নিহিত। পরন্তু গীতা মাত্র মোক্ষ ধর্ম্মেরই উপদেশক, সেই জন্য মুমুক্ষুর নিকট মাত্র বেদের অপরাপর ভাগ নিরর্থক। গীতাতে এই ভাবেই বিচার করা হয়েছে। (পৃঃ ৩৯, ১২)।

বেদের নাম ত্রয়ী, কারণ চতুর্ব্বিধ বেদ-সংহিতা তিন রূপ মন্ত্রে বিভক্ত—ঋক্ (স্তোত্র), যজুঃ (আহুতি) এবং সাম (গীত)। ঋক্, যজুঃ, সাম বেদ আগে হয় এবং অথর্ব্ববেদ পরে হয় বলে বেদের প্রথম নাম ত্রয়ী নয়। ত্রিরূপ মন্ত্রে বিভক্ত চতুর্ব্বেদ সংহিতা ব্যাস সংকলন করেন মাত্র। সংহিতা ও সংকলন একার্থক। যে বেদ সংহিতায় যে মন্ত্রের আধিক্য, সেই মন্ত্রের অনুযায়ী সেই সংহিতার নাম হয়েচে। কেবল আথর্ব্বণ ঋষিরা প্রধান বলে অথর্ব্ববেদ এই নামে পরিচিত। বৈদিক যজ্ঞের ঋত্বিকদের মধ্যে ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ এবং ইনি অথর্ব্ববেদী হবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। অতএব অথর্ব্ববেদ নিকৃষ্ট নয়। (পৃঃ ২০)।

বেদান্ত দর্শনে—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত এই ত্রিবিধ মত ছাড়া আর একটি মত আছে, উহা নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত। এই মতটি শংকরের অদ্বৈত ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতের মাঝামাঝি। ইঁহারা জীব ও জগৎ ব্রহ্মের উপর বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি শংকরের এই মায়াবাদ, এবং রামানুজের ব্রহ্মে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ ভেদ স্বীকার করেন না, ইঁহারা এক ব্রহ্মেরই পরিণামে জীব জগৎ এই মতবাদ স্বীকার করেন। এই চারিটি মতকে বেদান্তের চতুর্ব্যূহ বলে। (পৃঃ ৩০, ৩১)।

স্বামী বাসুদেবানন্দ

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরা সংবাদ বা ললনা মঙ্গল গীতা—শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যভূষণ প্রণীত। মাধবপাশা সিদ্ধাশ্রম হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা আট আনা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর প্রাণত্যাগের পর শোকসন্তপ্তা উত্তরাকে সান্ত্বনাচ্ছলে কৃষ্ণ নানা ধর্মকথা উপদেশ করিতেছেন। এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পয়ারছন্দে গ্রন্থকার পুস্তকখানা লিখিয়াছেন। গীতার অনুকরণে ইহাতে আঠারটি অধ্যায় করা হইয়াছে। লেখক তাহাতে নানা গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষা বিশেষত্ব বর্জ্জিত এবং স্থানে স্থানে অনাবশ্যক দীর্ঘতা দোষযুক্ত। শিরোভাগে "বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যে নিত্য পাঠ্য ধর্ম্মগ্রন্থ", উপাধির সার্টি-ফিকেটের বিজ্ঞাপন এবং গীতার অনুকরণে গীতা মাহাত্ম্য প্রভৃতি শুধু অশোভন নয়, হাস্যকরও। লেখকের উদ্যমের আমরা প্রশংসা করি। পুস্তকের ছাপা, মলাট প্রভৃতি ভাল হইয়াছে।

পাহাড়ের কথা—শ্রীবিমলানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বায়, ১৪ দমদম রোড, কলিকাতা। ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য বার আনা।

অনেকেই দেশ ভ্রমণ করেন কিন্তু যথার্থ ভ্রমণকারীর দৃষ্টি লইয়া যাঁহারা যান, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আবার সেই অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে যাঁহারা ভ্রমণ কাহিনী যথাযথ মনোরম ভাবে লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা আরও কম।

পাহাড়ের কথার লেখক কাশ্মীর, দার্জিলিং, শিলং, প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে আনন্দ ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকে পাঠক ঐ সকল স্থানের ইতিহাস, ভৌগলিক তত্ত্ব অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্ম ও দেশাচার প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা হয়তো পাইবেন না, কিন্তু পাইবেন সেই সকল স্থানের একটি সাধারণ পরিষ্কার চিত্র, আর পাইবেন পাহাড় ভ্রমণের নির্মল আনন্দের অনুভব। এইদিক হইতে লেখক যথেষ্ট সফলকাম হইয়াছেন। লেখকের লেখন ভঙ্গি সাবলীল, সহজ ও সুন্দর।

বাংলা লেখকদের অনেকের মধ্যেই একটা বাতিক দেখা যায়, মাঝে মাঝে ইংলিশ শব্দ, অনাবশ্যক ভাবে দুই চারজন সাহেবের নাম ও উক্তি এবং কোন বাংলা শব্দের মানে যদি বাঙালীরা না বোঝেন, সেই ভয়ে শব্দের পশ্চাতে ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করিয়া গৌরব অনুভব করা। ইহাতে একটি কথা মনে হয়। ইংলিশ শাসনের আগে আমরা আরবি ফারসি শাসনাধীনে ছিলাম। বাংলা ভাষাতে বহু আরবি ও ফারশি শব্দও ব্যবহৃত হয়। যদি আমরা সেইগুলি আরবি অক্ষরে আমাদের লেখার মধ্যে ব্যবহার করি এবং যে সকল বাংলা শব্দের মানে আমরা বুঝিব না, সেইগুলির সঙ্গে আরবি অক্ষরে তার আরবি প্রতিশব্দটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমরা প্রাচীনত্বের গৌরবও লাভ করিব, আবার পাড়া-প্রতিবেশীদের বাহবাও পাইব।

আমরা দেখিয়া সুখী হইয়াছি, পাহাড়ের কথার লেখক এই ইংলিশ বাতিক হইতে অনেকটা মুক্ত। যে সামান্য ত্রুটি এই বিষয়ে রহিয়াছে, তাহাও আশা করি তিনি আগামী সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইবেন। বিদেশী শব্দ ব্যবহার অথবা বিদেশী মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করা কিছুমাত্র অন্যায় নহে। তবে তাহা নিজের মত করিয়া এবং নিজের দৈন্য প্রকাশ না করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ববিন্স নেষ্ট, সেলটার ফর ব্রিটিশ ফ্যামিলি প্রভৃতি বাংলা অক্ষরে লেখা আমরা প্রশংসা করি। মুসৌরী (Mussuri), নাইনিতাল (Naınıtal), দার্জিলিং (Darjeeling) (পৃষ্ঠা ৭২-৭৩) প্রভৃতি কথাগুলির ইংলিশ বাদ দিলে ক্ষতি কি? " Government middle School, পাশেই C M S School ও Sir Hari Sing technical School" (পৃষ্ঠা ৪৪) প্রভৃতি বাংলা কথায় অন্ততঃ বাংলা অক্ষরে দিলেই ইংলিশ না-জানা হতভাগ্য বাঙালী পাঠকের প্রতি আর অবিচার হয় না।

প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তুটি খুব পরিষ্কার হয় নাই এবং সেই জন্যই বোধ হয় অনাবশ্যক বোধ হইল। পুস্তকের ছাপা, মলাট সুন্দর ও সুরুচি সঙ্গত। দশখানা সুন্দর ছবি পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

অমিতাভ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রীতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৫৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র শেঠ কর্তৃক প্রকাশিত। ৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য চার আনা।

স্বদেশ সেবা, স্বদেশকর্মী প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকাবলী হইতে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকাখানা প্রণীত হইয়াছে। সংগ্রহ ভাল হইয়াছে।

অনন্তের ধ্যানে—স্বামী যোগানন্দ প্রণীত। রাঁচি যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রম (শ্যামাচরণ মিশন) হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ×৩২ আকারে ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

স্বামী যোগানন্দের 'মেটাফিজিক্যাল মেডিটেশন' পুস্তকের ইহা বাংলা অনুবাদ। ইহাতে প্রস্তাবনা, ভক্তি, প্রেম, সেবা, সফলতা, সৌহার্দ্য, বিনয়, ভীতি ক্রোধ ও দুশ্চিন্তা দমন অবলম্বনে, আনন্দ আশা ও সাহস, জ্ঞান ও ধারণা, শান্তি, নিরাময়-করণ, আত্মবোধ প্রভৃতি তেরটি অধ্যায় এবং ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর, আমার ভারত, সমাধি, শিবোঽহং নামক চারিটি কবিতা আছে। পুস্তিকাখানা পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্মের প্রার্থনা পুস্তকের অনুকরণে লিখিত।

এই পুস্তিকাখানা ধর্মপিপাসুকে আনন্দ দান করিবে।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

দেউল—(নাটক) শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৪৬ পৃষ্ঠা, দাম এক টাকা।

ভূমিকায় শ্রীযুত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন,—* * ইহা লেখিকার নাটক রচনার প্রথম উদ্যম বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য ইহার মধ্যে নাটক রচনার টেক্‌নিক সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের গুণী শিল্পিগণ কেমন ঐকান্তিক আগ্রহে নিজেদের সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি দুঃখ শোক অগ্রাহ্য করিয়া, সকল স্বার্থ-পরতা ও হিংসা দ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠিয়া পুরুষপরম্পরা ক্রমে ও শিষ্য পরম্পরাক্রমে বহু বৎসরের দুষ্কর তপস্যার দ্বারা নিজেদের ধ্যানের ধনকে পাষাণে রূপান্তরিত করিত; শিল্পীর হৃদয় ও মনের গঠন কিরূপ উদার ও উন্নত হইত বা হওয়া উচিত, শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত রসবস্তুটি কি, ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় লেখিকা অতি সুন্দর নিপুণতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। কথোপকথনের ও গানগুলির মধ্যে অতি উচ্চ ভাবের কথা কবিত্ব-মণ্ডিত ভাষায় রস ব্যঞ্জনায় পরিমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। * *

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত আমরাও আশা করি, লেখিকার সাহিত্য সাধনা দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে তাঁকে যশে ও গৌরবে মণ্ডিত করবে। যে রসসৃষ্টি সাহিত্যের প্রাণ বস্তু, তার ক্ষমতা লেখিকার আছে, এ পরিচয় তাঁর নাটকের বহুস্থানে পাওয়া যায়। টেক্‌নিক ও অন্যান্য বিষয়ে যে দোষ ত্রুটি আছে, সে সব আয়ত্ত করা খুব বেশি কঠিন হবে না।

পাত্রপাত্রী নির্বাচন সুন্দর হয়েছে। দৃশ্য নির্বাচন সর্বত্র যথাযথ ও সুন্দর হয় নি। অনেক স্থলেই দেখা যায়, পাত্রপাত্রীরা সকলেই যেন এক ভাষায় একই ভঙ্গিতে কথা বলছেন। প্রত্যেকের চরিত্রগত ও বাচন ভঙ্গির বিশেষত্ব রক্ষা করা উচিত।

নাটকখানি পাঠ করে আমরা আনন্দ পেয়েছি। ছাপা প্রভৃতি সুন্দর।

শশাঙ্কশেখর দাস

সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, শ্যামলাতাল (আলমোড়া)—আমরা শ্যামলাতাল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দ্বাবিংশতিতম (১৯৩৬) বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের নিষ্কাম কর্ম্মযোগাদর্শে ১৯১৪ সনে এই সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চ সহস্র ফিট উর্দ্ধে, টনকপুর হইতে একাদশ মাইল দূরে উত্তুঙ্গ হিমারণ্যের মনোরম প্রদেশে এই আরোগ্য নিকেতনটী অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ত্রিংশৎ মাইল পরিমিত স্থানে দুর্গত রুগ্নদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা অন্য কোথাও নাই। তিব্বত-ভারত বাণিজ্যবর্ত্মের পার্শ্ববর্ত্তী হওয়ায় প্রতিবৎসর নানাজাতীয় বহু বিদেশী বিপন্ন লোকও এই আরোগ্যায়তনের সেবা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিপন্ন নর-নারায়ণের সেবা ভিন্ন রুগ্ন আহত মূক গো মহিষাদি জন্তুদের সেবাও এই সেবাশ্রমের অন্যতম কর্ম্ম।

প্রথম হইতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত ইহাতে সর্ব্বমোট ২৭,৪০০ রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। ১৯৩৬ সনে মোট ২১ জন রোগী সেবাশ্রমের অন্তর্ব্বিভাগে এবং ৪,৪১৭ জন রোগী বহির্ব্বিভাগে সেবা ও চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্তর্ব্বিভাগে ৬ জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। এই আরোগ্যালয়ে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদীয় তিন রকমেই চিকিৎসা করা হয়। আলোচ্য বৎসরে সেবাশ্রমের মোট আয় ১৫১৩।৶৭ পাই, ব্যয় ১২০৫৶৬ পাই এবং উদ্বৃত্ত ৩০৮।১ পাই।

এই সেবাশ্রমে বর্ত্তমানে তিনটী বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছে। (১) ২০,০০০ টাকার একটী স্থায়ী ফণ্ড; (২) সেবাশ্রমের উত্তরোত্তর উন্নতি বিধানোপযোগী একটী ফণ্ড এবং (৩) একজন কৃতবিদ্য উপযুক্ত চিকিৎসক নিয়োগের জন্য মাসিক অন্যূন ৫০৲ টাকা আয়ের সংস্থান। এককালীন ১০০০৲ টাকা দান করিলে আত্মীয়জনের স্মৃতি রক্ষার্থে এই আরোগ্য-ভবনের অন্তর্ব্বিভাগে রোগীর জন্য একখানা আসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

দুর্গম প্রদেশে দুঃস্থ নারায়ণের সেবার জন্য আমরা দেশবাসী পুণ্যশীল নরনারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্‌-ফ্র্যান্‌সিসকো—গত এপ্রিল মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ সেঞ্চুরি ক্লাব এবং বেদান্ত সোসাইটিতে প্রত্যেক রবিবার এবং বুধবার বেদান্ত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন:—৪ঠা এপ্রিল, "কি উপায়ে সহজ জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়?" ৭ই এপ্রিল, "মায়া বা জাগতিক রহস্য।" ১১ই এপ্রিল, "ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায়।" ১৪ই এপ্রিল, "প্রজ্ঞা বনাম প্রত্যয়।" ১৮ই এপ্রিল, "দৈনন্দিন জীবনকে আধ্যাত্মিক করিবার উপায়।" ২১শে এপ্রিল, "প্রেমের ধর্ম্ম।" ২২শে এপ্রিল, "কর্ম্ম ও পুনর্জ্জন্মবাদ।" ২৮শে এপ্রিল, "আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন দূর করিবার উপায় কি?"

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শুক্রবার বেদান্ত সোসাইটি হলে তিনি ধ্যান ধারণাদি ও বেদান্ত তত্ত্বসাধন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি (মুর্শিদাবাদ)—বিগত ৪ঠা বৈশাখ হইতে দিবসত্রয় সারগাছি আশ্রমে মহাসমারোহে

শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গামাতার মহাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ তাঁহার মহাপ্রয়াণের কিছুদিন পূর্ব্বে এই পূজার সংকল্প করেন। সাধু ও ভক্তদের অক্লান্ত সমবেত চেষ্টায় তাঁহার এই সংকল্প সফল হইয়াছে।

৫ই বৈশাখ, রবিবার, অন্নপূর্ণা পূজার দিন সেবাশ্রমের চত্বারিংশৎ বার্ষিক মহোৎসব ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার নবম বার্ষিক আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত সাধু ও ভক্তদের এক সভায় সিঙ্গাপুরের স্বামী ভাস্বরানন্দ প্রমুখ কয়েকজন বক্তৃতা করেন। পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিদাস গাঙ্গুলী মহাশয় হৃদয়স্পর্শী কথায় সকলকে মুগ্ধ করেন। সভায় "সেবাব্রত" নামে একটী পুস্তিকা (পূজনীয় মহারাজের অভিভাষণ) পঠিত এবং বিতরিত হয়। তিনদিনে মোট প্রায় আট হাজার ভক্ত এবং দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতিদিনই আনন্দ কৌতুকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, রেঙ্গুন—গত ৮ই মে, শনিবার, কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনান্তে পণ্ডিতজী নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"আমার ভারত ভ্রমণকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যের প্রসারতা ও সুনিপুণ কার্য্যদক্ষতার ন্যায় অতি অল্প জিনিষই আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে। আজ রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনেও প্রকৃত সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত অনুরূপ দক্ষতা দেখিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটী উন্নতি লাভ করুক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও সেবাশ্রম, টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)—শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব টাঙ্গাইল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও সেবাশ্রমের সভ্য ও কর্ম্মিগণের অক্লান্ত কর্ম্মতৎপরতা ও অশেষ উৎসাহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত ৫ই হইতে ৮ই বৈশাখ উৎসবানন্দে মঠ মুখরিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সুন্দরানন্দ এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

৫ই বৈশাখ, প্রত্যূষে অত্র মঠ সংশ্লিষ্ট "বিবেকানন্দ শিক্ষামন্দিরের" ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ঊষা কীর্ত্তন হয়। পূর্ব্বাহ্ণে স্বামী সুন্দরানন্দ ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা ও হোম সমাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে গীতা ও চণ্ডী পাঠ হয়। পূজার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে প্রায় দুই শতাধিক স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তের সমাগম হয় ও তাঁহারা পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণকে পরিতোষ পূর্ব্বক সেবা করান হয়। দ্বিপ্রহরে সমবেত ভক্তগণকর্ত্তৃক লীলা কীর্ত্তন হয়।

৬ই বৈশাখ, স্বামী সুন্দরানন্দ মধ্যাহ্নে "ভজগোবিন্দ চক্ষু চিকিৎসালয়ে"র পুনরুদ্বোধন এবং অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে এক জনসভায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৭ই বৈশাখ, অপরাহ্ণে টাঙ্গাইল ৺কালীমাতার মন্দির সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে তিনি "হিন্দুধর্ম্মে অনৈক্য ও তাহার প্রতীকার" এবং ৮ই বৈশাখ, অপরাহ্ণে উক্ত নাটমন্দিরে ইংরাজী ভাষায় "হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

৯ই বৈশাখ, প্রভাতে তিনি বিবেকানন্দ শিক্ষামন্দির পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রবৃন্দকে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপদেশ দান করিয়া টাঙ্গাইল পরিত্যাগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও সেবাশ্রমের কার্য্যবিবরণী, টাঙ্গাইল—আমরা টাঙ্গাইল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও সেবাশ্রমের ১৩৪২ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। গত জানুয়ারী মাসে আশ্রম পরিচালিত "বিবেকানন্দ শিক্ষামন্দিরের"

সপ্তমমান পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। ইহার ছাত্র-সংখ্যা ২১৭ জন। মঠের "তরঙ্গিণী গ্রন্থাগারে" বহু পাঠক আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন। সেবাশ্রমের "মণীন্দ্রমোহন দাতব্য ঔষধালয়" হইতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ৩০৪৩ জন দুস্থ রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে "বিবেকানন্দ শিক্ষামন্দিরের" মোট আয় ২৪৭৫৷৶১০ ও মোট ব্যয় ২৩২১।৶১০ এবং অন্যান্য বিভাগের মোট আয় ১০৪৭৮৵১৫ ও মোট ব্যয় ৯৭০৶৫ আনা। আমরা এই সেবাশ্রমের উন্নতি কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা)—গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তিন দিন প্রাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার প্রাতে "শ্যামনাম" এবং উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তনাদি হয় এবং অপরাহ্ণে এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া গ্রামটী প্রদক্ষিণ করে। পরদিবস ৯ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরমহংস দেবের পূজা হোম ইত্যাদি আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ এক ঘটিকায় প্রায় দুই সহস্র ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন সাহা, এম্-এস-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। সভায় আশ্রমের বার্ষিক কার্য্যাবলীর বিবরণ পঠিত হইলে অবৈতনিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বহু সুবক্তা ঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর একটী মনোরম জলসার ব্যবস্থা হয়। স্বনামধন্য দানীবাবুর সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল দাস, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন পোদ্দার এবং আরও বহু গায়কের ভজন-সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। বালিয়াটী এবং ভাটারার স্বেচ্ছাসেবকগণ এই উৎসবের সকল অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন।

দেলুয়া (পাবনা)—গত ৫ই বৈশাখ, সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দেলুয়া গ্রামে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অপূর্ব্বানন্দ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ দিন পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও মধ্যাহ্নে দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ চন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভায় স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার পর স্বামী অপূর্ব্বানন্দ "ঠাকুরের জীবনী ও ধর্ম্ম" সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সাহাপুর আতকাপাড়া (কিশোরগঞ্জ)—গত ১২ই বৈশাখ, রবিবার, মৈমনসিংহ জিলাস্থ কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সাহাপুর আতকাপাড়া গ্রামে স্থানীয় ছাত্র ও যুবকগণের উদ্যোগে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত তালুকদার, এল্, এম্, এফ্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কয়েকজন বক্তা "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে 'রামকৃষ্ণ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় যাঁহারা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। পূজান্তে সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। জনসাধারণের আর্থিক ও কায়িক সাহায্য উৎসবটীকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়াছে। এই

স্থানে এইরূপ উৎসব গত কয়েক বৎসর যাবৎ আর হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কাগদী (ফরিদপুর)—গত ১২ই বৈশাখ, ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কাগদী গ্রামে অবস্থিত দক্ষিণ বিক্রমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শুভ জন্ম স্মরণোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগান্তে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ৫।৬টী কীর্ত্তনদল উৎসবে যোগদান করিয়া সমস্ত দিবসব্যাপী কীর্ত্তন দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলিকে আনন্দ দান করে। প্রিয়কাঠি গ্রামে অবস্থিত ইদিলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে ১৫।১৬ জন ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন এবং সুললিত কণ্ঠে দ্বিপ্রহরে "রামনাম-কীর্ত্তন' ও সন্ধ্যায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আরাত্রিক স্তব পাঠ করিয়া সম্মিলিত জনসাধারণকে বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত করেন।

অপরাহ্ণে তুলাসার গুরুদাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ মহাশয়ের সভানেতৃত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় আশ্রম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল মহাশয় বর্ত্তমান সভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রভাব ও বিবেকানন্দের বাণীকে বাস্তবরূপ প্রদানের পথ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পালং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-টি মহাশয় পাশ্চাত্য জগতের উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মিকতার প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী ও শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দুইটী কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় কর্ম্মযোগ ও স্বামী বিবেকানন্দের গঠন মূলক কার্য্যের উপর জোর দিয়া বক্তৃতা করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ

পরহিতব্রতচেতা যো মহাত্মা গতাসু
দিশি দিশি জনবৃন্দা যং ভজন্তি স্মরন্তি।
ভুবিসুরগুরুকল্পং সর্ব্বযোগেষু সিদ্ধং
নিখিলমনুজবন্ধুং রামকৃষ্ণং নমামি ॥১॥

ললিত-সরলবাক্যং রম্যকান্তিং সুদৃশ্যং
কলুষরহিতচিত্তং শক্তিমন্তং বিনম্রম্।
সততশমথপূর্ণং ব্রহ্মভাবাভিমগ্নং
নিখিলমনুজবন্ধুং রামকৃষ্ণং নমামি ॥২॥

অগণিতগুণিশিষ্যৈঃ সার্দ্ধমাসীনমেনং
হিতমিতবচনাঢ্যং জীবসিদ্ধ্যৈ যতন্তম্।
কৃতিমতিভজনানাং বিগ্রহং মূর্ত্তমেকম্।
নিখিলমনুজবন্ধুং রামকৃষ্ণং নমামি ॥৩॥

কলিকলুষবিনাশং কালিকাভক্তমীশং
ত্রিভুবনভয়নাশং মুক্তিবাদানুরক্তম্।
ভুবি পুনরবতীর্ণং রামকৃষ্ণাখ্যমাদৌ
নিখিলমনুজবন্ধুং রামকৃষ্ণং নমামি ॥৪॥

অদ্বৈতবেদান্ত কি বৌদ্ধের দান ?

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

পরাজিত জাতি যতক্ষণ না আত্মহত্যা করে ততক্ষণ তাহার ধ্বংস হয় না। ইহা একটী পরীক্ষিত সত্য। এই আত্মহত্যা এখানে আমাদের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গৌরবের, তাহা আমাদের নয়, তাহা পরস্ব—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তিতা, আমাদের সকল বিষয়ে দোষদর্শন, অপর অপেক্ষা নিজকে হীনজ্ঞান করা, আর এতদনুসারে শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করা বুঝায়।

আমরা আজ নানাদিক দিয়া আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের জাতির প্রাণস্বরূপ একটী দিক্ বাকি ছিল, এবার সে দিকের পথও উন্মুক্ত হইল। এতদিন বিষয়ী ব্যক্তিগণ এই আত্মহত্যা-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী ছিলেন, এতদিন বিধর্ম্মী ব্যক্তিগণ হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসে প্রবৃত্ত ছিলেন, এক্ষণে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এইকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

এজন্য আমরা কয়েকজন নিষ্ঠাবান্ বর্ত্তমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথাই বলিব। দেখিব—আমাদের ব্যাধি কতদূর মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে, দেখিব—আমরা আজ কত নিঃসহায়, কতদূর অধঃপতিত। এই পণ্ডিত মহাশয়গণ আমাদের জাতির, আমাদের ধর্ম্মের যাহা শেষ সম্বল, যাহা অতুলনীয় গৌরবের বস্তু, সেই সম্বলকেই, সেই বস্তুকেই আজ বৌদ্ধদান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুদ্যত। ইঁহারা কখন নিজ সিদ্ধান্তকে 'নিশ্চয়' বলিয়া ঘোষণা করেন, কখনবা সংশয়রূপে প্রকাশ করেন, কখনবা স্বসিদ্ধান্তের সত্যতার জন্য সুধী সমাজকে জিজ্ঞাসা করেন। ফলতঃ প্রায় সকল শ্রেণীর ব্যক্তিকেই ইঁহারা এইরূপে আকর্ষণ করিয়া আমাদের স্বরূপ-বিষয়ে আমাদের হৃদয়ে সংশয় বিষ প্রবিষ্ট করিতেছেন। যাঁহারাই হিন্দু ধর্ম্মের কিছু সংবাদ রাখেন, যাঁহারাই বেদ বেদান্ত উপনিষৎ দর্শন আদি আলোচনা করেন, তাঁহারাই জানেন যে, বেদের জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ডই বেদান্ত বা উপনিষৎ। আর সেই বেদান্ত বা উপনিষদের দর্শনই অন্তিমে অদ্বৈতবাদ। ইহাই বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, গৌড়পাদ এবং শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্য প্রচার করিয়াছেন। সেই উপনিষদের মধ্যে আবার মাণ্ডূক্য উপনিষৎই প্রধান, ইহা উপনিষদেই আছে, যথা ;—

"মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষুণাং বিমুক্তয়ে।"

(মুক্তিকোপনিষৎ)

অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের বিমুক্তির জন্য একমাত্র মাণ্ডূক্য উপনিষদই যথেষ্ট, ইত্যাদি। তদ্রূপ ঔপনিষদ দর্শন অদ্বৈতবাদই ভারতের অধিকাংশকর্ত্তৃকই গৃহীত ও অবলম্বিত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদের যত গ্রন্থাদি, যত পণ্ডিত, যত সাধক ও সন্ন্যাসী, তত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতপ্রভৃতি সকল মতবাদের গ্রন্থ ও সেবক একত্র করিলেও হয় না। সকল ধর্ম্মই যেমন একটা দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ আমাদের ধর্ম্মও এই বেদান্তদর্শনের উপর বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। সকল ধর্ম্মই যেমন কোন মহাত্মা মহাপুরুষ সিদ্ধপুরুষ বা অবতার পুরুষ অথবা ঈশ্বরবাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের ধর্ম্মও তদ্রূপ সেই নিত্য অপৌরুষেয় বেদ ও তাহার সার উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব

সর্ব্বোপনিষৎসার এই মাণ্ডূক্য উপনিষদ এবং ব্যাস গৌড়পাদ ও শঙ্কর প্রচারিত অদ্বৈতবাদই আমাদের ধর্ম্মের একপ্রকার প্রধান অবলম্বন। যদিও আমাদের মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ বিবাদ বিসম্বাদ আছে, তথাপি উপনিষদের সম্বন্ধে আদপেই বিরোধ নাই, এবং অদ্বৈতবাদের প্রাধান্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়াই দ্বৈতাদি মতবাদিগণ আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, আর তাহারও সমুচিত উত্তর অদ্বৈতবাদিগণ দিয়া সেই প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব বলা যাইতে পারে—মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ও অদ্বৈতবাদই আমাদের জাতির ও আমাদের ধর্ম্মের মর্ম্মস্থল, আমাদের জাতির ও আমাদের ধর্ম্মের প্রাণ। পণ্ডিত মহাশয়গণ, স্বেচ্ছায় কি পরেচ্ছায় জানিনা, কিন্তু এই মর্ম্মস্থলেই বা এই প্রাণেই আঘাত করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—এই মাণ্ডক্য উপনিষৎ আধুনিক গ্রন্থ, অপৌরুষেয় ত দূরের কথা। তাহার গৌড়পাদ-কারিকাও বৌদ্ধ গ্রন্থ। তাহার শাঙ্কর ভাষ্যও শঙ্করাচার্য্যের নহে। সুতরাং যে মূলের উপর হিন্দু ধর্ম্মরূপ মহা অশ্বত্থ বৃক্ষ দণ্ডায়মান, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলই ছিন্ন করা হইল। কালে সেই বৃক্ষ আপনা আপনিই শুখাইয়া যাইবে। হিন্দুর আত্ম-হত্যা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে।

ইঁহারা বলিতেছেন—শঙ্করের পরমগুরু গৌড়-পাদ যখন বুদ্ধের নাম করিতেছেন, গৌড়পাদের মতই যখন বিস্তৃত ভাবে লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিককারিকা প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থে রহিয়াছে, গৌড়পাদ যখন পালিগ্রন্থে বুদ্ধপদবাচ্য "দ্বিপদাংবরম্" পদ-দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে নমস্কার করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং এইরূপ আরও নানাপ্রকার হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অদ্বৈতবাদটী বৌদ্ধগণেরই উদ্ভাবিত। মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ও শাঙ্করভাষ্য কোনটীই হিন্দুর সম্পত্তি নহে। অবশ্য এই কথা যে কেবল ইঁহারাই বলিতেছেন, তাহা নহে, এই কথা এবং এই জাতীয় বহু কথা, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন অনেক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায়, অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং অনেক পাশ্চাত্য মতানুগামী হিন্দুসন্তানই বলিয়াছেন এবং বলিতে-ছেন। তবে এইসব পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া প্রথিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের একরূপ নেতা বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাই আমরা অখাদ্যভোজী ধর্ম্মানুষ্ঠানবর্জ্জিত বিলাতপ্রত্যাগত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পণ্ডিতের কথা না তুলিয়া ইঁহাদেরই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

তাহার পর ইঁহারা আমাদের ধর্ম্মের খণ্ডনাভি-প্রায়ে বা কোন অবৈদিকমতস্থাপনাভিপ্রায়ে এই কথা বলিতেছেন না, ইঁহারা সত্যনির্ণয়ের জন্য এই কথা অতি সংযতভাবে উত্থাপিত করিয়া সুধীমণ্ডলীকে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সত্যনিষ্ঠা ও সত্যানুরাগই ইঁহাদের এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। সুতরাং এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে আমরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ভুলিয়া যাই, অদ্বৈতবাদটী আমাদের ধর্ম্মমতের মূল নহে বলিয়া বুঝিতে বা সংশয়ও করিতে পারি, তাহার একটী অতি কৌশলপূর্ণ ও অতি দুর্ভেদ্য সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করা হইল। এ জাল সহজে কেহ দেখিতে পাইবে না, বুঝিতেও পারিবে না; সুতরাং এই জালে অধিকাংশকেই পতিত হইতে হইবে, ইহাকে ছিন্ন করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় আত্মহত্যার অমোঘ অন্তিম অস্ত্রের প্রয়োগ করাই হইবে। জানি না—কোন্ অসুরাত্মা অলক্ষিত-ভাবে এই সব পণ্ডিত মহাশয়ের হৃদয় এরূপভাবে কলুষিত করিয়া দিল। জানিনা তাঁহাদের এই আলোচনার ফল তাঁহারা বুঝেন কিনা বা বুঝিবার চেষ্টাও করেন কিনা? যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক—পণ্ডিত মহাশদিগের যুক্তিগুলির মূল্য কত!

প্রথমতঃ দেখা যায়—পণ্ডিত মহাশয়গণ বলিতেছেন—শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ, মাণ্ডূক্য কারিকায় "দ্বিপদাংবরম্"কে প্রণাম করিতেছেন বলিয়া গৌড়পাদ বৌদ্ধ অথবা বৌদ্ধমতানুসারী। কারণ, দ্বিপদাংবরম্ পদটী পালিগ্রন্থে বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বহুলভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব গৌড়পাদ, বুদ্ধকেই প্রণাম করিতেছেন, আর তজ্জন্য গৌড়পাদ বৌদ্ধ।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—এস্থলে গৌড়পাদের বুদ্ধত্বানুমানে যে হেতু প্রদর্শন করা হইল, তাহা কি অব্যভিচারী হেতু? আমরা ত ইহাকে অব্যভিচারী বলিতে পারিতেছি না; কারণ, দ্বিপদাংবরম্ শব্দটী মহাভারতে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণেও নরশ্রেষ্ঠকে—নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং মাণ্ডূক্য কারিকার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও নরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব বুদ্ধভিন্নেও দ্বিপদাংবরম্ পদ প্রযুক্ত হওয়ায় হেতুটী ব্যভিচারী হেতু হইল।

"দ্বিপদাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্"

ইহা মহাভারতে অন্ততঃ আট দশবার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে দ্বিপদাংবর কথাটী ব্রাহ্মণ অর্থেই ব্যবহৃত। যেমন গো অর্থে "চতুষ্পদাং বরিষ্ঠা" পদটী প্রযুক্ত হয়। কোন মহিষ বা হাতীতে আয়তনে বৃহৎ দেখিলেও চতুষ্পদাংবর পদটী প্রযুক্ত হয় না।

যদি বলা যায়—পালিগ্রন্থে দ্বিপদাংবরম্ পদের প্রয়োগবাহুল্য আছে। সুতরাং ইহার অর্থ বুদ্ধই হইবেন। তাহা হইলে বলিব—প্রথমতঃ মহাভারত পুরাণাদিতে ইহার কতবার প্রয়োগ আছে এবং পালিগ্রন্থে ইহার কতবার প্রয়োগ আছে গণনা করিয়া এই প্রয়োগবাহুল্য স্থির করিতে হইবে। কিন্তু একার্য্য কাহারও পক্ষে অল্প-সময়সাপেক্ষ নহে। সুতরাং প্রয়োগবাহুল্য উভয়বাদি-সম্মত হেতু হইল না। তাহার পর বাহুল্য থাকিলে তাহা নিশ্চায়ক হয় না, কিন্তু তাহা সংশয়কে দ্বার করিয়া সম্ভাবনাই উৎপাদন করে মাত্র। অতএব এই অনুমানটী সন্দিগ্ধসব্যভিচার নামক হেত্বাভাস-দোষ দুষ্ট হইল। অতএব ইহা অগ্রাহ্য।

তাহার পর যে-কোন নূতন সম্প্রদায় যে শব্দ ব্যবহার করে, সেই সম্প্রদায় কি নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া ব্যবহার করে? না, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত শব্দই প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকে। শব্দ ব্যবহার ত লোক বুঝাইবার জন্য, আর এই লোক এস্থলে অবৌদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায় নহে কি? এ জন্য যে নূতন জাতি লোকশিক্ষার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করে, তাহা পূর্ব্বপ্রচলিত শব্দই হয়, নূতন বা অপ্রচলিত শব্দ হয় না। হিন্দুর অপ্রচলিত শব্দ হইলে হিন্দুকে বৌদ্ধ করিবার সুবিধাই হইতে পারে না, অথবা তাহার নিজের দলের লোকই তাহা বুঝিতে পারিবে না। অতএব এরূপ কল্পনা নিতান্ত অস্বাভাবিক কল্পনা। দ্বিপদাংবরম্ অর্থ যখন নরশ্রেষ্ঠ বুঝায়, আর সেই নরশ্রেষ্ঠই যখন নারায়ণ ও ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তখন ইহা বুদ্ধকে বুঝাইবার জন্য বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে কল্পিত—ইহা কল্পনা করা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি উচ্চ শ্রেণীর কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে সেই উচ্চ শ্রেণীর পদবী ব্যবহার করিবার একটা প্রবৃত্তি তাহার স্বাভাবিক হয়—ইহা বেশ দেখা যায়। বুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সন্তান, তিনি ব্রাহ্মণের কার্য্য ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণপদবী তাঁহাতে আরোপ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার সম্প্রদায়েরই মধ্যে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। মহাভারতাদিতে ব্রাহ্মণ অর্থে বহুল-প্রযুক্ত দ্বিপদাংবরম্ শব্দটী যে তজ্জন্য বুদ্ধে আরোপিত হইবে—ইহাই ত স্বাভাবিক। সুতরাং পালিগ্রন্থে ইহার প্রসিদ্ধি মহাভারতাদিতে

প্রসিদ্ধির ছায়াবিশেষ বলিতে হইবে। অতএব এ দৃষ্টিতেও ইহা শুদ্ধ বুদ্ধের বোধক হইতে পারে না।

তাহার পর গৌড়পাদ যে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার অন্য প্রমাণ আছে। সুতরাং গৌড়পাদ দ্বিপদাংবরম্ শব্দে এই বুদ্ধকে লক্ষ্য করিতে পারেন না। গৌড়পাদ যে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা—মতসাম্য কখনই একের নিকট অপরের ঋণ সাব্যস্ত করিতে পারে না। স্বাধীনভাবে উদ্ভাবিত মতও একরূপ হইতে বহুস্থলে দেখা গিয়াছে।

তাহার পর যদি এই মতসাম্যের জন্য একের নিকট অপরের ঋণ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহারই নিকট পরবর্ত্তীকে ঋণী বলিতে হইবে। অদ্বৈতবাদ উপনিষদের বাদ। মাণ্ডূক্য উপনিষদকে যদি বিবাদাস্পদীভূত বলিয়া ত্যাগও করা যায়, তাহা হইলেও বৃহদারণ্যক প্রভৃতিকে ত বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলা সুবিধা হইবে না। এই বৃহদারণ্যকাদিতে যে অদ্বৈতবাদ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। এমন কি মাণ্ডূক্য হইতেও অধিক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অতএব অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধের সম্পত্তি নহে, কিন্তু বৈদিক সম্পত্তি। বস্তুতঃ বৌদ্ধাদি সকল মতবাদের বীজই আমরা বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপে দেখিতে পাই। সুতরাং বৌদ্ধই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বেদমতবাদের নিকট ঋণী, অদ্বৈতবাদ পরবর্ত্তী বৌদ্ধের নিকট ঋণী নহে। এতদ্ব্যতীত বেদ যে অপৌরুষেয় এবং ঈশ্বরবৎ নিত্য, তাহার বহু প্রমাণ আছে, এস্থলে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। এই সব কারণেও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎকে বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলা আদপেই সুবিধা হইবে না। আর তজ্জন্য বেদমতের পর বৌদ্ধমত, বৌদ্ধমতের পর বেদমত নহে।

তাহার পর শাক্যসিংহ বুদ্ধের পূর্ব্বে যে বহু বুদ্ধ ছিলেন, তাহা বৌদ্ধ ও বৈদিক উভয়েই স্বীকার করেন এবং তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ, (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য) ব্যাসের সময়ের লোক। ইহারও পূর্ব্বে বুদ্ধোৎপত্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে আছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ফলদ্বারা বলীয়ান্ অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিবর্গকে কর্ম্মকাণ্ড হইতে বিচ্যুত করিয়া শক্তিহীন করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু সম্ভবতঃ ত্রেতাযুগে মায়ামোহকে নিজশরীর হইতে উৎপাদিত করেন। ইনিই বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উপেক্ষা-কর্ত্তা, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মূলতত্ত্বের উপদেষ্টা। এ সময় বৌদ্ধগণ বেদ মানিতেন বলিয়াই বোধ হয়। তদ্ব্যতীত শান্তরক্ষিতের মতানুসারে বেদের নিমিত্তশাখায় বুদ্ধের কথা থাকায়, বেদমান্যকারী বৌদ্ধ যে একদল ছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ মহাপ্রামাণিক অমরকোষ-অভিধানকার বৌদ্ধ অমরসিংহ গৌতম বুদ্ধকে বুদ্ধই বলেন নাই। গৌতম বুদ্ধকে তাঁহার অন্য শিষ্যশাখা বুদ্ধ নামে সম্মানিত করিয়াছেন। তাহার পর বুদ্ধ যে বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন এবং বৈদিক গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন—ইহা বৌদ্ধদিগেরই কথা। এইরূপ বহু কারণে বুদ্ধকেই বৈদিকের নিকট ঋণী বলাই সঙ্গত।

এইবার দেখা যাউক গৌতম বুদ্ধ ও গৌড়পাদের মধ্যে কে পূর্ব্ববর্ত্তী? গৌড়পাদকে শঙ্করের সমসাময়িক করিয়া শাক্যসিংহ বুদ্ধকে পরবর্ত্তী করিবার তিনটী মূল আছে। **একটী** মাধবীয় শঙ্করবিজয়োক্ত গৌড়পাদশঙ্করসাক্ষাৎকারের কথা, **দ্বিতীয়টী** মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্যশেষে শঙ্করকর্ত্তৃক গৌড়পাদকে পূজ্যাভিপূজ্য পরমগুরু বলিয়া সম্মান প্রদর্শন, এবং **তৃতীয়টী** শঙ্করের সম্প্রদায়মধ্যে একটী গুরুনমস্কারমন্ত্রে গৌড়পাদশিষ্য গোবিন্দপাদ এবং তচ্ছিষ্য শঙ্কর বলিয়া বর্ণনা।

কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কি কথাগুলি আছে, তাহা ত দেখা উচিত। প্রথম, উক্ত সাম্প্রদায়িক গুরুনমস্কারমন্ত্রেই ব্যাসশিষ্য শুক, শুকশিষ্য

গৌড়পাদও বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রটী লক্ষ্য করিলে গৌড়পাদকে কেবল শুকশিষ্য না বলিয়া শুকপুত্রও বলা চলে।

"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং
শক্তিং চ তৎপুত্র-পরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং
গোবিন্দযোগীন্দ্র-মথাস্য শিষ্যম্ ॥১
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং
চ হস্তামলকং চ শিষ্যম্।
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যা-
নস্মদ্‌গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি॥"২

এখানে পরাশর পর্যান্তকে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং গোবিন্দযোগীকে শিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাস শুক ও গৌড়পাদকে শিষ্য বা পুত্রপদদ্বারা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তথাপি পরাশরের পুত্র ব্যাস, ব্যাসের পুত্র শুক—ইহা প্রসিদ্ধ কথা বলিয়া "তৎপুত্র পরাশরং চ" বাক্যের পুত্র শব্দের সহিত ব্যাস ও শুককে অন্বয় করায় বাধা নাই। কথা কেবল গৌড়পাদ সম্বন্ধে। কিন্তু পুত্র-শব্দের পূর্ব্বে নারায়ণ ব্রহ্মা বশিষ্ঠ ও শক্তি এই চারি জনে পিতাপুত্রসম্বন্ধ গ্রহণ করা যায় বলিয়া পরবর্ত্তী পরাশর ব্যাস শুক ও গৌড়পাদ এই চারিজনকে সেই পুত্র শব্দদ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে না কি? গৌড়পাদের পর আর পুত্র-শব্দ নাই। তাঁহার পর হইতে সম্বন্ধ-বাচী শিষ্য-শব্দই দেখা যায়, এবং ইহা অথ-শব্দ দ্বারা পৃথক্‌ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং গৌড়পাদকে শুকপুত্র বলায় বাধা হয় না। বস্তুতঃ এই সম্প্রদায়মধ্যে এইরূপ প্রবাদ এখনও বর্ত্তমান।

পক্ষান্তরে ইহাতে অনুকূল যুক্তিও আছে। বায়ুপুরাণ ও দেবীভাগবত পুরাণে ব্যাসের অনুরোধে শুকদেবের বিবাহের কথা ও তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যার কথা আছে। তন্মধ্যে এক পুত্র, "গৌর" যথা—বায়ুপুরাণে ৭০ অধ্যায়ে—

"কালী পরাশরাজ্জজ্ঞে কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম্।
দ্বৈপায়নাদরণ্যাং বৈ শুকো জজ্ঞে গুণান্বিতঃ ॥ ৮৪
উৎপদ্যন্তে পীবর্য্যাং ষড়িমে শুকসূনবঃ।
ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ৮৫
কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈব যোগমাতা ধৃতব্রতা।
জননী ব্রহ্মদত্তস্য পত্নী সা ত্বণুহস্য চ ॥ ৮৬

দেবীভাগবতে আছে—

পিতৄণাং সুভগা কন্যা পীবরীনাম সুন্দরী।
শুকশ্চকার পত্নীং তাং যোগমার্গস্থিতোঽপি স ॥৪০
স তস্যাং জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুর এব হি।
কৃষ্ণং গৌরং প্রভুঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতং তথা ॥৪১
কন্যাং কীর্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় ত্বণুহায় মহাত্মনে ॥৪২
অণুহস্য সুতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।
ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যা সমুদ্ভবঃ ॥"৪৩

এস্থলে শুকপুত্র গৌরকেই গৌড়পাদ বলিয়া সম্প্রদায়মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে। অতএব গুরু-নমস্কারমন্ত্রের বক্তব্যটী এতদ্দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইল। অবশ্য আপত্তি হইবে—গৌরকে গৌড় করা সঙ্গত নহে। কিন্তু ঘোড়াকে যখন ঘোরা বলিবার রীতি আছে এবং তাহার নানারূপ সমর্থনও আছে, তখন এই প্রবাদকে অগ্রাহ্য করা কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচ্য। অতএব গৌড়পাদকে শঙ্করের নিকট না আনিয়া শুকের নিকট লইয়া যাওয়ায় যুক্তির অনুকূলতাই দেখা যায়।

অবশ্য ইহাতেও আপত্তি হইবে—শঙ্কর, গৌড়পাদকে নিজ কারিকাভাষ্যমধ্যে—

"য স্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং
পাদ-পাতৈর্নতোঽস্মি"

এই বাক্যে গৌড়কে পরমগুরু বলায় এবং গুরুর গুরুকে পরমগুরু বলিবার রীতি থাকায়, গৌড়পাদকে শঙ্করের নিকটবর্ত্তী বলাই সঙ্গত বলিতে হয়। কিন্তু পরমগুরুকে পূজ্যাভিপূজ্য পদদ্বারা বিশেষিত করায় গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন ও অতি সম্মানার্হ বলিতে বাধা হয় না। গুরুর গুরু—পরম

গুরু, কিন্তু তাঁহার গুরু, ও তাঁহার গুরু—ইত্যাদির জন্য পৃথক্ নাম না থাকায় পরমগুরুপদের কোন রূঢ়ার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, অর্থাৎ গুরুর গুরুতেই আবদ্ধ করিবার কারণ দেখা যায় না। অবশ্য পরাৎপরগুরু শব্দের দ্বারা পরমগুরুর গুরুকে গ্রহণ করিবারও রীতি আছে। কিন্তু তাঁহার গুরু, তাঁহার গুরু—ইত্যাদি ধারা বুঝাইবার জন্য ত কোন শব্দ নাই। অতএব পূজ্যাভিপূজ্য বিশেষণটী পরমগুরুতে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া গৌড়পাদকে গুরুগোবিন্দপাদের গুরু না বলিয়া আরও প্রাচীন বলিতে বাধা নাই।

তাহার পর সাম্প্রদায়িক অন্য প্রবাদ এই যে, গৌড়পাদ—সিদ্ধযোগী, ব্যাসের মত এখনও বিদ্যমান। তিনিই যোগদেহে আসিয়া শঙ্করের চাক্ষুষ বিষয় হইয়াছিলেন। এই প্রবাদটী গৌড়পাদকে প্রাচীন করিবার পক্ষে অনুকূলই হইবে, প্রবাদ বলিয়া অবিশ্বাস করিলে শঙ্করগৌড়পাদসাক্ষাৎকার প্রবাদটীই অবিশ্বাস করিব না কেন? অসম্ভব প্রবাদ বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে যোগশক্তিতে অবিশ্বাস করিতে হয়, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানও অসঙ্গত হয়। অতএব শঙ্করগৌড়পাদসাক্ষাৎকারের প্রবাদটী, এই প্রবাদ ও পুরাণবচনদ্বারা, গৌড়পাদ স্থূলদেহী হইলে খণ্ডিত হইল, আর সূক্ষ্ম দেহী হইলে সমর্থিত হইল। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর প্রথম যুক্তিটী সিদ্ধ হইল না। দ্বিতীয়—পূজ্যাভিপূজ্য পরমগুরু বলিয়া উল্লেখটী সন্দিগ্ধহেতুতে পরিণত হইল। পক্ষান্তরে ইহার বিরুদ্ধে বলা যায়—শঙ্কর, গৌড়পাদকে "সম্প্রদায়বিদ্ আচার্য্য" বলিয়াছেন, এই সম্প্রদায়বেত্তৃত্ব প্রাচীনে যত সম্ভব হয়, তত অর্ব্বাচীনে সম্ভব হয় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর এই দ্বিতীয় যুক্তিটীও সন্দিগ্ধহেতুতে পরিণত হইল। তৃতীয়—গুরুনমস্কারমন্ত্রের প্রকৃত অর্থও পূর্ব্বপক্ষীর বিরুদ্ধই হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে পুরাণবচন, সাম্প্রদায়িক প্রবাদ এবং শঙ্করের সম্প্রদায়বিদ্ উক্তির দ্বারা গৌড়পাদ শুকের নিকটবর্ত্তীই হন, শঙ্করের নিকটবর্ত্তী হন না। অবশ্য এই সবও সম্ভাবনাই, নিশ্চয় নহে; তবে ইহা পূর্ব্বপক্ষীর সম্ভাবনা হইতে অধিক সম্ভাবিতই বটে।

তাহার পর শুকের নিকটবর্ত্তী গৌড়পাদ—এই কথায় আরও ভাবিবার বিষয় আছে, যথা—

১। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকটার্থকার, গৌড়পাদকে শুকশিষ্য বলিয়াছেন, যথা—

"তৎসূনুশ্চ শুকদেবঃ তচ্ছিষ্যশ্চ গৌড়পাদাচার্য্যঃ যথোপদিষ্টমেব রচয়াম্বভূব। তদেবং বেদাচার্য্য-পরম্পরয়া আগতং মায়াবাদম্"—ইত্যাদি।

২। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যে গৌড়পাদকে শুকশিষ্য বলা হইয়াছে। যথা—"তথাচ শুকশিষ্যঃ গৌড়পাদাচার্য্যঃ—" ইত্যাদি।

কেহ হয়ত বলিবেন—ইহা শাঙ্করভাষ্য নহে। কিন্তু আমরা বলি—হউক তাহাই, তথাপি এই প্রাচীন ভাষ্যে "গৌড়পাদ শুকশিষ্য"—এই অংশ সমর্থিত হইল।

অতএব গৌড়পাদকে শঙ্করের নিকটবর্ত্তী করিতে অধিক বাধাই আছে, কিন্তু শুকের নিকটবর্ত্তী করিতে তাদৃশ বাধা নাই—ইহাই বলিতে হইবে।

তাহার পর শঙ্করপ্রশিষ্যরচিত প্রাচীন বিদ্যার্ণব তন্ত্রের বাক্যে ব্যাস ও শঙ্করের মধ্যে প্রায় ৫০ পুরুষ ব্যবধান দেখা যায়। আরও তাহাতে দুইজন গৌড় দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারাও শঙ্করের গুরুর গুরু হন না। অতএব ইহাও গৌড়পাদের প্রাচীনত্বে অনুকূল সন্ধান। এজন্য "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" ও "অদ্বৈতবাদ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। অতএব গৌড়পাদ বুদ্ধের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত বলিতে হয়।

এখন বলা যাইতে পারে—গৌড়পাদ তাঁহার কারিকা মধ্যে বুদ্ধের নাম করিয়াছেন, সুতরাং তিনি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী শুকের নিকটবর্ত্তী বা শিষ্য নহেন।

কিন্তু এই কথাও যে নিশ্চায়ক নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ হয় না। কারণ, গৌড়পাদের উক্ত

"বুদ্ধ" প্রাচীন বুদ্ধও হইতে পারেন। শুনা যায়—ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ ব্যাসের সময় অর্থাৎ ৩১০১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ছিলেন। এই বুদ্ধ তিনিই হইতে পারেন। আর প্রাচীন কালে যে বহু বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাহা উভয়বাদিসম্মত কথা।

তাহার পর ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্যে দেখা যায়—"আকাশে চ বিশেষাৎ" (২।২।৪) সূত্রে শঙ্কর শ্রুতির দ্বারা, পরে যুক্তির দ্বারা এবং তৎপরে সুগতবাক্যদ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতেছেন। সুতরাং সুগত বুদ্ধ হইতে অন্য বুদ্ধ ছিলেন—ইহাই বলিতে হয়।

তত্ত্বসংগ্রহে দেখা যায়—শান্তরক্ষিত বেদের নিমিত্তশাখায় বুদ্ধের কথা আছে—বলিতেছেন। উপনিষদেও বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের বীজ দেখা যায়। ইহাও প্রাচীন আচার্য্যগণের মত। পুরাণেও যে বুদ্ধোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও প্রাচীন বুদ্ধের কথাই বলিয়া বোধ হয়।

ব্যাসকে যতই আধুনিক করা যাউক, বুদ্ধের পূর্ব্বে বলিতেই হইবে। আর ব্যাস,উপবর্ষ,শবর ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতি ভাষ্যকারকে বুদ্ধমতের উল্লেখ করিতে দেখিয়া তত্তদুক্ত মতকে আধুনিক বলিলে সেই ভাষ্যকারগণকে সূত্রার্থে অনভিজ্ঞ ভ্রান্ত বলিতে হয়। অথবা সূত্রগ্রন্থগুলিকেও আধুনিক বলিতে হয়। বস্তুতঃ সূত্রকারগণ প্রাচীন বৌদ্ধমতেরই খণ্ডন সূত্র-মধ্যে করিয়াছেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে। আর এইসব ভাষ্যকার যাহা বলিলেন, তাহা বুদ্ধের অনুসরণ, কিন্তু বুদ্ধ বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়া বৈদিক গুরুর শিষ্য হইয়াও কাহারও অনুসরণ করিলেন না—ইহা নিশ্চিতই অতি অপূর্ব্ব যুক্তি বটে! সুতরাং মাণ্ডূক্যকারিকায় বুদ্ধ নাম দেখিয়া প্রাচীন বুদ্ধ স্বীকার করায় এই সব বাধা থাকে না। কিন্তু প্রাচীন বুদ্ধ না স্বীকার করিলে কত অধিক বাধার সম্মুখীন হইতে হয়,তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

তাহার পর মাণ্ডূক্য কারিকায় যে কয় বার বুদ্ধশব্দ বা বুধ্ ধাতুনিষ্পন্ন পদব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলে গৌড়পাদের বৌদ্ধত্ব সম্ভাবনা আরও কমিয়া যায়, তথায় বুদ্ধ শব্দ যেখানে যেভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এই—

"প্রতি**বুদ্ধশ্চ** বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।২।২
ক এতান্ **বুধ্যতে** ভেদান্ কো বৈ
তেষাং বিকল্পকঃ। ২।১১
স এব **বুধ্যতে** ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥২।১২
তথা ভবত্য**বুদ্ধানা**মাত্মাঽপি মলিনোমলৈঃ॥৩।৮
জ্ঞেযাভিন্নেন সং**বুদ্ধ**স্তং বন্দে দ্বিপাদাং বরম্।৪।১
এবং হি সর্ব্বথা **বুদ্ধৈঃ** অজাতিঃ পরিদীপিতা। ৪।১৯
প্রতি**বুদ্ধ**শ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে। ৪।৩৪
মিত্রাদ্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য সং**বুদ্ধো** ন প্রপদ্যতে। ৪।৩৫
গৃহীতং চাপি যৎকিঞ্চিৎ প্রতি**বুদ্ধো** ন পশ্যতি ॥৪।৩৫
অসৎস্বপ্নোঽপি দৃষ্ট্বা চ প্রতি**বুদ্ধো** ন পশ্যতি।৪।৩৯
জাতিস্তু দেশিতা **বুদ্ধৈঃ** অজাতেস্ত্রসতাং সদা। ৪।১২
দ্বয়াভাবং স **বুদ্ধৈব** নির্নিমিত্তো ন জায়তে। ৪।৭৫
বুদ্ধাঽনিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবম্।৪।৭৮
বস্তুভাবং স **বুদ্ধৈব** নিঃসঙ্গং বিনিবর্ত্ততে। ৪।৭৯
বিষয়ঃ স হি **বুদ্ধানাং** তৎসাম্যমজমদ্বয়ম্। ৪।৮০
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বিজ্ঞেয়ং সদা **বুদ্ধৈঃ**প্রকীর্ত্তিতম্।৪।৮৮
আদি**বুদ্ধাঃ** প্রকৃত্যৈব সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সুনিশ্চিতাঃ।৪,৯২
আদৌ **বুদ্ধা**স্তথা মুক্তা **বুধ্যন্তে** জ্ঞতিনায়কাস্ত ৪।৯৮
ক্রমতে ন হি **বুদ্ধস্য** জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তাপিনঃ।
সর্ব্বেধর্ম্মাস্তথাজ্ঞানং নৈতদ্ **বুদ্ধেন** ভাষিতম্।৪।৯৯
বুদ্ধা পদমনানাত্বং নমস্কুর্ম্মো যথাবলম্। ।১০০

অর্থাৎ এ স্থলে "প্রতিবুদ্ধঃ, বুধ্যতে, বুধ্যতে, অবুদ্ধানাং, সংবুদ্ধঃ, বুদ্ধৈঃ, প্রতিবুদ্ধঃ, সংবুদ্ধঃ, প্রতিবুদ্ধঃ, প্রতিবুদ্ধঃ, বুদ্ধৈঃ, বুদ্ধা, বুদ্ধা, বুদ্ধা, বুদ্ধানাং, বুদ্ধৈঃ, আদিবুদ্ধাঃ, বুদ্ধাঃ, বুধ্যন্তে, বুদ্ধস্য, বুদ্ধেন, বুদ্ধা,—এই ২২টী বুদ্ধ বা বুধ্ ধাতুঘটিত শব্দ আছে। এস্থলে "নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্"(৪।৯৯) এই স্থলের বুদ্ধ-শব্দ ভিন্ন সবগুলিই যোগার্থপ্রধান শব্দ বলিতে হয়, কেবল এই শব্দটী হইতেই এক 'বুদ্ধ'কে

পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন "বুদ্ধস্য" এই একটী একবচনান্ত বুদ্ধ শব্দ ভিন্ন সবগুলিই বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানা ও জ্ঞানী অর্থে অন্য সকলগুলি এবং "বুদ্ধেন" (৪।৯৯) পদের বুদ্ধ শব্দটী কেবল ব্যক্তি-বাচকশব্দ বলিতে হয়।

বুদ্ধ শব্দ যে জ্ঞানীকে ও পরমাত্মাকে বঝায় তাহা মহাভারত পুরাণ ও উপনিষদে বহু স্থলেই দেখা যায়। "নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব" ইহা বেদান্তীর যত পরিচিত, এত আর কাহারো নহে। এস্থলে "বুদ্ধ" শব্দের অর্থ গৌতম বুদ্ধ বলা যেমন অসঙ্গত, কারিকার "বুদ্ধস্য" "বুদ্ধানাং" প্রভৃতি শব্দেও গৌতমবুদ্ধ বলা তদ্রূপ অসঙ্গত হইবে। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম হয় বলিয়া বুদ্ধ শব্দে জ্ঞানী ও পরমাত্মা উভয়ই সিদ্ধ হয়। উপনিষদাদির স্থল উদ্ধৃত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। অতএব এখানে যে একটী ব্যক্তিবাচক বুদ্ধ শব্দ, তাহাও বুদ্ধমতের সহিত বেদান্তমতের পার্থক্য দেখাইবার জন্য হওয়ায় এই বুদ্ধাদি শব্দ-প্রয়োক্তা গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলিয়া কল্পনা করা কখনই সঙ্গত মনে হয় না। এ সম্বন্ধে বহু কথাই বলা যায়, বাহুল্যভয়ে বিরত রহিলাম।

তাহার পর এই কারিকামধ্যে **বেদান্ত**শব্দ, **তৈত্তিরীয়** উপনিষদের নাম করিয়া উল্লেখ, **বৃহদারণ্যকের মধুব্রাহ্মণের** নাম করিয়া উল্লেখ এবং উহাদের বাক্য এবং **মুণ্ডক** ও **কঠোপনিষদের** অদ্বৈতবোধক বাক্য যথাযথ-ভাবে স্বমতের অনুকূলে উদ্ধার করা হইয়াছে—দেখা যায়। এতদ্দ্বারা "গৌড়পাদ বেদান্তী নহেন"—ইহা যে কি করিয়া বলিবার ইচ্ছা হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিম্নে বেদান্তপ্রভৃতি শব্দ ও তাহাদের বাক্যের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল—

বেদান্ত শব্দ যথা—

"স এব বুধ্যতে ভেদানিতি **বেদান্ত**নিশ্চয়ঃ ।২।১২
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং **বেদান্তেষু** বিচক্ষণৈঃ ।২।৩১

উপনিষদের নাম, যথা—

"রসাদয়ো হি যে কোশা
ব্যাখ্যাতা**স্তৈত্তিরীয়কে** । ৩।১১
দ্বয়োর্দ্বয়োর্**মধু**জ্ঞানে
পরংব্রহ্ম প্রকাশিতম্ । ৩।১২ (বৃঃ উঃ ২।৫)

উপনিষদের বাক্য যথা—

নানাত্বং **নিন্দ্যতে** যচ্চ
তদেবং হি সমঞ্জসম্ । ৩।১৩
(কঠঃ ২।১।১১, বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯)

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ
সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা ॥ ৩।১৫ (ছাঃ ৬।১।৪-৫, বৃঃ উঃ ২।১।২০, মৈঃ ৬।২৬, কৌঃ ৪।১৮)

নেহ নানেতি চাম্নায়াৎ
ইন্দ্রোমায়াভিরিত্যপি । ৩।২৪
(কঠঃ ২।১।১১, বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯, ২।৫।১৯)

সম্ভূতেরপবাদাশ্চ সম্ভবঃ
প্রতিষিধ্যতে । ৩।২৫ (ঈশ ১৪)

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাতং
নিহ্নুতে যতঃ । ৩।২৬
(বৃঃ ৪।৫।১৫, ২।৩।৬, ৩।৯।২৬)

অজমনিদ্রমস্বপ্নং
অনামকম্ অরূপকম্ । ৩।৩৬
(সুবাল, কঠ, মৈত্রায়ণি প্রভৃতি)

বিপ্ততে ন হি নানাত্বং তেষাং ক্বচন কিঞ্চন ।৪।৯১
(কঠঃ ২।১।১১, বৃঃ উঃ ২।৫।১৯, ৪।৪।১৯)

সোঽহমমৃতত্বায় কল্পতে" ৪।৯২। ইহা বহু উপনিষদে দৃষ্ট হয়।

এইরূপ বহু বাক্যদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ইহা বেদান্ত শাস্ত্রই।

তাহার পর এই কারিকামধ্যে বেদ শব্দেরও স্বমতের অনুকূলেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যথা—

বীতরাগভয়ক্রোধৈর্মুনিভি**র্বেদপার**গৈঃ । ২।৩৫

কেবল ইহাই নহে, ইহাতে ব্রহ্ম শব্দেরও যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। নিম্নে তাহারও তালিকা প্রদত্ত হইল—

ব্রহ্মশব্দ যথা—

"উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।৩।১

পবব্রহ্ম প্রকাশিতম্—৩।২

ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যম্—৩।৩৩

তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম—৩।৩৫

নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎতদা। ৩।৪৬

প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্" ৪।৫

পবিশেষে যে সব **যুক্তি তর্ক** ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যে সব **দৃষ্টান্ত** প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যে **মতবাদ** সিদ্ধ কবা হইয়াছে, তাহা বেদান্তেবই ব্রহ্মবাদ ভিন্ন আব কিছুই নহে।

তাহার পর এই মাণ্ডূক্য কাবিকাটী মাণ্ডূক্যোপনিষদের ব্যাখ্যাভিপ্রায়ে বচিত। ইহাব চাবিটী অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে মাণ্ডূক্য উপনিষদেরই ব্যাখ্যা দেখা যায়। অপব তিনটী অধ্যায়ে বেদান্তেব ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই প্রতিপাদিত হইযাছে। শঙ্কবাচার্য্য ইহাই তাঁহার মতেব মূল বলিয়া বুঝিয়াই এই কারিকার ভাষ্য কবিয়াছেন, কাবিকাব বাক্য ব্রহ্মসূত্রের নিজ ভাষ্যমধ্যেও উদ্ধৃত কবিযাছেন এবং গৌডপাদকে "সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্য"ও বলিয়াছেন। সম্প্রদায়েব মধ্যে প্রবাদও এই যে, কাবিকাভাষ্য শঙ্কবাচার্য্য কৃত। গৌডপাদ, শঙ্কবেব সহিত সাক্ষাৎকাবকালে এই কাবিকাভাষ্যেব কথা শঙ্কবকে জিজ্ঞাসাই কবিয়াছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পণ্ডিত মহাশয়গণেব মতে মাণ্ডূক্য উপনিষৎ, তাহাব কারিকা এবং তাহাব ভাষ্য কোনটীই বৈদিক মতবাদীব নহে, কিন্তু কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতেব রচনা—ইহা কি কবিয়া বলা হয়, তাহা আমাদেব বুদ্ধিব অগম্য। এইসব কারণে আমাদের মনে হয়, গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্য অভিন্নমতাবলম্বী। গৌড়পাদের মধ্যে যে সব কথা আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মতবাদ গঠন করিয়াছেন। আব এতদুভয় অবলম্বন করিয়া বেনামী লঙ্কাবতাবসূত্র ও নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিককারিকাপ্রভৃতি গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব মত সাম্যদ্বাবা অথবা বৌদ্ধগ্রন্থে বহুলপ্রযুক্ত শব্দেব প্রয়োগদ্বাবা গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলা যায় না।

অনেককে বলিতে শুনা যায় যে, গৌডপাদেব মত ও শঙ্কবেব মত অভিন্ন নহে, এবং লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিককাবিকাদি গ্রন্থে এই বিজ্ঞানবাদ বা শূন্যবাদ বিস্তৃতভাবে আছে বলিয়া এবং বুদ্ধের শূন্য সৎস্বরূপ—ইহা প্রমাণিত কবিবাব বহু হেতু থাকায় গৌডপাদেব কাবিকাই ইহাদের অনুকরণ মাত্র। গৌডপাদ বৌদ্ধবাদকেই উপনিষদ্‌ব্যাখ্যাব দ্বাবা প্রদর্শন কবিয়াছেন এবং শঙ্কর তাঁহাব অনুবর্ত্তন কবিয়াছেন।

কিন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কাবণ, যাঁহাবা গৌডপাদ ও শঙ্করের মতকে ভিন্ন বলেন, আমাদেব মনে হয়—তাঁহাবা এই মতদ্বয়ের আলোচনা ন্যায়াদিশাস্ত্রসাহায্যে কবেন নাই। তাঁহারা ইংবাজি বিদ্যাব সাহায্যেই ইহা স্বয়ংই কবেন; আব তজ্জন্য তাঁহাবা ইঁহাদেব গ্রন্থই বুঝেন নাই ইহাই মনে হয়।

দ্বিতীয়—বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ উক্ত বৌদ্ধ গ্রন্থে বিস্তৃত থাকায় তাহাব সাব গৌডপাদের কাবিকা না হইযা, তাহাবা গৌড়পাদেব কারিকারই বিস্তৃতরূপ—বলিব। কাবণ, সূত্রজাতীয়গ্রন্থভিন্নস্থলে বিস্তাব হইতে সংক্ষেপ কল্পনা করা অপেক্ষা, সংক্ষেপ হইতে বিস্তাবেব কল্পনাই সহজ ও স্বাভাবিক।

তৃতীয—শঙ্কব ও গৌডপাদ অগ্রে বুদ্ধ ছিলেন, পরে বৈদিক হইয়াছেন বা বৌদ্ধেব নিকট শিক্ষা কবিয়াছেন—এরূপ কোন প্রবাদাদি শুনা যায় না। প্রত্যুত বুদ্ধ ও নাগার্জ্জুন প্রভৃতি হিন্দু থাকিয়া হিন্দুশিক্ষালাভেব পর বুদ্ধ হইয়াছেন—ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ—গৌড়পাদের সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন ইহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চম—বৈদিক সম্প্রদায় চিরকালই বৌদ্ধ-

সম্প্রদায়কে ঘৃণাই করিত, মেশামেশি ত দূরের কথা—ইহা উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায়।

অতএব আচার্য্য গৌড়পাদ ও শঙ্কর—ইহারা বৌদ্ধমতকে বৈদিক পরিচ্ছদে মণ্ডিত করিয়াছেন—এই কল্পনা সত্যানুসন্ধিৎসু হিন্দুর কল্পনা নহে। যাহা হউক, এই জাতীয় যতই চিন্তা বা আলোচনা করা যাইবে, ইহাতে বৌদ্ধগণই হিন্দুর নিকট ঋণী, ইহাই সাব্যস্ত হয়, নিশ্চয় না হইলেও সম্ভাবনাধিক্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ গৌড়পাদ বৌদ্ধ নহেন—ইহাই সত্য।

অবশেষে একটী কথা বক্তব্য—আজকাল কেহ কেহ আবার মাণ্ডূক্য কারিকার চতুর্থ অধ্যায়টীকে পৃথক্ একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ বলেন। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়কে বৌদ্ধ গ্রন্থ বলেন না—ইহাও দেখা যায়।

কিন্তু একথা নিতান্তই অসঙ্গত। কারণ, অনেক শ্লোক উভয় ভাগেই দেখা যায়, একই প্রকার যুক্তিও তদ্রূপ উভয় স্থলে দেখা যায় এবং একই প্রকার শব্দ ও ভাষা উভয় ভাগেই দেখা যায়। যদি চতুর্থ ভাগটী প্রথমাদি ভাগের সহিত ঐরূপে ঐক্য না হইত, তাহা হইলে উক্ত কল্পনা সঙ্গত হইত। বাহুল্যভয়ে দৃষ্টান্ত আর প্রদর্শন করিলাম না। আর এইরূপ পার্থক্য কল্পনা করিতে হইলে কোন প্রাচীন আচার্য্যও এরূপ করিয়াছেন—ইহা প্রদর্শন করাও আবশ্যক হয়, কিন্তু তাহা হয় নাই। আর তাহা না করিয়া আজ এতদিন পরে নিজে নিজে কল্পনা করিলে তাহাকে অমূলক কল্পনাই বলিতে হইবে। আর এরূপ কল্পনা করিলে বাচস্পতি মিশ্রের কথা স্মরণ করিয়া বলি—যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, চতুর্থ অধ্যায়ের যুক্তিপ্রভৃতি যদি অদ্বৈতবেদান্তমতের বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলেও ওরূপ কল্পনা করা যাইত। পক্ষান্তরে "নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্" বাক্যদ্বারা গ্রন্থকার বৌদ্ধমতের তিরস্কারই করিতেছেন। এই সব কারণে এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত।

কেহ বলিয়াছেন—গৌড়পাদ কোন ব্যক্তির নাম নহে, উহা সম্প্রদায়বিশেষের নাম। কিন্তু ইহাও ভ্রম। এজন্য মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অচ্যুত সংস্করণের বেদান্তভূমিকা ২১ পৃষ্ঠা পাদটীকা দেখিতে পারা যায়। আমরা এ বিষয় আর আলোচনা করিলাম না।

কেহ বলিয়াছেন—কারিকার ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের "জ্ঞেয়াভিন্নেন" পদের দ্বারা বিজ্ঞানবাদই পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞেয় ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই—ইহা কি ব্রহ্মবাদও নহে? বিজ্ঞানটী স্থির বলিলে ব্রহ্মবাদ হয়—ইহা যে পঞ্চদশীকারও বলিয়াছেন।

আবার কেহ বলিয়াছেন—ধর্ম্ম শব্দটীর অর্থ শঙ্করাচার্য্য বুঝিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ইহাতে বক্তা, হয়—শঙ্করাচার্য্য হইতে বড় পণ্ডিত, অথবা শঙ্করের কথাই তিনি বুঝেন নাই—বলিতে হয়। কারণ, যে যাহাকে ভ্রান্ত বলে সে, হয়—তাহা অপেক্ষা অধিক জানে, অথবা তাহাকে বুঝে না—এইরূপ হয়। এই বক্তা কোন্‌টী হইতে চাহেন? সাহস বটে!

এইরূপ নানা লোকে নানা কল্পনা করিয়া আমাদের আত্মহত্যা যজ্ঞেরই পূর্ণসাধন করিতেছেন। আমরা এ জাতীয় পুরোহিতের জন্য চিন্তা করি না; কারণ, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ গত, বর্ত্তমানে কয়েকজন মাত্র বিদ্যমান; বলা বাহুল্য, ইঁহাদের দ্বারা সমাজ বিচলিত হয় নাই এবং হইবে কিনা জানি না, কারণ, ইঁহারা অন্তরে অন্তরে নাস্তিক। তবে যে সব ব্যক্তি শাস্ত্র চর্চা করিতে নূতন প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহাদের জন্য চিন্তা হয়; তাঁহাদের জন্যই এই প্রতিবাদ লিখিতে হইল। অবশ্য এই শাঙ্করাদ্বৈতধ্বংসের জন্য বহুদিন হইতে বহু আচার্য্য বহু চেষ্টাই করিয়াছেন। আচার্য্য

ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ, বিজ্ঞানভিক্ষু বলদেব ও তদনুগামী অসংখ্য পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহা ধ্রুবতারার ন্যায় নাবিকের পথপ্রদর্শকই হইয়া রহিয়াছে, হিমালয়ের ন্যায় অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান। অতএব এই সব পণ্ডিতের জন্য চিন্তা নাই—চিন্তা কেবল বিদ্যার্থীদিগের জন্য।

পরিশেষে একটী কথা এই যে, যাহা সন্দিগ্ধ বিষয়, তাহার কথা তুলিয়া সাধারণের ধর্ম্মকর্ম্মাচরণের মূলীভূত বিশ্বাসকে বিচলিত করা কি পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য? সত্যের অনুরোধে নিশ্চিত বিষয়কে প্রচার করা অবশ্যকর্ত্তব্য এবং মহৎকার্য্য, কিন্তু সন্দিগ্ধ বিষয়ের প্রচার কি ততোধিক অনিষ্টকর নহে? আজকাল আমাদের স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস বা সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারিলে ভাল চাকরী হয়, সাংসারিক উন্নতি হয় বটে, কিন্তু এই পথ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও অনুসরণ করা কি কর্ত্তব্য? অধিকারিভেদে শিক্ষাদানের আবশ্যকতা বুঝিয়া ভ্রান্ত বিষয়ের সাহায্যে সত্যে উপনীত করিবার রীতি কি সর্ব্বদেশে অনুসৃত হয় না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, বেদ না মানিয়া অলৌকিক বিষয়ে এ সংসারে অবিসংবাদি সত্য কি কিছু জানিতে পারা যায় বা প্রকাশ করিতে পারা যায়? অথবা জানিবার বা প্রকাশ করিবার সম্ভাবনাও আছে? যিনি যাহাই সত্য বলিয়া বলিবেন, তাহাতেই কি সন্দেহ উৎপাদন করা যায় না? তর্কশাস্ত্রের দ্বারা কি "হয়"কে "নয়" এবং "নয়"কে "হয়" করা যায় না, এবং স্থলবিশেষে অনেককে যথা ইচ্ছা বুঝাইতেও পারা যায় না? আর এই জন্যও কি শ্রুতিপ্রমাণ আমাদের মধ্যে অভ্রান্ত অবিসংবাদি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে না? আর সেই শ্রুতিপ্রমাণরূপ মাণ্ডূক্যাদি উপনিষদের বিষয়ে এবং সেই গৌড়পাদকে বৈদিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের বিশ্বাসরূপ শিষ্টাচারবিষয়ে, জিজ্ঞাসার ভান করিয়া সত্যনিষ্ঠা ও সত্যানুসন্ধিৎসার ছল করিয়া সাধারণের মনে সন্দেহের সঞ্চার করিবার প্রয়াস কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উচিত কার্য্য হইতেছে? আজ যে, শিক্ষার সাহায্যে বলির পশুকে সারমেয় বলিয়া বুঝাইয়া ব্রাহ্মণপরিত্যক্ত সেই পশুর দ্বারা দুর্ব্বৃত্তগণের উদরপূর্ত্তির ন্যায় আমাদের আত্মহত্যা যজ্ঞের অনুষ্ঠান সাধিত হইতেছে—তাহা কি পণ্ডিত মহাশয় ভাবিবার সময় পান না? আজ শিক্ষার স্থান যে কাশী কাঞ্চী নবদ্বীপ না হইয়া প্যারিস বার্লিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা কি পণ্ডিত মহাশয়গণ দেখিতেছেন না? আজ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা বা তন্মধ্যস্থ বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণসন্তান বিলাতে গিয়া মাতৃমাংসভোজী হইয়া গৃহে ফিরিতেছে, তাহা কি পণ্ডিত মহাশয়গণ বুঝিতেছেন না? আজ সেইভাবে প্রণোদিত হইয়া কি বিলাতি প্রথায় বেদাধ্যয়নের প্রবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি জাগরূক হয় নাই? এইরূপে আজ কি আমাদের শেষ অবলম্বন ও শেষ আশ্রয়স্বরূপ বেদবেদান্ত বিদ্যা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতে বসি নাই! আর এই জন্য আমাদের আত্মহত্যা যজ্ঞের শেষ আহুতি প্রদানের সময় কি উপস্থিত হয় নাই? বেদের পৌরুষেয়ত্ব, গৌড়পাদের বুদ্ধত্ব এবং শঙ্করের ভ্রান্তিঘোষণা—আজ আত্মহত্যা যজ্ঞের শেষ আহুতি, এই আহুতি আজ আমাদের পূজ্যাভিপূজ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত কয়েকজন দিবার জন্য দণ্ডায়মান। কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্। ভগবান্ এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শিল্প-সাধনা

সম্পাদক

মহাকবি দান্তে (Dante) বলিয়াছেন, "যিনি যে চিত্র অঙ্কিত করেন, তিনি তাহা হইয়া যাইতে না পারিলে সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন না।" শিল্পীর সমগ্র মনকে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে চিত্রাকারকারিত করিয়া চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। এই অবস্থায় শিল্পীর মানস-হ্রদে অন্য কোন বৃত্তি-তরঙ্গ উঠিতে পারে না। যোগী যোগ-সহায়ে যেমন চিত্তবৃত্তিসমূহ নিরোধ করিয়া মনকে এক লক্ষ্যে প্রধাবিত করেন, চিত্র-ধ্যানে শিল্পীর মন তেমন সেই অবস্থায় উপনীত হয়; ঐ সময়ে বহির্জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ-সঞ্জাত বাসনা তাঁহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে সক্ষম হয় না। চিত্রাঙ্কনের সময় তাঁহার মন, বাহিরের চক্ষুকর্ণাদি যে রাজ্যে যাইতে পারে না—সেই ভাব-রাজ্যে অবস্থান করত তাহার সঙ্গে তদাকার-কারিত হইয়া কাগজে বা প্রস্তরাদিতে ঐ ভাবকে রূপায়িত করে। বিষয়, কৌশল এবং পদ্ধতি যাহাই হউক, চিত্রে ভাবকে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করিতে হইলে শিল্পীকে চিত্রের ভাবের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে হয়। হিন্দুশাস্ত্র এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনার দিক দিয়া বলিয়াছে, "ন দেবো দেবম্ অর্চ্চয়েৎ", 'দেবতা ভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা করিতে পারেন না।' "শিবভূতঃ শিবম্ যজেৎ," যেমন 'শিবস্বরূপ ব্যক্তিই শিবের যজন করিতে পারেন', তেমন যিনি চিত্রের ভাবের সঙ্গে একীভূত বা অভেদ হইতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ শিল্পী। ধর্ম্মরাজ্যে এই একত্ব এবং অভেদত্বের পূর্ণ পরিণতি বেদান্ত শাস্ত্রে তাদাত্ম্য, অনন্যত্ব ও তদাকারকারিত্ব বলিয়া ব্যাখ্যাত। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে দ্বৈত জ্ঞান থাকে না, দুই এক হইয়া তখন মন এক অখণ্ড ভাবভূমিতে বিচরণ করে।

ধর্ম্ম-সাধককে এই সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে যেমন "সাধন চতুষ্টয়ের" ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, শিল্প-সাধককেও তেমনই অনেক সাধন সহায়ে চিত্রের ভাবের সঙ্গে আপনাকে এক করিবার কৌশল অর্জ্জন করিতে হয়। শিল্পী প্রথমতঃ মনোদর্পণে চিত্রের 'মডেল' দেখিয়া তুলি-কার সাহায্যে উহাকে রূপদান করেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য, পশুপক্ষী ও মানব হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদেবীর চিত্রাঙ্কনে পর্য্যন্ত এই একই মূলতত্ত্ব (principle) অনুবর্ত্তিত হয়। বিখ্যাত চৈনিক শিল্পী ছিং-হো বলিয়াছেন, "কাল্পনিক ও জাগতিক প্রত্যেক বিষয়ের সহজ ও প্রগাঢ় ভূয়োদর্শন অর্জ্জন কর তোমার হাত হইতে যথোপযুক্ত স্বাভাবিক চিত্র আপনা আপনি বাহির হইবে।" শিল্পী যদি তাঁহার মানস-দর্পণে চিত্র পূর্ণরূপে দর্শন না করিয়াই চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা হইলে উহার অভিব্যক্তি কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না, কারণ ঐরূপ স্থলে চিত্র স্বাভাবিক ভাব-ব্যঞ্জনা বর্জ্জিত হইবে; আর যে চিত্রে এই সহজ ভাবের প্রকাশ নাই, তাহা ললিতকলা নামেরই যোগ্য নয়।

চিত্র-শিল্পী ওয়াংলি বলিয়াছেন, "হোয়া পর্ব্বতের গঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান না থাকিলে আমি কি প্রকারে তাহা চিত্রিত করিব? এমন কি যদিও আমি হোয়া পর্ব্বত দর্শন করিয়াছি এবং ইহাকে তুলিকা সাহায্যে অঙ্কিত করিয়াছি, তথাপি ইহাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া আমি নিজেই মনে করিয়াছি। পরে আমি আমার নির্জ্জন গৃহ-কক্ষে,

আমার বাহিরে পরিভ্রমণ কালে, আমার শয্যায়, আমার আহারে, আমার বিহারে, অপরের সঙ্গে আমার বাক্যালাপের মাঝখানে এবং আমার সাহিত্য-রচনার মধ্যেও এই পর্ব্বতকে আমি বিশেষ ভাবে মনে রাখিয়া ভাবিয়াছি। একদিন যখন আমি আমার কক্ষে বিশ্রাম করিতে ছিলাম, তখন আমার গৃহের সম্মুখ দিয়া একদল বাদ্যকর বাজনা বাজাইয়া যাইতেছিল; আমি বাদ্যের শব্দ শুনিয়া হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈস্বরে বলিলাম, "আমি তাহা পাইয়াছি।" যথার্থই আমি যাহা খুঁজিতে ছিলাম, তাহা বাদ্যের শব্দের মধ্যে পাইলাম। অতঃপর আমি আমার পূর্ব্বাঙ্কিত হোয়া পর্ব্বতের চিত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উহার নূতন এক চিত্র আঁকিলাম।' নিউটন কি এই প্রকারেই বৃক্ষ হইতে আপেল পতনের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন? ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিল্প-সাধকের মন যখন কেবল বস্তুর বাহ্য দৃশ্যের উপর নিবদ্ধ না থাকিয়া উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাবের সহিত একীভূত হয়, যখন অভ্যাসের দ্বারা মন বস্তুর আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মত্বের ধারণা করিয়া সেই বস্তুময় হইয়া যাইবার শক্তি লাভ করে, তখন মাত্র সেই বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক এডিংটন বলেন, 'পদার্থবিদ্ যে জগৎ অধ্যয়ন করেন, সেই জগৎ প্রকৃত জগতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বিজ্ঞান আজও এই জগতের সন্ধান পায় নাই। শিল্পীর অনুপ্রেরণা কিম্বা ঋষির অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে এই জগৎ অভিব্যক্ত।' আমরা আধ্যাত্মিক সাধন ও শিল্প-সাধনকে এক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আধ্যাত্মিক সাধকের প্রত্যক্ষানুভব এবং শিল্প-সাধকের দৃষ্টির (artist's vision) মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। শিল্পীর রসজ্ঞান ও তত্ত্ব-বোধের মধ্যে ভূমা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও উহা ইন্দ্রিয়জ দর্শন বা প্রতিভামাত্রেই পর্য্যবসিত, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক সাধকের ভূমার প্রত্যক্ষানুভূতি অতীন্দ্রিয় এবং যথার্থ। অশুদ্ধ বাসনা এবং আমিত্বের লেশবর্জ্জিত পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে না পারিলে ভূমার প্রত্যক্ষানুভব অসম্ভব। এই পবিত্রতা সাধকের প্রকৃতিকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে ভূমার প্রত্যক্ষানুভূতির অধিকারী করে, কিন্তু শিল্প-সাধনের জন্য ইহার প্রয়োজন হয় না; শিল্পীর দৃষ্টি (vision) তাঁহার প্রকৃতির উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ধর্ম্ম-সাধকের ভূমার অনুভূতি তাঁহার অজ্ঞানতাকে চিরতরে নাশ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত শাশ্বত শান্তির রাজ্যে লইয়া যায়, কিন্তু শিল্পের রসাস্বাদজনিত আনন্দ (aesthetic enjoyment) ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া পরক্ষণেই শিল্পীকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের ক্রীতদাসে পরিণত করে। কাজেই শিল্পীকে ব্রহ্মবিদ্ ঋষি বলা যায় না। তবে 'শিল্প মূলতঃ যে চৈতন্যের বিকাশ' তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিল্পের দার্শনিকতত্ত্ব—রসানুভূতির মধ্যে আমরা "আনন্দ-রূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি"র আভাস পাই।

কোন বস্তুবিশেষ হইতে উহার আবরণ উন্মোচিত হইলে তৎসম্বন্ধে সমুদয় অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া বিষয়গত ভাব যেন চৈতন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি বোধি-দ্রুমনিম্নে বুদ্ধত্ব লাভ করিলে সেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিবার পূর্ব্বে যোগবলে ঐ মহাকাব্যের ঘটনাবলীর অভিনয় জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার অর্দ্ধাঙ্গ বাল্মীকি এবং অর্দ্ধাঙ্গ মহাবীর। রামায়ণকার বাল্মীকি

রামায়ণ-চিন্তায় ক্রমে রামগতপ্রাণ মহাবীরে পরিণত হইতেছেন, ইহাই মূর্ত্তিটীতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কথিত আছে, বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো প্রাণহীন প্রস্তর খণ্ডের বহিরাবরণের অভ্যন্তরে প্রাণবন্ত মূর্ত্তি লুক্কায়িত আছে মনে করিয়া এক অপার্থিব ভাবে বিভোর থাকিয়া যন্ত্রসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া বাটালির আঘাতে তাহাকে বাহির করিতেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধদ্বারা দৃশ্যের সঙ্গে দ্রষ্টার সম্পূর্ণ একীভূত হওয়ার ফলে এই অবস্থা উপস্থিত হয়। একহার্ট (Eckhart) বলিয়াছেন, "তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) সন্দর্শন করিবার সময় আমি ও ঈশ্বর এক।" এইরূপে বিখ্যাত সুফী সাধক জালালউদ্দীন হাসেমী আপন স্বরূপ বা আত্মার সঙ্গে জগৎকারণ ব্রহ্মের অভিন্নত্ব অকস্মাৎ একদিন প্রত্যক্ষানুভব করিয়া বলিয়া উঠিয়া ছিলেন, "আমি কি আশ্চর্য্য, আমাকে নমস্কার।"

দার্শনিক পণ্ডিত হিগেল "রিলিজিয়ন" এবং "ফিলসফির" ন্যায় আর্টকেও অনন্তের সহিত শান্ত জীবের মিলনের অন্যতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্ট মানে কোন বস্তু-বিশেষের ধ্যানে সেই অনন্ত চিরসুন্দরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাওয়া। তিনি আর্টকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) প্রতিরূপক আর্ট (Symbolic art), (২) কাল্পনিক আর্ট (Romantic art) ও (৩) উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ আর্ট (Classic art)। প্রথমটীর প্রতীক বিশেষের মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য নাই কিন্তু ইহা ব্যঞ্জনা দ্বারা অনন্তের ভাব উদ্বুদ্ধ করে। দ্বিতীয়টীতে বস্তুর সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভাবের দ্যোতনাই বেশী। তৃতীয়টীর মধ্যে বস্তুরও সৌন্দর্য্য আছে এবং উহা যে ভাবের অভিব্যক্তি দান করে তাহারও সৌন্দর্য্য আছে। উভয় সৌন্দর্য্য একত্রিত হইয়া শান্তকে অনন্তের সন্ধান দেয়। "সর্ব্ববিধ যথার্থ আর্টের একটা সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, তাহা অতি সাধারণ বিষয়কেও বিশ্বজনীন, সনাতন ও অনন্তভাবের অভিব্যক্তি প্রদান করে।" * হিগেল বলেন, 'যাহা জড় বলিয়া পরিচিত, তাহা জড় নহে—প্রস্তরীভূত চৈতন্য (intelligence petrified)।' প্রকৃত পক্ষেও জড়মূর্ত্তির মধ্যেও চৈতন্য আছে বলিয়াই উহা আত্মচৈতন্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। "The lord of nature is one with the lord of human soul"—Wallace 'প্রকৃতির স্রষ্টা পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত।' এই জন্যই জড়-প্রতিমা সাধকের সাধনপ্রভাবে জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত হইয়া উঠেন। দার্শনিক শেলিং (Schelling)ও এইরূপ মতবাদের সমর্থক। তিনি বলিয়াছেন, 'প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উপাদান আছে, প্রকৃতি সুপ্ত চৈতন্য।'

ভাববিশেষ যে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শিল্প-সাধকের মনোরাজ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিত্র এবং মূর্ত্তিসমূহের ভাবের অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করিলেই বোঝা যায়। অজন্তার দেয়ালগাত্রে অঙ্কিত দেবদেবী, মনুষ্য, পশুপক্ষী ও লতাপাতা সকলেই যেন কি এক অব্যক্ত ভাষায় তাহাদের মনের কথা ভাবগ্রাহী দর্শকের নিকট বলিতে সতত উদগ্রীব! ইলোরার কৈলাস মন্দিরের প্রস্তর-খোদিত দেবদেবীগণ এবং মহাবলীপুরমের 'রথনামীয়' গোটা পাহাড়-খোদিত মন্দির-গাত্রের "গঙ্গাবতরণ"

* "All true art whether it awakes awe of admiration, laughter or tears, whether it melts the soul or steels it to endurance, has a common characteristic, and that is, to raise the single instance, the prosaic or commonplace art, into its universal, eternal and infinite significance,"—Logic of Hegal by W. Wallace.

গুণগ্রাহী দর্শককে যেন পুরাণের কাহিনী শুনাইতে ব্যগ্র। ভারতের শিল্প-সাধক বহিরিন্দ্রিয়ের ভ্রমাত্মক দর্শনের উপর নির্ভর না করিয়া অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধ্যানে দেবদেবীগণকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়া মূর্তিতে সেই অলৌকিক দর্শন রূপায়িত করিয়াছেন। মাদুরার মন্দিরস্থিত বালক সুন্দরমূর্তির মূর্তিতে অভিব্যক্ত "রুদ্ধশ্বাস ব্যগ্রতা" (breathless eagerness)র সঙ্গে "উল্লাসজনক বিস্ময়" (rapturous surprise) শিল্প-রসজ্ঞের প্রকৃতই উপভোগ্য। নেপালের স্বয়ম্ভুনাথ বৌদ্ধ মন্দিরের স্বর্ণনির্মিত পঞ্চতারা মূর্তি এবং অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী নেপালী বৌদ্ধ এবং সকল শ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন। তিব্বতের লামা-পুরোহিত এই মন্দিরের অধ্যক্ষ। তারামূর্তি পাঁচটী এক প্রকার কুলুঙ্গির উপর বসান এবং ইঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এক প্রকার অপরূপদর্শন সামুদ্রিক সর্পের লেজ ধরিয়া কয়েকজন সমুদ্রকন্যা দণ্ডায়মানা। মূর্তিকয়টী যেন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হইয়া দর্শকের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে উদ্যত। ইঙ্গিতে মনের ভাব ব্যক্ত করা ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় ভাস্কর দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিতে যাইয়া তাঁহাদের পশ্চাতে যে শাস্ত্রীয় উপাখ্যান আছে তাহার প্রতি যে লক্ষ্য রাখিতেন তাহা সর্ব্বত্র প্রকট। মূর্তির মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ফোটাইয়া তুলিয়া ধ্যান এবং যোগের অভিব্যক্তিদানের আগ্রহ ভারত-শিল্পের বিশেষত্ব। মূর্তিতে বা চিত্রে ধ্যান বা অন্তর্মুখীভাব বিকশিত করার মধ্যেই ভারতীয় শিল্পীর কৃতিত্ব।

প্রাচ্য শিল্পী—বিশেষ করিয়া ভারত-শিল্পী চেষ্টা করিয়াছেন মানুষের ভিতরকার দেবত্বকে বাহিরে প্রকাশ করিতে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অদৃশ্য শক্তির বহিঃপ্রকাশ তাঁহাকে রূপ দিতে। অরূপের মধ্যে রূপ—অনাত্ম জড়ের মধ্যে আত্মার সন্ধান করা ভারত-শিল্পের প্রাণ। এই জন্যই বহিরঙ্গ প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের স্থান ভারত-শিল্পে নিম্ন। দৃশ্যমান জড়প্রকৃতি হইতে সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া অরূপকে রূপায়িত করাই ভারতের শিল্প-সাধনার আদর্শ। ভারতের শিল্প-সাধক সন্ধান করিয়াছেন—বৃক্ষলতাগুল্মের মধ্যে ভাষা, নির্ঝরিণীর মধ্যে গীতিকাব্য, মৃত্তিকা কাষ্ঠ ও প্রস্তরের মধ্যে সজীব মূর্তি এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে ঈশ্বর।
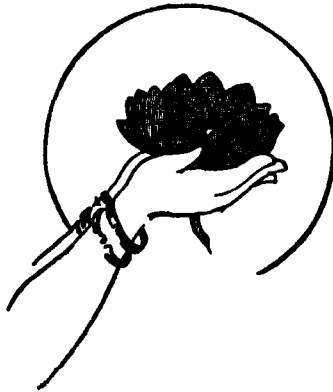
যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে

শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়

(১)

তখনো নিবিড় নিশা মৃত্যুময়ী মেঘ ঘন-ঘোর
ঘেরিয়া ভুবন
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে ব্যাপ্ত করি অনন্তের সীমা
সুপ্তিতে মগন।
মহাশ্মশানের বুকে মেতেছিল বীভৎস নর্ত্তনে
নগ্ন প্রেতকুল,
অমঙ্গল মৃত্যুধ্বনি গরজি উঠিল দিগ্বিদিকে
আর্ত্ত জীবকুল।

(২)

সে মহাদুর্য্যোগ রাতে দিক্‌ভ্রান্ত মানব পথিক
মৃত্যু সিন্ধু-জলে
আশাহীন অন্ধকারে কোন অভিশাপ বহি শিরে
ডুবিল অতলে।
কোটী কোটী মর্ম্মভেদী বেদনা-মূর্চ্ছিত গীতি বুঝি
পেয়েছিল সাড়া
আঁধারে উঠিলে ফুটি সুমঙ্গল প্রেমের মুরতি
দীপ্ত ধ্রুবতারা।

(৩)

স্বার্থে স্বার্থে মহারণ প্রাণে প্রাণে রক্তের পিপাসা
ভীষ্ম হানাহানি
অধর্ম্মের তীব্র বিষে ছেয়ে গেল ভুবন মণ্ডল—
নীলাম্বরখানি।
মহাপ্রলয়ের মাঝে এলে নামি নীলকণ্ঠ ওগো
ওগো ভোলানাথ
তোমার আশিস্‌-বাণী বিচ্ছুরিত হ'ল পূর্ব্বাকাশে
রক্তিম প্রভাত।

(৪)

ঘোর বিভীষিকা ঘন মৃত্যু ঘেরা অন্ধ সে নিশীথে
বিদারি স্তব্ধতা
ফুৎকারিলে তব শঙ্খে সুগম্ভীর গভীর নিনাদে
হে বিশ্ব-দেবতা।
তখনো শোনেনি কেহ, পশেনিক তব বজ্রবাণী
কাহারো শ্রবণে
করেনিক প্রাণভরা তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বহন
জীবনে জীবনে।

(৫)

তারপর একদিন রক্তিম গরিমাদীপ্ত প্রাতে
তোমার সন্তান
ভুবনে উড়ায়ে এল দেশে দেশে দিক্‌দিগন্তরে
বিজয় নিশান।
কে গো তুমি এসেছিলে কোন অমরার ওগো কবি
দিলেনাক ধরা ;—
তব প্রেম-কণা আজি বহ্নি-দীপ্ত সমুজ্জ্বল তেজে
জ্বালাইল ধরা।

(৬)

তোমার মহান্ প্রেম অলক্ষিত পথে তরঙ্গিয়া
ধায় দিকে দিকে
তোমার দুর্জ্জয় বাণী জিনে আনে নিখিল অবনী
একটী নিমিষে।
তোমার মহিমালোকে উদ্ভাসিত নিখিল গগন
মুগ্ধ দিবা যামী।
লহ গো প্রণতি মোর ভক্তি-অশ্রু ধৌত নিরমল
হে জীবন স্বামী।

(৭)

*   *   *   *   *

সেদিন ফাল্গুন প্রাতে নবীন চম্পক বসন্তের
শুভ আমন্ত্রণে
কি যেন আনন্দ-ব্যথা সঘনে উঠিল হিল্লোলিয়া
কাননে কাননে।
সুগোপন স্পর্শ তব কি জানি কি অজানিত সুখে
জাগাল ধরাবে
অসীম আপন প্রেমে ধরা দিল সীমার বন্ধনে
এ বিশ্ব মাঝারে।

(৮)

এলে বালকের বেশে স্নিগ্ধহাস্য রঞ্জিত অধর
সুন্দর সরল।
মূর্খতার আবরণে ঢাকিলে তোমার অপরূপ
কেন এত ছল ?
কে জানিত এনেছিলে লুকাইয়ে অন্তরের তলে
অক্ষয় রতন।
কার তরে এসেছিলে এত কবি ঢাকিয়া নিজেরে
করিয়া গোপন ?

(৯)

ভক্তি অশ্রু জলে তব কে জানিত ছিল লুক্কায়িত
ত্যাগের অশনি।
রেখেছিলে দীনবাসে যত্নভরে সঙ্গোপনে ঢাকি
সত্য মহামণি।
ভাবে ভোলা ঢল ঢল নয়নের কোণে ছিল জ্বালা
জ্ঞানের তপন।
মায়াঢাকা জীবনের ছদ্ম বেশ তলে কোথা ছিল
তনু জ্যোতিঘন।

(১০)

কোথা তব পীতধটি কোথা করে মুরলী মোহন
কোথা এলে ভুলি ?
কেনগো মধ্যাহ্নে গোঠে বৃক্ষচ্ছায়ে বাঁশরী তোমার
উঠেনা আকুলি।
কোথা তব পাঞ্চজন্য কেমনে ধ্বনিবে মহাবাণী
উদাত্ত গম্ভীরে।
এলে কেনো ম্লানবেশে নিরঞ্জন পল্লী ছায়াতলে
দীনের কুটীরে।

(১১)

হে মহান্ সত্যবহ্নি সুপ্রদীপ্ত জ্ঞানের ভাস্কর
বজ্র গরজন।
কোথা সে মূরতি তব উচ্ছৃঙ্খল প্রলয়ের মাঝে
উদ্দাম ভীষণ।
কোন ছলে এলে যদি দীনহীন দরিদ্রের বেশে
ধুলিম্লান কায় !
ব্যর্থ মায়া বেশ তলে চিদঘন কাঞ্চন তনু
লুকাবে কোথায় ?

(১২)

ক্ষীণ শীর্ণ দীর্ণ প্রাণ শত তপ্ত গ্লানি জরাতুর
মৃত্যুর লাঞ্ছনা।
শোকের কালিকা ক্লিষ্ট, অসহন অপমান জ্বালা
সুতীব্র গঞ্জনা
দূর হোক আজি সব ভাঙো ভাঙো মোহস্বপ্ন ঘোর
রুদ্র দণ্ডে তব
নাচো ওগো ভয়ঙ্কর উন্মত্ত ভয়াল নৃত্য সেই
সুন্দর তাণ্ডব।

(১৩)

দাও আজি নব প্রাণ শত আজি নবীন জীবন
নবরক্ত ধার
আনো আজি মহাবীর্য্য, হৃদয়ে জাগুক মহাবল
রণে মরিবার।
তখন তুলিব শির মহামৃত্যু হতে ঊর্দ্ধ পানে
বিদারি গগন
লিখে দিয়ো মহামন্ত্র বহ্নি লয়ে ললাট ফলকে
সত্যের লিখন।

(১৪)

জ্বালিলে যে হোমানল সুবিজন জাহ্নবী তীরে
তপোবন তলে,
ত্যাগপূত বহ্নিশিখা দীপ্তালোকে উঠিল উদ্ভাসি
মহামন্ত্র বলে।
ঝাঁকে ঝাঁকে এল প্রাণী জ্বালাইতে হৃদয়ের শিখা
জ্ঞানের আলোকে।
হৃদয়ে হৃদয়ে স্বামী কি লিখিয়া দিলে পুণ্যলিখা
বক্তের ঝলকে।

(১৫)

তব অশরীরী মূর্ত্তি বিরাজিছে কাল সিংহাসনে
বিস্মৃতি ভেদিয়া।
তোমার অশনিবাণী জাগিয়াছে হৃদয়েব তলে
তিমিব ছেদিয়া।
এসেছিলে ক্ষণতবে অত্যুজ্জ্বল আলোকের রূপে
রাজরাজেশ্বর
ধন্য কবি যুগান্তেরে ধন্য কবি ভূলোকেব ধূলি
হে ব্রাহ্মণবব।

(১৬)

তোমার উদার গাথা গেল ভাসি দিক্ দিগন্তরে
মঙ্গল পবনে
উল্লঙ্ঘিয়া শৈলরাজি উত্তরি' দুস্তর সিন্ধুনীল
বিবাট ভুবনে
আজি কোন মন্ত্র বলে বেঁধে আনে পূরব পশ্চিম
একপ্রেমডোরে
বিচিত্রের মাল্যখানি শোভে আজি হে বিশ্ববিধাতা
তব কণ্ঠ পরে।

(১৭)

শতাব্দীব প্রান্তে বসি হেবি আজি নির্ব্বাক বিস্ময়ে
তব মহালীলা
প্রেমেব পতাকা তব কোন মন্ত্রে ক্ষণিকেব মাঝে
নব আববিলা।
কি গাহিব তব গান ভাষাহারা ক্ষুদ্র এ হৃদয়
মুগ্ধ মূক প্রাণ
অসীম মহিমাতলে লক্ষ কোটী মানবের হিয়া
স্তব্ধ হে মহান্।

(১৮)

ছিন্নহোক সব মায়া হে প্রদীপ্ত সত্য মহীয়ান্
ওগো জ্যোতির্ম্ময়।
প্রকাশ কব হে তব অপরূপ বিবাট মূবতি
সে মহিমময়।
তাবপর ভেঙ্গে দাও চূর্ণকব অহঙ্কাব সীমা
ক্ষুদ্র জীবনেব
আপনারে হারাইব তোমা মাঝে বিপুল সঙ্গীতে
মহা মিলনেব।